"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

পরিচয়
বর্ষ ৪১ । সংখ্যা ৬-৭
পৌষ-মাঘ । ১৩৭৮

বাঙলাদেশ ঃ 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়'

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঙলাদেশ আজ মুক্ত। ইতিহাসের এক প্রচণ্ড অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরবে বাঙলাদেশের আবালবৃদ্ধবণিতা আজ ভূষিত। অমিত শৌর্য নিয়ে স্বদেশের সত্তা, স্বার্থ ও সম্মানের জন্য সার্থক সংগ্রাম করেছেন সেখানকার বাঙালিরা। ভারতভূখণ্ডে এমন উদ্দীপনাময় ঘটনার সাক্ষাৎ কখনও মিলেছে মনে হয় না। বিশ্বের বৃত্তান্তে নতুন সংযোজনা করতে চলেছে বাঙালি—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়।

ভারতের সৌভাগ্য ও গর্ব আজ এই যে পরম সৌহার্দ্য নিয়ে, বিপুল বিদেশী প্রতিকূলতায় সন্ত্রস্ত না হয়ে, বাঙলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে সাধ্যাতিরিক্ত সহায়তা দিতে সে চেয়েছে এবং পেরেছে। আর আমরা—যে যেখানে আছি—যারা মায়ের কোলে শুয়ে প্রথম কথা বলতে শিখি বাঙলা ভাষায়, তারা তো জানি যে বাঙলাদেশে মমতার ডোরে সবাইকে বেঁধেছে আর অপরাজেয় করে তুলেছে এই ভাষা। আর তাই আমাদের মনে এক অনাস্বাদিতপূর্ব প্রসন্নতা—বহু আশা ভঙ্গে দীর্ণ আঘাতের জীবনেও যেন একটা পরিণতি এসেছে, সার্থকতার সংকেত মিলেছে।

একটু আতিশয্য হচ্ছে কি? হয় তো হোক—কিছুটা বাগবাহুল্য আমাদের সহজাত। সেদিন দিল্লীতে আলিঙ্গন করলাম বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে—পরিশ্রান্ত অথচ সতত তেজঃপুঞ্জ সেই নেতা, 'জনগণমন অধিনায়ক' যার প্রকৃত বিশেষণ, স্পষ্টোচ্চারিত বাঙলায় সমবেত জনতাকে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, আবেগে আমি আজ আকুল'। এই আবেগে একটু যেন বিহ্বল হয়ে পড়া বাঙালিদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য নয় কি? একে অস্বীকার করা একপ্রকার অনৃতাচরণ। তবে বিহ্বলতাই যে শেষ কথা নয়, তা মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালিরাই

তো সর্বস্ব দিয়ে প্রমাণ করেছে, বাঙালির বুকের গহনে যে তেজ তা তো প্রোজ্জ্বল হয়ে জগতকে চমৎকৃত করেছে। একটু আতিশয্য হয় হোক—নতুন দিনের আলোয় নিজেকে সংবরণ করে নিতে শুধু যেন আমাদের বিলম্ব না হয়।

বাঙলাদেশের মুক্তি শুধু একটা ভৌগোলিক-রাষ্ট্রিক পরিবর্তন আনেনি, সমসাময়িক ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতিকেও এ-ঘটনা প্রভাবিত না করে পারে না। তবে প্রথমেই বলতে চাইছি যে ভবিষ্যতের কাছে প্রতীক্ষা আমাদের যাই হোক না কেন, আপাতত আমরা অনেকে অসম্ভব একটা ছটফটানি থেকে নিস্তার যে পেয়েছি এ-বড়ো কম কথা নয়।

মাসের পর মাস যখন আমরা বাঙলাদেশের স্বীকৃতি চেয়েছি অথচ আশানুরূপ সাড়া মেলেনি, মাসের পর মাস ধরে যখন মাঝে মাঝে রীতিমতো সন্দেহ হয়েছে যে হয়তো বা ভারত সরকার সদিচ্ছা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে ব্যর্থ হচ্ছে, তখনকার কথা মনে পড়ছে। মে মাসে (১৯৭১) মধ্যকলকাতায় এক মস্ত সভায় বক্তৃতা করার পর কয়েকজন ছেলে পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন বলল, 'আচ্ছা, দেখুন, অজয়বাবু (অজয় মুখোপাধ্যায়) আর আপনি আর ক'জন মিলে বাঙলাদেশের স্বীকৃতির দাবিতে আমরণ অনশন করছেন না কেন?' অনেকে হেসে উঠল, আমাকেও একটা জবাব দিতে হলো, কিন্তু গান্ধীজী-প্রবর্তিত অনশন প্রথায় বিশ্বাসী না হয়েও কথাটা আমার মনে ধাক্কা দিয়েছিল। বাস্তবিকই ভেবেছিলাম, অন্তত মনের ছটফটানিকে শান্ত করার একটা উপায় বুঝি ওভাবে মিলতেও পারে!

ঘটনাচক্রে, প্রায় একই সময়ে, "পোল্যাণ্ড" নামে যে-সচিত্র মাসিক কেউ কেউ দেখে থাকবেন, তাতে লক্ষ্য করলাম Szmul Zygielbojm-এর ছবি এবং জীবনকথা। ইনি পোল্যাণ্ডের ইহুদিসংঘের নেতা ছিলেন এবং হিটলারী অমানুষিকতায় যখন ওয়ারশ শহরের ইহুদি বাসিন্দারা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তখন সাহায্যের আশা নিয়ে লণ্ডনে যান (১৯৪০-৪১)। সেখানে প্রচুর সহানুভূতি অথচ বাস্তব সহায়তায় অনিচ্ছা কিম্বা অপারগতা দেখে নিজের যথাসাধ্য প্রয়াসের ব্যর্থতার ফলে তিনি ভগ্নহৃদয় অবস্থায় আত্মহত্যা করেন এবং একপত্রে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার বিবৃতি রেখে যান। এক খ্যাতনামা পোলিশ কবি এই ঘটনা নিয়ে লেখা তাঁর রচনার আখ্যা দেন: "The Bloodshed unites us" এবং এই নামে একটি গ্রন্থের সমালোচনা (যা থেকে এ-ঘটনা সম্বন্ধে আরও

কিছু জানা গেল) আমার চোখে পড়ল "Polish Perspective" মাসিকপত্রের ১৯৭১ সালের ৭-৮ সংখ্যায়।

"পরিচয়" পত্রিকার বিগত শারদীয় সংখ্যার জন্য না লিখে পার পাব না জেনে যখন লিখতে বসেছিলাম তখন মন ছিল ভারাক্রান্ত। বাঙলাদেশ ছাড়া অন্য বিষয়ে লিখব না, অথচ লিখতে বসে দেখলাম—পারছি না। কয়েকটা পাতা কোনোক্রমে লিখেও আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না; কেবল ভাবলাম এভাবে কথা সাজিয়ে যাওয়া একেবারে বৃথা, নিজেকে এবং অপরকে বঞ্চিত করা, তাই কিছুতেই লেখা সম্পূর্ণ করতে পারলাম না। মনের ছটফটানি থেকে গেল। কথা বলে আর লিখে কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়ার রাস্তাও আমার যেন বন্ধ হয়ে গেল।

নিছক নিজের কাছে তাই বাঙলাদেশের মুক্তি একটা প্রায়-অবিরাম যন্ত্রণার প্রায়-সম্পূর্ণ উপশম ঘটিয়েছে। আজও চিন্তা মুক্তিপর্বোত্তর অধ্যায়ের বিবিধ সমস্যা নিয়ে—চিন্তাজ্বর থেকে নিস্তার তো নেই—কিন্তু এ-চিন্তা হলো গুণগতভাবে ভিন্ন ও পূর্বের মতো যন্ত্রণাদায়ক নয়। কর্মের বলে বাঙলাদেশ নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। নকল মুদ্রা দিয়ে স্বাধীনতা আমরা কিনেছিলাম—দেশবিভাগের বিনিময়ে ভারত ও পাকিস্তানের সদাসন্ত্রস্ত অস্তিত্ব আরম্ভ হয়েছিল। ইতিহাসের কাছে রক্তের যে-ঋণ আমাদের ছিল, তা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সমেত বাঙলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিশোধ করেছে। বাঙালি বলে সবার আমাদের বুক আজ তাই দশ হাত; আর ভারতীয় বলেও এই আনন্দ যে বাঙলাদেশের অসমসাহস সংগ্রামে এদেশের জনতা, এদেশের জওয়ান আর এদেশের কর্তৃপক্ষ প্রকৃত সহযোগিতা দেবার সৌভাগ্য পেয়েছে।

আগেই বলেছি যে ভারত ভূখণ্ডে এমন উদ্দীপক ঘটনাও বড় একটা হয়নি। 'চিরদিন আছি ভিখারীর মতো জগতের পথ পাশে', রবীন্দ্রনাথের এ-বিলাপ তো মিথ্যা নয়। বিপুল আমাদের এই দেশ তো বিশ্বের দৃষ্টিতে এখনও প্রায় অকিঞ্চিৎকর—আধুনিক জগতের ইতিহাসে এদেশের অবদান নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে কি ঘটে না-ঘটে তাতে পৃথিবীর চেহারা বদলায় না—আমরা থেকেছি বিদেশী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, তারপর বড়লোকের গরিব কুটুম্বের মতো স্বাধীন হয়েও কেমন যেন ত্রস্ত, সংকুচিত, পরনির্ভর। গান্ধীজী মতবাদের দিক থেকে অহিংসা প্রতিরোধ প্রবর্তন করে জনতাকে ইতিহাসের

মঞ্চে নায়করূপে বসাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে প্রকৃত মুক্তি সংগ্রামের নিশানা দেখাতে চেয়েও দেখাতে পারলেন না। এদেশে আমরা রয়ে গেলাম, এখনও বহুলাংশে রয়েছি পরমুখাপেক্ষী—ইতিহাস সৃষ্টি যেন আমরা করতে অপারগ, আমরা চলব পরানুকারী ধারায়, অনুসরণ করব যে আদর্শ ও কার্যক্রম অপরাপর দেশে প্রচারিত ও পরীক্ষিত হচ্ছে, মান্ধাতাগন্ধী এই দেশে আমরা চলব ধীরপদে, সাবধানী পথিকের মতো পথ ভুলবার ভয়েই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকব। নিজেদের চিন্তায় আস্থা নেই, নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস নেই; অনিশ্চয়ের ভাবনায় জড়তাগ্রস্ত হয়ে থাকাই যেন এদেশের বিধিলিপি। এই যে দুঃসহ অধ্যায়—ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে যার অশুভ সূচনা—তার অভিসমাপ্তি যেন ঘটালো বাঙলাদেশের বজ্রনিপাতী অভ্যুদয়, দশদিক চকিত করে বাঙলাদেশের অকুতোভয় অভ্যুত্থান ইতিহাসে নতুন দিগন্ত যেন উন্মোচিত হলো। "প্রভাতসূর্য এসেছ রুদ্র সাজে, দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে"—একথাই বারবার মনে হয়েছে বাঙলাদেশের প্রচণ্ড নির্মম অনল পরীক্ষার দিনগুলিতে।

বিস্তৃত উল্লেখের প্রয়োজন নেই, কিন্তু একথা নিঃসন্দিগ্ধ যে মুজিবুর রহমানের অনন্য নেতৃত্বে ভাষা ও জাতিগতভাবে বহুধা নিপীড়িত বাঙালি নিজস্ব জাতীয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে—প্রথমে চেয়েছে স্বায়ত্তশাসন এবং পরে অত্যাচারীর অপরিসীম দৌরাত্ম্যের পরিচয় পেয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেছে। অনন্য সেই নেতৃত্ব, কারণ ইতিহাসে এমন নজির কোথাও নেই যে একটা গোটা দেশের জনতা প্রায় সমগ্রভাবে ঐক্যবদ্ধ। সোস্যালিস্ট দেশে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনতার সংহতি ঘোষিত হয়ে থাকে বটে, কিন্তু সেখানে —বাস্তব ঐতিহাসিক কারণে—বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব নেই। নির্বাচনেও তাই দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। ইংলণ্ডের মতো দেশে 'লেবর' পার্টির পক্ষ থেকে একবার বলা হয়েছিল যে আদর্শ অবস্থা হলো 'লেবর দলের' দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ, তার বেশি কাম্য নয়, কারণ অগ্রগমনের পথ নিয়ে নানা মত রয়ে গেছে। কিন্তু বাঙলাদেশে কোনো কোনো ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী চাক বা না-চাক, বিপ্লবেরই বারতা বইতে আরম্ভ করেছিল এবং সেজন্যই মুজিবের নেতৃত্বে দেশবাসী ১৬৯ এর মধ্যে ১৬৭ আসনে তাঁকে জয়ী করল, রৌদ্ররশ্মি দিয়ে যেন লিখলো ইতিহাসের পাতায় 'আমরা নতুন দেশ চাই, নতুন জীবন চাই, মুজিবর এসো, হাল ধরো, চলো এগিয়ে চলি!' সমাজকে যখন ঢেলে সাজাবার মাহেন্দ্রক্ষণ

আসে তখন প্রয়োজন হয় এমনই সংহতি ; এই সংহতি প্রকাশ পেল অভূতপূর্ব এক নির্বাচনের মাধ্যমে—প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব ছিল না, পার্লামেন্টারী রীতি-মাফিক কারও স্বাধীন ভোটাধিকারে বাধা ছিল না, অথচ আওয়ামী দলের বিজয় হলো প্রায় সামূহিক।

সম্প্রতি চিলিতে নির্বাচনের জোরে সমাজতন্ত্রের সমর্থক দলগুলির মিলিত সংস্থা জয়ী হয়েছে, ডক্টর আলেন্দের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে কতকটা কিউবা-র মতোই (যদিও ভিন্ন পথে) সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় এক দুর্গ নির্মিত হয়েছে বলে তাই নিয়ে জগৎজোড়া আলোড়ন দেখা দিয়েছে। মুজিবর রহমান যে-সংহতির নায়ক তার নির্বাচন-সাফল্য আরও অনেক বেশি চমকপ্রদ। তবে সমাজতত্ত্ব বিষয়ে নির্বাচনের প্রাকালে তেমন কোনো ঘোষণা তিনি করেননি—তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল পূর্ব-বাঙলায় বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। হয়তো এটাও ঠিক যে রাষ্ট্র ও সমাজ-তত্ত্বের কচ্‌কাচ সম্বন্ধে মুজিবর রহমান এবং তাঁর অধিকাংশ সহকর্মীর খুব বেশি আগ্রহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও অকাট্য যে পশ্চিম পাকিস্তানী দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে পূর্ববাঙলার সংগ্রামে জনতার দুঃখ-দৈন্য-বঞ্চনার মোচনই ছিল মুখ্য বস্তু ; বাঙলাভাষা নিয়ে যে-আবেগ তা ছিল এরই মর্মস্পর্শী প্রকাশ। তাই অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই স্বাধীন, সার্বভৌম বাঙলাদেশ আজ জগৎকে জানিয়েছে যে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র তার লক্ষ্য। অবশ্য বাঙলাদেশ একটা হানিয়াছাড়া কল্পরাজ্য নয় ; সেখানেও বহুজনের মধ্যে আছে বহুবিধ দুর্বলতা, আছে বহুযুগ-সঞ্জাত গ্লানির জের, মনুষ্যচরিত্র নিখুঁৎ নয় বলে সেখানে নিশ্চয়ই আছে অনেক বিড়ম্বনার সম্ভাবনা। কিন্তু সাম্প্রতিক সংগ্রাম থেকে একথা স্পষ্ট যে প্রায় সর্বজনের সম্মতি নিয়ে বিপ্লব সংঘটনের সামর্থ্য রয়েছে বাঙলাদেশের। অকল্পনীয় যন্ত্রণা ভোগের পর প্রায় এক ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন করে জনজীবন গড়ে তুলবে সেদেশে। ইতিহাসে এটা নতুন সংযোজনা নয় তো কি ?

* * *

গণতন্ত্রের লড়াইয়ে বাঙলাদেশের ভূমিকা যে কত প্রোজ্জ্বল তা বলে শেষ করা শক্ত। গান্ধীজী যে-অহিংসা সার্বজনীন প্রতিরোধের পদ্ধতি প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তার সব চেয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখি বাঙলাদেশে। সংগ্রামের সর্বসংহারী মূর্তি দেখা যাওয়ার আগে মুজিবর রহমানের ডাকে যে হরতাল সেখানে হয়েছে, যাতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে লাটভবনের বাবুর্চি

পর্যন্ত সবাই যোগ দিয়েছে, তা ইতিহাসে অতুলন। সামরিক শক্তি লেশমাত্র ছিল না যে-মুজিবরের হাতে, তাঁরই ডাকে গোটা অসামরিক শাসন পরিপূর্ণ সাড়া দিয়েছে, প্রচণ্ড শাস্তির ঝুঁকি নিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিকূল উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করেছে। ইতিহাসে অপর কোনো উদাহরণ নেই যে জনতার উদ্দীপনার প্রাবল্যে রেডিও স্টেশন হস্তান্তরিত হয়েছে প্রাক্তন কর্তৃপক্ষ স্থানচ্যুত হয়েছে, অথচ বন্দুক থেকে একটা গুলি বেরোয়নি, কেউই হতাহত হয়নি। .৭১ সালের মার্চের প্রথমার্ধে প্রখর পশ্চিম-পাকিস্তানী প্ররোচনা সত্ত্বেও মুজিবর রহমান নির্দেশ দেন যে ব্যাঙ্কে পশ্চিমাদের টাকা নিয়ে লেনদেন বন্ধ থাকবে কিন্তু তার প্রতিটি পাই পয়সা নিরাপদ থাকবে, বাজেয়াপ্ত করা হবে না। অভাবনীয় সাফল্যের সময়ে এ হেন সংযমী, সুশীল ব্যবহারেরও কোনো নজির কোথাও নেই। জাগ্রত জনশক্তি যে অসাধ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে, তারই আভাস তখন আমরা পেয়েছি বাঙলাদেশ থেকে। গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে অটুট রেখে যে বাস্তবিকই জনতার অভ্যুদয় অমোঘ হয়ে উঠতে পারে, তার এমন প্রদর্শনী ইতিহাসে কবে কোথায় দেখা গেছে? ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাই বাঙলাদেশের জাগরণ নতুন এক অধ্যায় সৃষ্টি করেছে বলা একেবারে অত্যুক্তি হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশ নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের আর এক শিক্ষাকে ভাস্বর চিত্রপটে উপস্থাপিত করল। এখনও বিশ্বে জনবিরোধী ধারা নির্মূল হয়নি; এখনও পশ্চিম-পাকিস্তানের দুর্বৃত্ত শাসকদের পৃষ্ঠপোষক শক্তিপুঞ্জ একান্ত প্রকট—যাদের নায়ক হলো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, যারা 'ইউনাইটেড নেশনসে' এবং অন্যত্র নিজেদের খল, ক্রূর, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশ্ববিবেককে পঙ্গু করে রাখল, যাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিপ্লবধুরন্ধর বলে বিঘোষিত মহাচীন জনগণের সর্বত্র-ঈপ্সিত সমাজতন্ত্রের আদর্শকে কালিমালিপ্ত করে ফেললো, যাদের চতুর জগদ্ব্যাপী চক্রান্তের ফলে বাঙলাদেশের সমব্যথী ভারত ও বিশ্বের সমাজবাদী দেশগুলির পক্ষে ত্বরিৎবেগে সেখানকার নিঃসন্দিগ্ধ মুক্তিসংগ্রামকে সহায়তা দেওয়া সম্ভব হলো না। তাই বাঙলাদেশকে নামতে হলো অসম সমরে—আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত পশ্চিমা ফৌজের বিপক্ষে প্রায় শুধু হাতে লড়তে হলো অবর্ণনীয় অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে নিজস্ব মুক্তিবাহিনী গড়তে হলো, জীবনপণ করে প্রায় অসম্ভব পরিস্থিতিতে, বস্তুত একক সংগ্রামের ভয়ঙ্কর সংকল্পে অটুট থাকতে হলো।

মনে হচ্ছে দিল্লিতে ১৯৭১ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে এক সভায় বাঙলাদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা শেষ করতেই শ্রোতাদের মধ্যে একজন বর্ষীয়ান্, যিনি বহুদিন দেশের বিশিষ্ট নেতা বলে পরিচিত এবং কিছুকাল একটি প্রান্তের রাজ্যপালও ছিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'পাকিস্তানী ফৌজের বিরুদ্ধে ক'দিন বাঙলাদেশ লড়তে পারবে মনে হয়?' তাঁর অনুমান কি, এই পাল্টা প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, 'এক পক্ষকাল—তার বেশি কেমন করে চালাবে এই অসম যুদ্ধ?' অন্তরাত্মা প্রতিবাদ করে উঠলেও কিছু বলিনি—আর স্বীকার করছি, বেশ কিছু ভয় ছিল। পশ্চিমবাঙলায় রাজনীতিতে যে নীচতা আর রিক্ততা তার কথা মনে কাঁটার মতো সর্বদাই ফুটে থাকে, আর পূর্ববাঙলায় আমাদেরই মতো মানুষ তো রয়েছে—তাই ভয় ছিল, এ-আগুনের পরীক্ষায় তারা শিরদাঁড়া খাড়া রেখে লড়তে পারবে তো? যুদ্ধে অনভ্যস্ত 'ইংরেজের হুকুমে কয়েকপুরুষ ধরে নিরস্ত্র, আজও সমরশিক্ষার সুযোগে বঞ্চিত, এবং ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলের অধিবাসী কর্তৃক ভীরু বলে নিন্দিত বাঙালি এই প্রায়-অসম্ভব সংঘর্ষে কোথায় দাঁড়াবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল বৈকি! 'আমার সোনার বাঙলা; আমি তোমায় ভালোবাসি' এই গানকে যারা সেই রুদ্র দিনে জাতীয় সঙ্গীত বলে ঘোষণা করে তাদের মনের গড়ন তো যুদ্ধোন্মাদ যন্ত্রমানব থেকে একেবারে আলাদা—পারবে কি তারা নির্মম মনুষ্যত্বহীন শত্রুশক্তির মোকাবিলা করতে, এ-ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সকল দুর্বল সংশয়ের অবসান ঘটালো বাঙলাদেশের মানুষ—এককোটি ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য, কিন্তু অভাব হয়নি মুক্তিযোদ্ধার। যথাসম্ভব সাহায্য এসেছে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে, প্রতিবেশীর কাছ থেকে। কিন্তু তা তো ছিল সর্বদা অ-যথেষ্ট; নির্ভর করতে হয়েছে প্রথমে এবং শেষ পর্যন্ত বাঙলাদেশেরই অন্তর্নিহিত শক্তির উপর। 'ধন্যোঽহম্ কৃত কৃতার্থোঽহম্, সার্থকং জীবনং মম', বলতে পারি আমরা সবাই—অল্পাধিক পরিমাণে আমরা সাক্ষী থেকেছি এই দেদীপ্যমান্ অভ্যুত্থানের।

তাই আমাদের কথা বাদ দিলেও চক্ষুষ্মান বিদেশী পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, বাঙলাদেশের লড়াই মনে পড়িয়ে দিচ্ছে আলজীরিয়ার মুক্তিযুদ্ধকে, যাতে বহু লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশের গণতান্ত্রিকতা মনে পড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকার অষ্টাদশ শতকীয় মুক্তি-সংগ্রামকে। আমাদের কথা না হয় নাই বলি, বিদেশী বহু সাংবাদিক, যাদের পক্ষপাত পরিপূর্ণভাবে পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রতি, তারাও বলতে বাধ্য

হয়েছে হিটলারী নৃশংশতা আর ভিয়েৎনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অমানুষিকতার অনুরূপ ঘটনা বারবার এবং বিপুল ক্ষেত্র জুড়ে, বাঙলাদেশে ঘটেছে। এজন্যই বলা যায় যে এই প্রথম ভারত ভূখণ্ড রাখতে পারল ইতিহাসের বুকে তার প্রকৃত মুক্তিকামনার জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য—এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটল যাতে পরদেশে সংঘটিত বীরকাহিনী মাত্র থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহের যে বঞ্চনা তা অপহৃত হলো। এই প্রথম বাঙালি হিসাবে—এবং বাঙলাদেশের সহায়ক রূপে ভারতবাসী হিসাবে—দুনিয়ার দরবারে বাস্তবিকই আমরা মাথা তুলতে পারলাম। নকলনবিশ বলে নয়, আত্মশক্তির উদ্দীপনায় অপরাজেয় হয়ে ওঠার সামর্থ্য আমরাও রাখি, একথা জগৎ জানল। বারবার বলি এমন ঘটনা আমাদের ইতিহাসে কোথায় কবে ঘটেছে ?

সারা ভারত যে উদ্বেলিত হয়েছে, তার মূল কারণ বাঙলাদেশের এই অকুতোভয় আবির্ভাব। প্রথম দিকে প্রকৃতই, এবং বিশেষ করে বাঙলার বাইরে ও দিল্লির কর্তৃপক্ষীয় মহলে প্রচুর সন্দেহ ছিল বাঙালির সামর্থ্য ও সংকল্পের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অচিরে সে-সন্দেহ দূর হলো এবং সর্বত্র সঞ্চারিত হলো বাঙলাদেশ বিষয়ে এক অদ্ভুত শ্রদ্ধার মনোভাব। পাকিস্তান বিপর্যস্ত হচ্ছে বলে যে সহজ উৎফুল্লতা বহুজনের মনে এসেছিল, এবং তাকে উপজীব্য করে জনসংঘ, স্বয়ং সেবক সংঘ প্রভৃতি অনেক আশা ও পরিকল্পনা করতে থাকে, তাকে একেবারে উপ্‌ছিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি অভিবাদনের চিত্তবৃত্তি এবং সেই সংগ্রামে একাত্ম হওয়ার কামনা। এজন্যই এক কোটি শরণার্থীর ভরণপোষণ নিয়ে কোনো কটূক্তি শোনা যায়নি; এজন্যই আকুমারীহিমাচল বাঙলাদেশের সংগ্রামে যথাশক্তির অধিক সাহায্যও উদ্যত হতে শঙ্কিত হয়নি। এজন্যই পাঞ্জাবী-বহুল ভারতীয় ফৌজে বাঙলাদেশ সম্বন্ধে উপেক্ষার লেশমাত্র দেখা যায়নি—এই প্রথম আমাদের ইতিহাসে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রকৃত সৌভ্রাত্র ও সহজ মানবিক মমতা নিয়ে বাঙলাদেশের মাটিতে যথার্থ মুক্তিফৌজের ভূমিকায় নামতে পেরেছে। হয়তো আমাদের চোখের সামনে ঘটছে বলে আমরা তলিয়ে ভাবি না, কিন্তু বাস্তবিকই এ-ঘটনা হলো যুগান্তকারী, এবং এর সঠিকতম শক্তি হলো বাঙলাদেশের অভ্যুত্থান।

সেই অতুলন অভ্যুত্থানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আজ বাঙলাদেশের নেতাদের। প্রায় সমান দায়িত্ব হলো তার সহকর্মী, সহমর্মী, সহযোগী প্রতিবেশী ভারতের। বাঙলাদেশ এবং ভারত মিলে নতুন ভবিষ্যতের সম্মুখীন আজ—মনে রাখতে হবে ইতিহাসের শিক্ষা যে বিপ্লব ঘটানোর চেয়ে বিপ্লবোত্তর সমাজের সাফল্যসাধন প্রায়ই হয় কঠোরতর। এজন্যই প্রয়োজন, অভিনিবেশ সহকারে পথনির্দেশ ও তদনুযায়ী কর্ম। এজন্যই প্রয়োজন, মোহ আর ভ্রান্তি আর চিন্তারহিত অবিমৃষ্যকারিতাকে সম্পূর্ণ বর্জন। এজন্যই প্রয়োজন, যে ঐক্য প্রকৃত প্রস্তাবে জনশক্তির মূল, সেই ঐক্যের সম্প্রসারণ। এজন্যই প্রয়োজন, যে অকিঞ্চিৎকর ভেদভাবাতুর উপাদান আজও বাঙলাদেশের সমাজে আছে তাদের পরিহার করে এবং ক্ষেত্রানুযায়ী দমন করে, সমগ্র অবশিষ্ট শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে একত্রিত রাখা। এজন্যই প্রয়োজন, যুদ্ধের উন্মাদনাপূর্ণ দিনগুলির আবেগকে সুপরিব্যাপ্ত অথচ সুস্থির, সংহত, যুক্তিসিদ্ধ, নীতিনিষ্ঠ করে রাখা। এজন্যই এত অপরিমেয় গুরুত্ব ন্যস্ত হয়ে রয়েছে বাঙলাদেশের ঘোষিত পরিকল্পনার উপর—সেখানে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটবে, 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে' দেশবাসী অবগাহন করবে।

বাঙলাদেশ জানে কে তার শত্রু আর কে তার মিত্র—ভারতের অভিজ্ঞতাও হলো অনুরূপ। বাঙলাদেশ জানে শত্রু বহুরূপী, নানা ছদ্মবেশে অনিষ্ট সাধনে সে কৃতসংকল্প। ভারতও জানে কিভাবে তার অবিমিশ্র সৌহার্দ্যেরও কদর্থ করার জন্য বৈরীপক্ষ নিয়ত সমুদ্যত রয়েছে। উভয় দেশ দরিদ্র ও নির্বিত্ত বলে আরও জানে অর্থানুকূল্যের ভান করে সাম্রাজ্যবাদ। তাঁরা ঊর্ণনাভী জালে বেঁধে ফেলার শক্তি আজও কম রাখে না। বাঙলাদেশের সংগ্রাম প্রচুর ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছে যে জনতা অপরাজেয়। আরও প্রমাণ করেছে যে এই অপ্রতিরোধ্য জনশক্তির ভিত্তি বিনা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ত্রিধারা একীভূত হতে পারে না।

ইসলামের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এই যে সর্বমানবের সমান অধিকার হলো বিধির বিধান। অপরাপর ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, তেমনই ইসলামের বেলাতেও দেখা গেছে ধর্মের নামে অধর্মের ছড়াছড়ি—যার সবচেয়ে জঘন্য আর ধিক্কার-জনক আধুনিক উদাহারণ দেখিয়েছে বাঙলাদেশে ইয়াহিয়া খানের নরাধম অনুচরবৃন্দ। কিন্তু যে বাঙলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী হলেন আনুষ্ঠানিক, ধর্মভীরু মুসলমান, তাঁরাই আজ ইসলামের ঐতিহাসিক অবদানকে সর্বজনের

জীবনে রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় যে নামছেন, তাতে সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বেই এর বহু আভাস মিলেছে। মুজিবর রহমান সমাজতত্ত্ব বিষয়ে বাক্-বিস্তার করেন বলে মনে হয় না, কিন্তু বলা যায় তাঁর সম্বন্ধে—

কৃষাণের জীবনের শরিক্ যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি—

এ যেন প্রকৃতই তাঁর বর্ণনা। বাঙলা ভাষার প্রতি মমতা, বাঙালির দৈনন্দিন অভাবী জীবনের বঞ্চনা-সঞ্জাত সহজ মানবিক অনুভূতি যে-নেতৃত্বকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত রেখেছে, সে-নেতৃত্ব ভুলভ্রান্তি করুক বা না করুক, জ্ঞাতসারে জনবিরোধী পথে পা দিতে চাইবে না। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সম্মিলন যে ঘটবে, তার অঙ্গীকার এর চেয়ে শক্তিশালী আর কি হতে পারে?

বহুকাল আগে, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে ও পরিপ্রেক্ষিতে, ইংরেজ লেখক রাস্কিন্ (Ruskin) বলেছিলেন এক "রত্নস্তূপ"-এর কথা, "যাতে মরচে ধরে না, যাকে পোকায় কাটে না, আর যার প্রতি আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তা কলুষিত হয় না"। বাঙলাদেশের মুক্তি-কাহিনী হলো তেমনই এক "রত্নস্তূপ" যার চেয়ে মূল্যবান সম্পদ ভারত ভূখণ্ডের আজ নেই। সকল আঁধার আজও নিশ্চয় কাটেনি, বহু বাধা এখনও রয়ে গেছে, ভবিষ্যতের পসরায় কোন্ নতুন আর উদ্ভট প্রতিবন্ধক দেখা দেয় কে জানে? কিন্তু অন্তত আপাতত, একান্ত সুদুর্লভ প্রসন্নতায় আমাদের চিত্ত যেন স্নাত, শুদ্ধ, শান্ত হয়ে আছে; আর বাঙলাদেশেরই পরম প্রিয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাক্য দিয়ে তাকে সম্বোধন করতে মন চাইছে—

হে বিজয়ী বীর নবজীবনের প্রাতে
নবীন উষার খড়্গ তোমার হাতে—
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক্ ক্ষয়
তোমারি হউক্ জয়॥

বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম থেকে কি শিখেছি

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

একুশে ফেব্রুয়ারি-স্মরণে পরিচয়ের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। শুধু বাঙলাদেশেরই নয়, সমগ্র ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে এই তারিখটি একটি কালজয়ী দিকচিহ্ন হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ১৯৫২ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারি বাঙলাভাষার অধিকারের দাবিতে পূর্ববাঙলায় যে আন্দোলনের প্রবাহ আত্ম-প্রকাশ করেছিল তাই তো আজ পরিণতি লাভ করেছে বাঙলাদেশের জয়যুক্ত মুক্তিসংগ্রামে। তত্ত্বের দিক থেকে এই যে কথাটি বুঝেছিলাম তা আমার অনুভূতির গভীরতম তলদেশ আলোড়িত করা উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে সম্প্রতি 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিটি দেখার সময়। দেখতে দেখতে মনে হলো যেন আমার প্রথম যৌবনের সেই দিনগুলিই রূপালী পর্দার উপরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সেই দিনগুলি, যখন মাতৃভূমিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দাসত্বশৃঙ্খল মুক্ত করাকেই জীবনের ব্রত বলে নিয়েছিলাম এবং যে-ব্রতের সাধনায় শ্রেষ্ঠ বৎসরগুলি অতিবাহিত করে এসেছি ব্রিটিশের কারাগারে, আন্দামানে সেলুলার জেলের নির্বাসনে। বিশেষত এপার বাঙলার বিগত কয়েক বৎসরের বেদনাময় অভিজ্ঞতার পর মনে হলো যেন এক নতুন প্রাণবন্যার বলিষ্ঠ স্পন্দনের পরশ পেয়েছি। নতুন করে দেখতে পেলাম জ্বলন্ত দেশপ্রেমের মহিমা, নিজের জন্য নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার পুণ্য প্রেরণা আর মৃত্যুভয়হীন দুর্জয় সঙ্কল্প। বিগত দুই-তিন বছর ধরে মনের মধ্যে যে গ্লানি জমে উঠেছিল তা ধুয়ে মুছে গেল। ফিরে এলাম এক নির্মল পবিত্র অনুভূতির মূর্চ্ছনা অন্তরে বহন করে।

কিন্তু না, আবেগের রাশ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তো লিখতে বসিনি। বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে একটি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, সত্তরের দশকের যুগান্তকারী মোড়। এই সংগ্রামের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় শুধু আবেগে উদ্দীপিত হলেই তো চলবে না। তার শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে ভারত ও বাঙলাদেশ উভয়েরই জাতীয় সার্বভৌমত্বকে সংহত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় পরিণত করার, জনগণের জন্য শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের যে-সংগ্রাম এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে

গিয়েছে এই সব কিছুরই স্বার্থে। আমাদের এই দুই রাষ্ট্রের ভাগ্য আজ অচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। তেমনিভাবে গাঁথা হয়ে গিয়েছে আমাদের দুই দেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী। ভারত-বাঙলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী আজ শুধু এই উপমহাদেশেই নয়, গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করেছে। দক্ষিণ-পূব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক মুক্তির আন্দোলনে ভারত-বাঙলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস আজ যেমন আমাদের সামনে মহান সম্ভাবনার নতুন সিংহদ্বার উন্মোচিত করেছে তেমনি উপস্থাপিত করেছে অত্যন্ত গুরুভার কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনের দৃষ্টিকোণ থেকেও এই পর্যালোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এই সংগ্রামের শিক্ষার কোনো না কোনো দিক সম্বন্ধে ভাসা ভাসা অথবা বিচ্ছিন্নভাবে অনেকেই অনেক কিছু বলছেন বা লিখছেন। সে-সবের মূল্যকে আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসের এতবড় একটা ঘটনার শিক্ষা সম্বন্ধে ঐটুকুতেই কি আমাদের দায়িত্ব শেষ হতে পারে? আমার জিজ্ঞাসার পরিধি অনেক বড়। আমি চাই একটা সামগ্রিক হিসেব-নিকেশ, যার আলোকে আগামী দিনের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এই ধরনের একটা হিসেব-নিকেশ করার যোগ্যতা আমার নেই, অধিকারও নেই। সে-কাজ করতে হবে প্রধানত তাঁদেরই, যাঁরা এই মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, যাঁরা দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আজকের এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি করে এসেছেন। আমার অনুরোধ তাঁদের সবার কাছে, বিশেষত বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে। কেন না, তাঁরাই মার্কস লেনিনবাদের আলোকে এই অভিজ্ঞতার মূল্যায়নে উদ্যোগী হয়ে অন্যান্য সংযোদ্ধাদের সাহায্য করতে পারেন। বাঙলাদেশের শিক্ষা ভারতের বর্তমান অধ্যায়ে কিভাবে কতটুকু প্রযোজ্য হতে পারে তার মূল্যায়নেরও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে ইতিহাসের ঐ একই চাহিদার নিরিখে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি যৌথ আলোচনা তথা চিন্তা বিনিময়ের মাধ্যমে এদিকে অগ্রণী হবেন বলে আশা করি। এই প্রবন্ধে আমি শুধু আমার মনে যেসব চিন্তা ও প্রশ্ন এলোপাথাড়িভাবে উঁকি-ঝুঁকি মারছে সেগুলিকে একটু গুছিয়ে সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই।

১) রাইফেলের নল নয়, জনগণই শক্তির উৎস। জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে

সমস্ত দেশপ্রেমিক শ্রেণীর, সমগ্র জনগণের ঐক্যই শক্তির মূলাধার। ইতিহাসের এই সুপরিচিত শিক্ষাই বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতায় আর একবার প্রমাণিত হলো। আমাদের দেশে সেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত রোমান্টিক বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের মুখে একটা কথা শুনে এসেছি যে, "বিপ্লব শুরু করলে জনসাধারণ এগিয়ে আসবে।" এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা জনগণের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র কার্যকলাপ শুরু করেছেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁদের ধারণাকে বারবারই ভুল বলে প্রমাণ করে দিয়েছে। জনগণ তাঁদের ডাকে সাড়া দেয়নি। আবার যখন জনগণ নিজেদের তাগিদে নিজস্ব পদ্ধতিতে সংগ্রামের ময়দানে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো এগিয়ে এসেছে তখন এই সব বিপ্লবীরা হয় তাদের থেকে দূরে সরে থেকেছেন নতুবা হারিয়ে গিয়েছেন। দুঃখের বিষয় যে সাম্প্রতিককালে মাওবাদ সেই বারবার ভুল বলে প্রমাণিত ধারণাটিকেই মার্কসবাদের নামে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেছে। ফলে, অনেক ক্ষতি হয়েছে, শক্তির অপচয় ঘটেছে এবং বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে।

বাঙলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রাম সেই ভ্রান্ত পথকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করে আপন গতিবেগে এগিয়ে এসেছে। এই সংগ্রাম কারুর পূর্বনির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী অগ্রসর হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে কখনও আংশিক সংগ্রাম, কখনও ব্যাপক গণ-বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে জনগণের সঙ্কল্প অমোঘভাবে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে সেই সংগ্রাম যে তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পার হয়েছে, অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচন, অহিংস অ-সহযোগ এবং পরে জঙ্গীশাহীর নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ, এই সমস্ত পর্যায়েই দুটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। একটি হলো জনগণের লক্ষ্যের মূলগত ঐক্য। সমস্ত প্রধান রাজনৈতিক দল তাকে উপলব্ধি করতে এবং স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করেননি। অন্যদিকে সংগ্রামের রূপ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন রকম ছুঁৎমার্গী মনোভাব দেখা দেয়নি অথবা বড হয়ে ওঠেনি। বাস্তব পরিস্থিতির তাগিদে যখন যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়েছে তাঁরা তাই করেছেন।

বিপ্লব সম্বন্ধে রোম্যান্টিক ধারণার ভূতটা যাঁদের কাঁধ থেকে এখনও নামেনি তাঁরা হয়ত বললেন যে সশস্ত্র সংগ্রামকে অনিবার্য ধরে নিয়ে আগে থেকে প্রস্তুত করলে হয়তো ঘটনার গতি অন্যরকম হতো। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়েছে যে জনগণের চেতনা ও মানসিক প্রস্তুতির স্তর এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেহাৎই ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠির ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে পর্যবসিত হয়। আর তা কার্যত জনগণের সংগ্রামে অন্তর্ঘাত হয়ে দাঁড়ায়।

বাঙলাদেশের জনগণের যে আত্মিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল তারই জোরে সম্ভব হয়েছে জঙ্গীশাহীর সুশিক্ষিত এবং সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যদলের সর্বাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে এমন দুর্জয় সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

এবার আসি আমার প্রশ্নে। যে সার্বিক ঐক্য গড়ে উঠেছে তার মূলে কাজ করেছে কতখানি স্বতস্ফূর্ততা এবং এতটুকু সচেতন রাজনৈতিক প্রস্তুতি? সংগ্রামের প্রথম দিকে স্বতস্ফূর্ততার উপাদানেরই প্রাধান্য থাকে বটে তবে তার তলদেশে যেসব উপাদান কাজ করে চলে সেগুলিকে একসূত্রে গেঁথে সুস্পষ্ট রূপ দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতের আকারে জনগণের সামনে তুলে ধরাই হলো রাজনৈতিক প্রস্তুতি। বাঙলাদেশের সংগ্রাম সেই ১৯৫২ সাল থেকে এ-যাবৎ যেসব অবস্থার মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসেছে তাতে এই ধরনের হিসেব নিকেশের সুযোগ বা অবকাশ ছিল খুবই সামান্য। কিন্তু আগামী দিনের পক্ষে তার গুরুত্বকে ছোট করে দেখা চলে না। প্রকাশ্য শত্রুর প্রকাশ্য আক্রমণ পরাজিত হয়েছে। এখন আঘাত আসবে ছদ্মবেশী শত্রুর দিক থেকে, বিভেদ এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির নানা সুচতুর কৌশলের মাধ্যমে। তাছাড়া, রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের পর্যায়ে বিভিন্ন দেশপ্রেমিক শ্রেণীর মধ্যে যে-ধরনের ঐক্য স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পর্যায়ে তার চরিত্রে খানিকটা পার্থক্য দেখা দেবে। অনেক নতুন সমস্যা উঠবে। এই পর্যায়ে জাতীয় ঐক্যকে আরো সংহত করে এগিয়ে নেওয়ার জন্য জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের প্রয়োজন অনেক বেশি। ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রন্টের কথা উঠেছে, কিছু পরিমাণে দানাও বেঁধেছে, তবে এখনও তা সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়নি। এই ফ্রন্টকে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টায় যে সব সমস্যা ও প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং হচ্ছে তার একটা সমীক্ষাও খুব জরুরি। সেই পরীক্ষা ভারতে আমাদের পক্ষেও অর্থাৎ বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির নিকটেও শিক্ষণীয় হবে। বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থনে ভারতে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল তা আসলে মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদের নয়া উপনিবেশবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্য। ভারতের জনগণ আবেগের মধ্য দিয়ে যে সত্যটি বুঝেছিল তাকে সচেতন উপলব্ধিতে পরিণত করার দায়িত্ব

এখানকার বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির। আর সেই উপলব্ধিই হবে ভারত-বাঙলাদেশ মৈত্রী, ঐক্য ও সমস্বার্থের অন্যতম প্রধান উপাদান।

২) এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমার বিশেষভাবে মনে হয়েছে। নয়া-উপনিবেশবাদের চরিত্র, বহুমুখী কৌশল এবং রণনীতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনও অস্পষ্ট, সচেতনতা অগভীর এবং সতর্কতা অনেক শিথিল। আমরা মাঝে মাঝে ভাসাভাসা ভাবে নয়া-উপনিবেশবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকি বটে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সময় সেটা আমাদের হিসেবের মধ্যে আসে না। বাঙলাদেশের ঘটনাবলী বিচারের সময় শুধু সেখানকার জনগণই নয়, আমরাও শুধু পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর কার্যকলাপকেই বড় করে দেখেছি। জঙ্গীশাহীকে মদৎ যুগিয়েছে, পিছন থেকে উস্কানি দিয়েছে এবং দীর্ঘকাল ধরে সুপরিকল্পিতভাবে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করেছে যে-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার ভূমিকা কিন্তু একেবারে শেষমুহূর্তের আগে পর্যন্ত প্রায় আমাদের হিসেবের বাইরে রয়ে গিয়েছে। বাঙলাদেশের জনগণের উপর নৃশংস পৈশাচিক আক্রমণ চালিয়েছে জঙ্গীশাহীর বেনামে মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদ। আর এটা শুধু সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী অর্থনৈতিক শোষণের স্বার্থেই নয়—ভারত উপ-মহাদেশে তথা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার রণনীতির স্বার্থে। উদ্দেশ্য—যাতে ঐ ভূখণ্ডের উপর তার নিরঙ্কুশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের এই পরিকল্পনাও আজকের নয়। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কতকগুলি দুর্বলতার দরুন যখন দেশ বিভক্ত হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান এই দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভেবেছিল যে দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক বিরোধের সুযোগ নিয়ে এই উপমহাদেশে নিজের প্রভাব কায়েম করে রাখবে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থান গ্রহণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকচক্র তার নিকটে আত্মসমর্পণ করে। তারপর থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকচক্রকে ব্যবহার করে এসেছে ভারতের উপর নিরন্তর চাপ-সৃষ্টির অস্ত্র হিসাবে। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্যদানের চুক্তি, পাকিস্তানের সেন্টো সামরিক জোটে যোগদান থেকে সেই পরিকল্পনার সূচনা। এই সব ঘটনা আমাদের অত্যন্ত জানা থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সময় সেগুলি অনেক সময় নজরের আড়ালেই থেকে যায়। অথচ বাঙলাদেশের ঘটনাবলীকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সেই বিশ্ব-রণনীতির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং অঙ্গহীন হয়ে থাকতে বাধ্য।'

সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে নয়া-উপনিবেশবাদের শিখণ্ডী এবং হাতিয়ার রূপে কাজ করে সেখানকার আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি। তত্ত্ব হিসাবে এই কথাটা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু আমাদের দেশে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিপদকে ছোট করে এবং নয়া-উপনিবেশবাদের উক্ত রণনীতির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার দুটি ঝোঁকই বামপন্থী-গণতান্ত্রিক মহলে রয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ পন্থা প্রতিক্রিয়ার পার্টিগুলি নির্বাচনে কতটা সাফল্য বা অসাফল্য ,অর্জন করেছে সেটাই তাদের শক্তিপরিমাপের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। তাদের সামাজিক ভিত্তি আছে, অর্থনীতিতে এবং প্রশাসন-যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলির উপরে প্রভাব রয়েছে এবং সবার উপরে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন। পাকিস্থানের জঙ্গীশাহীকে সামনে রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বাঙলাদেশের জনগণের উপরে যে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করেছিল তা ছিল পরোক্ষে আমাদেরও সার্বভৌমত্ব এবং অর্থনৈতিক প্রগতির আন্দোলনের বিরুদ্ধে আক্রমণ। যদি বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সাময়িকভাবে পরাজিত হতো তাহলে ভারত হতো নয়া-উপনিবেশবাদী রণনীতির আক্রমণের পরবর্তী শিকার। সেই বিপদ এখনও দূর হয়ে যায়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আজ আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রশ্নটিকে নতুন আলোকে বিচার করে দেখা একান্ত প্রয়োজন।

৩) বাঙলাদেশের ঘটনাবলী আর একবার প্রমাণ করে দিয়েছে যে কোনো দেশে জাতীয় মুক্তি এবং সামাজিক সংহতির প্রয়োজন কত বেশি। বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতা আমাদের দুই দেশের জনগণকে চিনিয়ে দিয়েছে যে বিশ্বে কে তাদের প্রধান শত্রু আর কে প্রধান মিত্র। জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের প্রধান শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর প্রধান মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার নেতৃত্বে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক শিবির হলো জাতীয় আন্দোলনের বিশ্বস্ততম বন্ধু, অবিচল সমর্থক এবং নয়া-উপনিবেশবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরী। সদ্য স্বাধীন দেশগুলির সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং সামাজিক প্রগতির গ্যারান্টি হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী।

ইতিহাসের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত এই সত্যটিকে ভুলিয়ে দেওয়ার এবং জাতীয় মুক্তিআন্দোলন সম্পর্কে সোভিয়েতের ভূমিকা সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরে বিভিন্ন মহল অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিল।

যারা সাম্রাজ্যবাদের অনুচর অথবা উগ্র জাতীয়তাবাদী তাদের দিক থেকে এরূপ চেষ্টায় বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে যাঁরা বিপ্লবের নামে শপথ নিয়ে থাকেন এই রকম কোন কোন মহল সোভিয়েত-বিরোধী কুৎসাকে পুঁজি করেই তাদের কল্পিত বিপ্লব-অভিযানে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সব কিছুকেই বিচার বিবেচনা ছাড়া অন্ধভাবে সমর্থনের কথা আজকার দিনে সোভিয়েত সমর্থকেরাও ভাবেন না। কিন্তু সোভিয়েত বিরোধিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। সোভিয়েত বিরোধিতা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির অপচেষ্টা কার্যত অনিবার্যভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেমদত যোগায়। বাঙলাদেশের প্রশ্নে চীনের ভূমিকাও তারই অকাট্য প্রমাণ। এই কষ্টিপাথরে চীনের অতিবিপ্লবীপনার মুখোস ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে তার অন্ধ সোভিয়েত বিদ্বেষ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতির স্বরূপটি অনাবৃত হয়ে পড়েছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের অভ্যুদয়ে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির অনুকূলে এসেছে এই সত্যকে স্বাগত জানাবার পরিবর্তে চীনের কাছে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনাটাই বিদ্বেষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংহতির গুরুত্বই ত' শুধু প্রমাণিত হয় নি। এদিক থেকে আমাদের যে কত কিছু করণীয় রয়েছে তাও বাঙলাদেশের ঘটনাবলী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সংহতির গুরুত্ব সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকলের সামনে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে, এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই। আজকার পৃথিবীতে নয়া-উপনিবেশবাদের বিশ্ব রণনীতির পটভূমিতে সারা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা যে একান্ত প্রয়োজন সেই কথাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে জনসাধারণের সামনেতুলে ধরা চাই। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে শুধু নীতিগত এবং ভাবগত সমর্থন তথা যোগাযোগই যথেষ্ট নয়। চাই তথ্য বিনিময়, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং চিন্তা বিনিময়ের নিয়মিত ব্যবস্থা। বাঙলাদেশের সংগ্রাম সম্বন্ধে বিশ্ব জনমতকে অবহিত করা ও সংগঠিত করার ব্যাপারে বিশ্ব-শান্তিসংসদ এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি যে গৌরবময় অবদান রেখেছে তার কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

বাঙলাদেশের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে আমরা যেমন আন্তর্জাতিক সমর্থনের প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছি সেই সঙ্গে আমরা যেন আমাদের

আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠি। বাঙলাদেশ সম্বন্ধে বিশ্বজনমত অতিক্রুত জাগ্রত এবং সোচ্চার হয়ে উঠছে না কেন বলে অনেককে অক্ষেপ করতে শুনেছি। অথচ অন্য সময়ে অগুদেশের মুক্তিকামী জনগণের সমর্থনে সংহতি প্রকাশের আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁদেরই অনেকে আবার উন্নাসিক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। বাঙলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি দেয় নি কেন বলে অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অথচ দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি, উত্তর ভিয়েতনাম ও পূর্ব-জার্মানীকে পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে আমাদের কর্তব্য পালন সম্বন্ধে কি তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন? ভিয়েতনাম, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়ার মুক্তিসংগ্রামীদের প্রতি আমাদের কর্তব্যই কি যথাযথ ভাবে পালন করেছি?

আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ এবং নিজেদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন এই দুটিকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না।

৪) আজকের যুগে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামাজিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। জনগণ স্বপ্ন দেখে এক শোষণমুক্ত সমাজের। তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর জনগণের সামনে প্রশ্ন আসে অর্থনৈতিক বিকাশের পথ বেছে নেওয়ার। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না। ধনতন্ত্রের পথ বেছে নিয়ে বিশ্বপুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ এবং তার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। ভারতে গত পঁচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা ধনতান্ত্রিক পথের ব্যর্থতা এবং দেউলিয়াপনাকে প্রকট করে তুলেছে। অ-ধনতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হওয়ার প্রশ্নটি এখানে আশু কর্মসূচীর মধ্যে এসে গিয়েছে।

বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে ওপার বাঙলার বহু লোকের বিশ্লেষণ আমি খুঁটিয়ে পড়েছি। মনে হয় যে, সেখানে সামাজিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা একটি প্রধান উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। বাঙালি মুসলমান জনগণকে ধর্মভিত্তিক জাতিতত্ত্বের বিষময় প্রভাব থেকে মুক্ত করতে এই উপাদানটির ভূমিকাই ছিল সম্ভবত সর্বপ্রধান। তাই সেখানকার প্রধান রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রনায়কেরা সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করেছেন।

আমরা যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী তারা মনে করি যে বাঙলাদেশের জনগণের সামনেও আসলে এই মুহূর্তে বিকাশের অ-ধনতান্ত্রিক পথ বেছে নেওয়ার প্রশ্ন এসে গিয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি অনিবার্যভাবে বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনের ব্যাপারে এই পথকে সামনে এনে দেবে। তাঁরা কিভাবে অগ্রসর হবেন, কি ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন সে অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষেও সহায়ক হবে।

৬) শেষ করার আগে বিশেষভাবে বলতে চাই এপার বাঙলার আমাদের একটি অত্যন্ত গুরু দায়িত্বের কথা।

বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিজয়লাভে ভারতের জনগণ, ভারত গভর্নমেণ্ট এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী যে মহান ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য ভারত-বাসী হিসাবে আমরা গর্ববোধ করি। তেমনি আমাদেরই রক্তের রক্ত, একই মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির সন্তান ওপার বাঙলার মানুষেরা এই উপ-মহাদেশের ইতিহাসে যে নবযুগের সূচনা করেছে তার জন্য বাঙালি হিসাবে আমরা গর্বিত। তারা প্রতিরোধের এক নতুন মহাকাব্য রচনা করেছে, বহু আত্মদান ও দুঃখবরণের মূল্য দিয়ে দ্বিজাতি-তত্ত্বের সমাধি রচনা করেছে। সেইজন্যই ভারত-বাঙলাদেশ মৈত্রীর ব্যাপারে, তাকে আগে সংহত, সুদৃঢ় ও স্থায়ী করে তোলার মহাব্রতে এপার বাঙলায় আমাদের উপরে কঠিন দায়িত্ব এসে পড়েছে। বাঙলা-দেশের মুসলিম জনগণ কিভাবে গত ২৪ বৎসরে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত হয়ে বাঙালি জাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে সেই প্রক্রিয়াকে বিশদভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। সেই শিক্ষাকে ভারতের অন্যান্য ভাষাভাষী জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। সেই শিক্ষার অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার, বিশেষত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন অভিযান পরিচালনা করতে হবে। বাঙলাদেশের শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে হবে এদেশের মুসলিম জনগণের পশ্চাৎপদ অংশের হৃদয়ের দুয়ারে। বাঙলাদেশে দ্বি-জাতিতত্ত্বের সমাধি রচিত হয়েছে বলে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছে মনে করার কোন কারণ নেই। নেই আত্ম-সন্তোষের অবকাশ। সাম্প্রদায়িকতার সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি যে সামন্তযুগীয় অবশেষগুলি তা আজও বজায় রয়ে গিয়েছে। উপরন্তু, একথা মুহূর্তের জন্যও ভোলা চলে না যে সাম্প্রদায়িকতার শক্তিগুলিকে মদত যুগিয়ে চলেছে সেই একই শত্রু—নয়া উপনিবেশবাদ।

আমাদের আত্মসমীক্ষারও প্রয়োজন আছে বৈকি। দ্বি-জাতিতত্ত্ব মাথা তুলতে পেরেছিল তার জন্য শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিম লীগকে দায়ী করেই ত' আমরা পার পেতে পারি না। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, সামন্তযুগীয়

ধ্যানধারণার শক্তিশালী প্রভাব এবং আমাদের জাতীয় আন্দোলনের কতকগুলি গুরুতর দুর্বলতাও যে উক্ত ভ্রান্ত তত্ত্বের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল সে কথা ভোলা চলে না। জাতীয় আন্দোলন যদি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ উভয়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করত তাহলে প্রাক-স্বাধীনতা যুগেই সম্ভব হতো উভয় ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে বলিষ্ঠ আঘাত হানা। কমিউনিস্ট পার্টি যে এক সময়ে মার্কসবাদের অপব্যাখ্যা করে ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতিতত্ত্বকে সমর্থন করেছিল তারও বলিষ্ঠ আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে। কমিউনিস্ট পার্টি পরে সেই ভ্রান্তিকে বর্জন করে ঠিকই। কিন্তু সেজন্য সত্যকার আত্মসমালোচনা হয়েছে কি?

এপার বাঙলার প্রগতিশীল লেখকেরা বাঙালির রেনেসাঁর দুর্বলতার কথা লিখেছেন। বাঙালির জাতীয় চেতনার জাগরণ যে খণ্ডিত ভাবে হয়েছিল সে কথাও তাঁরা কেউ কেউ বলেছেন এবং তার কারণ বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের বিশ্লেষণের একটি ত্রুটির কথা আমার বিশেষভাবে নজরে পড়েছে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের এক অংশের মধ্যে নবযুগ-চেতনার যে ধারাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল তার সম্বন্ধে আমারা খুব কমই মনে রাখি। হয়ত সে ধারাটি সেদিন ততটা শক্তি সঞ্চয় করে নি। তবু প্রশ্ন জাগে, তাকে জানার, বোঝার এবং তার সঙ্গে সেতুবন্ধের চেষ্টা হয় নি কেন? এই কথাটি বিশেষভাবে আমার মনে জেগেছে প্রয়াত আচার্য শহীদুল্লাহ সাহেবের ১৯২০/২২ সালে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ পড়ে। ঐ প্রবন্ধগুলিতে তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যা, বাঙালি মুসলমানের ভাষা কি হবে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখাগুলির মধ্যে শুধু যে একটা উদার ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সুপরিস্ফুট তাই নয়। সেদিনও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রশ্ন তুলেছেন যে বাঙালি মুসলমানের ভাষা কি হবে? আচার্য শহীদুল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ও দৃঢ়ভাবে জবাব দিয়েছিলেন যে বাঙলাই তাদের ভাষা, বলেছিলেন যে বাঙলা হিন্দু ও মুসলমান বাঙালি উভয়েরই মাতৃভাষা। ১৯৫২ সালে পূর্ব-বাঙলায় যে ভাষা-আন্দোলন শুরু হয় তার বীজ তিনি সেদিনই বপন করেছিলেন।

বাঙলাভাষা, বাঙলা লোকসাহিত্য, বাঙালির সংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলমান বাঙালি উভয়ের যৌথ অবদানে সৃষ্ট, পুষ্ট, লালিত ও পালিত। দেশ-বিভাগোত্তর যুগে ওপার বাঙলার বুদ্ধিজীবী ও গবেষকরা এ বিষয়ে যে পরিমাণে সচেতন হয়ে উঠেছেন তা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার আছে। সেই সচেতনতা আমাদের আত্মিক যোগসূত্রকে আরো সুদৃঢ় করুক। আমাদের আবেগ যেন শক্ত মাটির উপর পা রেখে দাঁড়াতে পারে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা-প্রসঙ্গে

কবীর চৌধুরী

সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে যখন আমরা চিন্তা করতে বসি তখন একটা সত্য আমাদের মনে উজ্জ্বল আশার সঞ্চার করে। তা হচ্ছে এই যে আমাদের সমাজের চিরায়ত জীবনধারায় কখনোই সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত কোনো সমস্যা ছিল না। আমাদের গ্রামীন সমাজে বাঙলাদেশের সাধারণ কৃষি-নির্ভর মানুষ স্বভাবগতভাবেই শান্তিপ্রিয়। তাঁদের যৌথজীবনে ধর্মভিত্তিক বা গোষ্ঠীগত সম্প্রদায় বিভাগ থাকলেও তাঁরা বৈষয়িক ও সামাজিক বন্ধনের এক-সূত্রে চিরকাল বাঁধা। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে যে বর্ণগত আভিজাত্যের অভিমান ছিল, সমাজে তার নানা কুফল অনুভূত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু, এই বর্ণবৈষম্য কখনো আপনা থেকেই সাম্প্রদায়িক অনর্থের সৃষ্টি করেছে, এমন কথা বলা যাবে না। বরং আমাদের সমাজের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ এক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক প্রতিবেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সহাবস্থান করে প্রকৃতিগতভাবে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সু-সম্পর্ক ও সম্প্রীতিতে অভ্যস্ত। রাষ্ট্রীয় আইন ছাড়াও ধর্মনিরপেক্ষতার একটা অলিখিত সামাজিক আইন এই সু-সম্পর্ক ও সম্প্রীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং কালে কালে তার সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিল।

অথচ এ কথা অস্বীকার করারও উপায় নেই, সাম্প্রদায়িকতার একটা উৎকট সমস্যা মাঝে মাঝেই আমাদের জনজীবনে ও সমাজজীবনে বিপত্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যা বহুকাল ধরে বহু যত্নে গড়ে তোলা। নৃশংস নাশকতার সম্মুখীনও আমাদের হতে হয়েছে এবং বিপুল বৈষয়িক ক্ষতি তো হয়েছেই। বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলা কালে, বিশেষ করে ঢাকা নগরী শত্রুমুক্ত হবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে, ধর্মান্ধ নরপশুরা বুদ্ধিজীবী নিধনের মাধ্যমে যে বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত করেছিল তার কথা কেউই কোনোদিন বিস্মৃত হতে পারবে না। যে ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িকতার জন্মদান করে সেই ধর্মান্ধতাই উপরোক্ত নারকীয় কাণ্ডকে সম্ভব করে তুলেছিল।

তাহলে, যে ব্যাধির মূল আমাদের সামাজিক নীতিতে নেই, এমনকি আমা-

দের বিভিন্ন ধর্মাচরণের মধ্যেও নেই, সেই ব্যাধির প্রকোপ আমাদের সমাজ-জীবনে যখন তখন দেয় কেন? আমরা মনে করি, এই সংকট একটা কৃত্রিম সঙ্কট। কৃত্রিম এই অর্থে যে এই সঙ্কট আমাদের সমাজশরীরে বাইরে থেকে আরোপিত একটি ভাইরাস। স্বাধীনতা-পূর্ব পাকিস্তান যুগে শোষণলোলুপ প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র সাম্প্রদায়িকতার এই ভাইরাস স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে সমাজদেহে ছড়িয়ে দিয়েছিল: তথ্যানুসন্ধানের সামান্য চেষ্টা করলেই এই সত্যের প্রমাণলাভ করা সম্ভব। আমরা এও জানি যে আমাদের সাধারণ জন-জীবনে শিক্ষার অভাব ও অর্থনৈতিক দুর্গতি এই সাম্প্রদায়িকতার চক্রান্তকে উর্বর ক্ষেত্র প্রদান করেছে। আবার সামাজিক পশ্চাৎপদতা অর্থনৈতিক শোষণের জন্যে অপরিহার্য পূর্বশর্ত হওয়ায় স্বার্থান্ধ মহল সাধারণ সামাজিক অগ্রগতির কার্যসূচিকে বানচাল করে দেওয়ার জন্যও সদা সচেষ্ট। আমাদের এই অভিজ্ঞতা আছে যে উৎপাদন ও উপার্জনের বিভিন্ন মাধ্যম এবং জমি, বাড়ি, বস্তি ইত্যাদি দখল করার কু-উদ্দেশ্য শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত মানুষ-এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সঞ্চার করে রক্তপাত, ব্যাপক উচ্ছেদ ও অন্যবিধ উপদ্রবের মাধ্যমে বিরাট অনর্থের সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, যাঁরা এই পরিকল্পিত অনাচারের ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছেন পরিণামে তাঁদের অপরিমেয় ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় নি। এমনও দেখা গেছে, কোনো সামান্য উপলক্ষ নিয়ে সাম্প্রদায়িক ডামাডোল শুরু হয়ে যাওয়ার পর হিন্দু ও মুসলমান গুণ্ডা একসংগে মিলে মুসলমানের ঘরে লুটপাট চালিয়েছে। এবং এর বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে। অর্থাৎ উপলক্ষটি সাম্প্রদায়িক হলেও, যারা লুণ্ঠন করে, ধর্মনির্বিশেষে তারা একটি শ্রেণী, এবং যারা অসহায়ভাবে লুণ্ঠিত হয় তারাও ধর্মনির্বিশেষে একটি শ্রেণী। এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে শোষণের যে-সব যন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়ে এসেছে, সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে তাদের একটি।

এর প্রতিকার কি? আমরা মনে করি সমস্যার প্রকৃত স্বরূপকে বোঝা এবং তার নিরসনের বাস্তবসম্মত প্রচেষ্টা চালানোই হচ্ছে এর প্রতিকার। বিভিন্ন মানবপ্রেমী মহল অবশ্যই তাঁদের সাংগঠনিক তৎপরতা দিয়ে এই মারাত্মক সামাজিক 'কু' সমপর্কে সমাজমানসকে সর্বদা উচ্চকিত রাখবেন। কিন্তু এই ব্যাধির নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রকর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের। শুধু কাগজে কলমে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই এই সমস্যার সমাধান হবে না। সরকারীভাবে সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুগত

দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা চাই। 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটির বাস্তব ও প্রকৃত প্রয়োগ ঘটাতে হবে। ধর্মাচরণ হবে একান্তভাবে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাজনীতি এবং কোনো রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সঙ্গে ধর্মের কোনো সমপর্ক থাকা চলবে না। কোনো ধর্ম-শিক্ষা বা ধর্ম-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনরকম সরকারী আনুকূল্য বা বিরোধিতা লাভ করবে না। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হবে পূর্ণতই এবং প্রকৃতই ধর্মনিরপেক্ষ। এমনি একটি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ-সংস্থানেই প্রকৃত সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এই শোষণহীন বঞ্চনামুক্ত অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের অন্ধকারমুক্ত উৎসাহোদ্দীপ্ত প্রত্যয় দৃঢ় নব জীবনায়ন সম্ভব। বলা বাহুল্য, মানুষের এমন জীবনের কাছে সাম্প্রদায়িকতার অনাচারের ব্যাপারটা অতীতের একটা হাস্যকর দুঃস্বপ্ন বলেই শুধু প্রতিভাত হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের বঙ্গ-ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত সেই সুখী সুন্দর সমাজ অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে আমরা এটাও জানি যে এর জন্য সর্বদা আমাদেরকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো সতর্ক থাকতে হবে এবং শিক্ষাব্যবস্থা সহ আমাদের বিভিন্ন কর্মধাচতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সুদৃঢ়ভাবে নির্ভীকতার সংগে বাস্তবায়িত করতে হবে। এখানে কোনো অর্ধ-পন্থার অবকাশ নেই।

বাঙলাদেশ ঃ সামাজিক বিপ্লব

বাসব সরকার

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক আগ্রহে পূর্ব-বাঙলার সমগ্র বাঙালি জাতির পক্ষে শপথের বাণী উচ্চারিত হয়েছিল সেখানকার কবিকণ্ঠে, 'প্রয়োজন হলে দেব এক নদী রক্ত'। জাতিসত্তার মহান প্রয়োজনে সেই এক নদী রক্তের মূল্যে জন্ম নিয়েছে আজকের বাঙলাদেশ। একদা লড়াই করে পাকিস্তান কায়েম করার যে-জিগিরে বাঙালির জাতিসত্তা উপেক্ষিত হয়েছিল, বিরাট একটা মানসিক বিপর্যয় ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তাগিদেই সেই লড়াই শুরু হয়ে যায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক কাঠামোকে কালোপযোগী করতে। রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান যে-ছিল কালানুচিত্য দোষে দুষ্ট, সেটা পাকিস্তান কায়েম করার সময় বিশেষ আমল পায়নি। ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে সেদিনের ঐতিহাসিক পুরুষদের দায় দায়িত্বের বিচার যেমন নিশ্চয়ই করতে হবে, তেমনি একথাও সম্ভবত মেনে নিতে হবে যে, সেদিন পাকিস্তান না হলে হয়তো আজকের বাঙলাদেশ হতো না।

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করবেন যে, দেশবিভাগের আগেই যদি স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশ গঠনের প্রস্তাব সেদিনের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব মেনে নিতেন, তাহলে তো দেশবিভাগের সমস্যাবলী, ছিন্নমূল মানুষদের অবর্ণনীয় দুর্দশা এবং সাম্প্রতিক রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা এড়ানো সম্ভব হতো। এই প্রশ্ন আজ নিছক কেতাবী। কারণ স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশ গঠনের প্রস্তাব তখন কোনো নেতৃত্বকে দিয়েই মানানো যেত না। লাহোর প্রস্তাবের বয়ানে ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে দুই মুসলমান প্রধান সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের নির্দেশ যেভাবে ও যে-কারণে লীগের আইনসভা সদস্যরা বাতিল করেছিলেন, তারপর সুরাবর্দী সাহেবের সার্বভৌম বাঙলাদেশ প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার প্রায় কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। অনুরূপভাবেই বলা যায় যে, কংগ্রেস নেতৃত্ব পশ্চিম-ভারতে দেশবিভাগে স্বীকৃত হয়ে, পূর্ব-ভারতে তা প্রতিহত করার জন্যে নৈতিকভাবে জোর করতে পারতেন না। ভারতে ধর্ম ও রাজনীতির একসাথে চলা যেদিন থেকে জনজীবনে শুরু হয়ে যায়, সেদিন থেকেই যেমন দেশবিভাগের সম্ভাবনা প্রকট হতে থাকে, তেমনি পাকিস্তান যেদিন থেকে কায়েম হয় সেদিন থেকেই

আজকের বাঙলাদেশের সম্ভাবনাও বাস্তবে প্রথম পদক্ষেপ করে। সুতরাং আজকের বাঙলাদেশকে বলা চলে ভারতীয় উপ-মহাদেশে ধর্মীয় রাজনীতির ঐতিহাসিক পরিণতি।

এক হিসেবে একথা বলাও হয়তো অতিশয়োক্তি নয় যে, পাকিস্তান আন্দোলনই ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান জনগণের জীবনে সামাজিক বিপ্লবের প্রাথমিক স্তর। কারণ পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে, ভারতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুসলমান জনসাধারণের প্রায় কোনো ভূমিকাই ছিল না। সেদিনও রাজনৈতিক সক্রিয়তায় মুষ্টিমেয় যে-কয়জন মুসলমান নেতা প্রথম সারিতে ছিলেন, তাঁদের জনসমর্থন ছিল নামমাত্র। তাঁদের অনেকেরই বিশেষ করে মহম্মদ আলি জিন্নার সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশেষ কোনো রুচি ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন মুসলমান জনগণের মানসিকতাকেই আমূল পরিবর্তিত করে। তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, ভারতের এক বা একাধিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই নতুন ভৌগোলিক জাতি-চেতনার বিকাশ ঘটে। এর আগে এই দেশটাকে স্বদেশ বলে মানতে, তা সে সমগ্র ভারত হোক অথবা তার কোনো খণ্ডিত অংশ 'পাকিস্তান' হোক, শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকেই গররাজী ছিলেন। বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তাঁদের কোনো ভৌগোলিক সীমানায় ইসলামী জনজীবনকে খণ্ডিত করা ছিল চরম গুনাহ। পাকিস্তান আন্দোলনের গোড়ার দিকে এঁরা অনেকেই তাই ধর্মীয় কারণেই তার বিরোধিতা করেছেন। শিক্ষিতদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ ছিলেন ইংরেজ-ঘেঁষা মানসিকতার শরিক। তাই হয় তারা রাজনীতি করতেন না কিম্বা করলেও ইংরাজ শাসকদের নির্দেশিত পথ ছেড়ে যেতেন না। এই দুই চিন্তাধারার বাইরে অবশিষ্ট শিক্ষিত মুসলমানরা ছিলেন সমকালের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী নেতাদের মতো রাজনীতিতে মডারেট ও কনষ্টিটিউশনালিস্ট অর্থাৎ নরমপন্থী, নিয়মমাফিক রাজনীতির প্রবক্তা। দেওবন্দ্ বনাম আলীগড়ের বিখ্যাত বিতর্কের মধ্যে এই ধারনাই মেলে।

এখানে প্রসঙ্গত একটা জিজ্ঞাসার কথা তোলা যেতে পারে। ভারতের জাতীয়-মুক্তি-আন্দোলনের এক বিশেষ ঐতিহাসিক পর্বে টেররিস্ট বা একসট্রিমিস্ট অর্থাৎ চরমপন্থী ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। এই আন্দোলনে যাঁরা জড়িত ছিলেন, যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন অ-মুসলমান। মৌলানা আজাদকে ইংরেজ শাসকরা একসট্রিমিস্ট বলে চিহ্নিত করলেও তিনি যতদূর জানা যায়

প্রচলিত অর্থে একস্‌ট্রিমিস্ট ছিলেন না। এই আন্দোলন ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক বিশেষ স্তরের স্বাভাবিক প্রকাশ। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনে, মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাকালে কিম্বা এই ধরনের একস্‌ট্রিমিস্ট ঝোঁক দেখা যায়নি কেন? এই আন্দোলন ভ্রান্ত বা এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মানুষ নিঃসন্দেহ এটাই কি এর প্রধান কারণ?

পাকিস্তান আন্দোলন মুসলমান জনসমাজের চিন্তায়-চেতনায় এক যুগান্তর ঘটায়। একজন সাধারণ অ-মুসলমানের মতো একজন সাধারণ মুসলমান যে বাঁচার তাগিদে তেল, নুন, লকড়ির সমস্যায় ভারাক্রান্ত ছিল, পাকিস্তান আন্দোলন তার সামনে এক কল্প-যুগের দরজা খুলে দেয়। জাতীয় স্বাধীনতা মানুষের সামনে কতো বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে আসতে পারে, তা পাকিস্তান আন্দোলনে উদ্বেলিত মুসলমান জনসমাজকে দেখে কিছুটা বোঝা গিয়েছিল। অবশিষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে কিন্তু সেই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়নি। ইতিহাসের দিকে এক নজর তাকালেও এই সত্য ধরা পড়ে। লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে গৃহীত হওয়ার মাত্র আট বছরের মধ্যেই পাকি-স্তান কায়েম হয়। সময় ও পরিবেশ নিঃসন্দেহে জিন্না সাহেবের অনুকূলে ছিল। কিন্তু শুধু সময় ও পরিবেশের আনুকূল্যেই এর সার্থকতা, এই ব্যাখ্যা নিতান্তই একপেশে। এর কারণ ইসলাম ধর্মের মধ্যেই নিহিত।

ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, জীবনদর্শনও বটে। ইসলামের একটা সামগ্রিক রূপ আছে, যা নিছক ধর্মের স্তর অতিক্রম করে সামাজিক মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করে। অর্থাৎ ধর্ম, সমাজ, সামাজিক মানুষের আচরণবিধি এবং সামা-জিক মানুষের রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ তার রাষ্ট্রব্যবস্থা, সবকিছুই ইসলা-মের অনুশাসন অনুসারে পরিচালিত হতে পারে। মানুষের সমস্ত অস্তিত্বকে একটি ধর্মের সঙ্গে আদ্যন্ত একাত্ম করে তোলার সম্ভাবনা ইসলামের অনুশাসনে প্রবল। পাকিস্তান আন্দোলনে একজন সাধারণ মুসলমান নিজের জীবনকে ধর্মের সঙ্গে একাকার করে ফেলার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। সব পণ্ডিতদের সব রকমের সংশয়, সন্দেহ, নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তাঁরা ছুটেছিলেন পাকিস্তান কায়েম করতে। সেই পাকিস্তান কায়েম করতে এবং কায়েম হওয়ার পরেও বেশ কিছু-দিন ইসলামী ভাবধারা ছাড়া অন্য কিছুকে আমল দিতে জনগণের বিপুল অংশ কিংবা রাজনৈতিক নেতৃত্ব, কেউই খুব রাজী ছিলেন না। বরং বলা যায় যে, রাজনৈতিক নেতারা যথেষ্ট সচেতনভাবেই ইসলাম-আশ্রয়ী হয়েছিলেন,

নিছক এই কারণেই যে ইসলাম বিশল্যকরণীর কাজ করে জনজীবনের সব ক্ষত, সব অভাব-অভিযোগের আপাত: শান্তির একটা প্রলেপ দেবে।

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ এ-দেশে যথেষ্ট প্রাচীন। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, ধৈর্যের সঙ্গে মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নয়ন করার চেয়ে, অনেক সহজ পথে মানুষের ভাবাবেগে নাড়া দিয়ে একটা রাজনৈতিক শক্তি খাড়া করার নজীর এ-দেশে প্রচুর। এদেশের বেশির ভাগ মানুষ হয় হিন্দু হিসেবে নিজের সামাজিক তথা রাজনৈতিক ভূমিকা চিন্তা করেছে, নয়তো মুসলমান হিসেবে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আমাদের পুরানো দিনের প্রথম সারির জাতীয় নেতারা হয় গীতা নয়তো কুর-আনের টীকা-ভাষ্য রচনা করে জনজীবনে নিজের প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজেছেন। অর্থাৎ সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা না করে, তাঁরা স্বধর্মাবলম্বীদের বেশির ভাগের কাছে, সেইভাবেই পৌঁছতে চেয়েছেন, যেভাবে গেলে সবচেয়ে অনায়াসে যাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, আমাদের পশ্চাৎপদ দেশে সেই পথ ছিল এবং এখনো আছে—ধর্মের পথ। সমাজ-জীবনের একজন মানুষের অবস্থান তার দিনানুদৈনিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত না করে তার একটা আপেক্ষিক পরিচয়কে বড়ো করে তোলা হয়েছে। একজন মানুষ—সে হয় কৃষক, না হলে শ্রমিক বা কোনো বৃত্তিজীবি, কিম্বা ব্যবসায়ী ছোট-বড়ো-মাঝারি কোনো ধাঁচের, কিম্বা কোনো না কোনো উপস্বত্ব ভোগী, এই পরিচয়টা তার গৌণ থেকেছে। ফলে একই অবস্থানে মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক চাপা পড়ে গেছে ধর্মের একটা মোটা দাগের আড়ালে। যেন ধর্ম এক হলেই জীবনের বনিয়াদ এক, বাস্তব অভিজ্ঞতা এক, অভাব, অনটন, চাওয়া ও পাওয়ার হিসেব নিকেশগুলিও এক হয়ে যায়। তা যে হয়নি এবং হতে পারে না, সেটা আজকের বাঙলাদেশ দেখলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জাতীয়তাবাদ যেমন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, তেমনি বিচ্ছিন্নও করে। সমজাতীয়তার উপাদান, তা সে বাহ্যিক বা মানসিক যাই-হোক না কেন, মানুষকে এক ভৌগোলিক সীমানায় একত্রিত করলেও পৃথিবীর জনসমষ্টি থেকে তার বিযুক্তি ঘটে। এর বিপদ যে বহু সে-ব্যাপারে চিন্তাশীল জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সজাগ থাকেন বলেই, তাঁরা জাতীয়তাবাদের সামনে একটা হুঁশিয়ারী রেখে দেন। তারই নাম আন্তর্জাতিকতা। জাতীয়তার দাবীতে অটল মানুষ যেমন অসহ বাস্তব অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায়, নিজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট ও ব্যাপক ঐক্যের মধ্যে

নিজেকে মিলিয়ে দিতেও চায়। এটা সেখানেই ততো বাস্তব, ফলপ্রসূ ও সার্থক হতে পারে, যেখানে জাতীয়তার উপাদানগুলি মানুষের চেতনার গভীরে ও জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। যেখানে তা কৃত্রিম, বাইরেকার বিষয়, আপাতত বা আপেক্ষিক সত্য, সেখানেই তার দুর্বলতাগুলি ফুটে ওঠে। তখন স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত মানুষ নিজেকে আরো বেশি দুর্বল, অসহায় মনে করে, অথচ স্বাধিকার দাবীর মূল লক্ষ্যই হলো আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার চেষ্টা করা।

জাতীয়তাবাদের সাফল্যে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রে জনজীবনে বৈচিত্র্য কম থাকলে, তার রাষ্ট্র কাঠামো সমগ্র সমাজের চলমান শ্রেণীবিন্যাসের বাস্তবতাকে স্বাধিকারের একটা প্রকাশ-বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে। সেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও জনজীবনের স্বাধিকার দাবীর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না—যা পরস্পর বিরোধী। সেখানে দ্বন্দ্ব হলো শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা কোন শ্রেণী কার স্বার্থে ব্যবহার করছে এবং করবে। কিন্তু পাকিস্তানে তেমনটি হওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না। জাতীয়তাবাদের কোনো পর্বেই ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ ও সংস্কৃতি উপেক্ষিত নয়। পাক-শাসকবর্গ এই সত্যটা কোনো দিনই বোঝেননি, আর পাক জনসাধারণ এটা বুঝতে চাননি পাকিস্তান কায়েম করার সময়। কিন্তু সজীব, বিকাশমান কোনো সমাজ, যার চালিকা শক্তি ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও সংস্কৃতি থেকে সংগৃহীত, তার দাবী চেপে রাখার চেষ্টা করলেই চাপা যায় না। একেই বলে ইতিহাসের বিধান। তার আত্মপ্রকাশ ঘটবেই. তবে কখনো তার গতি ধীর মন্থর, আবার কখনো তা দ্রুত বিকাশমান। যেমন বলা যায় ২৫শে মার্চের পর থেকে ১৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নয় মাসের কিছু বেশি সময়ে বাঙলাদেশের মানুষ যে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন, তা কি পূর্ববর্তী দুই যুগে কল্পনা করা গিয়েছিল? কিম্বা ১৯৫১ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারি এবং তার পরের দুই দিনে পূর্ববাঙলার যুব ও ছাত্রসমাজ যে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন, তা কি তার আগের চার বছরে পাওয়া গিয়েছিল? স্বাধীনতার জন্যে শহীদ হওয়া, স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্যে শহীদ হওয়া মোটামুটি সমজাতীয় চেতনা। কিন্তু স্বাধীনতাকে স্বাভাবিক ও সার্থক করার জন্যে আত্মবলিদান, ভিন্ন মানের চেতনা। ২১এ ফেব্রুয়ারি আত্ম-বলিদানে পাক-জাতীয়তাবাদের শরিক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, বাঙালিয়ানা নিয়ে চিহ্নিত হলো। সেদিনই তাঁরা বুঝতে শুরু করেছিলেন যে, তাঁরা পাকিস্তানী হলেও বাঙালি।

২১এ ফেব্রুয়ারিতে তাই পূর্ববাঙলায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। "আমরা পাকীস্তানী, না বাঙ্গালী, না মুসলমান? এই জিজ্ঞাসার জন্যেই হলো পাক-জাতীয়তাবাদী মানসিকতার অচলায়তনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রথম আঘাত। গত কয়েক বছর ধরে মহাচীনে আমরা সাংস্কৃতিক বিপ্লব দেখেছি। সেই বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল সমকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশে মানুষের মূল্যবোধকে কালোপযোগী করার জন্যে গণবিক্ষোভ সংগঠিত করা। তার অন্য ব্যাখ্যা, অন্য লক্ষ্য থাকতে পারে, কিন্তু প্রসঙ্গত তা গৌণ। কিন্তু পূর্ববাঙলায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। এর লক্ষ্য ছিল একটা রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের সামগ্রিক চিন্তার মধ্যে, একটা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিকত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। তার রাজনৈতিক চরিত্র অনেক পরে এসেছে, স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন ও প্রত্যাখ্যানের পথ ধরে। এক পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক কাঠামোয় বাঙালির সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রকাশ সম্ভব করার কোনো সুযোগ না পাওয়ায়, সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে নজর সরে এসেছে রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে। ফলে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশমান চেতনার ধারক ও বাহক মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় প্রাণের টানেই সমাজের বৃহত্তর শক্তি শ্রমিক ও কৃষকের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, সাহায্য ও সমর্থনের আশায়। যেহেতু সমাজের এই অংশের মানুষেরা পাক-শাসন ও প্রাক্তন শাসক ও শোষকদের মধ্যে নিজেদের অভিজ্ঞতায় কোনো পার্থক্য ধরতে পারেননি, তাই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের দাবী পূর্ণতা পেতে চেয়েছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদে। জন্ম হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের।

পূর্ববাঙলার সমাজজীবনে সমস্ত স্তরের মানুষের অভিজ্ঞতায় বঞ্চনার আঘাত এসে না লাগলে, বাঙালির জাতিসত্তার এমন এক সার্বিক প্রকাশ সম্ভব হতো না। ভাষা-আন্দোলন ছিল মূলত শিক্ষিত মানুষের আন্দোলন। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার চার বৎসরের মধ্যেই প্রধানত নিরক্ষর পূর্ববাঙলার জনজীবনে এমন কিছু শিক্ষা-বিস্তারের জোয়ার আসেনি, যাতে বাঙলা ভাষার দাবীতে লাখে লাখে মানুষ জান কোরবানী দিতে পারেন। অবাঙালি শাসকদের 'উর্দু-বাঙলা' চাপানোর ধাক্কায় মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন বুদ্ধিজীবী ও যুব ছাত্রসম্প্রদায়। ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে শহীদ তাঁরাই হয়েছেন। পরবর্তী কালেও সেই সাংস্কৃতিক দাবীর জন্যে তাঁরা আরো বেশি আত্মত্যাগ করেছেন বা করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু শুধু সেই কারণেই বাঙালি

জাতীয়তাবাদের বিস্ফোরণ সম্ভব ছিল না। পূর্ববাঙলার বুদ্ধিজীবিদের এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী চেতনা যখন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো মুক্তির পথ পায়নি, তখনই তা রাজনীতি সচেতন হলো এবং সমাজের অন্যান্য স্তরের অবহেলিত মানুষদের বঞ্চনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাঙালির মানসিকতায় একটা গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলো। এটাই হলো পূর্ব-বাঙলায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব তথা সামাজিক বিপ্লব। তা না হলে মাত্র চব্বিশ বছরের ব্যবধানে শুধু স্বৈরাচারী শাসন, অগণতান্ত্রিকতার কারণে, পাকজাতীয়-তাবাদী মানসিকতার বাঙালি জাতীয়তাবাদী মানসিকতার স্তরে উত্তরণ সম্ভব হতো না। আজকের বাঙলাদেশে তাই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও মেহনতী মানুষের গুরুত্ব ও মর্যাদা সমান স্বীকৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটাও স্বীকার্য যে, বুদ্ধি-জীবিদের মধ্যেই জাতীয় চেতনার উন্মেষ প্রথম ঘটে বলেই, পথিকৃতের সম্মান প্রাপ্য তাঁদেরই। পাক-সামরিকচক্রের পরিকল্পনামাফিক বুদ্ধিজীবী নিধনের কর্মসূচি সে কথা আরো বেশি সপ্রমাণ করে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের চালিকা শক্তি যে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় শ্রেণীস্বার্থের বিচারে তাঁরা প্রধানত মধ্যবিত্ত। স্বাধীনতা উত্তর পূর্ববাঙলায় প্রধানত এই শ্রেণী থেকেই শিক্ষায় অগ্রণী অংশের উদ্ভব। হয়তো বা সব দেশেই জাতীয়তা-বাদের বিশেষ শ্রেণী-নির্ভরতা মধ্যবিত্তদের কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। ভারতীয় অথবা পাক জাতীয়তাবাদের নির্ভরতা ছিল এই মধ্যবিত্তেরই উপরে। ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বুর্জোয়াশ্রেণী, নিজের স্বার্থের তাগিদেই পরে সামিল হয় মধ্যবিত্তের সঙ্গে। কিন্তু পাকিস্তানে বুর্জোয়া শ্রেণীকে কোনোদিনই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়নি। কারণ অবিভক্ত ভারতে পাকিস্তান আন্দোলনের ধারক ও বাহক শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ না করেই, বরং বহুক্ষেত্রে তাদের আনুকূল্যেই রাজনীতির প্রাঙ্গনে নেমেছিলেন। ফলে পাকিস্তানী বুর্জোয়াদের সঙ্গে পাক জনসাধারণের শ্রেণীগত বিরোধের সম্পর্ক, স্বাধীনতার আগে কখনো প্রকট হয়ে ওঠেনি। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতার এটা একটা প্রধান কারণ। ইসলামী ঐক্যের নামে এই দুর্বলতাকে ক্রমাগত চেপে রাখার চেষ্টা হয়েছে বলে, জনগণের শ্রেণীচেতনা কখনো খুব তীব্র হয়ে উঠতে পারেনি; অথচ মেহনতী মানুষের ছোট-বড়ো দাবী-দাওয়ার লড়াই ঘটনার চাপে যখন দানা বেঁধে উঠেছে, যখন সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে

মানুষের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে হলেও নানা দাবী উঠেছে, তখন সমাজতন্ত্রের কথাও প্রসঙ্গত এসে পড়েছে অনিবার্যভাবে। স্বাধীন বাঙলাদেশে আজ রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যের ঘোষণাতেও সমাজতন্ত্রের কথা জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হচ্ছে।

বিগত দুই দশক ধরে এশিয়ার স্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রায় প্রতিটি দেশেরই সামাজিক ন্যায়ের পটভূমিতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়েছে দেখা যায়। বলাবাহুল্য, এইসব ঘোষণার পিছনে আন্তরিকতা যথেষ্ট থাকলে, এশিয়া মহাদেশে বিগত দুই দশকে দু'একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জন্মলাভ করতো। সুতরাং তা যখন করেনি তখন হয় এই ঘোষণার-পিছনে শাসকশ্রেণীর আন্তরিকতার অভাব আছে, নয়তো সমাজতন্ত্রের ধারণা তাঁদের নিতান্ত অস্পষ্ট এরকম মনে করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জাতীয়করণ যে সমাজতন্ত্র নয় সে-ধারনা সম্ভবত বর্তমানে প্রসারিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের সহায়ক শক্তির প্রাধান্য সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত না হলে সমাজতন্ত্রের অনুকূল কোনো পদক্ষেপ সম্ভব নয়, একথাও আজ স্পষ্ট। সরকারী আদেশ-নির্দেশে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ গড়ে ওঠে না।

সম্ভবত বাঙলাদেশে আজ সমাজতন্ত্রের অনুকূল শক্তি সমূহের অগ্রগতির সম্ভাবনা সমুপস্থিত। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে জনগণের ব্যাপক ভূমিকা, পাক বুর্জোয়াশ্রেণীর শোষণ ও শাসনের অবসান এবং জাতীয় অর্থনীতিতে পাক বুর্জোয়াদের পরিত্যক্ত স্থান দখল করার জন্যে বাঙালি বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুপস্থিতি, একটা অধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ জাতীয় অর্থনীতির সামনে উন্মুক্ত হতে পারে : কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়েও যেমন ভারত-আগত মুসলমান ব্যবসায়ী ও ছোট মাঝারি লগ্নীকারকরা আমলাতন্ত্রের সহায়তায় অতি দ্রুত রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করে, সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে নিজেদের শ্রেণী-শাসন কায়েম করেছিল, বাঙলাদেশে সেই রকম বাঙালি বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাব যে ঘটবে না এমন কথা জোর করে বলা যায় না। জাতীয়তাবাদ পরশাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হাতিয়ার। কিন্তু স্বদেশী সমাজের পরস্পর বিরোধী শ্রেণী-স্বার্থের দ্বন্দ্বে, সেই জাতীয়তাবাদ অপেক্ষাকৃত শক্তিমান শ্রেণীর স্বার্থের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। ইতিহাসে এমন নজীর প্রচুর। অন্য যে কোনো দেশে জাতীয়তাবাদের তুলনায় মূল্য-বিচারে, চরিত্র-বিচারে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ব্যতিক্রম নয়। কারণ তা হওয়ার কোনো কারণ নেই।

বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক মানসিকতার বিপ্লব, বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লগ্নে, সারা দেশব্যাপী যে ব্যাপক গণঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানকার সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার গুনগত পরিবর্তনে সেই গণঐক্যের উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগই তার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষিত লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের তুলনায় কোনো অংশেই কম কঠোর নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলাদেশ এবং জাতি হিসেবে বাঙালি আজ ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলতাফ মাহমুদ সুর দিয়েছিলেন : "আমি কি ভুলিতে পারি" !

কুড়ি বছর ধরে এই গান মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়েছে। 'পূর্ব-পাকিস্তান' থেকে 'বাঙলাদেশ'-এর দীর্ঘ জটিল দুস্তর পথযাত্রায় কুড়ি বছর ধরে এই গান প্রতিটি যাত্রীকে বারবার গাইতে হয়েছে।

প্রতিক্রিয়া জানত একুশে ফেব্রুয়ারি হল বোধন, "সোনার বাঙলা" প্রতিষ্ঠা। তাই ওরা রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করেছিল। তাই ওরা বেছে বেছে হত্যা করেছে কবি সুরকার আলতাফ মাহমুদকে।

ফুটফুটে ছোটখাটো বউটিকে দেখলাম—সারা আরা মাহমুদ। বৃষ্টিশেষের পুষ্পিত টগর গাছের মতো শুভ্র শোকের প্রতিমূর্তি। চার বছরের বাচ্চা আছে একটা, আর বৃদ্ধা শাশুড়ী। কিছু বই, কিছু রেকর্ড। আর স্মৃতি···

ফিশফিশ করে বললেন : পঁচিশে মার্চ রাতে ? রাজারবাগের বাসায় ছিলাম। আমার ভাই-বোনরাও আমাদের সঙ্গে থাকত। উনিও সেদিন বাসায়ই ছিলেন।

যেন পাখি তার ডানা গোটাল। ভুরু কুঁচকে সেই ভয়াল রাতের কথা ভাবতে ভাবতে সারা মাহমুদ কথা বলছেন। ক্রমেই তাঁর স্বর স্পষ্ট হচ্ছে। ক্রমেই যেন একটা গলা তিনি শুনতে পাচ্ছেন, একটি সুর।

আমরা স্তব্ধ হয়ে তাঁকে দেখছিলাম ! বিষাদ আর প্রেরণার এমন সংমিশ্রণ শতাব্দীতে বারবার চোখে পড়ে না।

সারা বলতে লাগলেন : আমাদের বাসার সামনেই পুলিশ লাইন। পঁচিশে মার্চ রাতে এখানেই প্রথম আক্রমণ শুরু হয়, বাঙালি পুলিশরা এখানেই প্রথম অস্ত্র হাতে পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করে।

বিকেল থেকেই শহর থমথম করছিল। নানা রকম গুজব। সবাই বুঝেছে কিছু একটা হবে। কিন্তু ঠিক কী···তা কেউই জানে না। উনি বাসায় ফিরেছেন অসম্ভব অস্থিরতা নিয়ে।

এমন সময় পুলিশ ব্যরাকে হৈ চৈ শোনা গেল। ভাই গিয়ে জেনে এলো মিলিটারি আক্রমণ হতে পারে। ওখানে তাই প্রতিরোধের আয়োজন চলছে।

ফকরুল আলম বিল্লা সারার ভাই। পরবর্তীকালে সীমান্ত অতিক্রম করে 'মেলাঘর' ক্যাম্পে কাজ করেছেন। বললেন: আউটার সার্কুলার রোডের একদিকে পর পর সিভিলিয়ানদের বাড়ি, অন্যদিকে সাত-আটশো ফুট লম্বা টিনের ছাউনি দেওয়া শেডস। তার মধ্যেই কিচেন আর কিছু পুলিশের কোয়ার্টার। তারপর সারিসারি বিল্ডিং, পুলিশ ব্যারাক।

শ দেড়েক পুলিশ ঐ বিল্ডিংগুলোর ওপর পজিশন নেয়। বাকিরা রাস্তায়, নালার ধারে বা কোনো আড়াল বেছে পজিশন নেয়। ঐ টিনের শেডেও কিছু লোক পজিশন নিয়েছিল। তাছাড়া সিভিলিয়ানদের অনেকের বাড়ির ছাদেও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী উঠেছিল।

সারা বলতে লাগলেন: রাত এগারটায় এয়ার পোর্টের দিক থেকে ফায়ারিং শুরু হয়। উনি বললেন আলো নিভিয়ে সব একতলায় চলে যাও।

ঘণ্টাখানেক পরে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হল। দরজা-জানালা বন্ধ করে আমরা মুহূর্ত গুনছি। আমাদের গেটের সামনে মর্টার বসিয়ে পুলিশক্যাম্পে গুলী দাগা হচ্ছে। ওদিক থেকেও উত্তর আসছে। আমাদের বাড়িটা কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। আর বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে দিনের আলো। মিলিটারি সার্চলাইট জেলেছে।

ফকরুল হেসে বললেন: ট্রেসার লাইট।

সারা বলতে লাগলেন: সেই আলোয় মিলিটারি বিল্ডিংগুলোর ওপর পুলিশদের অবস্থান দেখে ফেলে। সম্ভবত বিল্ডিংয়ের ভিউ আরো স্পষ্ট পাওয়ার জন্য পাঞ্জাবীরা সেই প্রকাণ্ড টিনের শেডে রাত তিনটে নাগাদ আগুন ধরিয়ে দেয়। সে কি আগুন, উঃ। অনেকে তার ভেতরই আটক পড়ে। পুলিশরা ব্যারাক ছেড়ে রাস্তার পাশে নালার ধারে বা সিভিলিয়ান লাইনের কোনো দেয়াল কোনো গেটের আড়াল নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকে।

আর বাতাসে ঠিক বন্যার ঢেউয়ের মতো আগুন এদিক-ওদিক ধাওয়া করছিল। আগুনের গোল্লা, বাঁশের গিঁঠ ছিটকে ঘরে আসছে। দরজা-জানালা বন্ধ রেখে আমরা কি ভেতরেই পুড়ে মরব? আমাদের গেটের ধারে বাউণ্ডারির ভেতর ওঁর বড় আদরের কাঁঠালগাছটা পুড়ে গেল। আর মাত্র কয়েক হাত। তারপরেই আমাদের দালান। বাথরুমে চল্লিশ গ্যালন পেট্রল মজুত আছে।

পয়লা মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। তাই উনি পেট্রলটুকু আগেই কিনে রেখেছিলেন।

ফকরুল বললেন : বোনকে আলতাফ ভাই এইরকমই বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে তাঁর অন্য মতলব ছিল। এ-পেট্রল তিনি মলোটভ ককটেইল বানাবার জন্য মজুত রেখেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন আজ হোক কাল হোক মিলিটারির সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই ঐ পেট্রলের এক কণাও গাড়ির জন্য খরচ করেন নি।

সারা ভাইয়ের দিক এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। তারপর বলতে লাগলেন : আমাদের গোটা বাড়িটা তেতে উঠল। পোড়া গন্ধ। আগুনের আঁচ সইতে না পেরে টিনশেডের ঠিক উল্টো দিকের বাড়িগুলো থেকে বৌ-বাচ্চা নিয়ে মানুষজন গুলীর মধ্যেই দৌড়ে বেরিয়ে পড়ে। উনি বললেন : ভয় পেয়ো না, আমি আছি···

দাঁত দিয়ে তলাকার ঠোঁট কামড়ে মুহূর্তেক নীরব থেকে সারা মাহমুদ শেষ করলেন : শীতের ভারী ভারী জামা-কাপড় যা ছিল জলে ভালো ভাবে ভিজিয়ে পেট্রলের টিনের ওপর চাপা দিয়ে নিজে তিনি সারারাত বাথরুমে থেকেছেন, আমাদের কাউকে কাছে যেতে দেন নি। বাইরের ঘরে সবাই আমরা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। বাথরুমে একটু-আধটু আগুন যা আসছিল উনি নিভিয়ে ফেলছিলেন। কয়েক ঘণ্টা সেই ভয়ঙ্কর বিপদের সঙ্গে উনি একলা যুদ্ধ করেছিলেন।

আমরা স্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম। সেই মুহূর্তগুলো খানিক খানিক দেখতে পাচ্ছি। ঠিক গেটের সামনে পিশাচ মিলিটারিরা পজিশন নিয়ে আছে। চতুর্দিকে অবিরাম গুলীগোলা। মানুষজনের আর্তনাদ। পাকিস্তানী সৈন্যদের উল্লাসধ্বনি। দিন না রাত বোঝা যায় না। ট্রেসার লাইটের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। লকলকে আগুন বাতাসে চড়ে বর্গীর মতো একবার এদিক একবার ওদিক ধাওয়া করছে। অসহায় মানুষ হাহাকার করে একবার এদিক একবার ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে, আর মুখ থুবড়ে মরছে। বাইরের ঘরে বৌ—কতইবা বয়েস, কীইবা বোঝে, চার বছরের শিশুপুত্রকে বুকে চেপে ভয়ার্ত পায়রার মতো কাঁপছে। আর বৃদ্ধা মা। আর স্ত্রীর ভাইবোন।

বাথরুমে কয়েকঘণ্টা ধরে একা, একেবারে একা, পাহারা দিতে দিতে কবি

গাইয়ে সুরকার আলতাফ মাহমুদ দেখছেন পাক মিলিটারিরা বাঙলাদেশে আগুন জ্বেলেছে। আগুনে সংসার পুড়ছে, মানুষ পুড়ছে, গাছ পুড়ছে। পোড়া গন্ধে নিশ্বাস নেওয়া দায়। আগুনের আঁচে বাথরুমেও টেঁকা যায় না। কিন্তু চল্লিশ গ্যালন পেট্রল না বাঁচলে উঠোনের ঘাসটুকুও কালো হয়ে যাবে, আশেপাশের অনেকগুলো বাড়ির মাথায় নেমে আসবে সর্বনাশের অমোঘ বজ্র। আর, অপচয় হবে এক অমূল্য সম্পদের—প্রতিরোধ সংগ্রামে যার প্রয়োজনের কোনো তুলনা হয় না।

শান্ত স্থৈর্যে একা কয়েক ঘণ্টা প্রায় জতুগৃহের মধ্যে আগুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে চালাতে কি ভেবেছিলেন আলতাফ মাহমুদ? কবিতার কোনো পংক্তি কি তাঁর মাথায় আসে নি? গানের কোনো সুর কি তাঁর গলায় বাজে নি? কয়েক হাত দূরের কাঁঠাল গাছটায় যখন আগুন লাগল—তখনও কি তাঁর বড় ভালোবাসার বউটির কাছে একবার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে নি? গেটের বাইরে পজিশন নিয়ে মিলিটারিরা যখন সব কিছু ছারখার করে দিচ্ছে—তখন, ঠিক তখন, কোন ভরসায় তিনি ভবিষ্যতের প্রতিরোধের কথা ভেবেছিলেন?

সারা বললেন: বাতাসের গতির জন্য আমরা বেঁচে গেলাম। নইলে আমাদের বাসা, আমরা সবাই সে-রাতেই পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম।

বাড়িপোড়া আগুনের মধ্য দিয়ে কখন ভোরের আলো ফুটে উঠল টের পাই নি। বাইরের দিকে তাকানো যায় না, রাস্তার দিকে তাকানো যায় না। আমরা কোনোরকমে পাশের বাড়ি চলে যাই।

ঐ ২৬ তারিখ ভোরবেলা পুলিশরাও সিভিলিয়ানদের বাড়ি বাড়ি অস্ত্র এবং পোশাক ফেলে দেয়াল টপকে পালিয়ে গেল। অবশ্য ২৮, ২৯, ৩০ তারিখে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে অনেকে অস্ত্র ফেরৎ নিয়ে যায়। কিন্তু অনেকে আর আসে নি—তাদের কেউ কেউ আর কোনোদিনই আসবে না।

মিলিটারি জীপ রাস্তা দিয়ে মাইকে বলতে বলতে যেত: পুলিসলোগ, আর্মস থাকলে ফিরিয়ে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় যুবকরা পুলিশদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র লুকিয়ে ফেলে, কিছু বা পানিতে ফেলে দেয়। তাদের পরিত্যক্ত পোশাকও মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়।

২৭ তারিখে চার ঘণ্টার জন্য কার্ফ্যু উঠল। আমরা সবাই কমলাপুর বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে উঠলাম। তারপর শুনলাম মন্দিরও আক্রমণ করছে। খিলগাঁও-এ এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। দিন পনের ছিলাম। আলতাফ সাহেব লুঠের ভয়ে রাতে রাজারবাগের বাসায় গিয়ে থাকতেন।

আমার অনুমান এই সরল আর নিরীহ ভদ্রমহিলা জানতেন না, সম্ভবত পুলিশদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র এ-বাড়িতেও কিছু ছিল। আলতাফ মাহমুদ বোধহয় সেগুলো পাহারা দেওয়ার জন্যই বাড়ি ছাড়তে পারেন নি। এই অনুমানের কারণ অবশ্য এখন ব্যাখ্যা করা যাবে না।

এইভাবে কয়েক রাত কাটল। তারপর, দিন পনের বাদে, খিলগাঁও থেকে তিনি সকলকে বাড়ি নিয়ে এলেন।

ফকরুল আলম বিল্লা বললেন : ঐ পনের দিনের কথা আমার কাছে শুনুন। আমরা অনেক রাত অবধি তাস খেলতাম। মহম্মদ ইকবাল আর নাসের আহমদ থাকত। সীমান্ত পেরিয়ে ইকবালও পরে 'মেলাঘর' ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিল। তাস খেলতাম– কারণ কারোর চোখে ঘুম নেই। রাস্তায় মাঝে মাঝে জীপের শব্দ, তীব্র হর্ন। হঠাৎ আকাশের কোনো একটা দিক তামা হয়ে উঠত —অর্থাৎ শহরের কোথাও আগুন লেগেছে। আর থেকে থেকে নানা ধরনের গুলীর শব্দ। প্রথম কয়েকটা রাত খুবই খারাপ গেছে। আমি তো মাঝে মাঝে নিজের নিশ্বাসের শব্দেই চমকে উঠতাম। তারপর আস্তে আস্তে সয়ে এল। শহরের অবস্থা স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত কোনোদিনই স্বাভাবিক হয় নি। তবে, প্রথম কয়েকদিনের দুঃস্বপ্নের ঘোর ক্রমে এই শহরটাও কাটিয়ে উঠল।

আলতাফ ভাইকে দেখেছি, তাঁর নার্ভের জোর ছিল অসম্ভব, মুখ দেখে ভেতরের খবর কিছুই বোঝবার উপায় নেই। তাস খেলতে খেলতে একটা-দুটো কথা বলতেন। না, এই পনের দিন তিনি কলি গানও গান নি।

অন্যমনস্কের মতো মাঝে মাঝে বলতেন : কে বেঁচে আছে, কে কোথায় আছে—কিছুই বুঝছি না। কারোর সঙ্গে কারোর যোগাযোগ নেই। কীভাবে লিঙ্ক করা যায় ? কী করা যায় ?

একদিন হঠাৎ বললেন : আমি আসলে কিভাবে রেসিসটেন্স্ দেবে ভেবেছ ? ধাপে ধাপে একটু একটু করে তিনি আমার কাছে কথাটা পাড়লেন। আমি

তাঁর স্ত্রীর ভাই, একসঙ্গে থাকি, বন্ধুর মতো। কিন্তু এ-ব্যাপারে কোনোদিনই তিনি কাউকে সব কথা বলেন নি, আমাকেও না!

তবে মনে পড়ে গোড়ার দিকে আমরা প্ল্যান করেছিলাম—বোতল কেনা হবে, মিলিটারি এলে বোতলে পেট্রল ভরে ছুঁড়ে মারা হবে। বুঝলেন? হাইলি সফিসটিকেটেড আর্মসের বিরুদ্ধে সেই ছিল আমাদের প্রথম প্রতিরোধের অস্ত্র। তারপর এপ্রিলের শেষের দিকেই আলতাফ ভাই নিজের জন্য কীভাবে পাইপ গান তৈরি করিয়ে নেন।

ফকরুল আলম থামলেন। বোনের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে অন্যমনস্কের মতো হাসলেন। তারপর বললেন: জুলাই মাসের প্রথম দিকে ছেলেরা বাইরে থেকে অস্ত্র নিয়ে ফিরতে থাকে। আলতাফ ভাইয়ের সঙ্গে তাদের কারো কারো যোগাযোগ হয়।

প্রশ্ন করলাম: কি ভাবে? প্রথম যোগাযোগ কার সঙ্গে হয়েছিল?

ফকরুল আলম অস্বস্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন: জানি না। আগেই বলেছি সব কথা বলার অভ্যেস ওঁর ছিল না। আলতাফ ভাই একদিন আমাকে বললেন: ছেলেরা সব এসে গেছে, এইবার এ্যাকশন শুরু হবে।

ঢাকা শহরে এই সময়ে কিছু কিছু বোমা গ্রেনেড ফেটেছে। আমরা ভাবতাম সেগুলো এখানেই তৈরি। দুর্ধর্ষ ছেলেপিলে সব দেশেই থাকে, তারা ফাটাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ছেলেরা সংগঠিতভাবে বাইরে থেকে অস্ত্র নিয়ে ফিরছে—এটা স্বপ্নের মতো মনে হত। আমরা এইখানে বসে ভাবতাম উই আর ডুমড। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতাম, মুক্তাঞ্চলের কথা শুনতাম—কিন্তু নিজের চোখে কিছুই দেখতাম না।

আলতাফ ভাই বললেন: দে উইল ফাইট। আপনারাও চলে যান।

—আপনি যাবেন না?

—আমি সবকিছু ঠিক করে যাব।

ক্রমে আলতাফ সাহেবের বাড়িটা একটা কেন্দ্র মতো হয়ে ওঠে। সেখানে ঢাকা শহরের একাধিক ছোটো ছোটো গেরিলা গ্রুপের কেউ কেউ এসে জড়ো হতেন। গ্রুপগুলি অবশ্য আলাদা আলাদাই এ্যাকশন করত, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে যাওয়ায় নিজেদের মধ্যে তাঁরা ঐখানে বসে আগে-পরে অনেককিছুই আলাপ করে নিতেন। কেউ কেউ এঁরা পরস্পরের পূর্বপরিচিত

ছিলেন। এখন কাজের সূত্রে আবার একে অপরকে নতুন করে জেনেছেন। এ্যাকশনের সাফল্যে মাঝে মাঝে ছোটোখাটো সেলিব্রেসনও হত।

ঐ আড্ডায় কয়েকটি বেপরোয়া ছেলে আসত। তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল একধরনের দেশপ্রেম, "পাঞ্জাবী"দের বিরুদ্ধে অদম্য রাগ, উত্তেজনা আর সাহস।

আড্ডায় বসে আলতাফ সাহেব তাদের গল্প শুনতেন আর মাঝে মাঝে সাবধান করতেন: গেরিলাদের এত কথা বলতে নেই। কখনো বা কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলতেন: ওনারা নতুন তো, সব ঠিক বোঝেন না। কখনো বা ঠাট্টা করতেন: কী, এই বুদ্ধি নিয়ে কত বছর পলিটিকস করা হচ্ছে? হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যারা এ্যাকশন করেছিল তাদের একজনকে তো তিনি একদিন কিছুতেই গল্প থামায় না দেখে সস্নেহে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন, বলেন: যান যান, রাত হয়ে গেছে।

ধীর স্থির আলতাফ মাহমুদ ছিলেন ঐ কেন্দ্রের প্রাণ। "সমুদ্রের মৌন" নিয়ে তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন।

জুলাই মাসে মা ও স্ত্রীকে বলেছিলেন সবাইকে বরিশালে রেখে তিনি কাজে যাবেন। অর্থাৎ সীমান্ত পেরোবেন। কিন্তু যান নি। এদিকেও তাঁর কাজ ছিল। পাকিস্তানী সৈন্যরা যে বাঙলাদেশটা নিয়ে নিতে পারে নি, অস্ত্র হাতে খোদ ঢাকা শহরে মানুষ গেরিলাযুদ্ধ করছে—বাঙলাদেশকে, ভারতবর্ষকে, পৃথিবীকে এটা দেখাবার প্রয়োজন ছিল।

রেডিও টেলিভিসন সামরিক প্রশাসনের হাতে। কিন্তু বাঙলাদেশে বসেই যে মুক্তিযুদ্ধের গান লেখা হচ্ছে গাওয়া হচ্ছে—এটা সকলকে জানানো প্রয়োজন ছিল।

তাই তিনি থেকে যান। সেই প্রকাণ্ড বধ্যভূমিতে সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন—তাঁর গলায় গান, হাতে অস্ত্র।

আলতাফ মাহমুদ অনেককে নিরাপদে ভারতবর্ষে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। 'মেলাঘর' ক্যাম্প ও খালেদ মশাররফ-এর সঙ্গে তাঁর একটা যোগাযোগ হয়। যেসব গাইয়ে ঢাকায় থেকে গেছেন তাঁদের কাউকে কাউকে গোপনে ভারতবর্ষে পাঠাবার ব্যবস্থা করার অনুরোধ আসে। আলতাফ মাহমুদ ফেরদৌসী বেগমকে পাঠাবার চেষ্টা করেন। সেই সময়, আগস্টের প্রথম দিকে, আলতাফের মা ছেলেকে চলে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। ছেলে বলেন: যাব কিছুদিন পরে,

কাজ বাকি আছে। পঁচিশে আগস্ট ফকরুল আলমকে বলেন: আপনারা চলে যান, আমি দিন সাতেকের মধ্যেই আসছি।

আলতাফ মাহমুদ থেকে যান। বাঙলাদেশ জোড়া বদ্ধভূমির আসল হাড়িকাঠ ঢাকা শহরে বসে তিনি মৃত্যুকে শান্ত দৃঢ়তায় চ্যালেঞ্জ করেন—তাঁর হাতে অস্ত্র, গলায় গান।

সারা মাহমুদ বললেন: হাফিজ সাহেবের কথাও আপনার জানা দরকার। তিনি রেডিও পাকিস্তানের নামকরা মিউজিসিয়ান, বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, আলতাফ সাহেবের বন্ধু।

বাড়িতে কে কখন আসে, কেন আসে…আমি প্রায় জানতামই না। বুঝতাম কিছু একটা হচ্ছে—তবে ঠিক কি ব্যাপার তার আন্দাজ পেতাম না। পেতে চাইতামও না।

কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতাম। হাফিজ সাহেব এসে হর্ন দিলে উনি যে কোনো অবস্থায়ই থাকুন না কেন দৌড়ে বেরিয়ে আসতেন। গেটের পাশে কাঁঠাল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বলতেন। হাফিজ সাহেব বড় একটা ভেতরে আসতেন না।

ফকরুল বললেন: তখন স্বাধীন বাঙলা বেতার ভালোভাবে চলছে। রোজ প্রায় একই গান বাজত। আলতাফ ভাই এ-কারণেও নতুন গানের প্রয়োজন অনুভব করতেন।

সারা বলতে লাগলেন: কেউ জানে না, লতিফ সাহেব আমাদের বাড়ি বসেই গান লিখতেন। বলতেন—সুর দেওয়া হলেই ছিঁড়ে ফেলবে। আলতাফ সাহেবও কিছু গান লিখেছেন। ঐ সময়টা যেন আচ্ছন্নের মতো কাটিয়েছেন। দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে একা বসে সুর দিতেন। ঘরে কেউ থাকতে পেত না। হয়তো খুব কষ্ট পেয়েছেন। গলা খুলে গাইতে পারছেন না তো? আর, বাড়িতে যারা থাকে, নিয়মিত যারা আসে—তাদেরও জানতে দিতে চান না। এইভাবে কি সুর হয়, বলুন?

উজ্জ্বল চোখে প্রসন্ন মুখে হেসে সারা বলতে লাগলেন: কিন্তু সুর উনি দিলেন। লতিফ সাহেবের লেখা নিজের লেখা সব কটা গানেই আলতাফ সাহেব সুর দিয়েছিলেন।

—সেই কবিতাগুলি কোথায়?

—সুর দেওয়া মাত্র ছিঁড়ে ফেলেছেন।

—কোনো কপি নেই ?

বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে সারা মাহমুদ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লেন।

ফকরুল আলম বললেন : অবশ্য টেপ করে গিয়েছেন। সেই টেপ এখন বাঙলাদেশ বেতারকেন্দ্রে আছে।

সারা মাহমুদ সোৎসাহে বললেন : হ্যাঁ, টেপ করতে পেরেছিলেন। মিউজিক্যাল হ্যাণ্ডস যোগাড় করতেন হাফিজ ভাই আর রাজা হুসেন খান। আলতাফ সাহেব নিজের গাড়িতে ঘুরে ঘুরে গাইয়েদের যোগাড় করতেন। শিল্পী কারা ছিলেন ঠিক জানি না। ঢাকায় দুটো স্টুডিও আছে। বেঙ্গল স্টুডিও আর ফিল্ম ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন স্টুডিও। এর কোনো একটায় রিহার্সাল আর রেকর্ডিং হত একদিনে একসঙ্গে।

বুঝলাম আলতাফ সাহেব কোনো ঝুঁকি নিতে চান নি। এক জায়গায় সকলকে জড়ো করে গান শিখিয়ে রেকর্ড করে তবে শিল্পীদের বাইরে যেতে দিয়েছেন। তিনি চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত সঙ্গীতপরিচালক ছিলেন। সুতরাং স্টুডিওতে কেউ সন্দেহ করে নি।

সারা মাহমুদ বললেন : রেকর্ড করে সকলকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আলতাফ সাহেব রাত তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরেছেন। এপ্রিল মাস থেকে প্রায়ই তাঁর ফিরতে অনেক রাত হত। একদিন রাস্তায় ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। জোরে গাড়ি চালিয়ে রক্ষা পান, তবে ঢিলে উইণ্ডগ্লাস ভাঙে। তাছাড়া মিলিটারি পুলিশের ভয় তো ছিলই।

শুনলাম আলতাফ মাহমুদ দুবার রেকর্ড করান। প্রথম দিকে তাঁর ১২খানা গানের একটি স্পুল নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় একজন অবাঙালি ক্যুরিয়ের ধরা পড়েন। তাঁর মৃত্যু হয়। সেই স্পুলটা আর পাওয়া যায় নি।

জুলাইয়ের শেষের দিকে আবার অনেকগুলো গান রেকর্ড করে দুটো বড় স্পুল তিনি স্বাধীন বাঙলা বেতারকেন্দ্রের জন্য পাঠান। বহু দেরিতে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, সেটা কলকাতায় পৌঁছয়।

সারা মাহমুদ বললেন : এপ্রিলের শেষের দিকে ওঁর গানের ব্যাপার শুরু হয়। জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত ঐ কাজে ছিলেন।

ফকরুল আলম বললেন : আলতাফ ভাই আগস্টের প্রথম থেকে ঢাকার ক্র্যাক প্লাটুন-এর সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত হন। সেপ্টেম্বরের শুরুতে হয়তো চলে

যেতেন। কিন্তু তার আগেই ধরা পড়ে যান।

সারা মাহমুদ বললেন: তিরিশে আগস্ট সকাল ৬টায় মিলিটারি এসে আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে। আমরা কেউ জানতেও পারি নি। সামনের ঘরে ছিল আমার দুই ভাই আর ও-বাড়ির দুটি ছেলে, আমি ভাগনে বলে ডাকি। আলভিও ছিল, আগের রাতে সে আর ফেরে নি।

পেছনের ঘরে ছোট বোনটা রেওয়াজ করছিল। শেষ করে দরজা খোলা মাত্র দুজন আর্মি তার বুকের ওপর বন্দুক চেপে ধরে। বেচারা চীৎকার করে ওঠে। ওর চীৎকার শুনেই আমি ঘুমচোখে ঘর খুলে দৌড়ে বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠি: পাঞ্জাবী পুলিশ এসেছে। ও বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বলে: ভয় পাও কেন এত?

বেরোনো মাত্র ওরা দুজনে এসে ওর দুই হাত ধরেছে। সোজা ড্রইংরুম দিয়ে বাইরে নিয়ে গেছে। একটা কথা বলার অবসর পর্যন্ত পায় নি। আমাকে ওর সেই ছিল শেষ কথা: ভয় পাও কেন এত?

আমি আর মা ড্রইংরুমে যেতে যেতে শুনলাম কে যেন ভারী গলায় প্রশ্ন করছে: আলতাফ মাহমুদ কৌন হ্যায়?

ড্রইংরুমে পৌঁছে খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম বারান্দার খাটে আলভি আর ওরা চারজন বসা। তিনজন পাঞ্জাবী রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুজন আলতাফ সাহেবকে নিয়ে যাচ্ছে বারান্দা দিয়ে। দেখি সোজা পেছনের মাঠে পাশের বাড়ির দেওয়ালের ধারে একটা গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল।

নানা সূত্রে আমি জানতে পারি শনিবার ঢাকার ক্র্যাক প্লেটুনের একজন গেরিলা অস্ত্র হাতে ধরা পড়ে। সমস্ত রাত মার খেয়ে সে আরেকজনের নাম বলে ফেলে। তাকে রবিবার বিকেলে ধরা হয়। কয়েকদিন আগে এই যুবকই নিশুত রাতে একটা স্টিলের ট্রাঙ্ক আলতাফ মাহমুদের বাড়ি নিয়ে আসে। অন্ধকারে গাছতলায় চারজন মাটি খুঁড়ে সেটা পোঁতে। এক-আধদিনের মধ্যে সেই চারজনের দুজন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে চলে যায়। দিন সাতেক পরে আলতাফ সাহেবেরও গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার কথা ছিল। ইতিমধ্যে চতুর্থজন ধরা পড়ে এবং অকথ্য নির্যাতনের পর মিলিটারির কাছে স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়। তিরিশ তারিখ সোমবার সকালে এসে সে নাকি দূর থেকে আলতাফ সাহেবকে দেখিয়েও দেয়, এবং গাছতলাটা।

আরও জানতে পারি আলতাফ ভাইয়ের বাড়িতে যে গেরিলারা নিয়মিত আড্ডা দিত, তাদের একজন বিদেশে চলে যায় এবং স্বাধীনতা পর্যন্ত সেখানেই ছিল। এই সময় কয়েকজন আমেরিকানের সঙ্গে নাকি তার খুবই ঘনিষ্ঠতা দেখা গেছে।

সারা মাহমুদ বলতে লাগলেন: বন্দুক দেখিয়ে ওরা আলতাফ সাহেবকে মাটি খোঁড়াল। ওরা তাঁকে লাথি ঘুঁষি মারছিল, গায়ে মুখে কাদা ছুঁড়ছিল। আমরা বুঝতেই পারছি না জায়গাটা খোঁড়াচ্ছে কেন। শেষ পর্যন্ত ওরা কি তাঁকে নিজের কবর খুঁড়তে বাধ্য করছে? হায় আল্লা, আমাদেরই চোখের সামনে?

তারপর কয়েকজন মিলে একটা ট্রাঙ্ক টেনে তুলল। মুহূর্তে সব বুঝলাম। ওরা দ্রুত ওঁকে অন্য গেট দিয়ে বার করে নিয়ে গেল। যে-গাড়িটা অপেক্ষা করছিল, তাতে তুলল। তারপর অস্ত্র ভর্তি স্টিলের বড় ট্রাঙ্কটা নিয়ে গাড়ি চলে গেল।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সারা মাহমুদ আবার বললেন: চলে গেল।

মুহূর্তেক নীরব থেকে বলতে লাগলেন: ইতিমধ্যে ওপর থেকে অন্য ভাড়াটেদের তিনটি ছেলেকে ধরে এনে মিলিটারিরা আমাদের বারান্দার খাটে বসিয়ে রেখেছিল। রাস্তার চলন্ত জীপ থামিয়ে তিন বাড়ির এই এতগুলি ছেলেকে ধরে নিয়ে এবার তারাও চলে গেল।

সেইদিনই বিকেল পাঁচটায় ওপরের ভাড়াটিয়া তিনজন এসে যায়। বুধবার, পয়লা সেপ্টেম্বর, দুই ভাই দুজন ভাগ্নে আর আলভি ছাড়া পেল।

এই দুদিন ওরা রমনা থানায় আলতাফ সাহেবের সঙ্গে ছিল। তাঁকে দিনের বেলা এম. পি. এ. হস্টেলের কশাইখানায় নিয়ে টর্চার করত। রাতে রমনা থানায় রাখত।

সবাইকেই ভীষণ অত্যাচার করেছে।

মাথা নিচু করে পা ওপরে ঝুলিয়ে দিত। তারপর ধাক্কা। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দোল খেতে খেতে শরীরটা যেই কাছে আসে অমনি পিটুনি।

—এক মুক্তিফৌজকো নাম বাতাও।

বলতে না পারলেই মার।

আলভি ছবি আঁকে, নাম করা শিল্পী, তার হাতের নখ তুলে নিয়েছে। ভাই আর ভাগ্নেদের একজন অনেকদিন কানে শুনত না, একজন আজও

ভালোভাবে মাথা তুলতে পারে না, একজনের আঙুল ভেঙে গেছে। খন্দু এম. এস. সি. এগ্রিকালচারে থীসিস করত। ওরা চোখ বেঁধে তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করায়। এক মিলিটারি অফিসার বলে : আমি ওয়ান… টু…বলব, তার মধ্যে কোনো 'মুক্তি'র নাম না করলেই থ্রি এবং গুলী। খন্দু বলে : আমি কিছু জানি না। অফিসার তখন ওয়ান…টু ..বলে, কিন্তু থ্রি আর বলে নি। সে নতুন করে ভয় দেখায় : হাত-পা বেঁধে বুড়ীগঙ্গায় ফেলে দেবো! বলে : তোমার মতো কুত্তার জন্য এতটা শীষে নষ্ট করা ঠিক নয়।

ভীষণ অত্যাচার করেছে। একটা বাথরুমে ১৬ জনের থাকার ব্যবস্থা। সেই নরকে এমনকি ছড়িয়ে বসার মতো জায়গাও ছিল না। থাকতে না পেরে হাফিজ সাহেব এক সময় দীনুকে বলেন : একটু শুই?

হাফিজ সাহেব তার কোলে মাথা রেখে শোয়ার পর দীনু দেখে হাফিজ সাহেবের একটা চোখ তুলে নিয়েছে, আঙুলগুলো কেটে দিয়েছে। আলতাফ মাহমুদের প্রতিরোধের গানের সঙ্গে হাফিজ সাহেবের ঐ চোখ আর ঐ আঙুলই গর্জে উঠেছিল। তাই তাঁকে মরতে হয়েছে।

আলতাফ মাহমুদের ওপর অত্যাচারের মাত্রাটা ছিল আরও বেশি। জানা গেছে জেরার উত্তরে তিনি একটি কথাই বলেছেন। যে-ছেলেটি বাড়িতে এসে তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছিল, তার নাম করে বলেছেন : ষ্টিলের ট্রাঙ্কটা আমি ওর কথায় রাখতে বাধ্য হই। কি আছে নিজেও জানতাম না। দোষ হলে আমারই দোষ। বাড়ি থেকে আর যাদের ধরেছ—তারা কেউ কিছু জানে না।

আলতাফ সাহেব একটা নাম বললে হয়তো বেঁচে যেতেন, অন্তত অত্যাচার কিছুটা কম হত। কিন্তু আর কিছুই তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় নি।

সারা মাহমুদ বললেন : রমনা থানায় মুক্তিফৌজের অন্য ছেলেরা এই দুদিন ওঁকে পায়। খুব যত্ন করে। এম. পি এ. হস্টেলে নিয়ে সারাদিন মারধর করার পর ওরা রাত কাটাতে ওঁকে ফিরিয়ে আনত। পাঞ্জাবী পুলিশের সামনে সবাই আলতাফ সাহেবকে না চেনার ভান করত, তারপর পুলিশ চলে গেলেই লাফ দিয়ে উঠে ওঁর সেবায় লেগে যেত। বাঙালি পুলিশকে ঘুষ দিয়ে তারা একটু-আধটু ওষুধও আগেই আনিয়ে রাখত। আড়াই দিনে একবার সকলকে খেতে দেয়—রুটির ধারগুলো, মাঝখানে কিছু নেই ; আর পচা ডাল। ছেলেরা সেই খাবারই ভালোবেসে এগিয়ে দিত। কিন্তু খাবে কে? দিন ফুরিয়ে আসছিল!

আলতাফ সাহেব এই রমনা থানায় মৃত্যুর মুঠোয় বসে সেই অসম্ভব

অত্যাচারের মধ্যেও খসুকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন : দেশের কোনো কাজই তো করতে পারলাম না !

পরে এইখানকারই একজন বন্দী তাঁর ওপর নির্যাতনের নানা ভয়ঙ্কর খবর জানিয়ে বলেছিল তেসরা সেপ্টেম্বর চোখ বেঁধে আলতাফ ভাইকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়।

তারপর কি হয় আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। কেউ বলে তাঁকে এম. পি. এ. হস্টেলে দেখেছে— ক্ষতবিক্ষত চেহারা। কেউ বলে সেণ্ট্রাল জেলে দেখেছে— চেনা যায় না। কেউ বলে ক্যানটনমেণ্ট হাসপাতালে দেখেছে—একেবারে ফালা ফালা অবস্থা। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সংবাদও কেউ ঠিকমতো দিতে পারে নি।

সারা মাহমুদ বললেন : অকটোবর মাসে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে পারমিশান দিত। আমি যেতাম সেণ্ট্রাল জেলে, কয়েকবার গিয়েছি ; বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রেখে শেষে জানাত—ও-নামে এখানে কেউ নেই। আমার শাশুড়ী ক্যানটনমেণ্ট হাসপাতালে গিয়েছেন। সেখানেও তাঁকে খাতা দেখে বলা হয়েছে—ও-নামে কেউ নেই।

ফকরুল বললেন : ১৬ই ডিসেম্বর রাত দেড়টায় তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছিল। এমনকি খাতায় পর্যন্ত কোনো রেকর্ড নেই।

তারপর একটু গলা নামিয়ে বললেন : ফলে আমার বোন এখনও মাঝে মাঝে আশা করে—হয়তো আলতাফ ভাই বেঁচে আছেন।

বিষাদ ও প্রেরণার সেই প্রতিমূর্তির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম : হ্যাঁ, আলতাফ ভাই নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন।

আমার ১৯৫৪ সালের কথা মনে পড়ল। কার্জন হলের ঐতিহাসিক সাহিত্য সম্মেলনে কবি, সুরকার, সঙ্গীতশিল্পী ও রাজনৈতিক কর্মী তরুণ আলতাফ মাহমুদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখা সেই অমোঘ গান আমি তাঁর গলায়ই প্রথম শুনেছিলাম :

> "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
> আমি কি ভুলিতে পারি।"

আশ্চর্য সে-অভিজ্ঞতা কোনোদিন ভুলবার নয়। হাজার লক্ষ অশ্রুসজল

চোখে বজ্রের দৃঢ়তা প্রথম ঐখানেই লক্ষ্য করি। ঐখানেই আমি লতিফ ভাইকে গাইতে শুনি :

"ওরা আমার মুখের ভাষা
কাইড়া নিতে চায়
ওরা কথায় কথায় শিকল পরায়
আমার হাতে পায় ॥"

ওইখানেই শুনি :

"কোরাস : তুইশ বছর ঘুমাইলি
আর কেনরে বাংগালি
জাগরে এবার সময় যে আর নাই
আইজো কি তুই বুঝবি নারে
বাংলা বিনে গতি নাই ॥"

ওইখানেই শুনি :

"রাখতে বাংলা তোমার মান
ফাঁসির কাষ্ঠে দিমু জান
লইতে বুকে গুলি না ডরাই
বলরে মোমিন বলরে সবে
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।"

ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম! কুড়ি বছরের বন্ধুর রক্তাক্ত পথযাত্রা। কুড়ি বছর বড় একটা দুটো দিন না।

আলতাফ মাহমুদ পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকেই প্রাত্যহিক রাজনীতির সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন না। সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্রে যোগ দিয়েছিলেন, "পয়সা করেছিলেন।" কিন্তু পলটন ময়দানে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারির মূল অনুষ্ঠানটি তাঁরই পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হত। তিনি কেন্দ্রচ্যুত হন নি। তাই দুঃশাসকদের সমস্ত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ এবং ৭০ সালে লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে তাঁকে তাঁর যোগ্য ভূমিকায়ই দেখা গেছে। তিনি কেন্দ্রচ্যুত হন নি। ৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিক্ষুব্ধ শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান করতে তিনি রাস্তায়ও নেমেছিলেন। শহীদ দিবসে টেলিভিসনে গান গেয়েছিলেন :

"বাঙলার ভাষা বাঙালির আশা
আহ্বান আনে তারি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।"

তারপরেই মার্চ, তারপরেই আগস্ট, তারপরেই···

বাঙলাদেশের মাটিতে তিরিশ লক্ষ মানুষের রক্ত। বাঙলাদেশের মাটিতে দু লক্ষ ধর্ষিতা রমণীর অশ্রু। আর, একটা জাতির কল্পনাপরাস্তকারী বীরত্ব। এবং স্বাধীনতা। নতুন পতাকা, নতুন জাতীয় সঙ্গীত।

বাঙলাদেশ কেন্দ্রচ্যুত হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দিকে পৃথিবীর নবীনতম জাতি শুরু করেছে তার অভ্রান্ত জয়যাত্রা।

কিন্তু কৃষক জমিতে লাঙ্গল দিতে এখনও ভয় পায়, কারণ মাটি খুঁড়লেই কঙ্কাল বেরোয়। জেলে নদীতে জাল ফেলতে এখনও ভয় পায়, কারণ বাঙলাদেশে এমন কোনো নদী নেই বিল নেই হাওর নেই যেখানে শত-সহস্র মৃতদেহ ভেসে যায় নি। রাস্তার ধারে কিছু পড়ে থাকলে লোকে ভয়ে ছোঁয় না, কারণ এমন তিনটে পরিত্যক্ত বস্তায় নাকি শুধু কয়েক হাজার মানুষের চোখ পাওয়া গিয়েছিল। স্বাধীনতার দুমাস পরেও নাকি পাক সৈন্যদের ফেলে যাওয়া মাইন ফাটে, গণকবর আবিষ্কৃত হয়, বাঙ্কারে মেয়েদের ছেঁড়া ব্লাউজ পাওয়া যায়।

বাঙলাদেশের পরতে পরতে রক্ত। এবারের একুশে ফেব্রুয়ারি তাই আরো বেশি রক্তাক্ত।

ঊনত্রিশে আগস্ট, ধরা পড়ার আগের দিন, আলতাফ মাহমুদ রাত নটায় বেরিয়ে এগারোটায় ফেরেন। ভাত খান নি। চাপা অস্থিরতায় ছটফট করেছেন। আলতাফ ভাই কি বুঝতে পেরেছিলেন বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র তাঁকে ঘিরে ফেলছে?

স্বাধীনতার দেড়মাস পরে, আঠাশে জানুয়ারি, হারিয়ে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায়, বদর বাহিনীর হাতে নিহত শহীদুল্লা কায়সারের বাড়িতে 'স্টপ জেনোসাইড' তথ্যচিত্রের পরিচালক কথাশিল্পী জহীর রায়হান অস্থির হয়ে বলেছিলেন: এদেশে সি. আই. এর চক্রান্ত অব্যাহত আছে। সেই কালো হাত আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

জহীর ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদও কেউ ঠিকমতো দিতে পারে নি। ওঁর স্ত্রী সুচন্দাও বিশ্বাস করেন : জহীর রায়হান বেঁচে আছেন।

আমার চোখে 'স্টপ জেনোসাইড'-এর শেষ দৃশ্যটি ভেসে ওঠে। আমি মনে মনে চীৎকার করে বলি : জহীর ভাই নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন।

এবারের একুশে ফেব্রুয়ারি তাই আরো বেশি রক্তাক্ত।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন ঐদিন পিকিং শহরে মাও-সে-তুংয়ের সঙ্গে করমর্দন করবেন। আর চীন ও মার্কিন অস্ত্রে বিধ্বস্ত ঢাকা শহরের শহীদ মিনারে লক্ষ কণ্ঠের গান শুনতে শুনতে ঐদিন আমরা সামনে জহীর ভাইকে দেখব, আলতাফ ভাইকে দেখব। তারপর ইতিহাসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইব : আমি কি ভুলিতে পারি!

বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে

শান্তিময় রায়

বাঙলাদেশ-এর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সম্প্রতি অনেক তথ্য ও লেখা বেরিয়েছে। তবু অনেক কিছুই অলিখিত আছে, কেননা সে-সব কথা প্রকাশ করার সময় এখনো আসেনি।

২৫শে মার্চ মধ্য রাত্রিতে ইয়াহিয়া খান বাঙলাদেশের জনসাধারণ ও ১৯৭১-এর সাধারণ নির্বাচনে প্রদত্ত গণতান্ত্রিক রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পাকিস্তানকে কার্যত দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলাদেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সূচনা। এপ্রিল-মে মাসে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে ভারতের বুকে বাঙলাদেশের মানুষ আশ্রয় নিলেন। ভারতের জনগণ দল-মত-নির্বিশেষে ও ভারতের সরকার তাদের যা সাধ্য ও সামর্থ্য তাই নিয়ে এগিয়ে এসে অকাতরে শরণার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা এই জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে সম্পূর্ণ সার্থক করার সঙ্কল্পেও এগিয়ে এলেন।

১লা এপ্রিল লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে এক প্রস্তাবও গৃহীত হলো। সমস্ত ভারতের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন, দলমতনির্বিশেষে পার্লামেন্টে ঐকমত্যের দাক্ষিণ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই ঐতিহাসিক জাতীয় উদ্যোগে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। তাঁর সম্মুখে সমস্যা ছিল হিমালয় পর্বতের মতো দুর্লঙ্ঘনীয়। সমস্যাগুলি নিম্নরূপ :

(১) জনসংঘ, এস. এস.পি প্রভৃতি কয়েকটি রাজনৈতিক দল অবিলম্বে বাঙলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি জানাল। এই দেশে আশ্রয়প্রার্থী বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য অনেক নেতৃবৃন্দ, এমন-কি বহু এম. পি. এ. ও এম. এন. এ. এবং সাধারণ কর্মীরাও এই দাবিতে খুবই আলোড়িত ও উৎসাহিত হলেন।

বাঙলাদেশের কর্মচারী, সৈনিক ও পুলিস বাহিনীর ব্যক্তিরা—যাঁরা পরে মুক্তিবাহিনী গঠন করেন, তাঁরাও খুব তাড়াতাড়ি একটি সামরিক সমাধানের জন্য নানা দিক থেকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন : "কেন ভারতীয় সেনাবাহিনী ভিতরে ঢুকে পড়ছে না," "এখনি আক্রমণ করা উচিত" ইত্যাদি।

(২) কংগ্রেসের মধ্যেও এ ধরনের মতামত বেশ চালু ছিল। মনে পড়ছে,

যখন শরণার্থীদের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ পার হয়েছে—পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি খুবই উত্তেজিত ভাবে বললেন—"অবিলম্বে সামরিক অভিযান না করলে আমরা ডুবে যাবো।"

(৩) অনেক প্রখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে নানা বক্রোক্তি করতে থাকেন। "দেশকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন তাঁর পরামর্শদাতারা"—এই বলে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হলো।

(৪) দিল্লী ও কলকাতার দুইটি অভিজাত হোটেলে বিশেষ দেশের বিদেশী দূতদের আনাগোনা বেড়ে গেল। ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিবিপ্লব সম্পূর্ণ করে একজন সি. আই.এ-র বিশেষজ্ঞ হিন্দুস্থান হোটেল কন্টিনেণ্টাল ও গ্রাণ্ডহোটেলে উঠলেন। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ হতে লাগলো কিছু সংখ্যক এম এন. এ., এম. পি. এ. ও ঢাকা-চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক আর বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দের মধ্যে। এঁদের কেউ কেউ অতীতে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আবার অনেক অভিজাত ব্যবসায়ী ও অনেক ব্যাঙ্ক লুণ্ঠনকারী তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা নামধারী আদর্শবিহীন সুবিধাবাদী মস্তান এসে ভিড় করল কলকাতা ও দিল্লীতে, আগরতলা আর শিলং-এ। লুঠের টাকার সঙ্গে খয়রাতি ডলার মিশে একাকার হলো। এই মহারথীদের রৌপ্যমুদ্রার যাদুস্পর্শলাভ বাঙলাদেশ থেকে আগত এক সুবিধাভোগী সামান্যসংখ্যক ব্যক্তির অনেকেই করেছিলেন। শোনা যায়, আমাদের দেশের কোনো কোনো বিশিষ্ট আমলা এই সচল দাক্ষিণ্য লাভে তাঁদের লালসার হাত প্রসারিত করেছিলেন।

এ ছাড়া সন্ধ্যার আসরে—পার্ক স্ট্রীট্ অঞ্চলের নামী রেস্তঁরাগুলিও এঁদের ফিস-ফিস শব্দে সরগরম থাকত। আমাদের দেশের কোনো কোনো বিশিষ্ট সাংবাদিকও অক্লান্তভাবে এঁদের সঙ্গদান করে মধ্যরাত্রে ফিরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর এই 'সর্বনাশা নিষ্ক্রিয়তার নীতি'কে ব্যঙ্গ করতে কিংবা সস্তা রসিকতা করতেও কার্পণ্য করেন নি।

(৫) জুলাই-আগস্ট মাসে বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের বিরুদ্ধে এক পরাক্রান্ত সি. আই. এ-র চক্রান্ত প্রায় চরম পর্যায়ে ওঠে। এমন-কি আওয়ামী লীগেরও অনেক বিশিষ্ট নেতাকে[নাম না বলাই সমীচীন] মুখে বলতে শুনেছি, "ভারতবর্ষ চায় আমরা এইভাবে দুর্বল হয়ে যাই। এইভাবে নিঃশেষ হয়ে লাভ কি? তার চেয়ে কোনোক্রমে যেনতেনভাবে একটি রাজনৈতিক সমাধান করে ফেলাই ভালো। ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের ঘরে ফিরে যেতেই হবে।" এঁরা কিন্তু

মুক্তিযুদ্ধে হাতিয়ার ধরেননি। তবে বাকযুদ্ধ অনেক করেছেন। এইসব প্রচারের ফলে গ্যালব্রেথের **কনফেডারেশন-এর** প্রস্তাব মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

(৬) আমাদের দেশের নির্বোধ আমলারাও এই জাতীয় উদ্যোগে নানা সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের আত্মম্ভরিতা, সবজান্তাভাব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও সেখানকার নেতাদের সঙ্গে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার এই সব নেতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সি. আই. এ-র বিভ্রান্তকারী প্রচারের সুবিধা করে দিত। প্রথমত, মুক্তিযোদ্ধার বেশধারী মস্তানদের সঙ্গে এই সব আমলারা ভাগবাটোয়ারায় লিপ্ত থেকে সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচেষ্টায় বাধা দান করতেন। উত্তরবঙ্গ ও মেঘালয়ে এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে এই সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার ফলে এগুলি বন্ধ হয়।

দ্বিতীয়ত, আমলারা অনেক জরুরি কাজকে জরুরি মনে করতেন না। মুজিবনগরে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ-শিক্ষা-শিবির নির্মাণ করা হবে ঠিক হলো এপ্রিল মাসের শেষে। প্রধানমন্ত্রী মে মাসের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করতে বললেন। ভারপ্রাপ্ত আমলারা ভুল রিপোর্ট দিলেন : "সব হয়ে গেছে। আমরা সব ভার গ্রহণ করেছি।" অথচ মে মাসে তৈরি হলো মাত্র চারটি শিবির। আর সব শিবিরের ব্যয়ভার [পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের] প্রধানত বহন করলেন 'পশ্চিমবঙ্গ বাঙলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতি' ও হরিয়ানার 'বাঙলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতি।' এ ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য ও পশ্চিমবঙ্গের আরও অনেক ছোট ছোট সহায়তা সমিতি এই কাজে এগিয়ে এলেন। যেমন : 'মহারাষ্ট্র বাঙলাদেশ সাহায্য সমিতি,' অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ জিষ্ণু দে প্রভৃতির বাঙলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সাহায্য সমিতি, শ্রীমতী বীণা ভৌমিক পরিচালিত কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী পরিচালিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সমিতি, স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের পরিচালিত বাঙলাদেশ সংযোগ রক্ষা সমিতি, ন্যাশনাল রিলিফ অর্গানাইজেশন, বাঙলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহায়তা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ অধ্যাপক সমিতি প্রভৃতি বহু বহু জানা-অজানা সংস্থা-সংগঠন।

বস্তুত, বেসরকারী এই প্রচেষ্টা না হলে অক্টোবর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের

অভিযান-চালানো হতো একান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। মোটের উপর, মুষ্টিমেয় কয়েকজন দেশপ্রেমিক উচ্চ কর্মচারীর কথা বাদ দিলে বেশির ভাগ কর্মচারীই এই মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যুদ্ধকালীন কর্মোদ্যমের পরিচয় দেননি।

(৭) শুধু তাদেরই-বা দোষ দিয়ে লাভ কি? 'বাঙলাদেশ'-এর কর্মচারীরা মন্ত্রীদের বাড়িতে বা অফিসে এই সঙ্কটক্ষণেও যথারীতি শনিবার, রবিবার ছুটি পালন করে গিয়েছেন। অথচ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে মুক্তিযোদ্ধারা কিন্তু মরণপণ করে এগিয়ে চলেছেন! তাঁদের না ছিল পর্যাপ্ত খাদ্য, না ছিল যোগ্য পরিধান, কিংবা আহত অবস্থায় চিকিৎসার সুব্যবস্থা। কিন্তু তবু তাঁদের কোনো দিন বিশ্রাম করতে দেখিনি। শুধু এক কথা, "অস্ত্র, আরো অস্ত্র দিন।" আমলাতন্ত্রীদের—তা এ-দেশেরই হোক বা আশ্রয়প্রার্থী সরকারেরই হোক—এই ঢিলেঢালা ভাব অনেকের নিকটই দুর্বোধ্য ঠেকেছে।

(৮) উদ্দেশ্যপরায়ণ সঙ্কীর্ণমনা কিছু দল 'ইন্দিরা-ইয়াহিয়া এক হ্যায়' ধ্বনি দিয়ে বা মুক্তিযুদ্ধের সর্বব্যাপী ফ্রন্টের বাইরে দলছুট কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে কো-অর্ডিনেশন কমিটি তৈরি করার মাধ্যমে, এদেশে এবং ওদেশে সংগ্রাম-বিরোধী বিভেদের বীজ উপ্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ভারতের বাইরে বাঙলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের বিবেক জাগ্রত করার কাজে সাফল্যলাভ করেনি। প্রথম থেকে ভারত সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট এটা ছিল একটি বিরাট সমস্যা। বিদেশে আমাদের বেশিরভাগ রাষ্ট্রদূত চরম অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন বলেই এই বিপর্যয়। এপ্রিল, মে ও জুন মাস পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া [চীন বাদে] ছাড়া আর কোথাও ইয়াহিয়ার নারকীয় হত্যা লীলার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রাথমিক সমর্থনকে বলিষ্ঠ সমর্থনে উন্নীত করা ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামরূপে স্বীকৃতি দানের পশ্চাতে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতের শান্তি-সংসদ, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও সারা ভারত মহিলা ফেডারেশন। এই সংস্থাগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে তথ্যভিত্তিক প্রচারের সাহায্যে—পৃথিবীর এক বিরাট অংশের সরকার ও জনসাধারণের সমর্থন সংগ্রহ করেন।

দুইটি ঘটনা এই দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

(ক) প্রথমটি হচ্ছে অক্টোবর মাসে কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট

পার্টির নবম কংগ্রেস। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণআন্দোলনের প্রতিনিধিবৃন্দ সর্বপ্রথম বাঙলাদেশ সম্পর্কে বাঙলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দে-র সঙ্গে খোলাখুলি বাঙলাদেশ-এর সংগ্রাম ও সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা এই সময়ে বাঙলাদেশে ইয়াহিয়ার নারকীয় অত্যাচারের ও মুক্তিবাহিনীর দুর্জয় প্রতিরোধের প্রায় দুই শতাধিক আলোকচিত্র প্রত্যক্ষ করেন। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিসহ একাধিক বিদেশী প্রতিনিধি কংগ্রেস-মঞ্চেই প্রত্যক্ষভাবে বাঙলাদেশ-এর আন্দোলনকে ওজস্বিনীভাষায় সমর্থন করেন। সোভিয়েত প্রতিনিধিদল সমস্ত প্রদর্শনীটির আলোকচিত্র গ্রহণ করে নিয়ে যান। আর, প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক ওয়েন রাইট, গাই বেস, জেফসন রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে থাকেন। এই কংগ্রেসের পর এঁরা দেশে ফিরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে গণ-আন্দোলন ও বিরাট সমাবেশের আয়োজন করেন। অতঃপর এঁদের দেশে ব্যাপক জন সমর্থন সৃষ্টি হয়।

(গ) এই সম্পর্কে দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর পশ্চিমদেশগুলি সফর। অনেক দিকথেকেই এ সফর ঐতিহাসিক ও অনন্যসাধারণ। প্রত্যেক সরকারকে তিনি এই সফরের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের বিরাট অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন করে সত্যিকারের জনসংযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

এই সমস্যাগুলির গুরুত্ব বিষয়ে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একেবারে অবহিত ছিলেন না, তা নয়। অনেকে অবশ্য বুকনিবাজ হিসাবে সমস্যাটির গুরুত্ব তথাকথিত নেতিবাগীশ অথচ উদ্দেশ্যপ্রবণ সঙ্কীর্ণ বিরোধীপক্ষের মতো করেই বুঝেছিলেন। অথচ তাঁরা জানতেন আমরা সামরিক রাষ্ট্র কখনো নই বা হতেও চাই নি। যুদ্ধ করতে হলে যে সামরিক প্রস্তুতির Contingency-র প্রয়োজন তা হঠাৎ একমাসে সম্ভব নয়। যারা আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতা তাঁদেরও এটা অজানা নয়। এসব সত্ত্বেও তাঁরা এই কয়মাস 'এক্ষুণি কেন যুদ্ধ নয়'—এই দাবি তুলে যদি সমস্যার সৃষ্টি না করতেন তা হলেও তাঁদের পক্ষে শোভন হতো। মোট কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যদান, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে যেতে সাহায্য করা—একটা সার্থক পরিকল্পনারই সার্থক রূপায়ণ।

মুক্তিবাহিনীর অপরাজেয় দেশপ্রেম, বাঙলাদেশের আপামর জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন, পশ্চিমবঙ্গ সহ আসমুদ্র-হিমাচল গোটা ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা, ভারতের গণতান্ত্রিক দলগুলির সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় জোয়ানদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাহস ও রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিপক্কতা—বাঙলাদেশ ও ভারতের জনসাধারণকে—শত বাধা ষড়যন্ত্র ও হিমালয়ের মত সমস্যাবলী সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের এই অসামান্য বিজয়ের গৌরব এনে দিয়েছে।

বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের সমস্যা

অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর আজ সকলের মনে যে প্রশ্নটা প্রথমেই জেগে ওঠে তা হলো, গত ন'মাসের সীমাহীন ধ্বংসযজ্ঞের পর বাঙলাদেশের অর্থনীতিকে কি তাড়াতাড়ি পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হবে? পশ্চিম পাকিস্তানের আর্থিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধুমাত্র বাঙলাদেশের সহায়সম্বলের ওপর নির্ভর করে কি শীঘ্র দেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নের গতিবেগ সঞ্চার করা যাবে? এই নবজাত দুর্বল অর্থনীতিকে কি শেষ পর্যন্ত এক উন্নত, প্রাচুর্যময় ও স্বাবলম্বী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে?

বাঙলাদেশের আর্থিক কাঠামোর গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। গত পঁচিশ বছর ধরে নয়া-ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি শুধু যে পঙ্গু ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তাই নয়, এই রাজ্যের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের সমস্ত পথ ক্রমশই রুদ্ধ হয়ে আসছিল। আজ সেই জগদ্দল পাথর অপসারিত হওয়ার ফলে বাঙলাদেশের নবজাত অর্থনীতির আকাশে বিপুল সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে। বাঙলাদেশের নেতৃত্ব যদি সত্যিই দেশকে মুমূর্ষু পুঁজিবাদের আওতা থেকে মুক্ত করে সমাজতন্ত্রের পথে অর্থনৈতিক অভিযান শুরু করতে পারেন, সেক্ষেত্রে এই পশ্চাৎপদ অর্থনীতির দ্রুত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এক সুদৃঢ়, শোষণমুক্ত, স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে।

অন্যান্য অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান কোন অংশে কম নয়। আজকের প্রয়োজন হলো, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি রচনা করে সঠিকপথে তা রূপায়িত করার চেষ্টা করা। বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সারা বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে

কোনো সন্দেহ নেই যে, বাঙলাদেশ তার অর্থনৈতিক ফ্রণ্টে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের সংগ্রামেও এঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করবে। বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো যে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে তার আভাস এখন থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রতিবেশী ভারতের ভূমিকা,—বাঙলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই সে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার মৈত্রীবন্ধন গড়ে তুলতে সচেষ্ট রয়েছে। পঁচিশ বছর আগে তৎকালীন পূর্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেড় হাজার মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। আজ একথা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, নবজাত বাঙলাদেশ এবং প্রতিবেশী ভারত, বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মেই এক পরিপূরক অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। শোষণ অথবা আর্থিক বৈষম্যের পরিবর্তে এই দু'দেশের পরিপূরক অর্থনীতির মূল সূত্র হবে,—সমমর্যাদা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে উভয়দেশের উন্নয়ন ও বিকাশের পথ সুগম করা।

কিন্তু বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন-সমস্যা আলোচনার আগে প্রয়োজন হলো, গত পঁচিশ বছর ধরে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে পূর্ববঙ্গের অর্থনীতিতে কি ঘটেছে তা পর্যালোচনা করা। এই পর্যালোচনার মধ্যে পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলসূত্র ধরা পড়বে এবং তারই ভিত্তিতে বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মসূচি রচনা সম্ভব হবে।

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ

আজ একথা সর্বজনবিদিত যে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে পূর্ববঙ্গকে ব্যবহার করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের এক নয়া-উপনিবেশ হিসাবে। পশ্চিম-পাকিস্তানের উন্নয়নের স্বার্থে পূর্ববঙ্গকে গড়ে তোলা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের পশ্চাৎ প্রদেশ বা hinterland হিসাবে। তাই পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পতিদের দ্রুত অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির স্বার্থেই পূর্ববঙ্গের মানুষকে অনেকখানি মূল্য দিতে হয়েছে।

পঁচিশ বছর আগে দেশ-বিভাগের সময় পাকিস্তানের দুই অংশ,—পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অর্থনৈতিক কাঠামোর দিক থেকে মৌলিক প্রভেদ ছিল না। দুই অংশেরই অর্থনীতি ছিল প্রধানত কৃষি-ভিত্তিক। পশ্চিম পাকিস্তানের

প্রধান কৃষি-উৎপাদন ছিল তুলা ও গম এবং পূর্ব পাকিস্তানের ছিল পাট ও ধান। দুই অংশেই শিল্প ছিল খুবই সামান্য। অর্থনৈতিক পরিভাষায় যাকে ভিত্তি সংগঠন বা 'infrastructure' অর্থাৎ পথ, ঘাট, বাঁধ, সেতু ইত্যাদি বলা হয় সেক্ষেত্রেও দুই অংশের মধ্যে ব্যবধান ছিল খুবই সামান্য; দুই অংশেই বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল নগণ্য।

কিন্তু পাকিস্তানের জন্মের কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি আগের মতই পশ্চাৎপদ থেকে গেল না। পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিতে উৎপাদনের ধাঁচ বদলালো; কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল শিল্পের অগ্রগতি। মূল ধাতুজাত শিল্পদ্রব্য, যানবাহনের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যন্ত্রশিল্প, রসায়ন ও ভেষজ শিল্প, চিনি, বস্ত্র, রেশম ও কৃত্রিম তন্তুজাত দ্রব্য, তামাক, তৈল, কাগজ প্রভৃতি শিল্পপ্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়নের মূল ভিত্তি রচনা করা হলো। আর এই কাজে পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যবহার করা হলো নয়া-উপনিবেশ হিসাবে।

পাকিস্তানের প্রথম-দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাকালে (১৯৫৫-৬৫) দেশের মোট রপ্তানি-বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ। অথচ এই একই সময়ে দেশের মোট আমদানি-বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল মাত্র ২৯ থেকে ৩০ শতাংশ। অপরপক্ষে একই সময়ে পাকিস্তানের মোট রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ ছিল যথাক্রমে ৩৮ থেকে ৪০ শতাংশ এবং ৬৯ থেকে ৭১ শতাংশ (Pakistan C. S. O. Bulletin, May, 1967)। অর্থাৎ, এর পরিষ্কার অর্থ হলো, পূর্ব পাকিস্তান তার বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে তার বেশিরভাগ ব্যয় হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি এবং অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্য আমদানির কাজে। এবং এ সমস্ত কিছুই করা হয়েছে পূর্ব পরিকল্পিত সরকারি নীতির ভিত্তিতে। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে আমদানি লাইসেন্স সংক্রান্ত সরকারি নীতির মধ্যে। ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত মোট আমদানির লাইসেন্সে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল মাত্র ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। বাকী সমস্ত লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানকে। এর মধ্যে কেবলমাত্র করাচীর অংশই ছিল ৬০ শতাংশেরও বেশি (Stephen R. Lewis : Pakistan, Industrialization and Trade Policies, P. 150)।

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মূলধনীদ্রব্য আমদানির ব্যাপারে কি পরিমাণ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে তা বোঝা যাবে নিম্নলিখিত তথ্য থেকে :

মূলধনীদ্রব্য ও মূলধনীদ্রব্যের রসদ আমদানি (বার্ষিক গড় হিসাব)

(লক্ষ টাকায়)

	প্রাক্ পরিকল্পনা যুগ (১৯৫১-৫২—১৯৫৪-৫৫)	প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা (১৯৫৫-৫৬—১৯৫৯-৬০)
	আমদানির মূল্য—শতাংশ	আমদানির মূল্য—শতাংশ
পূর্ব পাকিস্তান	১৬৬৩ — ৩১'১	২৬৮৫ — ২৯'৯
পশ্চিম পাকিস্তান	৩৬৭৬ — ৬৮'৯	৬২৮৪ — ৭০'১
সমগ্র পাকিস্তান	৫৩৩৯ -- ১০০'০	৮৯৬৯ — ১০০'০

(সূত্র : Nurul Islam : Imports of Pakistan, Growth and Structure, 1967)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে স্থির পুঁজি বিনিয়োগের (fixed investment) ক্ষেত্রে কি বিরাট ব্যবধান ঘটেছে তা বোঝা যাবে নিম্নলিখিত তথ্য থেকে :

স্থির পুঁজি বিনিয়োগ : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান

(লক্ষ টাকায়)

	১৯৫৯-৬০		১৯৬০-৬১—১৯৬৪-৬৫		১৯৬৫-৬৬	
	পরিমাণ	শতাংশ	পরিমাণ	শতাংশ	পরিমাণ	শতাংশ
পূর্ব পাকিস্তান	১০,২৩৭—	৩৩'৭	২০,৩৮১—	৩২'২	২৩,৮৪৬—	৩০'৯
পশ্চিম পাকিস্তান	২০,১৪২—	৬৬'৩	৪২,৯৬৯—	৬৭'৮	৫৩,৪০৭—	৬৯'১
সমগ্র পাকিস্তান	৩০,৩৭৯—	১০০'০	৬৩,৩৫০—	১০০'০	৭৭,২৫৩—	১০০'০

(সূত্র : Evaluation of the Second and Third Five Year Plans of Pakistan)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব পাকিস্তানের মোট নিয়োজিত পুঁজির

বেশির ভাগ এসেছে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এর অর্থ হলো, পাকিস্তান যে বৈদেশিক সাহায্য লাভ করেছে তার অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের কাজে, আর তার ছিটে-ফোঁটা মাত্র পড়েছে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থকে বলি দিয়ে এবং তারই সহায় সম্পদের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। এবং ক্রমশ পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পজাতদ্রব্য বিক্রির সুরক্ষিত বাজার হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানকে গড়ে তোলা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের হার অত্যন্ত কম হওয়ার ফলে অধিকাংশ নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্প-জাতদ্রব্য ও শিল্পের কাঁচামালের জন্য পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যে সমস্ত জিনিস আমদানি হতো তা হলো, বস্ত্র ও বস্ত্রজাতদ্রব্য, সুতা, কাঁচা তুলা, তামাক, তৈল ও তৈলবীজ, খাদ্যশস্য, চিনি, সিমেন্ট, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, রসায়নদ্রব্য, সার, ঔষধপত্র, ধাতু ও ধাতবদ্রব্য প্রভৃতি। এর মধ্যে অনেক-জিনিসই পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প প্রসারের মারফত উৎপাদন করা সম্ভব ছিল। আবার অনেক জিনিস কয়েকটি প্রতিবেশী বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে তুলনা-মূলকভাবে সস্তা দামে আমদানি করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এর কোনটাই না করে পূর্ব পাকিস্তানকে এই সমস্ত জিনিস চড়া দামে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিনতে বাধ্য করা হলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কাঁচা তুলা সরবরাহ করে পূর্ব পাকিস্তানে বস্ত্রশিল্প প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা না করে বস্ত্রের ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিমের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হলো। পূর্ব পাকিস্তানকে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে স্বাভাবিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ না দেওয়ার ফলে এই দেশের একপেশে অর্থনীতির ওপর অনাবশ্যক আর্থিক বোঝার চাপ সৃষ্টি হলো।

শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানে যে সীমিত শিল্পপ্রসার ঘটলো তার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি বৃহৎ একচেটিয়া শিল্প-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর। এক কথায়, পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সম্পদ নিয়মিতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান হতে থাকল। অবাধ মুনাফার আশায় এই সম্পদের একাংশ আবার ফিরিয়ে এনে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োগ করা হলো।

পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্প-গোষ্ঠীর পূর্ণ কর্তৃত্বের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প-বাণিজ্যে এই দেশের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত হলো।

পশ্চাৎপদ অর্থনীতি

পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিকাশকে বিভিন্ন উপায়ে সঙ্কুচিত করার বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। পাকিস্তানের জন্ম থেকেই সামরিক-আমলাতন্ত্রচক্রদ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় পাকিস্তানী সরকার গত পঁচিশ বছর ধরে সুপরিকল্পিতভাবে এইরূপ বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ ও প্রয়োগ করে এসেছে। ফলে পূর্ববঙ্গে গড়ে উঠেছে এক পশ্চাৎপদ একপেশে অর্থনীতি। কৃষির ওপর নির্ভরশীল এই রাজ্যে মোট জাতীয় আয়ের ৫৬ শতাংশ আসতো কৃষি থেকে। মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে, ছোট বড় শিল্প মিলিয়ে শিল্প থেকে সামগ্রিক আয় হলো ৮ শতাংশ। এর মধ্যে বড় শিল্পের অংশ হলো মাত্র ৫ শতাংশ। এই রাজ্যে কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের হার থেকে গেছে অত্যন্ত কম। পূর্ববঙ্গে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় অর্ধেক। পূর্ববঙ্গের উৎপাদন কাঠামোর মধ্যে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ধান ও পাটের ওপর নির্ভরশীল এই কৃষি-ভিত্তিক রাজ্যে খাদ্যের ঘাট্‌তি দেখা দিয়েছে, কারণ কৃষির ক্ষেত্রেও বিশেষ কোনো উন্নতি ঘটেনি। পূর্ববঙ্গের মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য পশ্চিম পাকিস্তানের দৈর্ঘ্যের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ; এবং পূর্ববঙ্গের মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য পশ্চিম পাকিস্তানের মোট রেলপথের এক-তৃতীয়াংশ। পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি শিল্প-গোষ্ঠীর একচেটিয়া কর্তৃত্বের ফলে পূর্ববঙ্গে বাঙালি শিল্পপতিশ্রেণীর স্বাভাবিক বিকাশলাভ সম্ভব হয় নি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালি ব্যবসায়ীরা কোণ-ঠাসা হয়ে থেকেছে। কেন্দ্রীয় আমলাগোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালিদের যথাযথ প্রতি-নিধিত্ব না থাকার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের স্বার্থ পদে পদে বিঘ্নিত হয়েছে। ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সাল, এই পনেরো বছরে পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনীতিতে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে তা নিম্নলিখিত তথ্য থেকে বোঝা যাবে :

উন্নয়নের গড় বার্ষিক হার : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান

(১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৪-৬৫)

সামগ্রিক নতুন সম্পদ সৃষ্টি (Gross Value added)

	পূর্ব পাকিস্তানে	পশ্চিম পাকিস্তানে
কৃষি ক্ষেত্র	১'৭	২'৫
অ-কৃষি ক্ষেত্র	৪'৬	৫'৫
প্রদেশের সামগ্রিক উৎপাদন	২'৮	৪'০
জনসংখ্যা	২'৫	২'৫
মাথাপিছু সামগ্রিক উৎপাদন	০'৩	১'৫

(সূত্র : Stephen R. Lewis : Pakistan, Industrialization and Trade Policies. P. 139)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচি

গত পঁচিশ বছরের এই আধা-ঔপনিবেশিক পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক পটভূমির কথা স্মরণ রেখে বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের কর্মসূচি রচনা করতে হবে। এই কর্মসূচির প্রথম পদক্ষেপ হবে, গত ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানী আক্রমণের ফলে যে বিপুল ধ্বংসলীলা ও ক্ষয়ক্ষতি সংঘঠিত হয়েছে, বাঙলাদেশের অর্থনীতিকে সেই ক্ষতচিহ্ন থেকে মুক্ত করে আবার তাকে পুনর্গঠিত করা। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হবে, সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা স্মরণ রেখে পরিকল্পনানুযায়ী দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পিত অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আজকের স্বল্পমেয়াদী পুনর্গঠনের কর্মসূচি কার্যকর করতে হবে।

পাকিস্তানী আক্রমণের ফলে বাঙলাদেশের রেলপথ, রাস্তাঘাট, সেতু, ঘরবাড়ি ও কলকারখানা ধ্বংস হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। বহু কলকারখানা কাঁচামালের অভাবে অচল হয়ে রয়েছে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে চাষ-আবাদ না হওয়ার ফলে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষি-পণ্যের অনটন দেখা দিয়েছে। আমদানি বন্ধ হওয়ার ফলে বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের দারুণ ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। এই একই কারণে লৌহ, ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, নানা ধরনের মূলধনীদ্রব্য ও সিমেন্টের অভাব দেখা দিয়েছে। রপ্তানি বন্ধ হওয়ার ফলে রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার জন্য আজকের জরুরি প্রয়োজন হলো সিমেণ্ট, নানা ধরনের লৌহ, ইস্পাত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি। এখনি চাষ-আবাদ স্বরু করার জন্য প্রয়োজন হবে, কৃষিবীজ, হাল-বলদ, কৃষিযন্ত্রপাতি, সার, প্রভৃতি। পশ্চিম পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেন-দেন বন্ধ হওয়ার ফলে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ব্যবস্থাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কলকারখানা চালু রাখার জন্য কাঁচা তুলা, সূতা, তৈলবীজ, তামাক, কয়লা, রসায়নদ্রব্য প্রভৃতি এখন আর পুরনো দেশগুলো থেকে আমদানি করা সম্ভব হবে না বলে নতুন দেশের সন্ধান করতে হবে। মূলধনী ও ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, দেশলাই, মশলা, সুপারী প্রভৃতি রপ্তানী পণ্যের জন্য নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে।

বাঙলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হবে আজকের একপেশে অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে এক স্থিতিশীল স্বাবলম্বী অর্থনীতি গড়ে তোলা। দ্রুত উন্নয়নের গতিবেগ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হলো বিভিন্ন ধরনের চিরাচরিত উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশের মধ্যকার সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়-সম্বল ও উপকরণের সর্বাধিক প্রয়োগ ও ব্যবহার। স্বাবলম্বী অর্থনীতি গড়ে তোলার অর্থ এই নয় যে, এখনি দেশের মধ্যে দুনিয়ার সব জিনিস উৎপাদন করার চেষ্টা করতে হবে। এর প্রকৃত অর্থ হলো, পশ্চাৎপদ কৃষি-ভিত্তিক একপেশে পরনির্ভরশীল অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তে, তুলনামূলক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যবহার মারফত দেশের উৎপাদন কাঠামোর পরিবর্তন ঘটানো এবং শিল্পায়নের পথে এক সুসম অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা। বাঙলাদেশের শিল্পপ্রসার ও উন্নয়নের প্রয়োজনে আগামীদিনে বিপুল পরিমাণ মূলধনী দ্রব্য, শিল্পের রসদ ও বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে হবে। তাই কেবলমাত্র পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির ওপর নির্ভর না করে বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের জিনিস উৎপাদন করে বাঙলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে বহুমুখী করে গড়ে তোলা আজ একান্ত প্রয়োজন। আর প্রয়োজন হলো, গত কয়েক বছর ধরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি চলেছে তা

রোধ করে মূল্যমানকে স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কিং, মুদ্রা-ব্যবস্থা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কৃষির উন্নয়ন

সাম্প্রতিক ইকাফে রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে কৃষির ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিবর্তে এক বদ্ধতা বা stagnation-এর অবস্থা চলছে। ১৯৬৯-৭০ সালে চাউলের উৎপাদন হয়েছে এক কোটি ১৮ লক্ষ টনের মতো। ফলে, খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টন। প্রধান খাদ্যশস্য 'আমনে'র উৎপাদন একেবারেই বৃদ্ধি পায় নি; 'আউশ' শস্যের উৎপাদন সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। একমাত্র শীতকালীন 'বোরো' ধানের উৎপাদন পরিকল্পিত সেচের ফলে বেশ কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে 'বোরো' ধানের উৎপাদন ছিল ৫ লক্ষ টন; ১৯৬৮-৬৯ সালে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১৩ লক্ষ টন। কাঁচা পাটের উৎপাদন রয়ে গেছে ৬০ লক্ষ বেলের মতো।

কৃষির ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বাঙলাদেশকে খাদ্যশস্যের দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা। বাঙলাদেশে দ্বিতীয় ফসল হিসাবে ব্যাপকভাবে গমের চাষ সম্ভব। এর জন্য জলের প্রয়োজন হবে কম এবং উচ্চফলনশীল বীজের মারফত এতে দ্রুত সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় দশ লক্ষ টন গম আমদানি করতে হতো। সুতরাং ব্যাপক গম উৎপাদনের মধ্য দিয়ে এই ঘাটতি মেটানো সম্ভব। শুধুমাত্র গম নয়, ধান, পাট ও অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও উচ্চফলনশীল বীজ ও উন্নত কৃষিউৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। এর জন্য যেমন একদিকে কয়েকটি উন্নত বীজের খামার, বহু ফসলের জন্য সেচপ্রকল্প ও বন্যানিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, অপর দিকে তেমনি উন্নত চাষের চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে সার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন কারখানা, কীটনাশক ঔষধ উৎপাদনের কারখানা এবং কৃষি-যন্ত্রপাতি, মোটর, পাম্প, টিউবওয়েল প্রভৃতির জন্য নতুন নতুন শিল্পগঠনেরও ব্যবস্থা করতে হবে। বাঙলাদেশে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের জন্য বিদেশ থেকে তুলা আমদানি ছাড়াও লোনাজলের জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে তুলাচাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। চিনিশিল্পের প্রসারের জন্যও ব্যাপকভাবে আখচাষের

কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, ডাল, আলু ও তেলের ঘাটতি মেটাবার জন্য কৃষিক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন। আধুনিক কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন করে যদি জমিতে অন্তত দুটি কিংবা ততোধিক ফসল তোলা যায় তাহলেই একমাত্র কৃষির ক্ষেত্রে সঙ্কট সমাধান সম্ভব।

শিল্পের প্রসার

শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন হলো, আভ্যন্তরীণ ঘাটতি দূর করার জন্য অবিলম্বে বস্ত্রশিল্প, সিমেন্ট, চিনিকল, সারকারখানা, তৈল ও বনস্পতি শিল্প, সিগারেট কারখানা প্রভৃতিতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। এছাড়া সম্প্রতি প্রাকৃতিক গ্যাসের যে সন্ধান পাওয়া গেছে তা থেকে রসায়ন শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা কাজে লাগানো প্রয়োজন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃষি-উন্নয়নের প্রয়োজনে সার কারখানা, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিযন্ত্রপাতি, পাম্পসেট ও মোটর এবং টিউবওয়েল প্রভৃতির জন্য নতুন শিল্পগঠন প্রয়োজন। বাঙলাদেশের স্বাভাবিক নদীপথের কথা স্মরণ রেখে পরিকল্পনানুযায়ী নৌকা, ষ্টীমার, লঞ্চ, প্রভৃতি শিল্পের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের মতো জলযানকে আধুনিক করার জন্য মোটরচালিত নৌকার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে অল্পশক্তি সম্পন্ন মোটর সেট তৈরীর কারখানা গঠন করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে বাঙলাদেশে যদি জলযান শিল্পের উৎপাদনকে উন্নত করা যায়, সেক্ষেত্রে এই সমস্ত পণ্য রপ্তানির বাজারও সৃষ্টি হতে পারে। বাঙলাদেশে বর্তমানে যে ইস্টার্ণ রিফাইনারী, মেশিন টুল ফ্যাক্টরী, ইলেকট্রিক ওয়্যার ও কেবল ফ্যাক্টরী এবং লৌহ ও ইস্পাত কারখানা আছে, তার সম্প্রসারণ ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাঙলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে তোলা প্রয়োজন। বর্তমানে ছোট ও মাঝারি আকারে এবং ভবিষ্যতে বিরাট আকারে এই শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। ভারত ও অন্যান্য স্থান থেকে যদি খনিজ লোহার সরবরাহ আসে সেক্ষেত্রে ইস্পাত শিল্পের প্রসারের ফলে ভারতও লাভবান হতে পারে। এই সমস্ত শিল্পের সঙ্গে যদি বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, টায়ার ও টিউব, বাইসাইকেল, সেলাইকল, ঔষধের কারখানা, ঠাণ্ডাঘরের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি শিল্প গড়ে তোলা যায় সেক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ

চাহিদা মেটানো ছাড়াও বহুমুখী রপ্তানি বাণিজ্যের বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব। কাগজ ও নিউজপ্রিণ্টের উৎপাদন আরও সম্প্রসারিত করলে এই পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। শুধু কাঁচা মাছ ও কাঁচা চামড়া রপ্তানি না করে টিনের মাছ ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানির দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। ব্যাপক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র আকারের বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য শিল্প গড়ে তোলার প্রচুর সুযোগ বাঙলাদেশে আছে। সর্বোপরি প্রয়োজন হলো ব্যাপক হারে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন, যার অভাবে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে।

বাণিজ্যের পুনর্বিন্যাস

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রধানত যে সমস্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হতো তা হলো কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, দেশলাই, চামড়া, মাছ, মশলা, সুপারী প্রভৃতি। বাঙলাদেশে যদি উপরোক্ত কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচি রূপায়িত করা সম্ভব হয় তাহলে শুধু যে অত্যাবশ্যকীয় বহু পণ্যদ্রব্যের আমদানি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে তাই নয়, রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য রপ্তানির ফলে দেশের শিল্পায়নের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও রসদ আমদানি করা সম্ভব হবে। এককথায়, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্বিন্যাস ঘটবে।

কোন্ পথে ?

কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, নবজাত বাঙলাদেশের নেতৃত্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন্ নীতি গ্রহণ করবেন ? দ্রুত উন্নতির প্রয়োজনে উৎপাদন শক্তির বিকাশের জন্য তাঁরা কোন্ পন্থা অবলম্বন করবেন ? পাকিস্তানী শাসনের যুগে সামরিক আমলাচক্র পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি ও সামন্তশ্রেণীর স্বার্থে পূর্ববঙ্গের স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। স্বাধীন বাঙলাদেশের নেতৃত্ব কি সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শোষণের অবসান ঘটিয়ে দ্বিধাহীনভাবে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে তাঁদের অর্থনৈতিক অভিযান শুরু করবেন ? ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী ও কয়েকটি শিল্পের জাতীয়করণ,

শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেন সংক্রান্ত কয়েকটি সরকারী ঘোষণাকে নিঃসন্দেহে শুভসূচনা বলা যেতে পারে, যা অতীতকে বর্জন করে ভবিষ্যতের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই পথ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বাঙলাদেশের নবজাগরণের এই সন্ধিক্ষণে একথা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভেঙে-চুরে ঢেলে না সাজালে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন হলো, কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাঠামোগত এবং উৎপাদন-সম্পর্কগত পরিবর্তন সাধন। বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণের এক নতুন রাজনৈতিক শক্তি জন্মলাভ করেছে। সামন্ততান্ত্রিক-পুঁজিবাদী কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। বাঙলাদেশের নেতৃত্ব যদি এই শক্তিকে শৃঙ্খলিত করার চেষ্টা না করেন তাহলে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের কাজেও এই শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কৃষি-উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হলো, আমূল ভূমিসংস্কার মারফত সামন্ততান্ত্রিক শক্তিকে খর্ব করা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মারফত সমবায় খামার ও অন্যান্য যৌথ উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা সংগঠিত করা। দেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন হলো ব্যক্তি মালিকানার শক্তিকে খর্ব করে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-সংস্থা মারফত ব্যাপক শিল্পগঠনের কর্মসূচিকে রূপায়িত করা। বিদেশী পুঁজি যাতে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করতে না পারে তার জন্য একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান মারফতই বিদেশী অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করা উচিত। অবাধ মুনাফা ও ফাটকাবাজি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-সংস্থা মারফত খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় শিল্পজাতদ্রব্যে লেনদেন এবং আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ একান্ত প্রয়োজন। বাঙলাদেশে আজ সবকিছু নতুনভাবে সুরু হচ্ছে বলে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের স্বার্থে এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক সহজ। বাঙলাদেশের রাষ্ট্রনায়কদের ওপর আজ সদ্য স্বাধীন জনগণের প্রভাব অনেক বেশি এবং প্রতিবিপ্লবী কায়েমী স্বার্থের প্রভাব সবচেয়ে কম। তাই বিশ্বের বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দেশের সহযোগিতায় নবজাত বাঙলাদেশের অর্থনীতি অতি স্বল্পকালের মধ্যে এক নতুন স্তরে উন্নীত হতে পারে।

বাঙলাদেশ ও ভারত : পরিপূরক অর্থনীতি

ভারতবাসীদের আজ একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বাঙলাদেশের পুনর্গঠনে ভারত যে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা করছে তা নিছক একতরফা দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রশ্ন নয়। বাঙলাদেশের কাছ থেকে ভারত এমন অনেক কিছু পেতে পারে যার দ্বারা ভারতের অর্থনীতি অনেক ব্যাপারে সঙ্কটমুক্ত ও আরও শক্তিশালী হতে পারে। ভারত-বিভাগের পর পাকিস্তানের জন্মের ফলে একদিকে ভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে এবং অপরদিকে পূর্ববঙ্গের অর্থনীতিতে এক ভারসাম্যহীনতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেন-দেন বন্ধ হওয়ার ফলে অবস্থা চরমে পৌঁছায়। বাঙলাদেশের জন্মলাভের পর আজ একথা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে ভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙলাদেশের অর্থনীতির মধ্যে এমন অনেক উপাদান আছে যার ফলে উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও স্বাভাবিক লেন-দেনের মাধ্যমে এক পরিপূরক অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে।

কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্পায়নের কাজে ভারত বাঙলাদেশকে বহুভাবে সাহায্যে করতে পারে। উচ্চফলনশীল খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতের সহায়তা বাঙলাদেশের খুবই কাজে লাগবে। বাঙলাদেশের শিল্পায়নের কাজে ভারত বিশেষজ্ঞ ও কারিগরি সাহায্য, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতি মারফত সহযোগিতা করতে পারে। ভারতে মূলধনীদ্রব্য ও ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে বেশ কিছু পরিমাণ উৎপাদনক্ষমতা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বাঙলাদেশের শিল্পগঠনের কাজে এই শক্তি ব্যবহৃত হলে ভারতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া বাঙলাদেশের বাজারে ভারতের কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোল, সিমেন্ট, বস্ত্র, চিনি, সার, ঔষধপত্র ও রসায়নদ্রব্য, মোটর গাড়ি, কৃষি-উন্নয়নের যন্ত্রপাতি প্রভৃতির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

এর বিনিময়ে ভারত বাঙলাদেশ থেকে পাবে উৎকৃষ্ট কাঁচাপাট, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, মাছ, হাঁস-মুরগী ও শাকসব্জী, বাঁশ ও অন্যান্য বনসম্ভার প্রভৃতি। বাঙলাদেশে যদি ইস্পাত শিল্প, সার কারখানা, টায়ার-টিউব কারখানা গড়ে ওঠে, ভারত নিজের প্রয়োজনে এই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করবে। এই সমস্ত শিল্পগঠনের কাজে ভারত কারিগরি সাহায্য ছাড়াও যন্ত্রপাতি এবং খনিজ লোহা,

রসায়নদ্রব্য, কাঁচা রবার প্রভৃতি কাঁচা মাল দিয়ে সাহায্য করতে পারে। বাঙলাদেশের ষ্টিমার, লঞ্চ প্রভৃতিও ভারত ক্রয় করতে পারে। বাঙলাদেশে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠলে ভারতের বাজারে সহজেই এই সমস্ত পণ্য স্থান করে নিতে পারবে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারত ও বাঙলাদেশ যদি অভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হয় তাহলে উভয় দেশই বিপুলভাবে লাভবান হবে। পাটশিল্প ও চা-শিল্প উভয় দেশেরই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। অথচ বিশ্বের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে এই দুই শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। বিকল্প পণ্যের তীব্র প্রতিযোগিতার হাত থেকে পাট শিল্পকে রক্ষা করার জন্য উভয় দেশের কর্তব্য হলো, এক অভিন্ন মূল্যনীতি ও বাণিজ্যনীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে বৈদেশিক বাজারের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া। এই উদ্দেশ্যে উভয় দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক যুক্ত পরামর্শদাতাকমিটি গঠন করা যেতে পারে। চা-শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতি অনুসরণ করলে সুফল পাওয়া যাবে।

বাঙলাদেশের প্রধান নদীগুলির উৎপত্তিস্থল হলো ভারত। উভয় দেশের নদ-নদী ব্যবস্থা এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে দুই দেশের যুগ্ম প্রচেষ্টা ভিন্ন কোনো কার্যকর বন্যা-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব নয়। জলসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। আজকের নতুন পরিস্থিতিতে উভয় দেশের স্বার্থে এইরূপ যুক্ত পরিকল্পনা কার্যকর হতে পারে। তাছাড়া, জলপথের ব্যবহার ও উন্নয়নের ফলে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেন-দেন সহজতর হবে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর যে সমস্ত বাধা-নিষেধ সৃষ্টি হয়েছিল তা অপসারিত হওয়ার ফলে আসামরাজ্য ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ভারতের অন্যান্য স্থানের মধ্যে জলপথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে, এই এলাকার বাণিজ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে উভয় দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে ভারত ও বাঙলাদেশের পর্যটন শিল্পও প্রসারলাভ করবে।

কিন্তু দু'দেশের মধ্যে এই পরিপূরক অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সময় এ বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন যে এই সুযোগে যেন ভারতের বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বাঙলাদেশের অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে। এই শক্তিশালী গোষ্ঠী যদি আমলাতন্ত্রের সাহায্যে কোনক্রমে বাঙলাদেশে মাথা গলাবার সুযোগ পায় তাহলে শুধু যে বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে তাই নয়, ভারতীয় জনগণের স্বার্থও এর ফলে বিপন্ন হবে। তাই উভয়দেশের মধ্যে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা হওয়া উচিত সরকারি স্তরে এবং সমমর্যাদা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে।

ঐতিহ্য সাধনা ও বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী

তরুণ সান্যাল

জাতিবিকাশের পূর্বশর্ত হিসাবে জাতির ব্যক্তিত্ব পুনরাবিষ্কার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে জাতি যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সার্বভৌম হতে চায়, তেমনি তার নিজের শিকড় ও জীবনধর্মী আবহমানতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে নিতেও সে উন্মুখ হয়। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামতো কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিকতার বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার আপ্রাণ সাধনাই নয়, ব্যক্তি ও সমাজের আত্মবিকাশের লক্ষ্যে জাতির অগ্রাভিযানই তার অন্বিষ্ট।

নতুন ও পুরনো শোষণ

অথচ দীর্ঘস্থায়ী পরাধীনতা ব্যক্তিমানুষকে তার গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হতে দেয় না। এই বন্দীদশা সমাজজীবনকে যতটা সম্ভব ততখানিই অন্ধকার ও অন্ধতার মধ্যে বন্দী রেখে দেয়। খাদ্য ও জীবিকার সমস্যাটি এমনভাবে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপানো হয়ে থাকে যে তার ফলে একদিকে সাধারণ মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও ক্ষুধার অন্ন, পরিধেয় বস্ত্র ও মাথার উপরে সামান্য আচ্ছাদন অর্জনে ব্যর্থ হয়, অন্যদিকে তারই ফলে তারা নিছক টিকে থাকার তাগিদে বিদেশী শাসক-শোষককুলের স্বদেশী বশংবদদের উপরে মূলত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আমাদের বঙ্গদেশে—অধুনা বাঙলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে একসময় সাম্রাজ্যবাদীরা এমনি কাজই করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বাহন করে এ-দেশের মানুষকে ভূমিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে কেমন ভাবে বেঁধে ফেলা হয়েছিল তা আমরা আজ জানি। জমির উদ্বৃত্ত উৎপাদিকার মূল্য হিসাব করে, ঐ মূল্যের শতকরা নব্বই ভাগ ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল। ঐ নব্বই শতাংশ জমিদারকুল কলেক্টরের কাছারিতে নির্দিষ্ট দিনে পৌঁছে দিত। প্রজা বিলি করার ক্ষমতা ছিল জমিদারের। দশ শতাংশ উদ্বৃত্ত মূল্য জমিদারের রাজস্ব আদায়ের কমিশন, আর এই কমিশনের উপরে আয় বাড়াবার জন্য প্রজাসাধারণের উপরে তার চাপ ছিল নানা ধরনের।

উপরন্তু পশ্চাৎপদ প্রজাবিলিস্বত্বের ফলে যে সম্পদশালীরা উচ্চ খাজনা ও উচ্চ নজরানা দিতে পারত, তারাই জমির মালিক হয়ে সেই জমি ঠিকায়, চাকরানে বা ভাগে দিয়ে বা অন্যবিধ নানা পন্থায় ভূমিহীন চাষীর শ্রমসম্পদ লুঠে নিতে পারত। অর্থাৎ, উৎপাদকের ঘাড়ের উপরে ছিল স্তরের পর স্তর পরম্পরা—এবং এই শোষণ-পিরামিডের মাথার উপরে ছিল সাম্রাজ্যবাদ—এভাবে বাঙলার চাষী সর্বরিক্ত হয়েছে। উত্তরাধিকার আইনের মারপ্যাঁচের মধ্য দিয়েও সামান্য জমির প্রজা ক্রমশ ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে। এ-গুলি ছিল অর্থনৈতিক শোষণের দিক। অ-অর্থনৈতিক শোষণের দিকও ছিল। প্রভুর নানাবিধ ইচ্ছাকেও কার্যকর করতে বেগারপ্রথা বা শোষণভিত্তিক অন্যবিধ সামাজিক বন্ধন-পরম্পরা গড়ে দেওয়া হয়েছিল। এবং এরই সঙ্গে প্রভুগোষ্ঠি পরিচালিত ধর্মীয় আচার-সংস্কারের দায়ে চাষী-জোলা-জেলে প্রত্যেককেই আজীবন ধনীর কাছে ঋণী থাকতে হতো। সুতরাং জমির মালিকানার একচেটিয়া কেন্দ্রীভবনও ঋণ-নির্যাতিত জনগণকে বন্দী রেখেছে, তার স্বাধীন ও সতেজ মনুষ্যত্বকে বিকশিত হতে দেয়নি। এই উদ্বৃত্ত এবং তজ্জাত প্রভুকুলের বিলাস-ব্যসন ও ব্যয় সাম্রাজ্যবাদীদের পণ্য বিক্রয়ের সংগঠিত বাজারেরও ভিত্তি ছিল। অন্যদিকে প্রভুর দায় মেটাতে চাষীকে উৎপাদিত সামগ্রীর distress sale করতে হতো আড়তদারের কাছে। আড়তদার বা আড়কাঠি এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী মালিকানার কলকারখানায় কাঁচামাল যোগান দিত। শাসককুলের আইন-কানুন-পুলিশ ব্যবস্থার স্বেচ্ছাচারী চাপ এবং গ্রামের জমিদার-জোতদার-মহাজন-আড়তদারের উৎপীড়ন মানুষকে ভারবাহী পশুতে পরিণত করেছে। এই ভারবাহী পশুদের মনোজগতে প্রভাব বিস্তারের জন্য নানা মাপের প্রভুরা ধর্ম-সঙ্কীর্ণতা ও নানা ধরনের কুসংস্কার চাপিয়ে দিয়েছে। আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের ভিত্তি তাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের যুগপৎ শোষণ এবং শাসন অব্যাহত রাখার এই সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে বিঘ্নিত করতে বা লড়াইকে ধ্বংস বা খর্ব করার জন্য যত ধরনের বিষকাঁটা কীলক হিসাবে ভেতরে প্রবেশ করার প্রচেষ্টা চলেছে, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা অন্যতম। দেশ স্বাধীন হবার পর সাম্রাজ্যবাদীরা পাকিস্তানে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার উদ্বৃত্ত ব্যবহার করে সামন্ততন্ত্র থেকে একচেটিয়াপতি হবার বিকৃত পথে পা বাড়ানো বিকাশমান পুঁজিপতিদের হাতে তাদের এই

শোষণ-শৃঙ্খলের দায়িত্ব দেয়। অর্থাৎ, গ্রামের সামন্ততন্ত্র যদি রক্ষিত হয়, মহাজন যদি একচেটিয়াপতিদের ব্যাঙ্কের সহায়তায় ঋণ ও আড়তদারির ব্যবস্থা চালু রাখতে পারে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি যদি একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে কোলাবরেশন চালাতে পারে, তা হলে শোষণের ঘরাণাটা একই থেকে যায়, কেবলমাত্র শোষণের নকশার সামান্য রদবদল ঘটে। এই নতুন পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সামন্তপ্রভু-আড়তদার-মহাজন-জোতদার ও সাম্রাজ্যবাদের মাঝে আরও একটি স্তর প্রবেশ করে, তারা হলো একচেটিয়া পতি। শুধু তাই নয়, 'স্বাধীন' হবার পর যে আর্থনীতিক প্রেরণা ও উৎসাহের সৃষ্টি হয় এবং যার ফলে আপাত ইন্‌ফ্রাস্ট্রাকচার হিসাবে, বিশেষভাবে পূর্ব-পাকিস্তানে বিপণনগত প্রয়োজন এবং সামরিকবাহিনী বহনের জন্য যে রাস্তা-ঘাট, বাঁধ ইত্যাদি তৈরি করার দিকে ঝোঁক দেখা যায় তারজন্য নিযুক্ত কনট্রাক্টার প্রভৃতির হাতে অর্থাগম অনুৎপাদক একটি অন্তবর্তী সমাজগোষ্ঠিকেও এদের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এসব উন্নয়নমূলক কাজে কর বাড়ে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, বিদেশী ঋণ বাড়ে, অথচ এরই ফলে সামন্ততান্ত্রিক জনগোষ্ঠি সহ আমলা-ফয়লা বা ব্যুরোক্রেসীর বোলবোলাও বাড়ে। উচ্চ কর্মচারীর সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারী ব্যয়ভিত্তিক উৎপাদন-শিল্প একধরনের আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া মানসিকতারও জন্ম দেয়। একটি দুষ্টচক্র দেশের আত্মবিকাশকে চূর্ণ করার জন্য কার্যকর থাকে। সামন্ততন্ত্রী ব্যবস্থার ফল হিসাবে কৃষিজাত উৎপাদনে ঘাটতি, একফসলী ব্যবস্থা পশ্চাৎপদ 'পূর্ব পাকিস্তান'কে আর্থনীতিক দিক থেকে বিশ্ব-বাজারের মূল্যস্তরের উপরে নির্ভরশীল করে তোলে—সে মূল্যস্তর আবার ঠিক করে দেয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই। রপ্তানি ও আমদানি মূল্যের মধ্যে এবং বাণিজ্য শর্তের ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদীদেরই স্বার্থেই থাকে লক্ষ্যণীয় ফারাক। খনিজ তেল, যন্ত্র, ইস্পাত প্রভৃতি দ্রব্যের উপরে থাকে সাম্রাজ্যবাদীদের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ। দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার দারিদ্র্য যত বাড়ে, ততই আমদানিকৃত খাদ্য, ঋণ এবং অন্যবিধ বন্ধনে দেশ জড়িয়ে পড়ে। এ-সবের মধ্য দিয়ে উপনিবেশিকতা নয়া উপনিবেশিকতায় রূপ নেয়। পাক-শাসকগোষ্ঠি জনগণের সম্ভাব্য রোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটের অন্তর্ভুক্ত করে। সাম্রাজ্যবাদীরা প্রত্যক্ষ লুণ্ঠনের বদলে সামনে একদল পুতুল রেখে তাদের কাজ হাসিল করে। পাক-শাসকগোষ্ঠি জনগণকে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভারত-বিদ্বেষ, খালের জল, কাশ্মীর প্রভৃতি

সমস্যার নামে যুদ্ধের জিগির অব্যাহত রাখে এবং ইসলামের নামে পশ্চাৎপদ জনগণকে আচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টা চালায়।

নতুন ঘরানার পরাধীনতার রং বদল

ঐতিহ্য বিচার করতে গিয়ে এত কথা বলা প্রয়োজন হলো এই কারণে যে, স্বাধীনতার আগের যুগের শোষণ তো বটেই—পাক-স্বাধীনতার পরবর্তী-কালে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই শোষণের রকমফের বাঙলাদেশ নামক ভূখণ্ডে প্রাকৃতিক ও শ্রমসম্পদের নয়া ঔপনিবেশিক নির্মম শোষণের দাপট উৎপাদকশক্তিগুলির বিকাশ ব্যাহত করেছে। এতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়েছে, নিরক্ষরতা ও অতি নিচুমানের জীবনযাপন আধুনিক শ্রমশিল্প বিকাশের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। অথচ মানুষের দুঃখ বেদনার অন্ত নেই, শোষণের শেষ নেই, যন্ত্রণার অবসান নেই। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বের পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরাই শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন একটু সংগঠিতভাবে জনগণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার কথা বলে সহজেই তাঁরা জনগণের মন কেড়ে নিয়েছেন। শোষক হিসাবে তাঁরা নির্দিষ্ট করেছিলেন আপাত চোখের সামনে দৃশ্যমান জমিদার মহাজনদের—যারা জন্মে ছিলেন হিন্দু ঘরে। ধর্মীয় কুসংস্কারকে এই নতুন নায়কেরা শাসন ক্ষমতা হাতে নেবার জন্য জনসমর্থন পাবার ভাবাদর্শ বলে নিরূপণ করেন।

রাজনৈতিক রণধ্বনি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে, সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক বুকনিবাজকে সমর্থন জানিয়েছে। সেই বুকনিবাজের নির্দেশ মান্য করেছে। এ-ভাবেই জন্ম নেন 'কায়দে আজম'-এর মতো সর্বজ্ঞ নেতারা, যাঁরা হয়ে ওঠেন সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান। অথচ দিনের পর দিন যায়, ত্রাণ-কর্তা 'প্রতিশ্রুত ভূমি'তে তাদের আর পৌঁছে দেন না। সামাজিক বৈপরীত্যগুলি তীব্র হয়ে দেখা দেয় এবং জনগণের ললাটলিপি হয় দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বঞ্চনা। এক সামন্ততান্ত্রিক ক্ষুদ্রগোষ্ঠি, সরকারী উচ্চপদাধিকারী ও ব্যবসায়িক সুবিধা আদায়-কারীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দেশব্যাপী দারিদ্র্যের পটভূমিতে জনগণের মনে অত্যন্ত খারাপ ধারণার জন্ম দেয়। ফলে, জনগণের ক্রোধ এই পূর্বতন 'জাতির পিতা'দের বিরুদ্ধে দানা বাঁধতে থাকে, আর এই পরিবেশে দমনপীড়নমূলক শক্তিকে হাত বাড়িয়ে আনার জন্য শোষকগোষ্ঠি

নেতৃত্ব বদল ঘটায় সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। এ-ভাবে ইস্কান্দার মীর্জা, আইয়ুব, ইয়াহিয়া খানের দল গদীয়ান হন। এমন-কি পূর্বতন পূর্ব-পাকিস্তানে আইয়ুবের সামরিক একনায়কত্বকে দক্ষ, কার্যকর এক সামাজিক শুদ্ধিপর্ব বলে চিহ্নিতও করা হয়েছিল। এই নতুন শাসকগোষ্ঠি তাদের অনুকূলে একদল দেশী মানুষকে সামিল করার চেষ্টা করে। তারা হলো দেশের এক ক্ষুদ্র বুদ্ধিজীবী অংশ ও সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠির কমবাইন। আইয়ুবের আমলে তৎকালীন পূর্বপাকিস্থানে সত্যিই সুযোগ-পাওয়া গোষ্ঠির মধ্যে ছিল এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী—যেমন কিছু সংখ্যক অধ্যাপক, টেকনিসিয়ান, উপদেষ্টা, সরকারী গবেষণা বিভাগের কর্তা, সাংবাদিক ইত্যাদি ইত্যাদি যাদের হাতে প্রচুর অর্থ এসেছে নানা কায়দায়। বেসিক ডেমোক্রেসীর দাক্ষিণ্যে গ্রামে সামন্ত ও আধা-সামন্ত প্রভু এবং সামন্তপ্রথার সঙ্গে আর্থনীতিক সূত্রে সম্পর্কিত গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী—মোল্লা, মৌলবি—মক্তাব ও বিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কাঁচা টাকার স্বাদ জেনেছেন। এ-অবস্থায় জাতির শিকড়, সাংস্কৃতিক পরিশুদ্ধি, জাতীয় সত্তা—এ-সব কথা অবান্তর বোধ হয়। দিনগত পাপক্ষয়ই তখন জীবন, সে জীবনে আত্মবিকাশের সমস্যাটাই মনে জাগবার কথা নয়। কিন্তু বাঙলাদেশে স্বাধীনতার সংগ্রামে ব্যাপকভাবে সদ্যতন বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে যুক্ত হলেন, তার সূত্রটি অন্বেষণ করার প্রয়োজন আছে। বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ছিল এই স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথমাবধিই অপরিসীম।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীর শ্রেণীভিত্তি

কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর বহু বিপথগামিতা সত্ত্বেও, নতুন বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে ভিন্নতর মতই পোষণ করতে হবে। কেননা বুদ্ধিজীবীর শ্রেণীভিত্তি 'পূর্ব পাকিস্তানে' ভিন্ন চরিত্রের ছিল। এঁদের দেশে তখনও বুর্জোয়া বিকাশ শিকড় গাড়েনি, অথচ বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থার 'সেকুলার' দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এঁদের পরিচয় ঘটে। বিশেষভাবে এঁরা এক প্রজন্মের বুদ্ধিজীবী। যে বুদ্ধিজীবীরা সামন্ত-প্রভুদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পাকিস্তানের প্রবক্তা ছিলেন, এই তরুণ বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন তাঁদের থেকে ভিন্ন চরিত্রের। এঁদের প্রতিযোগী হিসাবে মান ও সংখ্যাগত বিচারে গুরুত্বপূর্ণভাবে আর হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন না। হিন্দু তকমাধারী সামন্তপ্রভুদেরও আর অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন থেকে আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদায় আসীন হয়ে,

ঢের পরে আগন্তুক মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের করুণার পাত্র হিসাবে দেখতেন। নবউদ্ভূত মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও অসম প্রতিযোগিতায় বিমূঢ় হয়ে একধরনের হীনমন্যতাজাত গূঢ়ৈষণার শিকার হন। তাঁদের আত্মবিকাশের সমস্যাটিকে সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীরা কূটকৌশলে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যায় রূপ দিয়ে তাঁদের পাক-রাষ্ট্রের প্রবক্তা করে তুলতে পেরেছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই হীনমন্যতার আর স্থান ছিল না। বরং তাঁরা ক্রমে ক্রমে আত্মবিকাশের প্রবণতা চরিতার্থ করার প্রয়োজনে রামমোহন থেকেই তাঁদের বুদ্ধিজীবীদেরও উদ্ভবের সূত্র টানলেন।

কিন্তু তাঁদের শিকড় রামমোহনেও ছিল না, আরও গভীরে ছিল, আরও ব্যাপকভাবে দেশকাল জুড়ে তা বিস্তৃত ছিল। লোকায়ত ভুবন আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই তাঁদের যথার্থ স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন শুরু হলো।

আসলে প্রলেতারিয়া ও বুর্জোয়া শক্তিগুলি আপেক্ষিক ভাবে দুর্বল থাকায় বাঙলাদেশে শিক্ষক-অধ্যাপক-ব্যবহারজীবীসহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবী এবং অফিস কর্মচারী নিয়ে মুখ্যত গঠিত সামাজিক মাঝের স্তরটি ক্রমবর্ধমান-গুরুত্ব পরিগ্রহ করেছে। অফিস কর্মচারীদের গোষ্ঠির বিকাশ উন্নয়নের প্রচেষ্টামূলক বা 'লিপ-সার্ভিস'যুক্ত দেশেও সামাজিক কাঠামোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসাবে ধরতে হবে। অভিজ্ঞ শ্রমিকদের অভাব, ধর্মীয় ও অঞ্চলগত সংস্কার ইত্যাদি পরাধীন উপনিবেশোপম পূর্ব-পাকিস্তানে শ্রমিক জনগণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শিল্পশ্রমিকদের অধিকাংশই ছোট আকারের শিল্প সংস্থাগুলিতে ছড়িয়ে ছিল। নৌ-পরিবহনেও অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা অগণ্য। শ্রমিক বাহিনীতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় যোগ দিচ্ছিলেন জন্মসূত্রে কৃষক। এঁদের গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক তখনও অব্যাহতই রয়ে গেছে। এবং কার্যক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের একটি ক্ষুদ্র অংশই আধুনিক বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের ন্যায় আচরণ করেছে। উপরন্তু, বাঙালি-অবাঙালি রূপভেদ প্রলেতারিয়েতকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় বেশি বেশি ভাবে সংগঠিত হতে দেয়নি। অথচ দেশের ব্যাপক জনমণ্ডলীর সঙ্গে অংশীভূত থেকে অসংগঠিতভাবেও এঁরা গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছেন। এ সত্ত্বেও বলতেই হবে, প্রলেতারিয়েত পার্টির বে-আইনী অবস্থান ও সাংগঠনিক কাজের নানা অসুবিধার ফলে শ্রমিকশ্রেণীকে যতবেশি স্বতঃস্ফূর্ততার অংশীদার করেছে, সংগঠিত সংগ্রাম তার চেয়ে ঢের কমই হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে

গ্রামের শোষিত মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত এক প্রজন্মের সন্ততন বুদ্ধিজীবী আত্মবিকাশের অধিকারকে স্বজাতির বিকাশের অগ্রশর্ত বলে জ্ঞান করেছেন এবং ভাষা ও সংস্কৃতির সার্বভৌমত্বের নামে জাতীয় সার্বভৌমত্বের সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছেন।

পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী, অফিস কর্মচারী—এঁরা সকলেই শ্রেণীগত অন্তঃসারের দিক থেকে পেটি বুর্জোয়া। এঁরা বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কথা যদিও জানেন, কিন্তু যেহেতু বাঙলাদেশে নিজস্ব পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেনি, সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের সর্বগ্রাসী এই যুগে এজন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতি এই নতুন পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর আগ্রহ কথঞ্চিৎ কম। মূলত এই পেটি বুর্জোয়াদের ভাবাদর্শ—জাতীয়তা ও সামাজিক পুনর্গঠনের ঈপ্সা। এঁদের আভ্যন্তরিক দোলাচল—আইয়ুবের অর্থানুকূল্য অথচ আত্মবিকাশের প্রশ্নে অনড় কেন্দ্রীয় শাসন, দুইয়ে মিলে স্ববিরোধ এঁদের কাউকে কাউকে উগ্র রাজনীতিক হঠকারিতার দিকে যেমন ঠেলে দেয়, তেমনি একাংশ আলবদর-এর মতো সংগঠনকেও মদত দেয়। কিন্তু এই দুই সঙ্কীর্ণমনা বাম-দক্ষিণ বিকৃতির বাইরে অধিকাংশই ছিলেন ভিন্ন পথের পথিক। পাকিস্তানী শাসক ও শোষকদের সম্মুখীন হয়ে প্রথম দিকে এঁরা প্রায় রমেশচন্দ্র দত্তের মতো বলতে থাকেন, প্রশাসনিক, সামরিক ও রাষ্ট্র পরিচালনাগত গুরুত্বপূর্ণ কাজে এঁদের সমঅংশিদার করতে হবে। 'ভারতের আর্থনীতিক ইতিহাস (বৃটিশ শাসনের আদি যুগ)' গ্রন্থের ভূমিকাতে রমেশচন্দ্র ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের আত্মবিকাশের সমস্যা নিয়ে লিখেছিলেন,"... উচ্চতর পদগুলি কাগজে কলমে মাত্র সাধারণের জন্য খোলা ও সিবিল সার্ভিস সহ, শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক-তার পুলিশ এবং চিকিৎসা বিভাগেও ভারতীদের উচ্চপদ লাভের সুযোগ থাকা উচিত।" কিন্তু শেখ মুজিবরের মতো ব্যক্তিরাও ছিলেন। এঁরাও শ্রেণীগত তাৎপর্যে বুদ্ধিজীবী। এঁরা সামন্ততন্ত্র, পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজি, ব্যাঙ্ক, একচেটিয়াপতি এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসমতার শোষণমূলক তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ভারতবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার ধুয়ো তুলে সেই শোষক কম্বাইন-যে বাঙলাদেশ শোষণ করছে, কৃষক-শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীর আত্মবিকাশের স্বার্থ যে অভিন্নভাবেই একসূত্রে গ্রথিত—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তা পরিষ্কার ধরতে পেরে নির্বাচনের কর্মসূচি হিসাবে প্রথমত ছয় দফা, পরে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে' তোলার আহ্বান জানান। ইতিহাসের নির্দিষ্ট পর্যায়েই পেটি

বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে এমনধারা গণতন্ত্রীদের জন্ম দিতে পারে—যাঁরা দৃঢ়পণ বিপ্লবী, যাঁরা পুঁজিবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার এবং সমাজতন্ত্র অভিমুখে অপুঁজিবাদী বিকাশের পথ ধরে দেশকে পরিচালিত করার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। এবং এ নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের ব্যাপক ফ্রন্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েই ইতিহাসে নিয়ামকের ভূমিকা নিতে সমর্থ।

দুই জাতীয়তাবাদ

বলাবাহুল্য, এই দৃঢ়পণ বিপ্লবীদের কাছে জাতীয়তাবাদ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ রূপ নেয়। জাতীয়তাবাদের নানাবিধ সংজ্ঞা আছে। তবু সংক্ষেপে বলা যায়, জাতীয়তাবাদ প্রাথমিক অর্থে সেই সর্বগ্রাসী বোধ, যা একটি জাতিকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনে প্রণোদনা দান করে।

আজকের দিনে বহু বিজ্ঞ পশ্চিমী লেখক জাতীয়তাবাদকে 'শিশুরোগে'র ছটফটানি বলে উল্লেখও করে থাকেন। আবার কোনো কোনো লেখক এ যুগে জাতীয়তাবাদের নতুন উজ্জীবনও লক্ষ্য করেছেন। ফরাসী সমাজতান্ত্রিক রেমঁও আঁর মনে করেছেন, ইউরোপে পুরনো ধাঁচের জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবন দেখা যাচ্ছে। নিপীড়িত দেশগুলিতেও দেখা দিয়েছে জাতীয়তাবাদ—তবে এ জাতীয়তাবাদের রূপ অবশ্য ইউরোপে জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের কালের চেনাজানা পুরোনো রূপের চেয়ে স্বতন্ত্র। প্রখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক আরনল্ড জে. টয়েনবির মতে, "ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী এবং কমিউনিস্টরা প্রথম অর্থে জাতীয়তাবাদী। দ্বিতীয় অর্থে ততদূর পর্যন্ত এঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বা কমিউনিস্ট—যতক্ষণ এ-সব আদর্শবাদ জাতীয়তাবাদের পথরোধ করে না দাঁড়ায়।" টয়েনবি জাতীয়তাবাদকে এ-যুগের ঐতিহাসিক শক্তি বলে উল্লেখ করেও মানবজাতির পক্ষে একে ক্ষতিকর বদাভ্যাস বলেই মনে করেছেন। তাঁর মতে এর জন্ম হয়েছে উপজাতীয়তাবোধ থেকে এবং সমাজের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত থাকবার সাধ থেকে। তিনি বলেছেন, বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়েই এই ক্ষতিকর বদাভ্যাসের নিরাকরণ হতে পারে মাত্র।

অতি বাম তরুণকুলের মধ্যেও প্রচলিত আছে যে, এ-যুগে জাতীয়তাবাদ ব্যাপারটাই ক্ষতিকর। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী এই বোধ। ফলে যাঁরা জাতীয়তাবাদের পথাবলম্বী, তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করার মধ্যেই এঁদের 'বিপ্লবী' আন্তর্জাতিকতা-চিন্তা প্রতিফলিত হয়।

রেমণ্ড তাঁর এক অর্থে সঠিক। তিনি দু-জাতীয় জাতীয়তাবাদের কথা ঠিকই ধরেছেন। একজাতীয় জাতীয়তাবাদের অন্তঃসার হলো সাম্রাজ্যবাদীস্তরে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ, অন্যটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার তাৎপর্যে আন্তর্জাতিকতার পথেই প্রসারিত। পশ্চিমী দেশগুলিতে পুঁজিবাদ বিকাশের প্রথম যুগে, সামন্ততন্ত্র থেকে প্রগতিশীল সামাজিক স্তরে উন্নয়নের মন্ত্রই ছিল জাতীয়তাবাদ। সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্য, সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতা দূর করে পণ্য, শ্রম ও কাঁচামালের প্রসারিত বাজার এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োজনে যে এক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা দরকারী ছিল তারই ভাবাদর্শ ছিল এই মতবাদ। কিন্তু সামন্ততন্ত্র চূর্ণকারী পুঁজিবাদ নিজেও এখন রক্ষণশীল হয়ে পড়েছে, বরং এখন তা পদানত অঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম রক্ষী। আন্তর্জাতিক বাজার, কাঁচামাল ও শ্রমশক্তি লুণ্ঠন করার প্রয়োজনে, সে আজ সাম্রাজ্যবাদী দানবরূপ নিয়েছে। জন্ম দিয়েছে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা বা শভিনিজম, জাত্যন্ধতা, উন্নত জাতির তত্ত্ব ও ফ্যাশিবাদ। একটার পর একটা জাতির আকাঙ্ক্ষাকে বিনাশ করে, সাম্রাজ্যবাদ আজ 'জাতীয়তাবাদে'র নামে জাতিবৈর মনুষ্যত্বঘাতী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষ মূলধনের পীড়নে সাম্রাজ্যবাদী স্বদেশে যেমন পীড়িত, অন্যদেশের শ্রমজীবী মানুষও তেমনিই তার নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদীর শোষণে নির্যাতিত। তাই শ্রমিকশ্রেণীর এই শোষণ-বিরোধী সংগ্রামের ভিত্তি আন্তর্জাতিকতা। সকল দেশের শ্রমিকই এক চূড়ান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধমান। পরাধীন দেশের ব্যাপক জনসমষ্টি—যার মধ্যে শ্রমিক-কৃষক-পেটি বুর্জোয়া এমন কি জাতীয় বুর্জোয়া সবাই আছে—তারা এই একই শত্রুর দ্বারা পীড়িত। তাদের জাতির মর্মবেদনা এই শোষণের বিরুদ্ধেই প্রকাশিত। এই স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠি যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপন জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে, সে লড়াই আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থেকে যুগপৎ তা একই শত্রু-বিরোধী। এ-তাৎপর্যে এই জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার সঙ্গী।

বিশেষভাবে যে দেশে বুর্জোয়া বিকাশের রূপ খণ্ডিত, পেটি বুর্জোয়া ও মধ্যশ্রেণী আত্মবিকাশের প্রয়োজনে বিপ্লবের সারথী হয়ে ওঠে, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব, আর্থনীতিক স্বনির্ভরতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে অপুঁজিবাদী পথে বিকাশের জন্য উন্মুখ হয়, প্রত্যক্ষভাবেই এ-জাতীয়তা তখন সমাজতন্ত্রী আন্তর্জাতিকতার সঙ্গী, এবং তাই বাঙলাদেশে সেই আন্তর্জাতিকতার দিকেই তা প্রসারিত। লেনিনের মতে এমন-কি "যে-কোনো নির্যাতিত জাতির বুর্জোয়া

জাতীয়তাবাদের এক সাধারণ গণতান্ত্রিক অন্তঃসার আছে, যা নির্যাতনের বিরুদ্ধে নির্দেশিত, এবং এই অন্তঃসার আমরা নিঃশর্তভাবে সমর্থন করি।" সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্বিংশ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে তাই চমৎকার ভাবে বলা হয়েছে······"জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম থেকে উদ্ভূত শক্তিগুলি, সর্বোপরি এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্যমুক্ত ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্যবাদের উপরে ক্রমেই অধিকতর চাপ দিচ্ছে। প্রধান কথা হলো, বহু দেশেই জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বাস্তবে সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদী উভয়বিধ শোষণ-মূলক সম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হতে শুরু করেছে।" আমরা রেমণ্ড আঁরকে বলতে পারি সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী, যাদের উভয়েরই মতবাদ আন্তর্জাতিকতা, সদ্যস্বাধীন দেশগুলির জাতীয়তাবোধ তাদেরই ভ্রাতৃ-প্রতিম। এ বোধসঞ্জাত সংগ্রাম বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের 'সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদ'কে চূড়ান্ত ভাবে পরাস্ত করবে এবং বিশ্বব্যাপি আন্তর্জাতিকতাকে ফলপ্রসূ করে তুলবে। টয়েনবিকেও বলি, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই ভাবি পৃথিবীর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত অবস্থান করছে।

এ জাতীয়তাবাদ কেবল-যে মুক্তি সংগ্রামকেই ত্বরান্বিত করেছে তাই নয়। বাঙলাদেশে দেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তা একটি অভূতপূর্ব অনুঘটকের কাজও করেছে। এই বোধ সামাজিক ঐক্য তথা ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে সবাইকে মনস্ক করে তুলেছে। এই মনস্কতাই সমাজে শোষক শক্তিগুলির অবস্থান বিষয়ে সচেতনতা দান করে এবং নির্যাতিত জাতির এই জাতি-সচেতনতা শ্রেণীসচেতনতাকেও প্রখর করে তোলে। এই জাতীয়তাবোধ জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন হতে দেয় না, বরং আগ্রহী করে তোলে। জাতীয় ভাষাবিকাশের প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করে ভাষাকে বিকশিত করে। এই চেতনাই জাতীয় শ্লাঘাবোধের জন্ম দেয়, ঐতিহাসিক অতীতের দিকে চোখ যায়, এবং জাতির অন্তর্নিহিত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের শিকড় আবিষ্কার করে। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ এ. ইস্কেনদেরভ স্বাধীনতাকামী জাতির বিশেষত্ব মনে রেখে তাই সঠিকভাবেই বলেছেন, "The ideas of nationalism strengthen the feelings of community, promote an interest in historical past, foster national pride, give an impetus to the development of national culture, stimulate the deve-

lopment of national language." [The Third World, p 226] বলাবাহুল্য, ঐতিহ্যমনস্কতা, জাতীয় শ্লাঘাবোধ, জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রেমিকতা এবং স্বদেশী ভাষা বিকাশের আকাঙ্ক্ষা এ-সবগুলি ক্ষেত্রেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অবদান অসামান্য।

অনেকেই বাঙলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক বা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বা তুঙ্গরূপ বলে মনে করেছেন। আর্থনীতিক পরাধীনতা-বোধই যে রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধের চেতনাকে জাগ্রত করে এটা তাঁরা মনে রাখেন না, আর রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধ বা জাতীয়তাবাদ ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জাতীয় শ্লাঘাগত গরিমাকে প্রাণবন্ত করে তোলে এ কথাটাও তাঁরা ভুলে যান। 'বাঙলাদেশ' 'বাঙলাদেশ' বলে যাঁরা বক্ষদেশ অশ্রুপিছল করছেন তাদের এই বিশেষ দিকটিতে চোখ ফেরাতে বলি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, যোগ্য দেশে যোগ্য অবস্থাতেই ঐতিহ্যমনস্কতা বা ভাষাগৌরব বা জাতিশ্লাঘা প্রগতির বাহন। উপজাতীয় ডাইনীবিদ্যা বা করোটি শিকার, অথবা ভাষার নামে আরণ্য রাজ্যে উপজাতীয় ব্যবধানের হাজার ডায়ালেক্টকে জাতির ভাষার মহিমায় সজোরে অভিষেক করা, বা উপজাতীয় কুসংস্কার কণ্টকিত আচরণকে জাতিশ্লাঘা বলে গণ্য করা প্রগতির পরিপন্থী। উপজাতির মধ্যে যে গণতান্ত্রিক জীবনভাবনা থাকে, যৌথভাবে জীবনচারণা থাকে, সেগুলিই উজ্জ্বল ঐতিহ্যের স্মারক। সুখের কথা সংখ্যায় সাড়ে সাত কোটি বাঙালি জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য, ভাষা ও জাতিশ্লাঘার যৌথ জীবনসাধনাগত উত্তরাধিকার আছে। সেই উত্তরাধিকার আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতীয়তার নিহিত ফল্গুধারা বেগবতী স্রোতোধারার রূপ নিতে পেরেছে।

বাঙালি ঐতিহ্যের আবহমানতায় বুদ্ধিজীবীর শিকড় সন্ধান

ভোট-মোঙ্গোল-অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় মিশ্র এই নরগোষ্ঠি হাজার বছরেরও অধিককাল নদী-বিল-অরণ্য অধ্যুষিত পলিমাটির ভুবনে বাস করে আসছেন। হিন্দুকুশের গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে যতগুলি নরগোষ্ঠি ভারতবর্ষে এসেছে তারা এদেশে অধিষ্ঠান করার পরই কৃষিভিত্তিক এশিয়-সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্য গঠনের আদর্শে ভারত উপমহাদেশের এই পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত ধেয়ে এসেছে। অনেক নির্জিত জনগোষ্ঠিও এ-অঞ্চলে আশ্রয় খুঁজেছে, পরবর্তীকালে আদি জনগোষ্ঠির সঙ্গে মিশে গেছে। উত্তর ভারতীয় সমাজ ও আর্থনীতিক প্রথা—যা সনাতনত্বে

অভিসিক্ত হয়ে ধ্বংসাবশেষ নিয়ে অদ্যাবধিও অন্তত মানস-ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করছে, সেই বর্ণাশ্রম, গ্রামসমাজ ও কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত সেচ ব্যবস্থার অংশীভূত হয়ে এ অঞ্চল ছিল না। বরং আক্রমণকারীদের নিকটে দুর্গম এই অঞ্চলে জনগণ নিজস্ব ঘরানার এক গণতান্ত্রিক জীবনধারাতেই অভ্যস্ত ছিল। ব্রাহ্মণ্য যুগের উচ্চবর্ণের মানুষেরা বা মধ্যযুগে তুর্কী-পাঠান-মোগল রাজপুরুষেরা বা উলেমা মৌলবীরা এই বিশাল জনগোষ্ঠির গণতান্ত্রিক জীবনধারার মধ্যে ভাসমান দ্বীপসদৃশ ছিলেন। এঁদের সংস্কৃতিতেও এই জনগোষ্ঠির লোকায়ত সংস্কৃতিজারিত আচরণের বহুবিধ ছাপ পড়েছে, কিন্তু অন্যদিকে এই জনমণ্ডলীর জীবনে আগন্তুকদের ধর্ম ও সংস্কারের কথাঞ্চিৎ কোটিং পড়েছে মাত্র। উৎপাদন পদ্ধতি যেমন ছিল অপরিবর্তিত, কৃৎকৌশলও রয়ে যায় অভিন্ন, ফলে বস্তুগত সংস্কৃতিতে আক্রমণকারীদের উপস্থিতিতেও হেরফের হয়নি। উৎপাদনশৈলী এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কায়দার মধ্যদিয়ে যে সামাজিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তাই ছিল আচরণে ও জীবনচর্যায় প্রোথিতমূল। এই গণতান্ত্রিক জীবনচেতনাই কখনো তাকে গ্রহণ করিয়েছে বৌদ্ধ আচ্ছাদন বা নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজের গণতান্ত্রিক আবরণ বা মুসলিম ঘেরাটোপ। বাঙালি-সংস্কৃতি-পথিক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই বুঝেছিলেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহা দ্বারা সংস্কৃতপূর্ব যুগই তাহাকে মণ্ডিত করিয়াছিল। ···বাঙ্গালা ভাষার উপরে সংস্কৃত একটা মুখোস পরাইয়া দিয়াছে। বঙ্গ পল্লীর দোয়েল ময়ূর সাজিয়া বাহির হইয়াছেন।" অথবা "তখন সিন্ধাবাদের স্কন্ধে বৃদ্ধের মত বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃতের আদর্শ চাপিয়া বসে নাই। এই সকল কাহিনী কাব্যের নায়ক নায়িকা বেনে, সদ্গোপ, বৈশ্য, ব্যাধ এমন কি ডোম জাতীয়। যে সকল গান ও ছড়া দেবমণ্ডপে বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে গীত হইয়া পূজার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে নবমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহা পরিহার করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ছড়া গ্রহণ করিলেন কিন্তু কাস্তে ভাঙ্গিয়া করতাল গড়াইয়া লইলেন।" সেই লোকায়ত ঐতিহ্যের এ-যুগোপযোগী বিভাস হলো গণতন্ত্রের জাগরণ, এবং এ জাগরণ আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক অন্তঃসার গ্রহণে উন্মুখ ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থার প্রতিই প্রসারিত।

এই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য-সচেতনতা বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে লোকায়ত সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহী করেছে। তার কাছে 'রামচন্দ্রের প্রপিতামহ' সহ সমুদ্রগুপ্ত,

হর্ষবর্ধন, আকবর-মানসিংহ প্রভৃতির মতোই বক্তিয়ার খিলজিও আক্রমণকারী। সপ্তদশ অশ্বারোহীর কপোলকল্পিত কাহিনীতে সে মুসলিম বীরত্বের নামে গদ্‌গদ বিগলিতচিত্ত হয়না। বক্তিয়ার বা ক্লাইভ উভয়ের প্রতিই তার মানসিকতা সমধর্মী। লোকায়ত কবিকাহিনীতে বা বৃহৎ কথায় লোকবীরদের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের কাল থেকে বাঙালি সাহিত্যকে সংস্কৃতকরণের যে চেষ্টা চলেছিল, তারই ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণেরাও এক সময় ব্যাধ বা বণিক, ইছাই ঘোষ-কানাড়া-হরিহর বাইতি-লাউসেন থেকে কালকেতু-চাঁদসদাগর, গ্রাম্য কোচান থেকে কৃষি কর্মের শিব সবাইকে তাঁদের পুরাণ-কাহিনীর অংশীদার বলে মেনে নেন। আক্রমণকারীই বাঙালি সংস্কৃতির আবহমানতার কাছে মাথা নিচু করে, সংস্কারবশত তাকে যেন গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। মানুষের মধ্যে প্রকৃত বা সমাজ বৈপরীত্যের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামী অভিব্যক্তি থাকে, তাকে সংহত করেইতো রূপ দেন শিল্পী। এ-ভাবেই একজন ফিদিয়াস এসে জিউস-এর প্রস্তরিভূত রূপ দেন, একজন বাল্মীকি রামচন্দ্রের, একজব ব্যাসদেব অর্জুন ও কর্ণের, একলব্য ও দ্রোণের।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সাম্রাজ্যবাদী ভগ্নস্তূপের মধ্যে থেকে এখন নতুন জাতীয়তায় উজ্জীবিত সদ্যস্বাধীন দেশের রূপকারের কিছুই প্রায় শেখবার নেই। ও-সব দেশে সাহিত্যিকের সৃষ্টি বহুলাংশে তো কেবলমাত্র আঙ্গিকের পরীক্ষাতেই আজ পর্যবসিত। যেহেতু সমাজের ব্যাপক মানস-ভুবন থেকে সে লেখক বিচ্ছিন্ন, সে-জন্য বিষয়বস্তু নয়, লিপিচাতুর্যের মধ্য দিয়ে নিজের বুদ্ধিগত বৈশিষ্ট্য দেখাতেই তিনি আগ্রহী-উৎসাহী ও পারদর্শী। ১৯২৮ সালে গর্কী সরলভাবে সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে কয়েকটি কথা বল্লেন। তাঁর মতে সমাজই সৃজনশীলতার তাৎপর্যে শিল্পকর্মটির যোগ্য অন্তঃসার যোগান দেয়, শিল্পী কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী তাকে যোগ্য আঙ্গিকে প্রকাশ বা পরিবেশন করেন। শিল্পী যখন সমাজের সৃজনশীলতা বিষয়ে অমনোযোগী হয়ে পড়েন, তখনই জন্ম নেয় কলাকৈবল্যবাদ, 'ব্যক্তিই সার্বভৌমসমাজ' প্রভৃতি আপ্তবাক্যের। ফাউস্তের চারিত্র্যউপাদান লোককথায় গ্যেটে বা মারলোর ঢের আগে থেকেই জানা ছিল। "মিল্টন এবং দান্তে, মিকিভিৎস, গ্যেটে এবং শীলার—এঁরা যে এত উর্ধে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তার কারণ এঁরা সমষ্টির সৃজনশীলতার দ্বারা দীপ্ত হয়েছিলেন, প্রেরণা লাভ করেছিলেন প্রচলিতজ নপ্রিয়

গাথাবলী থেকে। সে উৎস সুগভীর, বৈচিত্র্যময়, বোধিবিধৃত এবং সম্পদশালিনী। ব্যক্তিগত তাৎপর্যে এতে কোনো কবিকে ছোটো করা হয় না। এবং বলা যায়, আকাটা হীরা হলো সমষ্টি বা সমাজের বিষয়, আর তাকে মেজে-ঘসে যোগ্য আকারে কেটেকুটে চমৎকার মণিমাণিক্যের সন্ধান দেয় ব্যক্তিশিল্পীর লিপি চাতুর্য। শিল্পকর্ম আবশ্যিক ভাবেই ব্যক্তির সঙ্গেই সাঙ্গীকৃত, কিন্তু সমষ্টিরই কেবলমাত্র সৃজনকর্মের যোগ্যতা আছে। জনগণ গড়েছেন জিউস, তাকে প্রস্তরিভূত রূপ দিয়েছেন ফিদিয়স।"

বাঙালি জাতি ও নতুন সংস্কৃতিসাধনা

আমাদেরও আশা, বাঙালি ঐতিহ্যের মুক্তিস্নানে পবিত্র নতুন শিল্পী ও বাঙলাদেশের লেখকদের হাতে এই সমষ্টির মানবমহিমা শিল্পে বিম্বিত হবে। লোকায়তিক জীবনধারার মধ্যেই আছে ব্যক্তিমুক্তিস্নানের পতিতপাবনীপ্রবাহ। আর সেই পথেই আছে সর্বশেষ বিচারে "genuine appropriation of human essence by and for man···" সেই পথেই হবে মার্কস যেমন বলেছেন "true dissolution of the conflict between existence and essence."

যে বিপুল মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হলো ও শেষপর্যন্ত সফল হলো, কেবল তারই রূপায়ন মহৎ সাহিত্য শিল্পের জন্ম দিতে পারে। বাঙালি উপন্যাসকার আবশ্যিক অর্থেই চোখ ফেরাবেন লোকায়ত ও জীবনঘনিষ্ট শ্রমজীবীর দিকে, অথচ সে মানুষটিও আর আগের মানুষটি নেই। নির্বাচন, অসহযোগ, সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্নিশীর্ষে উত্তীর্ণ হয়ে রাষ্ট্রীয় রূপ বদলে দেবার মধ্য দিয়ে নিজেও সে বদলে গেছে। সামন্ততন্ত্রের বন্ধন ছিন্ন করে এ মানুষটির সাধ—শ্রেণীদ্বন্দ্বের জীর্ণ অচলায়তনে ব্যক্তিত্ব চূর্ণকারী অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতা থেকে মানবিক সৌন্দর্যের সীমাহীন অন্তঃসারের দিকে অভিযাত্রা। বাঙলাদেশের লোকায়ত জীবনচেতনায় উৎপাদনভিত্তিক ও মানবকেন্দ্রিক যে সাংস্কৃতিক অভি-ব্যক্তি কয়েকধাপ শোষণ-শাসনের শক্ত আচ্ছাদনের নিচে নিজ নিয়মে প্রধাবিত ছিল, বুর্জোয়া কলোনিয়ল শিক্ষাব্যবস্থা বুদ্ধিজীবীকে যার প্রতি চোখ ফেরাতে দেয়নি, এবার বাধারহিত সেই প্রবাহ জীবনের কূলছাপিয়ে বাধাবন্ধহীন উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়বে। এই সাংস্কৃতিক উদ্দীপনে বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক সমাজচিন্তা ও মানবিকতার বেগবান ধারা স্বাভাবিক ভাবেই যুক্ত হলে, বাঙালি রচনা ক্লাসিকের

জন্ম দেবে। কেননা একটি মহাযুগের পরিসমাপন যখন নবজাগরণের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে যায়, তখনইতো আসে এ-যুগের জীবননির্যাসসহ ক্লাসিক বোধ। বন্ধনজনিত অনন্বয় দূর করে সামাজিক ও ব্যক্তিমুক্তি ব্যক্তির উচ্চতর বিকাশ সমাজসাযুজ্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীর জাতীয়তাবাদ কেবলমাত্র স্বাধীন অর্থনীতি ও রাজনৈতিক রাষ্ট্রেরই পত্তন করবে না, সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তার লোকায়ত জীবনঐতিহ্যকে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। জাতির সংস্কৃতির মধ্যেও তো থাকে দুটি সংস্কৃতি। শোষক ও শোষিতের। উৎপাদনের বিশ্বে শোষক পরগাছা মাত্র। তার সাংস্কৃতিক জীবন তাই সীমাবদ্ধ এবং ক্রমসঙ্কুচিত। শোষিত মানুষের জীবনের উৎপাদনকেন্দ্রিকতা যে যৌথতাৎপর্যে মানবকেন্দ্রিকতার জন্ম দেয়, সেই মানবকেন্দ্রিকতার সামাজিক প্রকাশ গণতান্ত্রিক সমসমাজের মধ্যে বিস্তৃত। লেনিন বলেছিলেন শ্রমজীবী মানুষের আছে এক গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি। একটা পুরো জাতিই যখন সংখ্যাগতভাবে ও গুণগতভাবে শোষিত, এবং স্বদেশী সামন্ততন্ত্র ছাড়া স্বাধীন বাঙলাদেশে যখন প্রত্যক্ষ শত্রু নিশ্চিহ্ন, তখন গণতান্ত্রিক মনুষ্যত্বের উৎসারইতো বাঙলাদেশে দৃষ্টিগোচর হবে। বাঙলা-দেশের লোকগাথা, লোকগীতি, লোকচরিত্র, লোকসাহিত্য, অতিকথা বা মীথ সব কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জীবিত হবে। আমরা কল্পনায় বাঙলাদেশের নতুন কবিতার কথা ভাবতে পারি যা লোকায়ত জীবনের অনুষঙ্গ, মহাকাব্য বীর মহিমার রূপকল্প বা প্রতীকে প্রগতিমুখী মনুষ্যত্বের সঙ্গী হবে। লোক আঙ্গিক ও বিশেষিত আঙ্গিকের মধ্যে এক ধরনের সংগতি বা সমন্বয় লক্ষ্য করা যাবে। এ ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিপুল কার্যকরী ভূমিকা নিতে বাধ্য। এমন কি লোকায়ত-জীবনচেতনা কায়িক ও মানসিক শ্রমের বুর্জোয়াসমাজসঙ্গী বৈপরীত্যকে দূর করতে সাহায্য করবে। লোকায়ত শিল্পীর কায়িক শ্রম ও শিল্পসৃজন একই সঙ্গে সম্পর্কিত। এর ফলে উৎপাদকই গায়ক বা কবি, কবি বা গায়কও উৎপাদক। এই গণতান্ত্রিক বস্তু ও মানস ব্রহ্মাণ্ডের অংশীদার হতে পারলে বুদ্ধিজীবী লেখকেরও অর্গলমুক্তি ঘটবে। পণ্য উৎপাদনভিত্তিক, মূলধন-নিয়ন্ত্রিত সাহিত্য বা শিল্পকর্মের সঙ্গে তাদের আর সম্পর্ক রাখার কারণ থাকবে না। নাটক চলচ্চিত্রেও নতুন সাংস্কৃতিক ও বৈপ্লবিক পরিণতির পক্ষে এই পরিস্থিতি বড়ই অনুকূল।

পশ্চিম বঙ্গের সাম্প্রতিক সংস্কৃতি ও বাঙলাদেশ

সমভাষাভাষী বলে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক শিল্প সাহিত্যের প্রতি তরুণ বাঙালি বুদ্ধিজীবীর অনুরাগ জন্মানো স্বাভাবিক। বিশেষভাবে পূর্বতন শাসনব্যবস্থা কৃত্রিম বাধা-নিষেধের পাহাড় বানিয়ে ওদেশ ও এ-রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক ব্যবধান সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়েছে। হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভব আজ প্রায় দেড়শ বছর। এঁরা প্রথম যুগে (১৭৯৩-১৮৮৫) ছিলেন নিজ সমাজের উচ্চকোটি অবস্থানের স্থায়ী ব্যবস্থার বিরোধী এবং ইংরেজের সহযোগী। দ্বিতীয় যুগে (১৮৮৬-১৯০৫) ছিলেন ইংরেজি শাসনে যোগ্য অংশীদার হবার জন্য আবেদন-নিবেদন অর্থী। তৃতীয় যুগে (১৯০৫-১৯) ছিলেন নিয়মতান্ত্রিকতা ও সন্ত্রাসবাদে দোলায়িত। চতুর্থ যুগে (১৯২০-১৯৪৭) ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত ও গণআন্দোলনে বিশ্বাসী। বর্তমানে (১৯৪৭—) পুঁজিবাদসৃষ্ট অনন্বয়ের ফলে একদিকে বিপ্লবী অন্যদিকে ব্যাপক অংশ আত্মরক্ষার তাগিদে যে-শাসন ও ব্যবস্থা তাদের আর্থিক সুবিধা দান করতে পারে তারই অনুবর্তী এবং এই বিচারে চূড়ান্তভাবে দোদুল্যমান ও অনন্বয়িত। পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীসহ নানা ধরণের অনুৎপাদক মধ্যশ্রেণী এ-রাজ্যের মোট আয়ের প্রায় ত্রিশ শতাংশ আত্মস্থ করে। এঁরাই এ-রাজ্যের শিল্প-সাহিত্য উপভোগ করেন। মনোপলি প্রেস ও প্রকাশন সংস্থাগুলি সাহিত্য শিল্পগত পণ্য উৎপাদন করে এবং তাদের প্রয়োজন অনুসারে লেখকের মূল্যও তারা নির্ধারণ করে। পশ্চিমী পুঁজিবাদের অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত হয়ে এ রাজ্যের সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা রুচি নিয়ামকেরও ভূমিকা নিয়েছেন। "Now-a-days consumers no longer act on their own free will. The demand curve is no longer the product of spontaneous wants. It is manufactured·· The consumer is 'brain-washed'...the process of consumer's brain washing has become a branch of psychoanalysis. Consumer wants are no longer a matter of individual choice. They are mass produced [A. Hansen. Consumer Record 1960] এ-দিক দিয়ে এ-সাহিত্যশিল্প আঙ্গিকে বিপুল বৈচিত্র্য আনলেও মানবকেন্দ্রিকতা বা মানুষের essence বিষয়ে নিরাসক্ত থেকে বিকৃত existence-এর কথাই বলে। আবশ্যিক ভাবে বাঙলাদেশের বাঙালি লেখকেরা উল্লিখিত প্রথম চার যুগের

শিল্পীদের কাছে অনেক কিছুই পেতে পারেন, এবং তাঁরা তা পেয়েছেনও বটে। কেননা বিভাগপূর্ব ভারতভূখণ্ডে ঐ চারিটি ধারার উত্তরাধিকারী আমরাও যেমন, তাঁরাও তেমনি। কিন্তু বিভাগোত্তর ভারতে, এই পশ্চিমবঙ্গের পুঁজিবাদী বিকাশের বিকৃত চাপ শিল্পসাহিত্যকে বন্ধ্যা করেছে। অপরদিকে নতুন ভাবে পরাধীন বাঙালি বুদ্ধিজীবী চারটি স্তর দ্রুত পার হয়ে গেছেন মানসিকতায়। দ্রুততম গতিতে প্রবেশ করেছেন এক স্বাধীন সার্বভৌম জাতিবিকাশের কালসন্ধিতে। অথচ যে দেশ তাঁরা গড়ছেন, পুঁজিবাদী পাষাণচাপ সে দেশে এখন অনুপস্থিত। বরং পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ততন্ত্র-একচেটিয়া পুঁজির যুগে, যে বুদ্ধিজীবীরা কিঞ্চিৎ অর্থানুকুল্যের ভাগীদার হয়েছিলেন তাঁরাও বর্তমানে নিষ্প্রভদ্যুতি হতে বাধ্য। আমাদের এ দেশে এ ধরণের বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশীদাররা কিছুটা সন্দিহান হলেও, একেবারে দালালের পর্যায়ে এঁদের সবাইকে ঠেলে দেওয়া হয়নি। এ হলো পুঁজিবাদী বিকাশেরই পরিণাম যার ফলে সৎ মানসিকতার সাহিত্যিকও কেবলমাত্র টিকে থাকার প্রয়োজন দুর্যোধনের শিবিরে দ্রোণাচার্য হতে বাধ্য হন। বৃহৎ মনোপলি প্রেস নিয়ন্ত্রিত জনপ্রিয়তা—লেখকের সৃজনীশক্তিতে রক্তমোক্ষণ ঘটায় এবং ক্রমাগত শূন্য করে দেয়। এমন কি তাঁদের সামনে লোভের টোপ ফেলে তাঁদের আদর্শচ্যুত করে থাকে। তারপর মনোপলি রচিত নতুন হাওয়ার ধাক্কায় এঁরা আস্তাকুঁড়ে চলে যান। সাহিত্যসেবা ও সাংবাদিকতার মধ্যে মনোপলি প্রেস ব্যবধান দূর করে, মালিকগোষ্ঠীর মুনাফা শিকারের অসহায় শ্রমিকে তাঁদের পর্যবসিত করে। এরই বিপ্রতীপে আছেন সমাজতন্ত্রী ঘরানার লেখক-শিল্পীবৃন্দ। এঁরা ক্রমাগত বাঁধ তুলে এই মনোপলি পণ্যের অন্তঃসার-শূন্যতা প্রমাণ করে নতুন জীবনধর্মী শিল্পের সৃজনপ্রয়াসী। উপচিকীর্ষার ভেক নিয়ে মনোপলি প্রেস বাঙলা দেশের গণতান্ত্রিক মানসিকতা চূর্ণ করা এবং জীবনবিরোধী ভাবাদর্শ আমদানির প্রচেষ্টা চালাবেই। এখন তারা সুধীর বিনয়ী বাঙলা দেশ-এর নামে প্রায় মূর্চ্ছা যায়। এক সময় যেমন বর্ণাড শ লিখেছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-সম্পর্কে অনেকটা প্রায় তেমনিই। পুঁজিবাদীদের চরিত্রই এমনি "As the great champion of freedom and national independence, he conquers and annexes half the world, and calls it Coloni zation. When he wants a new market for his adulterated Manchester goods, he sends a missionary to teach the natives the Gospel of Peace. He fights you on patriotic

principles, he robs you on business principles". (The Man of Destiny) এঁরা সংস্কৃতির নাম করে পতাকা নিয়ে এগোয়, পেছনে থাকে পুঁজির থলি, শোষণ ও মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী ক্রিয়াকর্মের ওস্তাদের দল। ভারত ও দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে বাঙলাদেশ রাষ্ট্র ভূমিকা গ্রহণ করবে। কিন্তু পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বশংবদ পশ্চিমবঙ্গের মনোপলি প্রেসের হুকুমবরদারদের সম্পর্কে সচেতন হতে হবে বাঙলাদেশের আধুনিক বুদ্ধিজীবীকে। সমাজতন্ত্র ও নতুন সংস্কৃতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ বাঙলাদেশ সরকারের এ বিষয়ে দায়িত্ব খুবই বেশি।

নতুন সংস্কৃতির যথার্থ বন্ধু

বাঙলাদেশের আর্থনীতিক পুনর্গঠন ও বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক সামন্তশ্রেণী দুর্বল হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদ পরাস্ত হয়েছে, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ রণক্ষেত্রে রাজনীতিগতভাবে পরাজিত। পুনর্গঠন ও বিকাশের সহায়তা দেবার নাম করে সাম্রাজ্যবাদীরা মূলধন রপ্তানির চেষ্টা চালায়, পি এল. ৪৮০-এর টাকায় বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক লবি কিনে থাকে ; ভারি শিল্প, যন্ত্র-উৎপাদনী শিল্প ও স্বনির্ভর অর্থনীতি গঠনের তারা পরিপন্থী হয়। এভাবেই তারা নতুন কায়দায় বাঙলাদেশে ফিরে আসার চেষ্টা চালাবেই। সুতরাং স্বনির্ভর ও স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়োজনে বাঙলাদেশের সামনে বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নিঃশর্ত সহায়তা। ইতিমধ্যেই তা সৌভ্রাতৃত্ব-মূলক অঙ্গীকার ও নানা চুক্তির সাহায্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। এ-তো গেল অর্থনীতির কথা। আর্থনীতিক পুনর্গঠন ও বিকাশের পাশাপাশি বাঙলাদেশে ব্যাপকভাবে শুরু হবে গণতন্ত্রীকরণ। মুক্তিসংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে তা ইতিমধ্যেই বহুদূর ব্যাপকভাবে প্রসারিত। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, এ গণতন্ত্রীকরণের ভিত্তি হলো তলা থেকে বিকশিত গণতন্ত্র—অর্থাৎ কৃষি-ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের বিলোপ, যার অন্যনাম গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় ও ভাবাদর্শগতভাবে নতুন জীবনচেতনার উদ্বোধন অনেকখানিই বুদ্ধিজীবীদের আপ্রাণ প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকতে বাধ্য। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আর্থনীতিক সহযোগিতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সহযোগিতা এখানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। কমিটমেণ্টে বিশ্বাসী সাহিত্য-শিল্পই জীবনের

সারাৎসারকে এবং গণতান্ত্রিক মানব-অন্বেষাকে আত্ম রূপভাত করতে পারে।

সদ্যস্বাধীন বাঙলাদেশে বর্তমানে অবশ্যই একধরনের জাতি-শ্লাঘা ভিত্তিক সঙ্কীর্ণ আবেগ দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ বাইরে থেকে কোনো কিছুই নেবার নেই, বা নেবার প্রয়োজন নেই। বিশেষভাবে বাঙালি সংস্কৃতিকে অগ্রাধিকার দেবার প্রশ্নটি যখন মুক্তিসংগ্রামে অনুঘটকের কাজ করেছে। কিন্তু সত্যকারের গণতান্ত্রিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সঙ্কীর্ণতা ক্ষতিকর হবে। তাই অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাও কাজে লাগানো সম্ভব, উচিতও। বিশেষভাবে সোভিয়েতের অভিজ্ঞতা ও সমাজতন্ত্রী শিবিরের অভিজ্ঞতা এখানে সৃষ্টিশীল তাৎপর্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। মধ্য এশিয়ার দেশগুলি কিভাবে আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিশ্বের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে, তার অভিজ্ঞতা বাঙলাদেশকে নতুন জীবনব্রতে বহুবিধ সৌভ্রাতৃত্বমূলক শিক্ষা দিতে পারে। বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক মানবিকতার আদর্শবিশ্বাসী শিল্পীদের অভিজ্ঞতাও এ পরিপ্রেক্ষিতে খুবই মূল্যবান। ব্রেশ্‌ট্, আরগঁ, এলুয়ার, নেরুদা, ল্যাক্সনেস প্রভৃতি নাট্যকার-কবি-লেখক—যাঁরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও সমাজতান্ত্রিক অভিব্যক্তিকে কার্যকর করেছেন তাঁদের কাছেও বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী অনেক কিছুই পেতে পারেন। স্বদেশী লোকায়ত মানসিকতার আধুনিক তাৎপর্যে গণতান্ত্রিক মুক্তি, সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা এবং অ-সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের গণতান্ত্রিক শিল্পীকুলের অভিজ্ঞতা—এতগুলি উৎস থেকে বাঙলাদেশের শিল্পী লাভবান হতে পারেন। এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাও মিলিয়ে নেওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক মানব-চেতনা-বিধৃত সাহিত্য—যা প্রথম চারটি ধাপের পর স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কেবলমাত্র মুক্তবুদ্ধি গণতান্ত্রিক চৈতন্যে উদ্ভাসিত কিছু রচনায় এবং বামপন্থী ও প্রগতিশীল সাহিত্যের মধ্যেই বিকশিত হয়ে জীবিত ও প্রসারিত আছে—বাঙলাদেশের বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্যের সঙ্গে এই প্রগতিশীল সাহিত্যই সম্পর্কিত। বাঙলাদেশের জীবনধর্মী সাহিত্য-শিল্পের সংস্পর্শে এসে যেমন এই ধারাটিরও পুনর্জীবন ও বিভাসন হবে, তেমনি এঁদের অভিজ্ঞতাও বাঙলাদেশের রূপকারদের কথঞ্চিৎ উপকার করতে পারে। জীবনধর্মী কোনো অভিজ্ঞতাইতো আর মানবতাবিশ্বাসী বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীর কাছে দূরের নয়।

"এই বাঙলায় তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা"

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

বাঙলাদেশের মানুষের জীবনে আবার ঈদ এসেছে। কিন্তু সেই খুশি কোথায় মানুষের মনে? উৎসবে মত্ত হতে পারেনি এবার বাঙালি। বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়ে বলেছেন, "এবারে কোরবাণী বন্ধ করো। অনেক গরুছাগল মরেছে, আর নয়"। বাঙলা একাডেমীর সেলিনা হোসেন বলছিলেন, "আমরাও তো ওদের কাছে গরুই ছিলাম। সত্যিই অনেক কোরবাণী হয়েছে। বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করেছে, আর নয়, আর নয়।···কিন্তু আমার ভালোবাসার মানুষ, তাকে তো আর কোনোদিন ফিরে পাব না। আমার পাশের বাড়ির বউটির চোখের জল তো আর শুকোবে না। সারা জীবনের সমস্ত ঘণ্টা অপেক্ষা করলেও সেই "একঘণ্টা"তো আর শেষ হবে না—ওর স্বামী তো আর কোনোদিন ওকে আদর করবে না। সুইডেনের যে মেয়েটি বাঙালিকে বিয়ে করে বাঙলার বউ হয়ে ঢাকায় এসেছিল সে তো চিরদিনের মতো বাঙলাদেশ ছেড়ে চলে গেল"।

সেলিনা হোসেন। ছেলেমানুষ মেয়ে। মাত্র ২৭ বছর বয়স। ছোট ছোট দুটো মেয়ের মা। এখনও হাসে, গল্প করে, কাউকে কাছে পেলে ছাড়তে চায় না। ওকে দেখে মনে হয়েছিল "বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি···"। স্বামী মারা গেছেন—পাক জল্লাদের হাতে নয়, আল বদরের হাতেও নয়; এত রক্ত এত হত্যা সহ্য করতে না পেরে তিনি মারা গেছেন—বাঙলাদেশ স্বাধীন হবার পর। সেলিনার এটাই সবচেয়ে বড় দুঃখ। ও বলছিল, "সব ঝড় ঝাপটা ধকল সয়ে সয়ে বেঁচে রইলাম, আর তারপর কিনা ও কোথায় চলে গেল! ২৫শে মার্চ রাতে গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম আমরা দুজনে। বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে। রাস্তায় ভারী বুটের শব্দ। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি ঘরে ঢুকে পড়ল। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ নিজে শুনতে পেলে ভয় পাচ্ছি। ভয় পাচ্ছি অবুঝ মেয়ে দুটো না কেঁদে ওঠে। বাঁচলাম।

রাতটা কেটে গেল। সকালবেলা দুজনেরই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে

মনে হয়েছিল বয়সটা অনেক বেড়ে গেছে। পরদিন কার্ফ্যু। তারপর দিনও। ২৭শে কয়েকঘণ্টার জন্য কার্ফ্যু তুলে নেয়। আশ্চর্য! আমার স্বামী আমাকে নিয়ে রাস্তায় বেরলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আজ রাস্তায়? বললেন, বাড়িতে লুকিয়ে থাকব কেন, চলো দেখে আসি আমাদের কোন বন্ধুদেব মারলো। তুমি তো গল্প উপন্যাস লেখো। যাদের দেখে আসব আজ, তাদের কথা লিখবে না?……রাস্তায় চলছি! একি! মানুষকে এভাবে মারতে পারে? রাস্তায় বাজারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র মরা মানুষের মিছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে পড়তে পারছিলাম লাল রক্তে লেখা স্বাধীন বাঙলার কথা। রাস্তায় বেরিয়েছেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক শহীদল্লা কায়সারও। আমাদের রাস্তায় দেখে জোর করে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

……তারপর দীর্ঘ ন'মাস ঢাকা ছেড়ে কোথাও যাইনি, এ বাড়িও ছাড়িনি। কাজ করতে গেছি রোজ বাঙলা একাডেমিতে। প্রথম প্রথম খুবই ভয় করত, তারপর আর তাও করত না। আল বদরের লোক আমাদের খুঁজতে এসেছে। পায়নি। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে পাকসেনারা ভারী বুটের শব্দ তুলে হেঁটে গেছে। আল্লার দোয়া বাড়িতে ঢুকে আমাদের খতম করে দেয়নি। রোজই মনে হতো আজ বোধহয় আমাদের শেষ করবে। এক একটা রাত কাটত, মনে হতো একটা দিন তো বাঁচলাম।

তারপর একদিন আল বদরের ছেলেরা এসে আমাদের পাশের বাড়ির দুই বন্ধুকে ধরে নিয়ে গেল। তাঁরা আর ফিরে এলেন না। তারপর শুনলাম শহীদুল্লা কায়সার, মুনীর চৌধুরী, ডঃ রাব্বি এঁদের সবাইকে নিয়ে গেছে। এঁদেরও আর ফিরে পেলাম না। পালিয়ে পালিয়ে আমরা বেঁচে আছি। মনে হতো বেঁচে থাকাটাই যেন কঠিন, মৃত্যুটা অনেক সহজ। একটা কথা প্রথম থেকেই মনে হতো, বাঙলাদেশ এবার স্বাধীন হবেই। এ বিশ্বাস ছিল বাঙলার সমস্ত সাধারণ মানুষেরও। এ বিশ্বাসই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। দেশ স্বাধীন হলো। অবরুদ্ধ নগরী ঢাকা মুক্ত হলো। শুনলাম, সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার জয় সম্বন্ধে এত সুনিশ্চিত ছিলেন যে, বিজয়ের পর 'সংবাদ'-এর প্রথম সংখ্যার জন্য সমস্ত খবর তৈরি করে সাজিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু 'সংবাদ'-এর সেই সংখ্যা দেখার জন্যে শহীদভাই রইলেন না। ১৪ই ডিসেম্বর, স্বাধীনতার দুদিন আগে, পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলেন শহীদভাই। আর ন'মাস ধরে পাক জল্লাদরা যার সাহস কেড়ে নিতে পারল না, মনের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করে

যিনি বেঁচে রইলেন, ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত, মনের সমস্ত শক্তি হারিয়ে, ৫ দিনের মধ্যে আমার সমস্ত খুশিকে ভাসিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন”।

২৭শে জানুয়ারি ছিল ঈদ। সেদিন রাতে নিমন্ত্রণ ছিল ইকবাল আমেদের বাড়িতে। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের সংস্কৃতি সম্পাদক এবং সংস্কৃতি সংসদের সহসভাপতি। তার প্রধান অপরাধ সে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। ভারী মিষ্টি গলা। জুন মাসে পাক সেনারা একদিন মাঝরাতে বাড়িতে হানা দিয়ে ইকবালকে তুলে নিয়ে যায়। আর এই তো সেদিন ১৭ই ডিসেম্বর বাঙলাদেশ স্বাধীন হলে মুক্তিফৌজ ওদের জেল থেকে বের করে আনে। ইকবালের আম্মা এবং আব্বা বলে উঠলেন, “জেলে কি শুধু ওরাই ছিল, আমরা সবাই একটা বিরাট জেলের মধ্যে অবরুদ্ধ ছিলাম। এক অর্থে আমাদের অবস্থা ওদের চেয়েও খারাপ ছিল। তখনকার মনের অবস্থা কি আজ আপনাদের কথায় বোঝাতে পারব? সে যে কী দিন গেছে তা একমাত্র আল্লাই জানে, আর আমরা জানি!

“২৫এ মার্চ রাত ১২টায় যা শুরু হলো তা আমরা প্রথমে বুঝতেই পারিনি, যখন বুঝলাম তখন মনে হলো এসব মানুষের কল্পনারও বাইরে। বেঁচে রইলাম এটাই একটা আশ্চর্য। বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকতাম। রাত হলেই কেমন যেন একটা আতঙ্ক হতো। নিজেদের চেয়েও ভয় হতো ছেলেদের জন্য। লড়াই তো করিনি, রাত হলে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতাম, তবু মনে হতো এবারে আমরা জিতবই। জানালা একটু ফাঁক করে বাইরে কাউকে পাহারায় বসিয়ে শুনতাম—‘আকাশবাণী’ কলকাতা এবং ‘স্বাধীনবাঙলা’ বেতার কেন্দ্র থেকে খবরাখবর। তারপর জুন মাসের একরাতে ঘুম ভেঙে গেল দরজায় দমাদম বুটের লাথিতে। রাত তখন আড়াইটা। নিরুপায় ভাবে দরজা খুলে দিলাম। ঝড়ের মতো খান সেনারা ঢুকে পড়ল ঘরে। চোখের উপর দিয়ে মারতে মারতে আমার তিন ছেলেকেই, আর এক ভাইকে নিয়ে গেল। বাড়িতে রইলাম আমরা দুজনে।”

ইকবালের মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনি তখন কি করলেন?” বললেন “বিশ্বাস করবেন না ভাই। ওরা চলে যাবার পর আমার প্রচণ্ড ঘুম পেল শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘণ্টাখানেক পর ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ মনে হলো, আমার কোনো ছেলেই তো আর ফিরে আসবে না। তাহলে? কেমন যেন বোবার মতো হয়ে গেলাম।” ওর বাবা বললেন,, “শোকে দুঃখে আমরা কিরকম পাথর

হয়ে গেছলাম। স্মৃতিশক্তিটা প্রায় হারিয়ে ফেলেছি। কত পুরনো চেনা লোক হয়তো, কিছুতেই নাম মনে করতে পারি না। দুদিন পরে আমার দুই ছেলে আর ভাইকে ছেড়ে দিল, কিন্তু ইকবাল ছাড়া পেল না। কতকিছু শুনতাম মার খেতে খেতে ইকবাল পাগল হয়ে গেছে; কানে এমন প্রচণ্ড মেরেছে যে কালা হয়ে গেছে; শুনতাম আর ভয় করত। প্রথম যেদিন ওকে দেখার অনুমতি পেলাম সেদিন বুঝলাম ও বেঁচে আছে। সেটা সেপ্টেম্বর মাস। প্রচণ্ড ভয়ে দুরু দুরু বুকে জেলে গেলাম। আমরা দুজনেই ভাবছি বেঁচে তো আছে কিন্তু কি জানি হাত পা সব ঠিক আছে কিনা! কিন্তু একথা ভরসা করে পরস্পর পরস্পরকে বলতেও পারছি না। বাড়িতে কতবার মিলিটারি এসে শাসিয়ে গেছে। আর প্রত্যেকবার ভেবেছি এবারেই বুঝি শেষ করে দেবে। এই ক-মাস অফিস ছাড়া আর কোথায়ও যাইনি। এ শুধু কারাগার নয় কারাগারে আমাদের আটকে রেখে জল্লাদরা খাঁড়া উঁচিয়ে আছে। এইভাবে মৃত্যুকে সামনে রেখে ন'মাস এখানে থেকেছি। এ যে কি যন্ত্রণা তা বোঝাতে পারব না।........."

শাঁখারি পট্টি—হিন্দুদের বাস এখানে। এখানের মানুষেরা জীবিকা অর্জন করে প্রধানত শাঁখা তৈরি করে। ২৭শে জানুয়ারি দুপুরে গেলাম শাঁখারি পট্টিতে। দুপাশে গায়ে গা লাগিয়ে উঁচু উঁচু বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে সরু গলির মতো রাস্তা, মোড়েই জগন্নাথ কলেজ। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। একটা ঘর করেছিল বধ্যভূমি—যেখানে মেয়েদের হার, চুড়ি, বালা, চুলের গোছা পাওয়া গেছে। রাস্তা দিয়ে দুপাশের পোড়া বাড়ি দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপের সামনে এক ভদ্রলোক দাঁড়ানো। নমস্কার করে নাম জিজ্ঞেস করলাম। নাম ননীগোপাল দত্ত, বাড়ির মালিক। উল্টোদিকে একটা বড় সাইনবোর্ড, বড় বড় করে লেখা আছে 'স্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী'। সেটাও একটা ধ্বংসস্তূপ। সাইনবোর্ডটা না থাকলে বুঝতে পারতাম না এখানে একটা লাইব্রেরি ছিল। ননীগোপালবাবু বললেন "পরিবার কলকাতায় আছে। ২৭শে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে পাক সেনার তাড়া খেয়ে পালিয়েছিলাম। এখন দেখতে এসেছি বাড়িঘর কিছু আছে কিনা? শাঁখারি পট্টির সবচেয়ে ধনী লোক আমি। এই বইয়ের দোকান কত পুরনো। সমস্ত সৌখীন জিনিস আমার ঘরে ছিল"। আর আজ? পরিবার-কে এনে কোথায় তুলবেন তা ভাবতে গিয়েই তিনি দিশেহারা। একখানা ঘরও

আস্ত নেই। দোতলা বাড়ি, নিচে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার আকাশ দেখতে পাচ্ছি বোমা ফেলে বিরাট গর্ত করে দিয়েছে। ইঁট বালি সুরকি জমে স্তূপ হয়ে আছে আর সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন একদা বাড়ির মালিক। বলছিলেন "শাঁখারি পাড়ার হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও কিছু করতে পারেনি। আর এবার? খানসেনারা আমাদের ঘরে ঢুকতে সাহস পায়নি, তাই বাইরে থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাড়ি জালিয়ে দিয়েছে। ২৫শে ২৬শে সাহস করে এখানে ছিলাম, তারপর আর পারলাম না, সব বাড়ি ঘর খাঁ খাঁ করছে। ক'দিন ধরে আমাদের খাওয়া নেই, ঘুম নেই। ভাবছি সকালে কিছু খাওয়া দাওয়া করে কিছু টাকাপয়সা নিয়ে পালাব। দেখতে না দেখতে খানসেনারা তাদের বিহারী বন্ধুদের সাহায্যে আমার বাড়ি ঘেরাও করল। খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠল। পায়খানা দিয়ে পালালাম। ছাদ দিয়ে ছাদ, এরকম করে করে ২৩ নং বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সেখানে আমরা প্রায় জনদশেক। লুকিয়ে আছি। সেখানেও ঢুকল বিহারীরা। ভগবানের দয়া আমাদের খুঁজে পেল না। তারপর ওখান থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিই তাঁতিপাড়ায়। প্রায় ২০০ লোক এক বাড়িতে। বেঁচে গেলাম। ওখানেই শুনলাম, আমার লাইব্রেরি পুড়িয়ে দিয়েছে। ভাবলাম যাই দেখে আসি। এক মুসলমান ভাই বাধা দিলেন। তারপর কলকাতা এলাম। কদিন হলো ফিরেছি, বলতে পারেন এ কোন শ্মশানে ফিরে এলাম"? উত্তর মিলবে কি?

কলকাতা থেকে রওনা হবার আগের দিন বইয়ের দোকানে চোখে পড়ে একটা বই—'বন্দী শিবির থেকে'—শামসুর রাহমান। টুকরো টুকরো যে সব খবর আসত মাঝে মাঝে, তাতে এটাও একটা খবর ছিল। শুনেছিলাম কবি তাঁর ১৪টি কবিতা এক মুক্তিযোদ্ধার হাতে কলকাতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই চৌদ্দটি কবিতাই 'বন্দী শিবির থেকে'। ঠিকই করেছিলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করব। ২৭শে সকালটা কেটেছিল কবির সঙ্গে গল্প করে। বড় ভালো লেগেছিল। দরজার কড়া নাড়তেই এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, উজ্জ্বল দুটো চোখ। আমাদের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি শামসুর রাহমান"। নতুন ঢাকার বাসিন্দা নন তিনি, ঘর তাঁর নয়াবাজারের পাশে, যে নয়াবাজার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ আগুনের আঁচ এখনও তাঁর চোখে মুখে। কোথায় যেন একটা ভয়, একটা আতঙ্ক আছে। বলছিলেন, "আমি তো মেয়ে মানুষ নই, ভীতুও নই, তবু মাঝে মাঝেই

রাতে চিৎকার করে উঠেছি। মনে হয়েছে দরজায় বুঝি সবুট পদাঘাত, সেনারা এল, এবারই মারবে। ঘুম ভেঙে উঠে দেখি—না কিছু না। কি ভাবে ছিলাম, আজ আর বলতে পারব না, এটুকু শুধু বলতে পারি—আমি ছিলাম। রোজ একটা করে কবিতা লিখতাম—এগুলোই ছিল আমার সাহস আমার প্রেরণা। মাঝে মাঝে স্ত্রী বলতেন, 'এগুলো পুড়িয়ে ফেলো, এসব পেলে আমাদের তো শেষ করে দেবে'। হেসে বলতাম, 'মরতে তো হবেই, মানুষের মতো মরতে দাও।' মানুষের এমন অমর্যাদা কোথায়ও দেখেছেন? মানুষ তো মরেছে। কিন্তু বেঁচে থেকে যে কি যন্ত্রণা, কি অপমান সহ্য করছে, তা বলা যায় না। ভয়ার্ত জন্তুর মতো মানুষ দৌড়েছে। বুড়োকে দেখেছি উর্দ্ধশ্বাসে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। চোখের সামনে মেয়ে বউকে ধর্ষণ করছে, বাবা, স্বামী চোখের সামনে দেখছে প্রতিবাদ করার সাহসও হারিয়ে ফেলেছে। মা পালাচ্ছে, বাচ্চা পিছনে পড়ে আছে। মনুষ্যত্বের এই অবমাননা আমায় রক্তাক্ত করেছে। আর আমরা যারা পালাইনি, আমরা ছিলাম "নিজ বাসভূমে পরবাসী।"

বললাম, "আপনার কয়েকটা কবিতা পড়ে শোনান"। একটার পর একটা কবিতা পড়ে যেতে লাগলেন। কবির কথা আমার কথায় আর না লিখে, ওঁর কবিতার মধ্য দিয়েই ওঁকে চিনি। সেপ্টেম্বর মাসের ৬ই লেখা একটা কবিতা —'বাজেয়াপ্ত'—

"অতঃপর গণতন্ত্র আসবে এখানে
রাজকুমারের মতো পক্ষীরাজে চড়ে, হাত জীবনের দিকে
ব্যাকুল বাড়িয়ে ভেবে রাতে
ঘুমের বিবরে আমি লুকিয়েছিলুম
মোহন স্বপ্নের লোভে! অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত,
সকালে উঠেই ঘুম ছেঁড়া চোখে দেখি,
বাজেয়াপ্ত শিশুর দোলনা খেলাঘর
বাজেয়াপ্ত মেয়েদের হাসির পূর্ণিমা,
বাজেয়াপ্ত জননীর স্নেহ
বাজেয়াপ্ত তরুণের প্রেম,
... ...
বাজেয়াপ্ত কৃষক মজুর ছাত্র আর বুদ্ধিজীবী
বাজেয়াপ্ত গণতন্ত্র গণপ্রতিনিধি

বাজেয়াপ্ত লাউমাচা. বস্তি, হাট, একদা মুখর সবগলি,

… … … …

বাজেয়াপ্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান

বাজেয়াপ্ত মৌলনা ভাসানী, মণি সিং

…………বাজেয়াপ্ত

বাজেয়াপ্ত

বাজেয়াপ্ত।"

তারপর ?　　তারপর "আমাদের মৃত্যু আসে"—

"আমাদের মৃত্যু আসে ঝোপে ঝাড়ে নদীনালা খালে

আমাদের মৃত্যু আসে কন্দরে কন্দরে

আমাদের মৃত্যু আসে পাটক্ষেতে আলে

গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে

আমাদের মৃত্যু আসে মাঠে

পথে ঘাটে ঘরে……… ….."

ভয় নাই।　　"আমি বন্দী নিজ ঘরে। শুধু

নিজের নিঃশ্বাস শুনি, এত স্তব্ধ ঘর

আমরা কজন শ্বাসজীবী

ঠায় বসে আছি

সেই কবে থেকে। আমি, মানে

একজন ভয়ার্ত পুরুষ,

সে, অর্থাৎ সন্ত্রস্ত মহিলা

ওরা মানে কয়েকটি অতি মৌন বালক বালিকা

আমরা কজন

কবুরে শুদ্ধতা নিয়ে বসে আছি।………"

কিন্তু কোথা থেকে যেন আবার সাহসও খুঁজে পান। পালানোর অপমান তাঁকে পীড়িত করে। দৃপ্তকণ্ঠে তাই বলতে পারেন :

"…তবু আমি যাবো না কখনো

অন্য কোনোখানে।

থাকবো তাদের সঙ্গে এখানেই, বাজেয়াপ্ত হয়েছে যাদের

দিনরাত্রি, যন্ত্রণায় বিদ্ধ হ'য়ে সকল সময় সারিবদ্ধ

মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা যাদের নিয়তি।"

তবুও একটি আত্মপ্রত্যয় জেগে ওঠে। সেই বিশ্বাসই তাঁকে ধরে রাখে নিজ দেশে।

"...সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে,
নূতন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাঙলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা"

মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। অনেকগুলো কবিতা পড়ে, তিনি একটু থামলে, জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনি কি করে লিখলেন এমন কবিতা।" বললেন, "২৫শে মার্চের প্রচণ্ডতা আমাকেও মূক করে দিয়েছিল। প্রায় মাস দেড়েক কোনোকিছু ভাবতেও ভয় পেতাম। কাজ করতাম আমি 'দৈনিক পাকিস্তান' (এখন দৈনিক বাংলা) কাগজে। একদিন কাগজটা ওল্টাতে ওল্টাতে একটি পুরনো ছবি চোখে পড়ে। রাজশাহীতে গোলমাল শুরু হয় ওরা মার্চ। গুলি গোলা চলে। অনেকে নিহত হন। ছবিটি (ফোটোগ্রাফ) ছিল একটি ছেলে গুলি খেয়ে পরে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে, বাঁচবে না মনে হয়। এই মৃতপ্রায় ছেলেটি তার দেহের রক্ত দিয়ে পাশের দেয়ালে লিখছে 'স্বাধীন বাংলা'। ছবিটি আমায় তখনও মুগ্ধ করেছিল। এখন এই ছবি নতুন মানে নিয়ে আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে দিল। ভাবলাম, লোকটা তো যে কোনো মুহূর্তে মরে যাবে। সে যদি মারা যাবার আগে, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নিজের রক্ত দিয়ে 'স্বাধীন বাংলা' লিখতে পারে, তবে আমি কেন কবিতা লিখতে পারব না? আমি তো এখনও বেঁচে আছি। শুরু করি কবিতা লিখতে। এই কবিতাই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে—আমি বেঁচে আছি এই কবিতার প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে"।

বসির মিয়ার ছেলের পাঁজর

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

খুলনা সহরের চিঁড়ে-মুড়ির দোকানদার কানাই দাস মহাশয় সমীপেষু—

চোখ বুজলেই মনে পড়ে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আপনি বসে আছেন রিকশার ওপর। পরনে নীল লুঙ্গি। সাদা হাফ সার্ট। এক গাল দাড়ি। চোখদুটো গর্তের ভেতর। চোখদুটোর কথাই মনে পড়ে সবচেয়ে বেশি। আপনি তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে। কিন্তু আমাকে দেখছিলেন না।

কাঁচা রাস্তার ওপর আপনার রিকশার হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। আমাদের একদিকে রেডিও সেণ্টার। আকাশে লম্বা শুঁড় তুলে নির্জনে দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে সেই খালটা, ভৈরবের সঙ্গে যার যোগ। জোয়ার-ভাটা খেলে। আমাদের চারপাশে ধূ ধূ মাঠ। মাথার ওপরে বিশাল আকাশ। তার একপাশে লাল আভা। সূর্য ডুবে যাচ্ছিল। অন্যপ্রান্তে রূপোলি ভাব। পুবদিকে। আর আমাদের চারদিকে, পথে, মাঠে, খালের পাড়ে, সর্বত্র মানুষের হাড়। হাতের হাড়, পায়ের হাড়, বুকের পাঁজর, মাথার খুলি। দু-একটা কঙ্কালের গায়ে তখনও জীর্ণ শাড়ী জড়ানো। মনে আছে কানাইবাবু? আপনিই তো দেখিয়েছিলেন আমাকে।

'তারপর কি হলো?'

আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিই। আপনি তখন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। পশ্চিম দিগন্তে দ্রুতগামী সূর্যের কাছে। কিংবা হয়তো চুকনগরে যে আমের ক্ষেতে লুকোচুরি খেলতে-খেলতে আপনার ছেলেরা মেশিনগানের গুলি বুকের মধ্যে নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল, সেই ক্ষেতের ওপর দাঁড়িয়ে। অথবা হয়তো ফরিদপুরে আড়িয়াল খাঁর পাড়ে দাঁড়িয়ে আপনি তখন তাকিয়ে ছিলেন ঠাকুরদার আমলে তৈরি আপনাদের বাড়িটির ভগ্নাবশেষের দিকে। আপনি তখন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে।

'তারপর···সবাই বলল, ফিরে যাও। কোনো ভয় নাই। ইণ্ডিয়ান সোলজার আছে। আমার ওয়াইফও ওই ঘটনার পর আর চুকনগরে থাকতে···'

আমি আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে। আপনি বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলছেন। কষ্ট হচ্ছে আপনার। আরও একজনের কষ্ট হচ্ছিল। বসির মিয়ার। আপনার রিকশার চালক। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি। লক্ষ্য করা আপনার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। আপনার কাহিনী শুনতে-শুনতে বসির মিয়া ক্রমাগত তার লম্বা, শাদা দাড়িতে হাত বোলাচ্ছিল। আর বিড়বিড় করছিল, আল্লা, আল্লা, হায় আল্লা!

বসির মিয়ার কাহিনী আপনি জানেন কিনা জানি না। হয়তো আপনার জানাই ছিল। কিংবা পরে জেনেছেন হয়তো! শহরে থাকা যখন অসম্ভব হয়ে ওঠে, জুলাই নাগাদ আপনারা, অর্থাৎ আপনি এবং আপনার আশেপাশের হিন্দুরা যখন চুকনগরের দিকে রওনা হয়ে যান, বসির মিয়ারা-ও শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে যায়। চলে যায়, কিন্তু সবাই পৌঁছতে পারেনি। বসির মিয়া-র এক ছেলেকে ওরা…আপনার বড়ো ছেলের মতোই, যে-ছেলে চুকনগরের আখের ক্ষেতে…দশ কি এগারো…সে অবশ্য মেশিনগানের গুলিতে মারা যায়নি। পাঞ্জাবী পাক-সেনারা তাকে ধরে নিয়ে যায়। ডাগর মেয়ের মতো কচি ছেলেদের দিকেও নজর ছিল ওদের। সে ছেলে আর ফিরে আসেনি।

সেই বসির মিয়াও আপনার কাহিনী শুনতে-শুনতে কষ্ট পাচ্ছিল। লম্বা, শাদা দাড়িতে তার হাত। তিরতির করে নড়া দুই ঠোঁটে আল্লার নাম। দুচোখে ম্লান ভালোবাসা।

আপনি তখন বলেছিলেন, 'এখন আর আমাদের কোনো ভয় নাই। তবু হিন্দু ভাইরা ফিরে না আসা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না। এ-পর্যন্ত কয়েকঘর মাত্র…'

আমাদের চারপাশে তখন গোল হয়ে ভিড় জমেছে। সে ভিড়ে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। মজা দেখার ভিড় নয়। কেউ কথা বলছিল না। কোনো শব্দ হচ্ছিল না। সবাই নত মুখে শুনছিল আপনার কাহিনী। অথচ সেই ভিড়ের প্রত্যেকটি মানুষেরই হয়তো আপনার মতো একটা কাহিনী বলার আছে। নইলে অতো মানুষের হাড় আর শব এলো কোথা থেকে? দুচোখে শোক আর ভালোবাসা নিয়ে অতো মানুষ ওখানে আসছে কেন? অমন মমতা নিয়ে আপনার কাহিনী শোনার প্রয়োজনই বা কি তাদের?

আসলে আপনার দুঃখের মধ্যে ওরা ওদের নিজের বেদনাকে খুঁজে পাচ্ছিল। আপনার কষ্টের সঙ্গে নিজেদের কষ্টকে একাকার করে দিয়ে সমগ্র যন্ত্রণার মধ্যে একটা মহত্ত্ব খুঁজছিল ওরা। যন্ত্রণার সেই নরকের মধ্যে ওই

মহত্বটুকু অনুভব করতে না পারলে যে মানুষ বাঁচে না। ওই মহত্ত্বের অস্তিত্বই জীবনের শক্তি। যে-শক্তি মানুষকে নিজের দুঃখের চেয়ে অপরের কষ্টকে বড়ো বলে মানতে শেখায়। মৃত্যুকে দুহাতে সরিয়ে জীবনকে আনতে শেখায়। কানাইবাবু, বিশ্বাস করুন, সেদিন খুলনার রেডিও সেণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আমি, আপনি, বসির মিয়া এবং সকলেই সেই মহত্ত্ব আবিষ্কার করছিলাম।

এই মহত্ত্বের শক্তির কথা আমার বানানো নয়। বই পড়েও শেখা নয়। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েকঘণ্টা আগে একজন অর্ধশিক্ষিত মানুষের কাছ থেকে জানা। আপনি হয়তো তাকে চেনেন না। মানুষটি যশোর ক্যাণ্টনমেণ্টের আহমেদভাই। আমি তাকে বলি মিয়াভাই।

কানাইবাবু, মিয়াভাই-এর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। তারপর ভাববেন ওই মহত্ত্বের কথাটা আমার মনগড়া কিনা। আর, অনুগ্রহ করে চিন্তা করে দেখবেন, 'হিন্দুভাইরা ফিরে না আসা পর্যন্ত' অস্বস্তি বোধ করার অধিকার আপনার আর আছে কিনা! আপনাকে মানায় কিনা!

দুই

চোখ বুজলেই মনে পড়ে।

তিনটি কিশোরী দৌড়চ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে, রান্নাঘরের পাশ দিয়ে, উঠোন পার হয়ে, ঠাকুরদালান ছাড়িয়ে বারবাড়ি পেছনে ফেলে দৌড়চ্ছে তিনটি কিশোরী। তাদের পেছনে ছোট্ট-ছোট্ট পা ফেলে ছোট্ট একটি ছেলে। কিছুতেই তাল রাখতে পারছে না ওদের সঙ্গে। হরিণীর মতো ছুটছে তিনটি কিশোরী। কলমগাছ ছাড়িয়ে, আষাঢ়ে আমের গাছটা পাশে রেখে, সিঁদুরে আমের গাছটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ওরা পার হয়ে যায় বড়ো রাস্তা। কাঁচামাটির গরুর গাড়ি যাওয়ার পথ। বড়ো বড়ো কুলগাছের তলায় আস্টেলের বন। তা পেরোলেই নদী। ছোট্ট সেই ছেলেটা যখন হাঁপাতে-হাঁপাতে নদীর পাড়ে এসে পেঁছিয়, কিশোরীরা তখন ঝাঁপ দিচ্ছে।

ঝপাং

ঝপাং

ঝপাং

শব্দগুলো তার কানে আসতেই ছেলেটা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। রাগে, হিংসায় আর দুঃখে। তার ঝাঁপানো নিষেধ। সে সাঁতার জানে না।

মিয়াভাই, যশোর কিংবা পূর্ববাঙলা, শব্দটা শুনে চোখ বুজলেই আমার মনে পড়ত এই দৃশ্যটা। ছোট্ট ছেলেটার জন্যে কষ্ট হতো। ওই ছোট্ট ছেলেটা আমি।

এখন বাঙলাদেশ। পূর্ববাঙলা আর নেই। মিয়াভাই, বাঙলাদেশ —শব্দটা শুনে চোখ বুজলেই এখন আমি দেখতে পাই বিশাল প্রান্তরে যত্নে গড়া অসংখ্য শহীদের কবর। আর শুনতে পাই, সেই কবরের আকাশে ভুবন-কাঁপানো অসম্ভব একটা গর্জন। এই গর্জনের নামই বোধহয় বিপ্লব কিংবা বাঙলাদেশ।

মিয়াভাই, যশোর নামটা শুনে চোখ বুজলেই এখন আমি অন্য একটা ঝাঁপ দেওয়ার দৃশ্য দেখতে পাই। তিনটি কিশোরী নয়, ঝাঁপ দিচ্ছে এক জওয়ান। রৌদ্রের উজ্জ্বল আলোতে নীল জলের নদীতে নয়। অন্ধকারের আড়ালে ছাপ দিচ্ছে আখের বনে। কানের পাশে ভেসে যাচ্ছে ঝপাৎ ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দ নয়। রাইফেলের হি-সস্সস্!

মিয়াভাই, বুকের মধ্যে অনেকগুলো ফুটো নিয়ে আপনার বড়োসাহেব মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই আপনি আপনার হাতটা যে ধরে ছিল বড়োসাহেবকে মরতে দেখে আর্দালির প্রতি তার কি তেমন নজর ছিল না কিংবা হয়তো খুন হয়ে যাওয়া প্রৌঢ়ের দীর্ঘ দাড়ির দিকে তাকিয়ে বালুচিস্থান অথবা পাখতুনিস্তান বা পাঞ্জাবে তার নিজের বৃদ্ধ পিতার কথা হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে মনে পড়ে যাওয়ায় বিশ্বাস করুন মিয়াভাই ওদেরও পিতা থাকে পিতারা প্রৌঢ় হন তাঁদের দীর্ঘ দাড়িতেও পাক ধরে তাঁরা ভাবেন এবং তাঁদের বলা হয় তাঁদের ছেলেরা আল্লার এবং দেশের সেবায় অথচ ছেলেরা তখন তাদের নেতা আর সেনাপতিদের নির্দেশে নিজেরই পিতাকে ঘর থেকে বের করে আখের বনের পাশ দিয়ে গিয়ে হাড়ের পর হাড় আর হাড় আর হাড় কিন্তু আপনার উরুর হাড় যখন ভেদ করল গুলিটা তখনও আপনি দৌড়চ্ছেন আচমকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আখের বনে ঝাঁপ দিয়ে মায়ের আঁচলের মতো অন্ধকারের আড়ালে আড়ালে।

কানাইবাবু, চোখ বুজলে আপনিও দেখতে পাবেন, লোকটা পালাচ্ছে। আপনারা যেমন পালিয়েছিলেন ঠিক তেমনি, এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রাম, সেখান থেকে আর এক গ্রাম। লোকটার উরুতে তখনও শীষের গুলি। তাড়া খেতে আর পালাতে পালাতে ঝিকরগাছা নাভারণ বেনাপোল। তারপর মুক্তিফৌজের হাত ধরে বনগাঁ। বনগাঁর হাসপাতালে। সেখানে তখন অসম্ভব ভিড়। রুগী আছে তো ডাক্তার নেই, ডাক্তার আছে তো যন্ত্রপাতি নেই। মিয়াভাই চলে

এলেন কোলকাতায়। সোজা মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে ডাক্তার-নার্স-ছাত্ররা মিলে…

কি আশ্চর্য দৃশ্যটা! চোখ বুজে একবার দেখুন, কানাইবাবু! ওই মেডিক্যাল কলেজের পাশে এবং পেছনে ওই কোলকাতাতেই যে-মুসলমানদের বাস তারা এবং তাদের প্রতিবেশী হিন্দুরা মিলেমিশে বাস করতে-করতে হঠাৎ দাঙ্গা বাধিয়ে মুসলমান মারে, হিন্দু মারে। একটা সময় ছিল যখন বছর-বছর দুর্গাপূজার মতো নিয়ম করে দাঙ্গা হতো। আর সেই মেডিক্যাল কলেজেই কিনা, আল্লাহ্-র 'সেবাইত'দের উপহার একটি শীষের গুলি একজন মুসলমানের উরুর মধ্যে থেকে বের করে তাকে সুস্থ করার জন্যে একদল হিন্দুর ছেলে·· আহ্! কি একটা দৃশ্য! কানাইবাবু, বলুন তো চোখ জুড়িয়ে যায় কিনা!

'মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার বাসুদেব রায়কে নিশ্চয়ই চেনেন?'

আমি চিনি না। কিন্তু সে-কথা বলতে পারিনি। বলা যায় না। কৃতজ্ঞতার এমন সরল ভালোবাসাকে ব্যথা দেওয়া অসম্ভব। জীবনে প্রথম লজ্জা পাই আর আফশোষ হয় একজন মানুষকে চিনি না বলে।

আমি কথা ঘোরাতে চেষ্টা করি। যশোর এখনও এমন ফাঁকা-ফাঁকা কেন? তেরো-চোদ্দদিন হয়ে গেল মুক্তি এসেছে, এখনও…কোর্ট পাড়া ফাঁকা, কোর্টের মধ্যে মসজিদ খাঁ খাঁ করছে, একটা বড়ো গাছের ছায়ায় শ-খানেক লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, মাদারি-কা-খেল চলছে, পারভিনা হোটেল ঝাড়পোঁছ করা হচ্ছে মাছ-ভাতও পাওয়া যাচ্ছে বটে, চারজন তরুণ আনমনে হেঁটে চলে গেল, খুলনা রোডের পাশে বাঁশের বেঞ্চে বসে কাঁচের গেলাসে চা খেতে-খেতে গল্প করছে কয়েকজন কৃষক আর রিক্সাওয়ালা, ক্যান্টনমেন্টের দিক থেকে জন-পঞ্চাশেক লোকের একটা শান্ত মিছিল চলে যাচ্ছে স্টেশনের দিকে, জেনারেল অরোরা আসবেন কপোতাক্ষের ব্রিজ উদ্‌বোধন করবেন, ইণ্ডিয়া থেকে প্রথম ডাক আসছে আজ রেলগাড়ি চেপে।

এইসব সূত্রে আমি কথা ঘুরিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে চাই। মিয়াভাই তবুও বলেন:

'ডাক্তার তো না যেন…আপনারা তাঁকে বলবেন, আমি এখনও রোজ তাঁর কথা…একবার শুধু আমাদের এখানে তাঁকে…'

কথা ঘোরানো যায় না কিছুতেই।

'আপনার ওপর দিয়ে তা হলে খুব গেছে?'

মিয়াভাই লজ্জা পান। তারপর হেসে ফেলেন। বলেন :

'তেমন আর কি? আমার চেয়ে কতো কষ্ট পেয়েছে কতো লোক। তাছাড়া…'

যশোর ক্যাণ্টনমেণ্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসের পাশে, গাছের ছায়ায় বসে কথা হচ্ছিল। মিয়াভাই হঠাৎ উঠে দাঁড়ান।

'আসেন।'

মিয়াভাই হাঁটতে থাকেন। পেছন পেছন আমরা। অফিসের সীমানা ছাড়িয়ে কয়েক পা গিয়েই…

'এদের কথা ভাবেন তো একবার।'

আঙুল দিয়ে দেখান মিয়াভাই। হাড়ের মাঠ। মানুষের হাড়। হাতের হাড, পায়ের হাড়, বুকের পাঁজর। একটা কঙ্কালের পায়ের দিকে তখনও খাঁকি-খাঁকি জীর্ণ একটা প্যাণ্টের আভাস। মিয়াভাই-এর বড়োসাহেবের শরীরের হাডও আছে ওর মধ্যে কোথাও।

'আমারও তো ঐখানেই থাকার কথা।'

সেই মুহূর্তে, যশোরের মাটির ওপর, মাঠজোড়া মানুষের হাড় আর খুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে আমার কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করছিল। অথচ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম রাইফেলের শব্দ আর বন্দুকের বারুদ, মানুষের রক্তের গন্ধ পাচ্ছিলাম বুকের ভেতর। মানুষের শেষ আর্তনাদ। আর, সব কিছু ছাপিয়ে আমার মাথার ওপর বিশাল আকাশ থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম একটা গর্জন। 'এদের কথা ভাবেন তো একবার।' সেই গর্জনই বোধহয় বিপ্লব কিংবা বাঙলাদেশ। কী আশ্চর্য মহত্ব এই উপলব্ধির!

কানাইবাবু. বিশ্বাস করুন, সেদিন খুলনা রেডিও সেণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আমি. আপনি, বসির মিয়া এবং আমাদের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো আমরা সবাই এই মহত্বই ·আবিষ্কার করছিলাম। বিশ বছর ধরে পূর্ববাঙলা এই মহত্বেরই সন্ধান করেছে। সাধনা করেছে। রক্ত দিয়ে। প্রাণ দিয়ে। তারপর একদিন পূর্ববাঙলা —বাঙলাদেশ হয়ে গেছে।

কানাইবাবু, চোখ বুজলেই এখনও আমি দেখতে পাই বাঙলাদেশের দুজন মানুষকে। আপনাকে আর বসির মিয়াকে। আপনি তখন আপনার দোকানের কথা বলছিলেন। আমরা শুনছিলাম। আপনার কথার মধ্যে কি যেন একটা ছিল। আমার মনে হচ্ছিল আপনি একটা চিড়েমুড়ির দোকানের

কথা বলছেন না। অনেক যত্নে গড়ে তোলা একটা মন্দিরের কথা বলছেন। আপনার ভালোবাসার মন্দির।

'সেই ব্যাটাই চালাচ্ছে এখন দোকানটা।'

আপনার দোকান তা হলে খোলা! অথচ একটু আগেই আমি দেখে এসেছি খুলনা শহরের অধিকাংশ দোকানেই তালা ঝুলছে। পিকচার প্যালেসের মোড়ে কয়েকটা দোকান খোলা। সেখানে ঝলমলে আলো। কিন্তু ভেতরের দিকে অনেক দোকানই তখনও বন্ধ।

খোঁজ করতেই জানা গেল কারণটা। আপনিও বললেন। গোলমাল বাধতেই অনেক বাঙালি হিন্দুর দোকান দখল করে নিয়েছিল কোনো কোনো মুসলমান। তাদের মধ্যে বাঙালিও ছিল, বিহারীও। গোলমাল যখন আরো জটিল হলো, আপনারা সব শহর ছেড়ে গ্রামের পথ ধরলেন। কেউ কেউ গ্রাম ছাড়িয়ে চলে গেল সীমান্তের দিকে। হিন্দু-মুসলমান বাছবিচার না করে একদল বিহারী নেমে পড়ল দোকান দখলের কাজে। সব সম্পত্তিই তো তখন তাদের। তারপর যুদ্ধ। তারপর স্বাধীনতা পেয়েই একদল বাঙালি মুসলমান বিহারীদের দোকানপাট আপন করে নিল। মালিক হয়ে বসল। তার মধ্যে পড়ল বাঙালি হিন্দুদের বেদখল দোকানগুলোও।

কিন্তু স্বাধীনতার মানে তখনও বোঝেনি তারা। আর স্বাধীনতা যারা আনল সেই মুক্তিফৌজকেও ভালো করে চেনেনি। মুক্তিফৌজ শহরে পৌঁছে দিনকয়েক সময় নিল সব বুঝতে। তারপরেই, কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে হাতে স্টেনগান নিয়ে সেইসব দোকান থেকে টেনে বের করে দিল বে-আইনি দখলদারদের। ঝুলিয়ে দিল তালা। আসল মালিক এলে, ভাবনাবিচার করে, তাকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে দোকান।

'লোকটা তো আমার চেনা। আগে জামায়েত করত। এখন আওয়ামী সেজেছে।'

'আপনি তাহলে এখন কি করবেন?'

'দেখি। আপোষের কথা চলছে। মনে হয় ফিরিয়ে দেবে।'

'যদি না দেয়?'

আপনি হেসেছিলেন। সেদিন ওই একবারই হাসতে দেখেছিলাম আপনাকে। নিশ্চয়তার হাসি।

'মুক্তি-কে খবর দিলেই মজা টের পাবে বাছাধন।'

সেই মুহূর্তে আমি সব বুঝতে পারলাম।...তবু হিন্দুভাইরা ফিরে না আসা পর্যন্ত যে স্বস্তি পায় না, সে বাঙলাদেশের মানুষ কানাই দাস নয়। পূর্ববাঙলার এক অবহেলিত হিন্দুসন্তান। পঁচিশ বছরের অভ্যাসে ওকথা সে এখনও বলে। একই কথা একই ভাবনা পঁচিশ বছর ধরে তাড়া করে বেড়ানোর পর অমন অভ্যাস আপনা থেকেই গড়ে ওঠে। তারপর যুদ্ধ হয়। বিপ্লব হয়। ভূগোল ইতিহাস অদলবদল হয়ে যায়। পূর্ববাঙলার সেই অবহেলিত হিন্দুসন্তানই অনায়াসে বাঙলাদেশের মানুষ কানাই দাস হয়ে ওঠে। নিশ্চয়তার হাসি হেসে সে বলে, 'মুক্তি-কে খবর দিলেই মজা টের পাবে বাছাধন।'

বসির মিয়া তখন মাথার ওপর লাল আকাশ নিয়ে নমাজ পড়তে বসেছে। মনে আছে কানাইবাবু, আপনার রিকশার পাশেই, হাঁটু গেড়ে বসে...

কিন্তু, বসার জায়গা কোথা ? পায়ে পায়ে হাড়।

মানুষের হাড়। বসির মিয়া দুই হাতে তুলে নেয় একখানা হাড়। সযত্নে সরিয়ে রাখে পাশে। তারপর আর একখানা। তারপর...

আমরা ম্লান দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখি—বসির মিয়া নমাজ পড়ার জায়গা তৈরি করছে।

কানাইবাবু, বসির মিয়াদের ছেলেরা আপনার দোকান পরিষ্কার করে দিচ্ছে। ভালোবাসার দোকানের মতো আপনার চিঁড়ে-মুড়ির দোকান। আর আপনি এখনও বসে আছেন রিক্সার ওপর ? নেমে আসুন। বসির মিয়ার হাত পরের হাড়খানাতে পৌঁছবার আগেই নেমে আসুন। ওর সামনে থেকে সযত্নে সরিয়ে নিন হাড়খানা। কে জানে, ওইটেই হয়তো বসির মিয়ার ছেলের পাঁজর।

ওর নামই তো বাঙলাদেশ।

দুবেলা মরার আগে মরব না

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

"সেটা ১৯৭১-এর জুলাই মাস। ঢাকা ক্যান্টনমেণ্টের বন্দীশিবিরে চরম নির্যাতন চলছে আমাদের উপর। একে অন্যের সঙ্গে কথা বলবার উপায় নাই, চোখ তুলে তাকালেও বেদম প্রহার। এই অবস্থায় একদিন একটি তরুণ ছাত্রকে বেদম মারতে-মারতে নিয়ে এল পাক-সেনারা, তাকে দিয়ে জোর করে গান গাওয়াল। ছেলেটি দরাজ গলায় গান ধরল সেই অবস্থাতেও—'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। সতেজ সুরেলা গলার গানে গমগম করতে লাগল জেলখানা, কেমন যেন রোমাঞ্চ লাগল আমাদের সবার দেহমনে। ভুলে গেলাম মৃত্যুভয় মারের ভয় কয়েক মুহূর্তের জন্য, সোজা হেঁটে গেলাম ছেলেটির কাছে, অভিবাদন জানালাম তাকে, মৃত্যু-দূতদের উপেক্ষা করে যে আমাদের আবার শোনাল সোনার বাঙলার ভালোবাসার গান।"

আবেগের সঙ্গে কথাগুলো বলছিলেন বাঙলাদেশের একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী—ঢাকায় বসে, আমাদের সঙ্গে অন্য কথার ফাঁকে। ছেলেটিকে ততদিনে আমরাও চিনেছি, বাঙলাদেশের মুক্তির পর কলকাতায় এসেছিল সে, শুনিয়েছে আমাদের বাঙলাদেশের অনেক গান। নাম তার ইকবাল আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ বছরের ছাত্র, অর্থনীতিতে এম. এ. ফ্যাইন্যাল পরীক্ষা দিচ্ছিল ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। বাঙলাদেশের সেরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েদের সে অন্যতম। তার গাওয়া গানের রেকর্ডের জনপ্রিয়তা সুবিপুল। বাঙলাদেশের প্রসিদ্ধ সংস্কৃতিনায়ক ওয়াহিদুল হক পরিচালিত সংস্থা 'ছায়ানট'-এর অন্যতম উৎসাহী কর্মী ইকবাল। ছাত্র-আন্দোলনেও সে যথেষ্ট সক্রিয়। বাঙলাদেশ ছাত্র-ইউনিয়নের প্রার্থী হিসেবে ১৯৭১-এ সে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের সংস্কৃতি-সম্পাদক নির্বাচিত হয়। ঢাকার 'সংস্কৃতি-সংসদ'-এরও সে অন্যতম সহ-সভাপতি।

২৫এ মার্চের পর ঢাকাতেই ছিল ইকবাল। নির্ভীকভাবে কাজ করে যাচ্ছিল প্রতিরোধ-সংগ্রামের কর্মী হিসেবে। ১৩ই জুন মধ্যরাত্রে পাক-সেনাদল বাড়ি

ঘেরাও করে তাকে গ্রেপ্তার করে। শুধু তাকেই নয়, তার কিশোর দুই ভাই ও তার কাকা—এদেরও গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় একই সঙ্গে। বাড়িতে ফেলে রেখে যায় তার বজ্রাহত বাবা ও মাকে। এবার ঢাকা গিয়ে ইকবালদের বাড়িতে বসে, ওর মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমরা, 'কি করলেন আপনি তখন?' উত্তর দিতে এখনও শিউরে ওঠেন মহিলা, বললেন, 'কেমন যেন পঙ্গু হয়ে গেল শরীর মন। আচ্ছন্নের মতো ঘুমিয়ে পড়লাম, নইলে বোধহয় সে-রাত্রেই পাগল হয়ে যেতাম।' ইকবালের বাবা বললেন, 'আমরা তখন অধিক শোকে পাথর।'

পরের কাহিনী ইকবালের কাছেই শুনেছি। 'আমাদের সবাইকেই ধরে নিয়ে গেল ক্যাণ্টনমেণ্টে। একদিনের মধ্যেই দুই ভাই ও চাচাকে ছেড়ে দিল। আমাকে নিয়ে চলল পাক-সেনাদের বড় কর্তাদের কাছে। পুলিশের একজন বড় কর্তা আমাকে বলল, 'ইকবাল, তুমি কি করেছ, তা আমি জানি না। কিন্তু নিশ্চয় গুরুতর কিছু করেছ, কারণ তোমাকে একেবারে কর্নেলের কাছে নিয়ে যাবার হুকুম এসেছে।'

'নিয়ে গেল আমাকে এক বন্দীশিবিরে—নাম তার এফ. আই. ইউ. (Field Interrogation Unit)। ট্রাক থেকে নামামাত্র পাক-সেনারা দৌড়ে এল, 'মেহ্মান আ গিয়া।' একজন হাত বাড়িয়ে দিল, না-বুঝে আমি হাত বাড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান—মুখ থুবড়ে পড়লাম মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে দমাদ্দম বুটের লাথি। সেখান থেকে আমায় নিয়ে গেল এক চোরা-কুঠুরিতে—নাম তার 'নিরাপদ খাঁচা' (Safe Cage)। দুদিন ধরে আমাকে দিয়ে ঘাস কাটাল, নর্দমা সাফ করাল, প্রায় উপোস করিয়ে রাখল।

'তারপর ১১টায় শুরু হলো আমাকে জেরা। একজন পাক-ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করল, 'ওয়াহিদুল হক কে?' আমি জবাব দিলাম, 'ছায়ানটের মাস্টার-মশাই।' ক্যাপ্টেন বলল, 'তুমিই হচ্ছ ছায়ানটের রাজনৈতিক সংগঠক। তুমি গান গেয়ে গেয়ে মানুষকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করো।' কিছুক্ষণ বেদম মারধোর চলল। তারপর হতাশ হয়ে পাক-সেনানীরা আমাকে আবার ফেরৎ পাঠাল বন্দী-খাঁচায়।

'তার পরদিন আমাকে নিয়ে গেল নিকৃষ্টতম বন্দীশিবিরে। সেখানে ঢোকামাত্র আমার উপর বেদম মারধোর শুরু হলো—কিল, ঘুঁষি, লাথি, বন্দুকের বাঁটের আঘাত। একটা আঘাতে ডান কানটা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল—অসম্ভব যন্ত্রণা হলো। পরে জেনেছিলাম যে ঐ মারেই আমার ডান-কানের পর্দা ফেটে

গিয়েছিল। একদফা মারধোরের পর আমাকে ঢোকানো হলো একটি কারাকক্ষে। সেখানে যমদূত প্রায় একজন খানসেনা ছিল প্রহরী। সে বলল, 'আমার নাম কি তুমি জানো? ঐ যে ছেলেটা ঐদিকে রয়েছে, ওকে জিজ্ঞেস করো।' জিজ্ঞেস করে জানলাম যে ঐ প্রহরীটি সবার কাছে 'খুনী জল্লাদ' নামে পরিচিত, এমনই ভয়াবহ অত্যাচার করে সে। ঐ কক্ষেই নওগাঁর একটি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রকে দেখলাম। ম্যাট্রিকে সে চারটি বিষয়ে লেটার পেয়েছিল। খুনী জল্লাদ তার সর্বাঙ্গ সিগারেট দিয়ে পুড়িয়েছে, তাকে জীপের সঙ্গে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে। ফলে ছাত্রটি একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে। অন্যদেরও জীর্ণ শীর্ণ চেহারা, ন্যাড়া মাথা, চেনবার উপায় নেই।

'আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটু বর্ণনা দিই। ভোরবেলা ৪টেতে উঠে, চারজন করে সারবন্দী হয়ে বসতে হতো, তখন প্রহরীরা আমাদের মাথা গুণত। তারপর প্রাতঃকৃত্য সারার পালা—প্রস্রাব, পায়খানা সারার জন্য মাথাপিছু ঠিক এক মিনিট করে সময়, তার মধ্যে কাজ সেরে বেরিয়ে না এলে, বেদম মার চলবে। তারপর এক মগ চা ও জল—খাবার জন্য, চান করার জন্য, পায়খানা করারও জন্য। রাতে এই মগটাকেই বালিশের মতো মাথায় দিয়ে ঘুমোতাম। সকালে চা খাবার পর কয়েকঘণ্টা পরিশ্রমের কাজ—মাটিকাটা, নোঙরা সাফ করা ইত্যাদি। সেখানে, যে কোনোও অছিলায়, বেদম মার—প্রত্যহ।

'এই মার কেমন করে আমার ভাগ্যে কম জুটল, তার কাহিনীটা বলছি। প্রথম দিন মাটি কাটছি আর চড় ঘুঁষি খাচ্ছি, এমন সময় একজন পাকসেনা এসে প্রহরী-সর্দারকে বলল, জলতোলার জন্য আমার ৫।৪জন লোক চাই। বলে আমাকে সহ ৪জন বন্দীকে নিয়ে গেল অন্যত্র ও কয়েক ঘণ্টা কুঁয়ো থেকে বহু বালতি জল তোলাল। কাজ শেষ হলে ফিরে এসে দেখি যে-বন্দীরা মাটি কেটেছিল, তাদের প্রহরীরা এমন মার দিয়েছে যে বেশির ভাগই মাটিতে পড়ে, অনেকেরই নাক-কান দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরচ্ছে। আমি থাকলে, আমারও একই হাল হতো। তারপর কয়েকদিন ঐ পাক-সেনাটি আমাদের কাজে ধরে নিয়ে যেত ও কার্যত আমরা অল্পস্বল্প মারধোর খেয়ে রেহাই পেতাম। অনেক পরে, একদিন, ঐ পাক-সেনাটি আমাকে আলাদা ডেকে বলে :

'আমি পাঠান, তোমাদের বন্ধু। আমরাও শীঘ্রই তোমাদের মতো পাক জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব। তোমাদের বাঙালিদের জয় হবেই, কারণ তোমাদের মেয়েরাও কি প্রচণ্ড বীর। আজ স্বাধীন বাঙলা বেতারে তোমাদের

একজন মেয়ের বক্তৃতা শুনে আমি মুগ্ধ।' পরে জেনেছি পাঠান সেনাটি কবরী চৌধুরীর কোনোও বক্তব্য শুনেছিল। দারুণ দুর্দিনের এই বন্ধুটিকে আমি ভুলব না।

'বন্দী শিবিরের দীর্ঘ নির্যাতন কিভাবে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটায় তার একটা দৃষ্টান্ত দেবো। দুপুরে আমাদের খেতে দিত পোকাওয়ালা চালের ভাত ও দুর্গন্ধ ডাল। প্রথম দিন আমি ঐ ডাল খেতে পারিনি, বাটিটা সরিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশের বাঙ্ক থেকে ৪জন বন্দী একসঙ্গে ডালের পাত্রটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন ও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে ঐ দুর্গন্ধ ডাল মুহূর্তে নিঃশেষ করে দেন। দিনের পর দিন অর্ধাশনে, এমনই দুর্গতিতে ডুবে গিয়েছিল তাঁদের মানসিকতা।

'২৮এ জুন আমাকে কারাকক্ষ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো ভয়াবহ এফ. আই. সির (Field Interrogation Centre) সামনে। আমার সামনে পাবনা শহরের ৬৫ বছর বয়স্ক ডাক্তার সেলিমুল্লাকে ধরে অমানুষিক প্রহার করল। বৃদ্ধকে একটা বস্তার মধ্যে পুরে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখল কয়েক ঘণ্টা, পিন ফোটাল তার সর্বাঙ্গে। তারপর তাঁকে জোর করে লিখিয়ে নিল যে তিনি ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খান সেনাদের হত্যা করছেন। আমি বুঝলাম আমার ভাগ্যেও কি আছে।

'এক পাক-মেজরের আদেশে আমার উপরও চলল ঐ ধরনের নির্যাতন। আমার এক উত্তর, আমি গায়ক, লোকে গান গাইলে টাকা দিত, তাই গাইতাম। মেজর ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'ইকবাল, তুমি কাকে ধাপ্পা দিচ্ছ? আমরা জানি তুমি টাকার জন্য গাইতে না, তুমি গাইতে প্রচারের উদ্দেশ্যে। তুমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছ, আর গণসঙ্গীত গেয়ে জনতাকে উত্তেজিত করেছ বিদ্রোহের পথে।' একদিন উত্যক্ত হয়ে মেজর আমাকে প্রশ্ন করল, 'ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ তোমাকে কি এত দিয়েছে, যে তাকে তুমি এত ভালোবাস?'

'অনবরত মারের চোটে আমি তখন জর্জরিত। এমন সময় একদিন হুকুম হলো—তোমার গাওয়া সব গান টেপ করা হবে। টেলিভিশনের দপ্তর থেকে আমার গাওয়া গানের তালিকা ওরা পেয়েছিল। ফলে এসব গান জানি না বলা বৃথা, গাইলাম গানগুলো—চারিধারে কয়েকজন বন্দী নোট নিচ্ছে। মারের ভয়ে, কথা বলা দূরস্থান, চোখ তুলে আমার দিকে তাকাতেও সাহস পাচ্ছে না।

সব গানের পর মেজর বলল, এবার সোনার বাঙলা গাও। গাইলাম। গাইতে গাইতে কেমন জানি মনে হলো। ভয়, ভাবনা কেটে গেল। সব মনপ্রাণ ঢেলে গাইলাম। ঘর গমগম করতে লাগল, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' গানের শেষে নিজের বন্দীকক্ষে ফিরে যাচ্ছি, আশে-পাশের সমস্ত বন্দী উঠে এসে আমায় ঘিরে ধরল, কুশল জিজ্ঞেস করল, প্রহরীদের উদ্যত রাইফেলকে উপেক্ষা করে। সেদিন বুঝলাম রবীন্দ্রনাথ আমাদের কি দিয়েছেন।'

ইকবালকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে ছাড়া পেলে, কি ভাবেই বা ছাড়া পেলে।' ইকবাল বলল, 'পেট থেকে কোনোও স্বীকৃতি আদায় করতে পারবে না বুঝে, আগস্ট মাসে ওরা আমাকে পাঠিয়ে দিল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে বহু রাজনৈতিক কর্মী বন্দী। আমরা সেখানে নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত গাইতাম। বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সব গান, সুভাষদার কবিতায় সুর দেওয়া গান—'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'। জমাট জীবন। ১৭ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী এসে জেলারকে বাধ্য করল জেলের তালা খুলে দিতে। বজ্রকণ্ঠে জেল ফাটিয়ে 'জয় বাঙলা' ধ্বনি দিয়ে স্বাধীন ঢাকার রাজপথে স্বাধীনভাবে আবার বেরিয়ে এলাম আমরা।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কলকাতা যে চলে এলে এত চটপট, বাবা-মা ছাড়লেন?' ইকবাল হাসল, 'মায়ের একটু আপত্তি ছিল বই কি। কিন্তু এতদিন পরে সুযোগ পেয়েছি ভারতে আসার, শান্তিনিকেতন গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাবার, এ-সুযোগ হারাতে পারি!' দুদিনের জন্য এসেছিল ইকবাল। শান্তিনিকেতন গেছে, দেখা করেছে শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে। কলকাতায় দেখা করেছে সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে। দক্ষিণ-কলকাতার এক কলেজের ছাত্রীদের শুনিয়েছে তার সুরেলা কণ্ঠের গান।

২৪এ জানুয়ারি ভোরবেলা। ফরিদপুরের কাছে পদ্মার ঘাটে দাঁড়িয়ে ইকবাল, হাসনাৎ, মঞ্জু ও আমি। ইকবাল আমাদের দুজনকে নিয়ে লঞ্চে করে ঢাকা যাবে, হাসনাৎ কয়েকঘণ্টা পরে আসবে গাড়িটা পার করে। কাগজে মোড়া একটা বিরাট বাণ্ডিলকে অতি সযত্নে কোলে করে সারা পথ নিয়ে আসছিল ইকবাল। এখন হাসনাৎকে বার বার বলছিল, 'হাসনু ভাই, ঐটা কিন্তু খুব সাবধানে নিয়ে যাবেন, কোনোও চোট যেন না লাগে।' মঞ্জু হেসে

জিজ্ঞেস করল, 'বস্তুটি কি, এমন সন্তানের মতো যত্ন করে যাকে নিয়ে যাচ্ছ?' সলজ্জ ইকবাল বলল, 'ঢাকা গিয়ে দেখাব।'

২৭এ ঈদের রাত্রি, ইকবালদের বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ। ইকবালের মা বলছিলেন, 'এই ছেলেকে ফিরে পাব এমন ভরসা ছিল না ভাই।' ওর বাবা বলছিলেন, '৯ মাস প্রতি মুহূর্ত মৃত্যুর বিভীষিকা মাথায় নিয়ে সময় কাটিয়েছি আমরা। সে যে কি নরক-যন্ত্রণা, তা বোঝাতে পারব না।' ঘরটা কেমন থমথমে হয়ে গেল। কথার মোড় ঘোরাবার জন্য মঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'কই ইকবাল, সেই সযত্নে আনা জিনিসটি কি এবার দেখাও।' আঙুল দিয়ে দেখাল ইকবাল, বসবার ঘরে সামনেই রাখা রবীন্দ্রনাথের বিরাট আবক্ষ মূর্তি। রবীন্দ্রনাথকেই বুকে করে আনছিল ইকবাল। রবীন্দ্রনাথকে বুকে করেই রেখে দিয়েছে ইকবালের বাঙলাদেশ—এমনকি নরপশুদের নির্যাতনের নরককুণ্ড বন্দীশিবিরেও।

আটাত্তরের শ্রাবণ

সুফিয়া কামাল

ঘনছায়াশ্যাম মেঘের আড়ালে আবার শ্রাবণ এল,
এত দুঃসহ দিনের এশেষে সেকি এ খবর পেল ?
কেতকী গন্ধা শ্রাবণ নয়, শোনিত গন্ধা বায়ু,
তাইতো কেতকী এখনও ফোটেনি অবসাদে শিরাস্নায়ু
অবশ-বিবশ, বেদনার ভারে আজি এ শ্রাবণ ভরি
বিষাদের মেঘ ঘনায় কেবলি, কদম পড়েছে ঝরি।
বাংলার মেঘ মেদুর গগনে যন্ত্রদানব পাখা
উদ্‌গারি চলে বিষনীল ধূম, কুটিল চক্র আঁকা
লৌহ মারণ অস্ত্রের সারি চলে পথ বীথিকায়,
শ্যামল কোমল পেলব যা কিছু দলিয়া মথিয়া যায়।
তাইতো শ্রাবণ আকাশের নীল আঁখিভরা ছলছল
সুনিবিড় ব্যাথা উজাড় করিয়া ঢালিছে অশ্রুজল
দানবের জ্বালা অগ্নিদহনে তপ্ত ধরার দেহে
বড় বেদনায় বড় মমতায় বড় সুগভীর স্নেহে।
এবার শ্রাবণ ভগিনী জননী বধূদের আঁখিজলে
মেঘ রৌদ্রের আলোক ছায়ায় বিচ্ছেদ হোমানলে
জ্বলিয়া ঝলিয়া বিদীর্ণ করি বিক্ষত কেতকীর
বক্ষ ভরিয়া সৌরভ বহে গোপন—ঝরিছে নীর।

ছড়া ঘরে ঘরে

সানাউল হক

খাঁটি সোনা মাটি, আমার স্বদেশ
সোনার বঙ্গভূমি
জয়টিকাভালে স্বীয় ডাকনামে

স্বেচ্ছার হ'লে তুমি
পাড়া-প্রান্তরে, গঞ্জ বাজারে
সূর্য সেনানী দাঁড়ানো কাতারে
ধর্মের কল বাতাসে নড়ছে
অপকীর্তির চূড়াটি খসছে
আমার বাংলা রূপসী বাংলাদেশ
সোনালী সবুজে হলো তার উপোষ
অনাকারার যত সন্তান
সিদ্ধ লগ্নে আঁখি-উত্থান
ঘরে ঘরে খুশি কন্যার মত
স্বদেশীরা আজ শির-উন্নত
যে-মাটি পেলব, সোনা-উজ্জ্বল
স্বদেশ বঙ্গভূমি,
সময় এসেছে বিজয় লগ্নে
ওষ্ঠে তোমার চুমি।

তার উক্তি

সামসুর রহমান

এখন বালাই নেই ক্ষুৎ পিপাসার। গলাবন্ধ
কোটের দরকার ফুরিয়েছে এই শীতে। আত্মরক্ষা অর্থহীন,
অস্ত্রও লাগে না তাই। দেখুন সবাই শাদা চোখে
কিংবা ক্যামেরার যান্ত্রিক ওপার থেকে,
শহরের এক কোণে, শনাক্তের পরপারে উপাধানহীন
কেমন নিস্পৃহ শুয়ে আছি, কী প্রকার নিশ্চেতন,
রায়ের বাজারে।
এই যে করোটি দেখছেন, একদা এটাই ছিলো
স্বীকৃত আমার দামী মাথা আর সেই মাথার ভেতর
নানাবিধ চিন্তা পুঞ্জ পুঞ্জ

মেঘের মতন সূর্যোদয় কি সূর্যাস্তে
মোহন রঙিন
এবং গভীর বিবেচনা—
সেখানে ফ্রয়েড কার্ল মার্কস, রিল্কে, ডস্টয়ভস্কির
শান্তিপূর্ণ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ছিলো না বাধা কোনো।
এই যে যমজ লাঠি, সরু, শাদা, এরাই আমার
দু'টি বাহু, কোনোদিন কী আবেগে ধরতো জড়িয়ে
দয়িতাকে। আর এই শূন্য জায়গাটায়
স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড ছিলো, যা ওরা নিয়েছে উপড়ে পাশব আক্রোশে
আর এই পাত্র যেটা লোভাতুর কুকুর শেয়াল
পালালো সাবাড় করে, একেই তো জানতুম আমার নিজস্ব
কণ্ঠ ব'লে, যে-কণ্ঠে ধ্বনিত হতো বার বার অসত্য অন্যায়
ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো প্রতিবাদ, যে-কণ্ঠে ধ্বনিত হতো
কল্যাণের, প্রগতির কী সজীব জিন্দাবাদ আর স্বাধীনতা, স্বাধীনতা।
এ জন্যেই জীবনের ফুটফুটে দ্বিপ্রহরে হলাম কংকাল।

প্রতিটি অক্ষরে

আমার মগজে ছিলো একটি বাগান, দৃশ্যাবলীময়।
কখনো তরুণ রৌদ্রে কখনো বা ষোড়শীর যৌবনের মতো
জ্যোৎস্নায় উঠতো ভিজে। জ্যোৎস্নাভুক পাখি
গাইতো সুস্নিগ্ধ গান, আমার মগজে ছিলো একটি বাগান
মদির অভিনিবেশে পাখি গান গেয়ে উঠলেই
শিরায় শিরায় সব দিকে
উঠতো ঝিকিয়ে
নতুন কবিতাবলী মগজের রঙিন নিকুঞ্জে।
আমার সে সব কবিতায়
থাকতো জড়িয়ে সেই উদ্যানের স্মৃতি।
এখন যা কিছু লিখি, কবিতা অথবা

একান্ত জরুরী কোনো চিঠি
কিংবা দিনলিপি,
এখন যা কিছু লিখি সব কিছুতেই
ভর করে লক্ষ লক্ষ গুলিবিদ্ধ লাশ।
প্রতিটি অক্ষরে আজকাল
প্রতিটি শব্দের ফাঁকে শুয়ে থাকে লাশ। কখনো বা
গোইয়ার চিত্রের মতো দৃশ্যাবলী খুব
অন্তরঙ্গ হয়ে মেশে প্রতিটি অক্ষরে।
প্রতিটি পং'ক্তির রন্ধ্রে রন্ধ্রে
বিধবার ধু ধু আর্তনাদ
জননীর চোখের দুকূলভাঙা জল
হু হু ব'য়ে যায়। প্রতি ছত্রে
নব্য হিরোশিমা, দাউ দাউ
কতো মাই লাই।
আমার প্রতিটি শব্দ পিষ্ট ফৌজী ট্রাকের তলায়,
প্রতিটি অক্ষরে
গোলা বারু'দের
গাড়ির ঘর্ঘর,
দাঁতের তুমুল ঘষ্টানি,
প্রতিটি পংক্তিতে শব্দে প্রতিটি অক্ষরে
কর্কশ সবুজ ট্যাঙ্ক চরে, যেন বা ডাইনোসর।
প্রতিটি পংক্তির সাঁকো বেয়ে
অক্ষরের সরু আল বেয়ে উদ্বাস্তুরা যাচ্ছে হেঁটে
সারি সারি, বিষম পা-ফোলা, শুকনো গলা,
লক্ষ লক্ষ যাচ্ছে তো যাচ্ছেই,
প্রতিজন একেকটি দীর্ঘশ্বাস যেন।

আইন ও ইংরেজী

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের এক ইংরেজী কাগজে খবর বেরিয়েছে বাঙলাদেশের আইন আদালতের ভাষা ইংরেজী থাকবে। খবরটা কতখানি কাগজটির নিজস্ব খবর, কতখানি বাঙলাদেশের খবর, যাচাই করার উপায় নেই। বাঙলাভাষাকে যাঁরা নিজেদের অস্তিত্বের ভাষা করে এতদিনকার নানা বিভেদ, বিভ্রান্তি ও চক্রান্ত ধূলিসাৎ করে বাঙালি পরিচয়ে সগর্বে একটি স্বাধীন জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাঁরা তাঁদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও সেইসঙ্গে তার বিধিবিধানগুলি বাঙলাভাষায় ঢেলে সাজাবেন না বিশ্বাস হয় না। হয়তো সাময়িক এই ব্যবস্থা।

প্রসঙ্গত নিজেদের কথা এসে যায়। বাঙলাভাষাকে কাজেকর্মে, সরকারি দপ্তরে, আইনে, শিক্ষায় ব্যবহারের অধিকার বিনা সংগ্রামেই আমরা পেয়েছি। কিন্তু এই অধিকার প্রয়োগে আমাদের দ্বিধাসংকোচের শেষ নেই। অতীতের সংস্কার ভবিষ্যতের ভয় হয়ে নতুন পথে আমাদের পা বাড়াতে দেয় না। নানা অজুহাতে পড়ে-পাওয়া অধিকারকে আমরা ধামা চাপা দিয়ে রাখি। ১৯৬১ সালে পাশ করা 'সরকারি ভাষা আইন' তাই অকেজো আইন হয়ে আইনের কেতাবে চাপা পড়ে আছে।

হয়তো ইংরেজী সম্পর্কে আমাদের বহুদিনকার সংস্কার কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। এ কথা তো মিথ্যে নয়, যে-আইনকানুন শাসনপদ্ধতির সঙ্গে আমাদের কয়েকপুরুষের গাঁটছড়া বাঁধা তার কোনো কিছুই এ দেশের নয়। ইংরেজরা আমাদের শাসন ও শোষণ করার জন্যে যে-শাসনযন্ত্রটা আমদানি করেছিল সেই যন্ত্রটা তার কাজ নিখুঁতভাবেই করেছিল। তার ফলে কিন্তু আমরাও আর তিনশ বছর আগেকার আমরা রইলাম না। ইংরেজদের শোষণে ইন্ধন হয়ে এবং শাসনে শাসিত হয়ে ধনেপ্রাণে নিঃস্ব হয়েও মনেপ্রাণে একটা ব্যাপারে কিন্তু তারিফ না করে পারিনি, ইংরেজদের আইনকানুনে পরিপাটি করে গড়ে তোলা শাসনযন্ত্রটির মতো এমন নিপুণ যন্ত্র আর হয় না। কজনমাত্র ইংরেজ এই বিপুল বিশাল দেশটাকে কি মোক্ষমভাবে কবজা করে রেখেছিল শুধুমাত্র এই শাসনযন্ত্রটার কেরামতিতে। এবং এই যন্ত্রটা সচল থাকত ইংরেজী আইনের বাঁধা চালে। তাই ইংরেজরা যখন দেশ ছেড়ে চলে গেল, আইনকানুন সমেত

তাদের শাসনযন্ত্রটাকে এখানে সেখানে একটুআধটু দরকারমতো শোধন করে নিজেদের বলে চালাচ্ছি। (এইসূত্রে মনে পড়ছে অক্টারলনি মনুমেণ্টকে সম্প্রতি আমরা শহিদ মিনার-এ নামফেরতা করেছি।) কিন্তু যে যন্ত্র ইংরেজী বুলিতে চলতে অভ্যস্ত, ইংরেজী বুলি না আওড়ালে পাছে তা বিকল বা অচল হয়ে যায়, সেই ভয়ে বুলিটাকে আমরা রাষ্ট্রযন্ত্রের কলকবজা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। তাই, এ ধারণা যদি আমাদের মজ্জাগত হয়ে গিয়ে থাকে, রাষ্ট্রের বুলি মানে ইংরেজী বয়ানে আইনকানুন, তাহলে আমাদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের কাছে ইংরেজী বাদ দিয়ে আইন যা রাম বিনা রামায়ণও তাই।

দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে গড়ে তোলা থেকে চালানোতক দেশের সাধারণ মানুষের শরিকানা যেন বজায় থাকে, এমন একটা সদিচ্ছা আমাদের মনে থাকলেও কার্যত দেখা যায় ওই ইংরেজী বুলিরই শরণ নিয়েছি। ভুলে যাই ভাষাটা কি সমাজে, কি রাষ্ট্রজীবনে, প্রথম ও প্রধান্ যোগসাধনের বাহন। ভাষাকে দূরে রাখলে ভাষাভাষীও দূরে থেকে যায়। ইংরেজীর উপর নির্ভর করলে দেশের রাষ্ট্র-যন্ত্র আইনকানুন যতই শোধন করি না কেন, সে সবের মধ্যে থেকে অনেক পুরুষের ইংরেজীয়ানার সংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। দেশের শতকরা এক বা দুভাগ লোকের ইংরেজী মন্ত্রগুপ্তি জানা আছে। ইংরেজী বয়ানে গণ-তান্ত্রিক আইনকানুন শাসনব্যবস্থা চালু রাখা ও তদারকি করার ভার এঁদের উপর এসে পড়ে। জনকল্যাণে এঁরা যতই প্রাণপাত করুন না কেন, মাতৃভাষা সম্বল জনসাধারণ ইংরেজী বুলির আওয়াজ শুনে পুরনো সংস্কারবশে স্বদেশী সাহেবদের প্রণিপাত করে তাদের বাপদাদার মতো সভয়ে ও সংকোচে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের থেকে ভাষাগত এই ব্যবধান আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে একটা অভিশাপ। সেই কর্মকাণ্ডে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা যেন নিজ দেশে পরবাসী। এই অবস্থাটা আমরা বুঝেও বুঝি না। বোধহয় আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার অভাব বলেই।

কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। অন্তত আইনের ক্ষেত্রে ভাষাকে অবহেলা করা চলে না। যে ইংরেজী আইনের দৌলতে আমরা আইন শিখেছি, সেই আইনের একটা বড় কথা, আইন জানি না বলে আইনের হাত থেকে পার পাওয়া যাবে না। ইংরেজ আমলে আইন মানার দায় যতটা ছিল, আইন জানার দায়, আইনত থাকলেও কার্যত তেমন ছিল না। আজ নিজেদের দিকে তাকিয়ে যে আইন নিজেরা রচনা করছি সেই আইন মানার আগে জানার দায়

বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আইন জানি না বলে সাধারণ মানুষ যদি আইনের দায়িত্ব থেকে রেহাই না পায়, তাদের আইন না জানানোও কম দায়িত্বহীনতা নয়। যে ইংরেজী ভাষা ও আইনকে অভিন্ন মনে করছি সেই ইংরেজী ইংলণ্ডের আইন আদালতেও যে বেশিদিন অচল হয়নি সেই কথাটা এই প্রসঙ্গে মনে রাখলে আমরা মনে জোর পেতে পারি। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ যখন ইংরেজরা এই ভারত উপমহাদেশে পাড়ি জমাচ্ছে তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত, ইংরেজী স্বদেশের আইনের কাছেও অচ্ছ্যুত ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ইংলণ্ডের আপামর জনসাধারণ থেকে সরকারিমহল পর্যন্ত সবাই ইংরেজী ভাষাকে আইনের ভাষা বলে মেনে নিতে আগ্রহী থাকা সত্ত্বেও প্রায় চারশ বছরের আন্দোলনেও ইংরেজী আইনের ভাষা হতে পারে নি। এই চমকপ্রদ ইতিবৃত্তের কিছুটা বিবরণ আশা করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না!

অনেকদিন ধরে বিদেশী ও ভিনভাষী রাজশক্তির দখলে থাকার ফলে বাঙালি জাতির সমাজে ও সংস্কৃতিতে যে সংকরতা এসেছে, ইংলণ্ডের রাজতক্তে এগারোশতক থেকে পনেরোশতক পর্যন্ত ফরাসীভাষী নরম্যানরা অধিষ্ঠিত থাকার ফলে ইংরেজ সমাজেও ফরাসী প্রভাব পড়ে, তবে তা সীমাবদ্ধ থাকে রাজঅনুগ্রহধন্য ও রাজঅনুগ্রহপ্রার্থী ইংরেজদের মধ্যে। ফরাসীভাষা ও কেতা দুরস্ত হওয়া ছিল তখনকার আভিজাত্যের লক্ষণ। এই অভিজাতদের কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভব্য ভাষা ছিল ফরাসী বা তার অপভ্রংশ অ্যাংলোনরম্যান, এবং কেতাবি ভাষা ছিল লাতিন। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কিন্তু এই ভাষার কোনো যোগ ছিল না। তাই ভিনভাষীরা রাজতক্তে অধিষ্ঠিত থাকলেও ইংরেজীর প্রসার ও সমাদর ক্রমে বেড়েই চলেছিল। চোদ্দশতকে ইংরেজীভাষা জাতীয় ভাষা হয়ে ওঠে, এই ভাষায় শিক্ষা ও সাহিত্য রচনা শুরু হতে থাকে। এরপরে একশ বছরের মধ্যে ফরাসীর প্রতাপ কমে আসে এবং ইংরেজীভাষা আইন আদালত ছাড়া সমাজজীবনের আর সবক্ষেত্রে স্বাধিকার লাভ করে। এখন থেকে জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে ইংরেজীভাষার জয়যাত্রা শুরু হয়। ইংরেজীর সর্বতোমুখী প্রাধান্য বজায় রাখতে অনুবাদচর্চার উপর জোর দেওয়া হয় এবং এর ফলে দশ হাজারের বেশি ফরাসী শব্দ ইংরেজী শব্দকোষে স্থান পায়।

স্বভাবতই মনে হয়, সারা ইংলণ্ডে যখন ইংরেজীকে জাতীয় ভাষা হিসেবে

প্রতিষ্ঠা করার জন্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে তখন আইনের ক্ষেত্রে সেই ভাষা অনাদৃত রয়ে গেল কেন। এর একটা কারণ ছিল। সেই কারণ শুধু চোদ্দ-পনেরোশতকের ও পরবর্তী তিনশতকের ইংলণ্ডের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, সেই কারণ এই ভারতীয় উপমহাদেশে আইনী ভাষা ইংরেজীকে কায়েমী রাখার মূলে বেশ কিছুটা ইন্ধন যোগাচ্ছে। ইংরেজ আইনজীবীদের ফরাসীপ্রীতির কারণ খুঁজতে গিয়ে কোনো এক আইনবিদ যা বলছেন অনুবাদে তার কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

"শিক্ষিত ও যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে লাতিনের সঙ্গে ফরাসী দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষার ভাষা হিসেবে চলে আসছিল। সমাজের সবস্তরে ইংরেজী যত বেশি চালু হচ্ছিল, ফরাসী ততবেশি অভিজাত ও বিত্তবানদের মর্যাদার নিরিখ হয়ে ওঠে। তখনকার দিনে এই অভিজাত ও বিত্তবানরাই তাদের ছেলেদের আইন পড়তে পাঠাত। আর কারও তা সাধ্যায়ত্ত ছিল না। মধ্যযুগীয় তন্ত্রমন্ত্রের মতো আইনও ছিল রহস্যাবৃত এবং ইংলণ্ডের শাসকচক্র সাধারণ মেঠো লোকদের কাছে আইনের গোপন রহস্য জানাতে ব্যগ্র হবেন, এরকম বিশ্বাসের কোনো কারণ নেই।... ... একটা অজানা ভাষার মধ্যে পেশাগত গোপন কারিকুরি কুলুপ দিয়ে রাখার চেয়ে আর কি ভালো উপায় আছে পেশাগত একাধিপত্য বজায় রাখার! এই ভাবেই চীনা আমলাতন্ত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমন একটি ভাষার জোরে অটল থেকেছে যে-ভাষা কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ছাড়া আর কেউ বোঝে না। তেরোশতকের মাঝামাঝি সময় ইংলণ্ডের সামান্য লোকই ফরাসী জানত। কখনোই তা জনসাধারণের ভাষা হয়ে ওঠেনি। তারপর যত দিন গেছে, এ-ভাষা জনাকয়েক ছাড়া আর সবার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। আইনের ভাষা হবার পক্ষে এই তো যোগ্য ভাষা। এর পিছনে কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না —অবস্থার বিপাকে এমনি দাঁড়ায় তবে এতে স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ থাকায় ফরাসী ভাষায় আইনকে বহাল রাখা হয়।"

আইনী-ভাষার বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভে যে মনোভাব ইংরেজ জনসাধারণের মধ্যে উগ্র হয়ে ওঠে তা এই—ফরাসী ও লাতিন বিদেশী ভাষা, বিদেশী ভাষায় ইংরেজ তার আইনকে দেখতে চায় না চোদ্দশতকের মাঝামাঝি এই স্বাজাত্য অভিমানে রসদ জোগায় ক্রেসি, পোয়াতিএ, কালে ইত্যাদি কয়েক জায়গায় ইংরেজদের হাতে ফরাসীদের শোচনীয় পরাজয়। এই সময়েই প্লেগ মহামারীতে দেশবাসীর অনেকে মারা যায়। জাতীয় এই দুর্যোগের ফলে সামন্ততন্ত্রের গতায়ু

অভিজাতশ্রেণী ইংরেজীভাষী প্রাকৃতজনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। জনসাধারণ দাবি করে আদালতের কাজ ইংরেজী ভাষায় চালাতে হবে। এই দাবি মেনে নিয়ে ১৩৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যাটিউট অফ প্লিডিং পাশ করা হয়। ফরাসী ভাষায় রচিত হলেও এই আইন এই প্রথম আদালতে সওয়ালজবাবের ভাষা হিসেবে ইংরেজীকে স্বীকার করে নিল। কিন্তু সমগ্রভাবে ইংরেজীকে মেনে নিতে পারেনি। আইনটির চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকরণ থেকে তা বোঝা যায়। এই দুটি প্রকরণের বাঙলাভাষ্য নিচে দেওয়া হল :

"(৪) প্রজাদের শান্তি ও তুষ্টির জন্যে এবং তাদের ভালো ভাবে শাসন করার উদ্দেশ্যে রাজাধিরাজ এই আদেশ জারি করেছেন যে, যে-কোনো আদালতে যে আরজির সওয়াল করা হবে, তার, তার জবাবের, তার সমর্থনের, তার উপর বিচার বিতর্কের, ভাষা হবে ইংরেজী, তবে ঐ সবের বিবরণ লাতিন ভাষায় নথিভুক্ত করতে হবে।

(৫) এবং আগের মতোই এই অঞ্চলের আইন, আইনের পরিভাষা ও আদালতের পরওয়ানা ইত্যাদি আগে যে ভাষায় চলত সেই ভাষাতেই চলতে থাকবে।"

জনসাধারণ এই আইন পাশ হওয়ায় যতই খুশি হোক, আইনজ্ঞের কূটবুদ্ধি তাদের এই দাবি মানেনি। তারা ধুয়ো ধরল, ইংরেজীতে লেখা আইনের কোনো কেতাব নেই, আইনের শিক্ষা দেওয়া হয় প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী ফরাসীতে, এবং আদালতে আইনের যা কিছু বয়ান সব ফরাসীতে—এই সব কারণে অপরীক্ষিত, আনকোরা ও অপরিণত ইংরেজী ভাষাকে আদালতের ভাষা হিসেবে চালু করার চেষ্টা অপচেষ্টা। অতএব আইনী ফরাসীর অপ্রতিহত প্রভাব বজায় রাখার জন্যে কায়েমী স্বার্থ কোমর বাঁধল। কিন্তু সাধারণের ভাষাপ্রীতি তীব্র হওয়ায় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ফরাসীর প্রভাব ক্রমে ক্রমে কমে আসার ফলে সওয়ালজবাব ও যুক্তিতর্কের ভাষা হিসেবে আদালতে ইংরেজীর প্রচলন বেড়ে চলেছিল। জনসাধারণের এই দাবি আইনের নথিপত্রের ক্ষেত্রে প্রথম স্বীকৃতি পায় পঞ্চম হেনরির (১৪১৩—২২) সময়ে। ইকুইটিসংক্রান্ত কার্যক্রম প্রথম ইংরেজীতে নথিভুক্ত করা হয়। অবশ্য লিখিত ভাষা হিসেবে ইংরেজীর আইনের ক্ষেত্রে এই অনুপ্রবেশ আইনের অন্যান্য শাখায় কোনো সাড়া জাগায় না। যাইহোক মাতৃভাষায় আইনীবিতর্ক নিয়মিত চলার ফলে এই সময় থেকে আইনাইংরেজীতে প্রচুর ফরাসী ও লাতিন শব্দ আমদানী হয়।

বহুল ব্যবহৃত ফরাসী শব্দগুলিকে ইংরেজীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। ইংরেজীভাষার অনেক শব্দ আইনের বিশেষ অর্থে এই সময় থেকে ব্যবহার শুরু হয়।

আইনের ক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রভাব ও প্রসার যদিও বেড়ে চলেছিল, তবুও আইনীভাষার অনেকটাই জুড়ে রইল ফরাসী ও লাতিনের আবরণে গুহ্যতান্ত্রিকতা ও দুরভিগম্যতা। সতেরো শতকের মধ্যভাগে শিক্ষিত ইংরেজদের মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা দিল, তাদের কাছেও আইন দুর্বোধ্য রাখা হয়েছে। এরই পরিণতিতে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের কমনওয়েলথ ল্যাঙ্গোয়েজ রিফর্ম আইন পাশ হয়। এই আইনে প্রথম মেনে নেওয়া হল আইন আদালতের লেখবার ভাষা হবে ইংরেজী। এই আইনে নির্দেশ দেওয়া হল ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারির আগেকার মামলার বিবরণ, হাকিমের রায়, আইনের কেতাব, ইংরেজীতে অনুবাদ করতে হবে। ঐ তারিখের পরবর্তী আদালতের যাবতীয় বিবরণ, মামলার রায় ও আইনের কেতাব একমাত্র ইংরেজী ভাষাতেই প্রকাশ করতে হবে। এই আইনের শেষ সাবধানবাণীটি প্রণিধানযোগ্য। এই আইন যে লঙ্ঘন করবে, লঙ্ঘনের প্রতি অপরাধের জন্য অপরাধীকে কুড়ি পাউণ্ড অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। এর পরের বছরে পার্লামেণ্ট থেকে অনুবাদ-কাজ তদারক করার জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়, এবং অনুবাদের কোনো ত্রুটি থাকলে যাতে তা আইনের ভ্রম বলে ধরা না হয়, সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু ফরাসীদেশে নির্বাসিত ইংরেজ রাজকুল এই সময়ে দেশে ফিরে আসে এবং সেইসঙ্গে ফিরিয়ে আনে তাদের ফরাসীপ্রীতি। ফলে, কমনওয়েলথ ল্যাঙ্গোয়েজ রিফর্ম বন্ধ থাকে। কিন্তু ইংরেজীভাষার আইনীমর্যাদা লাভের দাবিকে বন্ধ করা যায় না। শেষ পর্যন্ত ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে আইনজীবীদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে ইংরেজীকে সর্বতোপ্রয়োগের জন্য আইন প্রবর্তন করা হয়। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ মার্চ থেকে সেই আইন কার্যকর হয় এবং শেষ আইনের উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল। এই আইনে দেশের ভাষাকে দেশীয় আইনের ভাষা বলে গ্রহণ করার সপক্ষে যে কারণ দেখানো হয়েছে, তা শুধু ইংলণ্ডে খাটে না, সব দেশেই খাটে।

"Whereas many and great mischiefs do frequently happen to the subjects of this kingdom from the proceedings in Courts of Justice being in an unknown language, those who are summoned and impleaded having no knowledge or understanding of what is alleged for or against them in the pleadings of their lawyers and attornies, who use a character not legible to any but persons practising the law; to remedy these great mischiefs and to protect the lives and fortunes of the subjects more effectually than heretofore, from the peril of being ensnared or brought in danger

by forms and proceedings in Courts of Justice, in an unknown language, be it enacted by the King's most excellent Majesty...That from and after the *25th day of March* one thousand seven hundred and thirty three...all proceedings whatever in any Court of Justice within that part of Great Britain called England and in the Court of Exchequer and in Scotland...shall be in English tongue and language only and not in Latin or French or any other tongue or language whatsoever...and all and any person or persons offending against this Act, shall for every such offence, forfiet and pay the sum of fifty pounds to any person who shall sue."

ইংলণ্ডের আইনীচক্র এই আইন যে সহজে ও স্বেচ্ছায় মানেনি, প্রাণের দায়ে ও শাস্তির ভয়ে বাধ্য হয়ে মেনেছিল, সেই সময়কার নামকরা আইনজীবীদের কথাতেই তা ধরা পড়ে। আঠারো শতকের ইংরেজ ব্যারিস্টার রোজার নর্থ তাঁর 'এ ডিসকোর্স অন দি স্টাডি অফ দি লজ্'-এ বলেছেন "Lawyer and law French are coincident, one will not stand without the other...for really the law is scarce expressible properly in English, and, when it is done, it must be Francoise, or very uncouth... A man may be a wrangler, but never a lawyer, without a knowledge of the authentic books of the law in their genuine language." ইংলণ্ডের আরেক আইনবিশারদ লর্ড এলেনবারো তো বলেই দেন, এই আইন আইনজীবীদের অশিক্ষিত করে ছেড়েছে ("tended to make attorneys illiterate")। ফরাসী লাতিন জানা যদি শিক্ষার একমাত্র মানদণ্ড হয়ে থাকে, তাহলে বটেই তো, তাদের শিক্ষাদীক্ষা রসাতলে গিয়েছিল যদিও সংযতবাক ইয়েসপার্সেনের মতে এই আইনীফরাসী "একটা বিকট জগাখিচুড়ি ভাষা" ("curious mongrel language")।

ইংলণ্ডের আইনেআদালতে যে ইংরেজি সত্য জলচল হল, কে জানত, আড়াইশ বছর পরে সেই ভাষা সাতসমুদ্র তেরো নদী পারে আরেক উপমহাদেশের আইনআদালতে চেপে বসে সেখানকার দেশজভাষাকে দূরে হটিয়ে রাখবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. **Amrita Bazar Patrika** : August 5, 1968.
২. **"** : August 6, 1968.
৩. **Stake of the Chosen few in English Education** : **B.P.R. Vittal / Statesman.** October 17, 1969.
৪. **The language of the law** : D. Mellinkoff.
৫. **A Discourse on the study of the Laws** : R. North.
৬. **Acts and ordinances of the Interregnum (1650). 455.**
৭. **Records in English. 1731** : 4 Geo II. c. 26.
৮. **A Biographical Dictionary of the Judges of England** : Foss (1870). 549.
৯. **Culture, Language and Personality** : Ed. Sapir [essay on 'Language' 39-41]
১০. **Growth and Structure of the English Language (1955)** : Jesperson (Para 84).

নদী নিঃশেষিত হলে

শঙ্খ ঘোষ

এই নামে একটি কবিতার বই লিখেছিল আনোয়ার। আমাদের বন্ধু, আনোয়ার পাশা।

নীলিমা ইব্রাহিমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আনোয়ারের খবর কিছু জানেন? কাগজে যা লিখেছে তা কি ঠিক?

আশা করছিলাম, হয়তো তিনি বলবেন: না, ঠিক নয়। আনোয়ার সময়মতো স'রে যেতে পেরেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, ভালো আছে ওরা। শীগগিরই আসবে কলকাতায়।

কিন্তু তা তিনি বললেন না। বললেন: ওটা ঠিক। আনোয়ার পাশাকে ওরা ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল চোদ্দই ডিসেম্বর। উনি একেবারেই সাবধান হন নি। বরং বিশ্বাস ক'রে ব'সে ছিলেন যে ওঁর কিছু হবে না। পঁচিশে মার্চের হামলায় ওঁদের ঘরেও গুলি ঢুকেছিল, তবু গায়ে লাগে নি। আনোয়ার বলতেন, তাহলে আমি আর মরব না। অথচ সেই মরতে হলো শেষ পর্যন্ত।

শনাক্ত করা গিয়েছিল?

হ্যাঁ। কিন্তু মুখ দেখে নয়। দশদিন পরে পাওয়া শব ফুলে উঠেছিল অনেকখানি, চিনবার কথা নয়। তবু চেনা গেল গায়ের চাদরখানি দেখে। আনোয়ারের ব্যবহার করা পুরোনো পরিচিত চাদর!

'তবু ভালো লাগে হাসতেই, বাঁচতেই' লিখেছিল আনোয়ার। আমাদের বন্ধু, আনোয়ার পাশা। এ যে কোনো বানিয়ে-তোলা কবিতার লাইন, এমন নয়। আমরা যারা ওর বন্ধু ছিলাম, আমরা মনে করতে পারি কেবল ওর হাসিভরা চোখ, আমরা মনে করতে পারি যে কখনোই ওকে ভেঙে পড়তে দেখি নি, ঝুঁকে পড়তে দেখি নি, আমাদের কাছে কেবল ধরা আছে ওর টলটলে স্বভাবের স্মৃতি।

আনোয়ারের বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ। অর্থাৎ আনোয়ার এদেশের ছেলে। আমরা রইলাম এখানে আর আনোয়ার চ'লে গেল আমাদের দেশে। কেন ওকে যেতে হলো সেকথা অনেকদিন ভেবেছি। কেন যেতে হলো? পাশ করবার পর ভাবতা-র ছোট্টো স্কুলটিতে যখন সে পড়াতে ঢুকেছিল, তখনো আনোয়ার ভাবে নি যে ওদেশে চ'লে যাবে কখনো। সেই স্কুল-হস্টেলের একলা ঘরটিতে ব'সে

ব'সে অথবা তার সামনে খেলার মাঠে ঘুরতে ঘুরতে আনোয়ার বলেছিল ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন।

কবিতা? কবিতা লিখছ না?

আমি কি আর লিখতে পারি? তবু, যা লিখেছি তাই নিয়েই একটি বই করবার ইচ্ছে হয়। ভেবে রেখেছি।

সেই ছড়াটা থাকবে তো তাতে? 'এলো লাল ধূমকেতু আকাশে'?

ওটা তোমার খুব প্রিয়, না? শেষ দুটো লাইন কিন্তু দেব না। ওটা থাকবে এইরকম:

এলো লাল ধূমকেতু আকাশে
অনেক আগুন দিল ছড়িয়ে,
আমাদের দীপগুলি আম্মা গো
নেবে না কি সে আগুনে ধরিয়ে?

দীপ তো রয়েছে ঘরে বাছা রে
একটুও তেল নেই জ্বলতে,
আগুন কী আলো দেবে যাদু রে
পোড়াবে কেবলই সে যে সলতে।

যে আগুন আলো দেবে
সে আগুন কই মা?
তোরই তারা-চোখে যাদু
তোরই চাঁদ-মুখে সে।
যে আগুন প্রাণ দেবে
সে আগুন কই মা?
সে যে তোর বুকে যাদু
তোরই পাটাবুকে সে॥

কিন্তু সে-বই তখন বেরুল না। সে-স্বপ্নও অল্পে অল্পে মিলিয়ে গেল কখন, একদিন এসে জানিয়ে দিল আনোয়ার: চললাম পুব বাঙলায়. তোমাদের দেশে। এডোয়ার্ড কলেজে কাজ পেয়েছি একটা।

পাবনার এডোয়ার্ড কলেজ! আনোয়ার সেখানে কাজ করতে যাবে?

ভালোই। তবু মনে পড়ে, পুরো খুশি হতে পারি নি সেদিন। এতো দূরে চ'লে যাবে?

কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ যতোদূর, পাবনাও প্রায় ততোটাই। তবু মনে হলো, আনোয়ার আমাদের কাছ থেকে স'রে গেল অনেকদূর।

কিন্তু আনোয়ার বলেছিল, ফিরে আসব আবার। চিরদিন থাকব না।

তারপর কখন একদিন ঢাকায় পৌঁছল আনোয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে। মধ্যে কখনো কলকাতায় এসেছে ওর নতুন কোনো বই হাতে নিয়ে, কখনো 'রবীন্দ্রছোটোগল্প সমীক্ষা'র মতো আলোচনার বই, কখনো 'নদী নিঃশেষিত হলে'র মতো কবিতা। সবই ঢাকা থেকে ছাপা।

যাওয়া-আসা বন্ধ হলো যখন, খবর জানতুম শুধু চিঠিপত্রে। টের পেতুম যে আরো অনেক লেখা নিয়ে, নতুন লেখার ভাবনা নিয়ে মেতে আছে আনোয়ার। ওদেশের পাঠকের মনে ওর রচনার প্রতিপত্তি কতোদূর পৌঁছেছিল তা আমার জানা নেই, ওর স্নিগ্ধ আচরণ কতোদূর কাছে টেনেছিল ওখানকার মানুষকে তাও আমি জানি না। কেবল, পঁচিশে মার্চের পর অনেকেই যখন আসছেন বাঙলাদেশ থেকে কলকাতায়, জনে জনে জিজ্ঞেস করেছি আনোয়ারের কথা, জানতে চেয়েছি কেন সে আসছে না—অনেকেই ঠিকমতো বলতে পারেন নি খবর। বলতে পারলেন জহির রায়হান। এপ্রিলের শেষ দিকে জহির বললেন: আনোয়ার সাহেব ভালো আছেন। পঁচিশের পর আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কিন্তু আজ জহির নেই। আজ আনোয়ার নেই।

বইয়ের ভিড় থেকে বার ক'রে এনেছি 'নদী নিঃশেষিত হলে'। কদিন ব'সে সেইটেই পড়ছি।

আজ যেন এই কবিতাগুলিতে অন্য রকম রঙ এসে লাগছে। মৃত্যু এইরকম। মৃত্যুর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে যখন কারো জীবনটাকে দেখা যায়, তার কাজকর্ম, তার উচ্চারণ—সে-সবই তখন আরেক তাৎপর্যে ফুটে উঠতে থাকে। চোখবাঁধা এই অপঘাত-মৃত্যুর পরিণাম যার, সে একদিন লিখেছিল 'আমারও একটি ব্রত: সহজ জীবন'। কেমন অসম্ভব পরিহাসের মতো শোনায় না? আনোয়ার হয়তো মস্ত কোনো খ্যাতিমান কবি ছিল না, কিন্তু ওর কবিতাই এখন আমি ভাবছি, কেননা কবিতার মধ্য দিয়েই আমরা ছুঁতে পারি কারো ব্যক্তিগত নিশ্বাস।

সেইরকম এক বুকভরা শ্বাস নিয়ে ও বলেছিল : 'এই মাটিতে এখনো আছে বেঁচে থাকার মানে'।

আজ শুধু চোখে পড়ে বইটি জুড়ে এই বেঁচে থাকবার ইচ্ছে : 'আজকে আকাশে বাতাসে কবিতা নেই। তবু ভালো লাগে হাসতেই, বাঁচতেই'। কিন্তু কোন জগৎ থেকে আঘাত আসতে পারে এই বেঁচে-থাকার ওপর, তারও কি আভাস ছিল না লেখায়? তাহলে এ লাইন কেন লিখবে আনোয়ার : 'সমাজের ধ্বজাবাহী ধর্মীয় ঈশ্বর তুমি সে-প্রেম জানো না একেবারে'?

আরেকজন কবি, আল মাহমুদ, লিখেছিলেন একদিন : 'কে জানে ধর্ম উঠে গিয়ে কবিতাই তার স্থান দখল করে কি না।' আমাদের চোখের সামনে নতুন বাঙলাদেশ জেগে উঠবার সাধনা করছে, সে স'রে যাবার চেষ্টা করছে ধর্ম থেকে কবিতায়, ধর্মীয় ঈশ্বরের প্ররোচনা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছে। ইতিহাস কি মনে রাখবে এই সিদ্ধির পথে কতো অগণ্য বলি দিতে হলো, কতো নিভৃত একাকী মনে এই স্থায়ী গুঞ্জন থেকে গেল বিলাপের মতো : 'আমার সোনার ধান শ্রাবণপ্লাবনে ধুয়ে যায়'?

ধান নষ্ট হয়ে যায়, নদী নিঃশেষিত হয়, কিন্তু তবু খানিকটা সান্ত্বনা নিয়ে বেঁচে থাকি আমরা। কেননা ঐ একই কবিতায় লিখতে পেরেছিল আনোয়ার : 'এখনো সজল আশা আছে তবে কোমল মাটি ও তৃণমূলে'।

আর এই সেদিন, রাজভবনে বলছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান : আমাদের কিছুই নেই। সব নষ্ট ক'রে দিয়ে গেছে ওরা। তবু ভয় পাই না। কেননা এখনো বাঙলাদেশে মানুষ আছে, আর আছে মাটি।

এখনো সজল আশা আছে তবে কোমল মাটি ও তৃণমূলে। এই মাটি ও তৃণের মধ্যে বেঁচে থাকবে আনোয়ার, আর তারই মতো আরো সহস্র শহীদ।

দুদিনের দিনপঞ্জি

আবুল ফজল

২৮.৭.৭১

সমাজে নির্যাতন আর বর্বরতা আগেও ছিল, হয়তো সব সময়েই ছিল। কিন্তু একটা রাষ্ট্রের পক্ষে এমন সঙ্ঘবদ্ধভাবে নির্যাতন, ধ্বংস আর নরহত্যায় সুশিক্ষিত মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়ার নজির আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। শুনেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের নাৎসী বাহিনী য়ুহুদী আর বিজিত দেশের উপর সুপরিকল্পিত ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ নির্যাতন আর গণহত্যা চালিয়েছিল। কিন্তু সে ত ছিল বিদেশ আর বিজাতির উপর। পাকিস্তান বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছে স্বদেশের নিরস্ত্র বে-সামরিক মানুষ—গ্রামের চাষী মজুর থেকে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসনিক অফিসার কেউই এ নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি স্কুল-কলেজের ছাত্রী আর কুলবধূরাও, এমনকি শিশু আর অশীতিপর বৃদ্ধরাও। আশ্চর্য! জাতীয় সৈন্যবাহিনী প্রয়োগ করা হয়েছে জাতির বৃহত্তর জনসংখ্যার বিরুদ্ধে। এবারকার নির্যাতন পাক-ভারতের ইতিহাসে এক জঘন্যতম অধ্যায় হয়েই থাকল। সার্বিক নির্যাতনের এমন কৃষ্ণতম অধ্যায় পৃথিবীর ইতিহাসেও আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ভেবে অবাক হতে হয় এবারকার নির্যাতনকারীরা সবাই মুসলমান আর নির্যাতিতেরও অধিকাংশ তাই। আর এ নির্যাতন চালানো হয়েছে কিনা ইসলামের নামে। ধর্মের এতবড় অবমাননারও দ্বিতীয় নজির অন্যত্র মিলবে কিনা সন্দেহ।

পাকিস্তানের সূচনায় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মহৎ বাণী যাঁরা প্রচার করেছিলেন এ-ক'বছরে তা যে এমন এক বিকট আর বীভৎস রূপ গ্রহণ করবে তা বোধ করি তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হলে তার মহত্বের দিক চাপা পড়তে বাধ্য, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় ধর্মান্ধতা। ধর্মান্ধতার এক ভয়াবহ আর কদর্য রূপ এবার আমরা দেখতে পেলাম পাকিস্তানের এ-ভূখণ্ডে যা এখন বাঙলাদেশ নামে চিহ্নিত।

২৯.৭.৭১

গত বারো-তেরো বছরের সামরিক শাসন মনে হয় দেশ থেকে সব রকম

নৈতিক চেতনা আর মূল্যবোধ সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এ-শাসনামলে সব রকম দুর্নীতি পেয়েছে প্রশ্রয়। দুর্নীতির পেছনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা আয়ুব-আমল থেকেই শুরু হয়। দেখেছি আয়ুব-মোনেমের নামে শ্লোগান আউড়ালে আর ওদের সরকারের পেছনে সমর্থন জোগাতে পারলে সাত খুন মাপ। সে অশুভ ধারা আজো সমানে অব্যাহত। ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষের চারিত্রিক মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার। এবারকার সংকটে আমরা শুধু সরকারী বর্বরতার নগ্ন চেহারাই দেখিনি, সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি আমাদের দেশের সর্বস্তরের মানুষের নৈতিক অধঃপতনেরও এক কদর্য আর বিকৃত রূপ। মানুষের লোভ যে কতখানি দুর্দমনীয় আর কত বেশি সীমাহীন হতে পারে তাও এবার দেখা গেল। এ-লোভ যে এতখানি নির্মম আর হৃদয়হীন হতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যেত না। বাঙলাদেশে যে পাশবিক বর্বরতা সৈনিকের বেশে আবির্ভূত হয়েছে তা অচিরেই দুমুখো সাপ হয়েই দেশের নিরীহ আর অসহায় মানুষের বুকে শুরু করেছে ছোবল মারতে। এ-সাপের পেছনে রয়েছে সরকারী সমর্থন আর পৃষ্ঠপোষকতা। তাই বেপরওয়াভাবে সারা দেশে ছোবল মারতে এ-সাপের কিছুমাত্র বাধেনি।

একদিকে দেশের সংগ্রামী মানুষের বিশেষ করে তরুণদের চরম আত্মত্যাগ আর অসাধারণ বীরত্বে আমরা মুগ্ধ আর গৌরবে স্ফীতবক্ষ, অন্যদিকে দেশের এক শ্রেণীর মানুষের চরম স্বার্থপরতা, নীচতা আর অমানুষিকতায় আমরা আজ লজ্জায় অধোবদন। লোভের এমন ক্রূর চেহারা, প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর এমন হৃদয়হীন আচরণ ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায় নি। আমাদের চোখের উপর দিয়ে ঘটে গেছে দুই দুটা মহাযুদ্ধ, ঘটে গেছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যা তেতাল্লিশের মন্বন্তর নামে খ্যাত। তার উপর দেখেছি দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ঙ্কর তাণ্ডব। কিন্তু লোভের এমন বিকট আর কদর্য চেহারা কখনো দেখা যায় নি। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতার পাশে পাশে নিজের দেশের মানুষের লোভের হৃদয়হীনতার আর পরস্ব অপহরণের যে ঘৃণ্য মূর্তি এবার দেখেছি তা কিছুতেই ভুলতে পারা যায় না, যায় না মন থেকে মুছে ফেলতেও। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতা একদিন কালধর্মে হয়তো ভুলে যাব আমরা, কিন্তু নিজের প্রতিবেশী মানুষের বিকৃত ক্ষুধার অমানুষিক ক্রূর রূপ কি কখনো মুছে যাবে স্মৃতি থেকে? এ-লোভের ফাঁদে কে ধরা দেয়নি? ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, চাষী-মজুর, আলেম-ফাজেল কেউ কি বাদ গেছে? এমন কি কোনো কোনো আলেম (মসজিদের ইমামও) জনসভায় দাঁড়িয়ে এমন ফতোয়াও নাকি দিয়েছে "হিন্দুদের ধন সম্পত্তি 'মালে গণিমৎ' (booty), তাই লুঠ করায় কোনো গুনাহ্ নেই, এ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত অর্থাৎ জায়েজ।" যদি কোনো ধর্মে বা শাস্ত্রে

সত্য সত্যই এমন নির্দেশ থাকে, তাহলে সে ধর্ম আর শাস্ত্রকে আমি ধর্ম আর শাস্ত্র বলে স্বীকার করতে রাজী নই। কোনো ধর্মশাস্ত্র যদি ন্যায় আর নীতি-বিরুদ্ধ কথা বলে তা আদতে ধর্মই নয়। ন্যায় আর নীতিধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্ম হয় না। ঐসব প্রতিষ্ঠা করাই সব ধর্মের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য, ধর্ম অর্থে এ আমি বুঝি আর বিশ্বাস করি। এসব বিসর্জন দেওয়ার নির্দেশ ধর্মহীনতার নামান্তর। আমার নিজের ধর্মেও যদি পরস্ব অপহরণের কিম্বা অন্য ধর্মাবলম্বীর সম্পত্তি লুঠ করার নির্দেশ থাকে, সে-নির্দেশ পালন করতে আমি বিনা দ্বিধায় অস্বীকার করব। প্রয়োজন হলে আমি ধর্মহীন কিম্বা নাস্তিক হয়ে দোজখে যেতেও রাজী কিন্তু অমন নির্দেশ পালন আমার জন্য নৈব নৈবচ।

এ-দুঃসময়ে শহর ছেড়ে প্রথমে হাশিমপুর (চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত এক গ্রাম) গিয়েছিলাম। একদিন ওখান থেকে নিজের গ্রামে যাচ্ছিলাম, মে মাসের শেষের দিক। আমাদের আগের গ্রাম কালিয়াইশ, ঐগ্রাম পেরিয়ে যেতে হয় আমার নিজ গ্রাম কেওঁচিয়ায়। মাস্টার হাটের দক্ষিণে মুসলমান পাড়ার পরেই কয়েকটি হিন্দু বাড়ি। দেখলাম বেছে বেছে এ-বাড়িগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু মাটির দেওয়ালগুলিই আছে খাড়া, চালের কথা দূরে থাক ঘরের দরজা-জানালার কপাট-চৌকাঠ আর উপরের কড়িবরগা পর্যন্ত সব উধাও। নেড়া দেওয়ালগুলি ছাড়া কোথাও কিছু নেই। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক লাঠি ভর দিয়ে পাশের এক পোড়াবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়ালেন। দেখলাম এক বিধবা বুড়ি স্তূপীকৃত ছাইয়ের গাদায় কি যেন খুঁজছে। আর কোথাও কোনো জনপ্রাণী এমন কি একটা গরু-বাছুরও চোখে পড়ল না ধারে কাছে। আগে আগে এসব বাড়ির সামনে দিয়ে যখন যাতায়াত করতাম তখন দেখতাম বাড়ির সামনে ফুলে ভরা বাগান, ক্রীড়ারত কত ছেলেমেয়ে। এখন সব তচ্‌নচ্‌, সব কিছু নিশ্চিহ্ন, অদৃশ্য। খাড়া দেওয়ালগুলি শুধু আকাশমুখো হয়ে যেন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। আষাঢ়-শ্রাবণের প্রবল বর্ষণে এতদিনে তাও বোধ করি ধ্বসে পড়েছে, মাটির দেওয়াল হয়ত মাটিতেই গেছে মিশে। এ বাড়িগুলি রাস্তার পুব দিকে, পশ্চিম দিকেও নজরে পড়ল বহু পোড়া গাছপালা, ঝলসে যাওয়া বাঁশঝাড়। নেড়া-মাথা খাড়া দেওয়াল আর আগুনের লোলহান শিখায় ঝলসে যাওয়া নির্বাক গাছপালাগুলি যেন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল আমার মনের ভিতর। তবুও মুখে কথা জোগাল না, হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য সন্তান আমি শুধু অবাক চোখে কিছুক্ষণ চেয়েই রইলাম। এমন নির্মম অত্যাচারের এতটুকু প্রতিকার করতে যে অসমর্থ সে হতভাগ্য নয়ত আর কি। প্রৌঢ় লোকটি আমার অচেনা, কিন্তু মনে হলো তিনি যেন আমাকে চিনতে পেরেছেন।

এগিয়ে এসে বল্লেন : প্রফেসার সাহেব না ?

: হাঁ।

মুখে কথা না জোগালেও ভদ্রতার খাতিরে কিছু একটা বলতে হয়, তাই বল্লাম : সব পুড়িয়ে দিয়েছে বুঝি ?

অবান্তর প্রশ্ন। নিজের কানেই ব্যঙ্গের মতো শোনাল। চোখের সামনে যা দেখছি তা ত উত্তরের বাড়া। তিনি সোজা আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লেন: মিলিটারিরা বিদেশী, ভিন্ন ভাষাভাষী, তারা আমাদের ঘরে আগুন দিয়েছে তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু যে সব মানুষের সঙ্গে আমাদের বংশানুক্রম সম্পর্ক, যাদের সঙ্গে অহরহ প্রতিদিন উঠ্-বস্ করেছি, হাটে বাজারে পথে ঘাটে খালে বিলে যাদের সঙ্গে রোজ দেখাসাক্ষাৎ, চিরকাল যাদের সুখ-দুঃখের ভাগী আমরা আর আমাদের সুখ দুঃখের ভাগী তারা—আজ সে সব মানুষ যদি চোখের সামনে আমাদের সর্বস্ব লুঠ করে, নিয়ে যায় গোলার ধান, হালের গরু-বাছুর, এমনকি থালা বাসন পর্যন্ত, ছাদের টিন আর দরজার চৌকাঠ-কপাট শুদ্ধ যদি খুলে নিয়ে যায় তাহলে সে-দুঃখ কোথায় রাখি বলুন? এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ভাষা আমি খুঁজে পাইনি। চেনা-জানা প্রতিবেশী মানুষের এমন হৃদয়-হীনতার করুণ কাহিনী আমি অন্যত্রও শুনেছি, নিজের চোখেও কিছু কিছু দেখেছি। যখন হাশিমপুরে ছিলাম সেখানেও এধরনের হৃদয়হীনতার কাহিনী শুনেছি। নিজের গ্রামে গিয়েও এই একই ধরনের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি শুনতে হয়েছে। গ্রাম ভিন্ন বটে কিন্তু কাহিনী একই। বাড়ির আশেপাশের পুকুরে ডোবায় ডুবিয়ে রাখা থালা-বাসন পর্যন্ত রক্ষা পায়নি। ঘরের মেঝেয় গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে রাখা সোনাদানা, টাকাপয়সার ত কথাই নেই। সারা ভিটা কুপিয়ে খুঁড়ে ছত্রখান করে এসব বের করে নেওয়া হয়েছে। গরু-ছাগল আর ঘরের টিন খুলে নেওয়া ত আছেই। গোলার ধান শুধু নয়, দল বেঁধে গোলাশুদ্ধ তুলে নিয়ে গেছে এমন নজিরও বিরল নয়। এসব লুঠতরাজ সাধারণ চুরি ডাকাতির মতো লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রাত্রের অন্ধকারে হয়নি, হয়েছে দিন-দুপুরে সারা গ্রামের চোখের সামনে, যাদের মাল মাত্তা তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে। অনেক য়ুনিয়নের অনেক মেম্বার আর প্রেসিডেণ্টও নিয়েছে এসব দুষ্কর্মে প্রধান পাণ্ডার ভূমিকা আর নিজেরা নিয়েছে সিংহের ভাগ। অসংখ্য পরিবারকে এভাবে একদম নিঃস্ব আর ফতুর করে দিয়ে পরিণত করা হয়েছে পথের ভিখিরিতে। ছেঁড়া কাঁথা বালিশটাও পায়নি রেহাই এমন দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্যও আমার হয়েছে। সামনের বেলা বাড়ির শিশু ছেলে মেয়েরা কি খাবে, রাত্রে কোথায় মাথা গুঁজবে, শীতে কি দিয়ে গা ঢাকবে—বংশানুক্রমে পাশাপাশি বাস করা প্রতিবেশীরা এটুকুও বিবেচনা করেনি। বিধবা আর অনাথের চোখের জলও এদের হৃদয়ে এতটুকু সহানুভূতির উদ্রেক করেনি। লোভ আর হৃদয়হীনতার লোল-জিহ্বা যে কত দীর্ঘ আর কত সর্বগ্রাসী আর তা মানুষকে কি ভাবে যে পশুর চেয়েও অধম করে দেয় তা দেখে মানুষের উপর শ্রদ্ধা আর বিন্দুমাত্র আস্থা রাখা যেন আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এবার মনুষ্যত্বের যে চরম অবমাননা আমাদের চোখের সামনে ঘটে গেল তার অংশীদার যেমন একদিকে পশ্চিম-পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী অন্যদিকে আমরা

বাঙলাদেশবাসীরাও। এ-দুমুখো সাপের একটা মুখ আমরা, এসত্য গোপন করে কোনো লাভ নেই। বিষ ফোঁড়াকে কাপড়ের নীচে লুকিয়ে রাখা হলে তাতে তার বিষক্রিয়া কিছুমাত্র হ্রাস পায় না এবং দেহও হয় না নিরাময়। এ গ্লানিকর দিনগুলির কথা মনে হলে লজ্জায় অধোবদন না হয়ে পারি না। তখন নিজেকে নিজে মনে মনে ধিক্কার দিই। নিজের অসহায়তার কথা স্মরণ করেই ধিক্কার। একবার কয়েকজন তরুণকে ডেকে বলেছিলাম : চলো না আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যেখানে সম্ভব এ-অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। যতটুকু সম্ভব বাধা দিই। কিছুটা অন্তত সুফল তাতে হতে পারে।

উত্তরে অসহায় কণ্ঠে তারা বলেছিল : তা হলে এ-লুণ্ঠনরা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে বলবে আমরা আওয়ামী লীগের লোক, আওয়ামী লীগের সমর্থক। অতএব সরকারবিরোধী। তার মানে মিলিটারিদের শত্রু। তখন সৈন্যরা আমাদের দিকে তাক করে উঁচিয়ে ধরবে হাতের বন্দুক।

তাই ত! আওয়ামী লীগের নাম আজ ওদের কাছে ষাঁড়ের সামনে লাল শালুর মতো। ভাবি কত অসহায় আমরা। মানুষ হয়ে মানুষের সামান্য উপকারেও এগিয়ে যেতে অক্ষম। পারছি না চোর ডাকাতের হাত থেকেও নিজের দেশের মানুষকে বাঁচাতে। পারছি না প্রতিবেশীর একটুখানি দুঃখমোচনে এগিয়ে যেতে। হিন্দুকে আশ্রয় দেওয়া, হিন্দুপ্রতিবেশীকে সাহায্য করা অপরাধ বলে বিবেচিত—স্বয়ং লুঠেরারাই গিয়ে লাগিয়ে দেবে মিলিটারিদের কাছে একথা! যে-সরকার আমার মনুষ্যত্বকে এমন নিম্নতমস্তরে টেনে নামিয়ে এনেছে, সে-সরকারের প্রতি আমি আনুগত্য জানাই কি করে? অথচ বিদ্রোহ করার কিম্বা মুক্তি-ফৌজে যোগ দিয়ে হাতিয়ার তুলে নেওয়ার বয়স আর শারীরিক শক্তি আমার নেই। আমি আজ এ-উভসংকটের শিকার, এক অসহায় জীব। কিছুটা অনুভূতিপ্রবণ বলে এ-অসহায়তার যন্ত্রণাও আমার বেশি।

দিন দুপুরে চোখের সামনে প্রতিবেশীর ঘরে প্রতিবেশী আগুন দিচ্ছে, লুঠতরাজ করে সর্বস্ব নিয়ে যাচ্ছে—কিছুদিন আগেও কি এমন কাণ্ড কল্পনা করা যেত? উভয়ের মধ্যে কতটুকুই বা ব্যবধান! যাদের ঘরবাড়ি লুঠতরাজ করা হচ্ছে আর যারা এসব লুঠতরাজ করছে উভয়ের মধ্যে স্রেফ এ-পার্থক্যটুকুই ত দেখা যায় একজন ডাকেন আল্লাকে অন্যজন ঈশ্বর বা ভগবানকে আর ডাকেন হয়তো ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে। না হয় উভয়ে একই দেশের অধিবাসী, একই ভাষাভাষী, একই সুখদুঃখের ভাগী। তবুও কিনা এ চরম নিষ্ঠুর আচরণ। ধর্মের এ ধর্ম-হীন ভূমিকার সঙ্গে আমি সুপরিচিত। তাই প্রচলিত অর্থে আমি ধার্মিক হতে চাইনি কোনোদিন আর ধর্মনিরপেক্ষতায় আমার বিশ্বাস দীর্ঘদিনের। ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ করে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে তাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের চেষ্টা যদি রাষ্ট্র না করে তাহলে এ-ধরনের অমানুষিক বর্বরতার অবসান ঘটবে না কোনোদিন। তখন এ হৃদয়হীনতার পুনরাবৃত্তিও যাবে না রোধ করা কিছুতেই।

বিভিন্ন স্বর

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

শব্দ ঘিরে ধরেছে বাড়িটাকে। হুইসিল বাজছে থেকে থেকে। চিৎকার উঠছে হুকুমের। হঠাৎ দৌড়ে যাচ্ছে কেউ। সদর দরজা ঝন করে উঠছে, খটাশ খটাশ করে জানালা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো আমগাছ এক রাজ্যের ছায়া দিয়েছে ছড়িয়ে। কাউকে স্পষ্ট দেখা যায় না, শুধু শোনা যায় বিভিন্ন শব্দ, বিভিন্ন ব্যক্তির কর্মতৎপরতা। হঠাৎ শব্দ ওঠে, ফের মিলিয়ে যায়। দূরে আগুনের শিখা জ্বলছে আকাশে। সম্মিলিত আওয়াজ ভেসে আসছে। দমকলের গাড়ি ঘণ্টা বাজাচ্ছে দ্রুত।

বাড়িটাকে ঘেরাও করা হয়েছে। এক দঙ্গল লোক ছুটে এসে ঢুকে পড়েছে বাড়িটাতে। ইলেকট্রিক তার কারা যেন কেটে দিয়েছে। অন্ধকারে আচ্ছন্ন সবকিছু। হয়তো পুরনো বাড়ি, তাই শব্দের অন্ত নেই। দ্রুত ধাবন্ত ইঁদুর সিঁড়িতে বাড়ি খেলে শব্দ উঠছে। হাতের ধাক্কায় দেয়ালের পলেস্তারা খসার শব্দ উঠছে। আর শব্দ উঠছে বিভিন্ন স্বরের।

আবুল চিৎকার করে ওঠে, পানি নেই, পানি ?

অন্ধকারের ভেতর গমগম করে গলা, আবছায়ার মতো মাথাগুলি ছাড়িয়ে দেয়ালে দেয়ালে বেজে ওঠে।

মাশুক আস্তে জিজ্ঞেস করে, পানি দিয়ে কি হবে ?

আবুল একটু থেমে বলে, তালিম ভাই মূর্ছা গেছে। রক্ত পড়ছিল অনেকক্ষণ ধরে।

ঘরের অন্য কোণ থেকে কার যেন গলা ভেসে আসে, চেঁচিয়ে জানান দাও, ওরা আসুক।

আবুল ফের চেঁচায়, কে বলে এসব ?

ফিশফিশ করে কে যেন বলে, উল্লুতেপনা শুরু করেছে বেটা।

দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে মাশুক বসে। মনে হয় চোখ ভেজা। কান্নার গলা বোধহয় ভারী হয়ে গেছে, কি হবে এখন আবুল ভাই। আমার

কাপড় রক্তে ভরে গেছে। এতক্ষণ টের পাইনি।

মাশুকের পাশে বুড়ো মতন একটি লোক হয়তো ঝিমুচ্ছে। ঘুমের গলায় বলে, রক্ত কার? তালিমের?

ঝুঁকে পড়ে হাত বুলোয় বুঝি, বুকের পাশে গুলী বিঁধেছে। থাক, চেঁচিও না।

আবুল ক্ষেপে ওঠে, চেঁচাব না? একটা মানুষ মরে যাবে, আর সবাই চুপ করে বসে থাকব?

বাইরে দ্রুত গাড়ি ছুটে যায়। কেঁপে ওঠে বাড়ির ভিত। বিড় বিড় করে কে যেন বকে, শালা। নিশ্বাস বন্ধ করে সবাই শোনে, শুধু পরস্পরের নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

বুড়োটি অন্ধকারের মধ্যেই অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে মাশুকের দিকে। চোখের মণি জ্বল জ্বল করে, সেই আলোয় আস্তে আস্তে ফোটে মাশুকের মুখ, আস্তে আস্তে ঘিরে ধরে স্মৃতি, সস্নেহে বলে, তুমি ইসমাইলের ছেলে না? বয়স তো অল্প দেখছি। তুমিও এসেছ?

আবুল অবাক হয়ে বলে, আসবে না!

বুড়ো আপন মনেই বলে, ঠিক বাপের মতো চেহারা।

মাশুকের কাছে অসহ্য ঠেকে, দম বন্ধ হয়ে আসে। সেই সকালবেলায় বেরিয়েছে মিছিলে, ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত। কতগুলি ধ্বনি মুখ থেকে মুখে বেজেছে, সেই থেকে তৈরি হয়েছে বিশ্বাস, বর্মের মতো সেই বিশ্বাসে গা ঢেকে ঘুরেছে পথ থেকে পথে। চোখে গেঁথে নিয়েছে দৃশ্য: ফাঁকা পথঘাট, দ্রুত ধাবন্ত গাড়ি, আগুন, লাঠি, গ্যাস, চিৎকার, চিৎকারে ধ্বনিত বিরোধিতা, তাড়া, গলিতে লুকনো, ইঁট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি, ফের চিৎকার। সন্ধ্যা নাগাদ তাড়া খেয়ে ছুটে এসেছে এখানে, পরিচিত অপরিচিত অনেকে, পরে টের পেয়েছে বাড়ি ঘেরাও হয়েছে। অন্ধকারে গলা টিপে ধরেছে সবার। ভয় পাচ্ছে তারা যদি উঠে আসে। উঠে তো আসবেই, ধরা তো পড়বেই, কিন্তু অন্ধকার বলে হয়তো ইতস্তত করছে।

মাশুক না বলে পারে না, আবুল ভাই, কি হলো তোমার?

বুড়ো আস্তে আস্তে বলে, সেই কবে গিয়েছি তোমাদের ওখানে। তোমার মা কেমন আছে? তোমার বাবা? হাঁ, তাতো জানি, জেলে। তা দু-বছর হলো না? ভালোই হলো, গিয়ে বলব: বাপকা বেটা।

হঠাৎ-ওঠা বাতাসের মতো বুড়োর স্বর ছড়িয়ে যায়। বুঝি কাঁপে গাছের পাতা, দীঘির পানি, মা-র শাড়ি, আস্তে আস্তে অন্ধকারের মধ্যে গড়ে তোলে ঐসব, স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ বোধ হয় সবকিছু। সবাই কেমন স্বস্তি বোধ করে।

মাশুকের ভালো লাগতে শুরু করে, ভয়ের ভাবটা কমে যায়। বুড়ো কথার মধ্যে দিয়ে ঘরোয়া পরিবেশ বানিয়ে দিয়েছে। আতঙ্ক অস্বস্তি তাই অজানা মনে হয় না। এতক্ষণ আতঙ্ক অস্বস্তি ছিল বোধগম্যতার পরপারে, যেন অজানা বলেই তাদের পীড়ন সর্বগ্রাসী, মারাত্মক; অনুক্ষণ মনে হয়েছে তারা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে, ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, হয়তো এলোপাতাড়ি মেরে হাতকড়া পরাবে, ঐ বোধটা দাঁত ব্যথার মতো লেগেছে। এখন আর সেই ভাব নেই, আতঙ্ক আর অস্বস্তি ঘরোয়া বিপদের মতো লাগছে।

আবুল আচমকা বলে ওঠে, মরে গেছে। এই দেখ, শিরা বন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েক লহমা চুপ থেকে বুড়ো বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

ভয় ফের ঘিরে ধরে মাশুককে। জ্যান্ত তালিম ভাইকে ভালো লাগত। কিন্তু মরা তালিম ভাই ভয় ধরায়, মরার বোধ ভয় সংক্রমিত করে দেয়, আবুলের দিকে তাকিয়ে মাশুক তাই বলে, আমার ভয় করছে আবুল ভাই।

একটু চুপ থেকে ফের বলে, মুখটা ঢেকে দাও না। কেমন দেখাচ্ছে।

বুড়ো হাত বাড়িয়ে দেয়, এদিকে আয়।

মাশুক তার দিকে সরে আসে।

বুড়ো বলে, ভয় করছে ? ভয় কিসের। আমরা এতগুলো মানুষ এখানে রয়েছি।

মাথা ঝিম ঝিম করে মাশুকের। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। মা-র সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। আবুল ভাই আর তালিম ভাইয়ের কথায় স্কুল ছেড়ে না বেরোলে হত, কিন্তু বাবার কথা তারা বলায় সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। বাবার মুখ ঝাপসা মনে পড়ে। জেলে থেকে থেকে মুখ তাঁর কেমন তারার মতো সুদূর। বুড়ো বোধহয় বাবার বন্ধু। কখনো ওদের বাসায় বুড়োকে দেখেছে কি ? মনে পড়ে না। হয়তো এসেছেন ও যখন খুব ছোট ছিল, হয়তো এসেছেন বাবা যখন জেলে যেতেন না।

বুড়ো আস্তে আস্তে বলে, মাশু।

মাশুক জবাব দেয়, কি ?

ওকে কাছে টেনে নিয়ে বুড়ো বলে, পাগলা, অত ভাবিস কেন বলতো।

আচমকাই আবুল বলে, ভেবে লাভ আছে নিশ্চয়ই। ভাবতে ভাবতেই ইশারা মেলে পথের।

একটু বুঝি হাসে বুড়ো, কে জানে। তোর মতো বয়েসে তাই ভাবতাম, সব কিছু সহজ বোধ হত। এখন কেন জানি মনে অত জোর নেই।

আবুল জোরেই বলে, তাহলে আজ কেন এসেছেন ?

কয়েক লহমা চুপ থেকে বুড়ো বলে, অভ্যাস হয়ে গেছে। কিছু হলে থাকতে পারি না।

মাশুক হঠাৎ ফোঁপাতে শুরু করে। সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। স্তব্ধতার ভার সবাইকে পাগল করে তোলে। বন্ধ দরজার বাইরের সব শব্দ অদ্ভুত, আশ্চর্য ও ভয়ানক ইঙ্গিত দেয়া শুরু করে।

আবুল বলে ওঠে, কথা কন চাচা। ভালো লাগছে না।

সিধে হয়ে বসে বুড়ো বলে, হাঁ তাই ভালো।

যেন কথা বললে দূর হবে নিঃসঙ্গতা। কোনো কিছু করার এখন নেই: বাড়িটা নিঝুম, দূরে নানা শব্দ আর অন্ধকার। যেন অন্য পৃথিবী, প্রাত্যহিকতার পরপারে ; কেবল ক্লান্তি, রক্ত, ক্ষোভ দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে সবাইকে।

কোণ থেকে কে যেন বলে ওঠে, আবার বক্তৃতা করছে, সখ কত।

মাশুক আস্তে আস্তে বলে, চাচা।

বুড়ো জবাব দেয়, কি ?

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মাশুক বলে, আচ্ছা চাচা, বাবাকে ছেড়ে দেবে না।

আবুল একটু হেসে বলে, এখানে বসে ছাড়া পাওয়ার ভাবনা করা শুনা।

কয়েক লহমা চুপ থেকে মাশুক বলে, করব না ? মা কতো রাত চুপিচুপি কাঁদে বালিশে মুখ গুঁজে।

বুড়ো বলে ওঠে, কাঁদবে না ? বাবাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, কাঁদবে না ?

বাইরে কাদের পায়ের শব্দ ওঠে। জোর গলায় কে যেন কি সব নির্দেশ দেয়। সদর দরজা খোলার আওয়াজ হয়। ঠাণ্ডা তীব্র হাওয়ার মতো সেই শব্দ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

আবুল আপন মনেই বলে, এইতো তালিম ভাই মরে গেছে, তোর পায়ের কাছে শুয়ে। কেমন অদ্ভুত লাগছে সব, খাপছাড়া। সারা সকাল সারা দুপুর একত্রে ঘুরেছি। এখন একজন নেই। বিশ্বাস হয় না।

মাশুকের মনে ভাবনা জাগে : ব্যাখ্যায় সবকিছু বোঝা যায়, সরল সহজ মনে হয়, তবু তো অনিশ্চয়তা দূর হয় না।

ঘরের অন্যদিকে সাড়া ওঠে। এলোমেলো কথাবার্তা শোনা যায়। কিছুটা উত্তেজিত স্বর, তাতে আবেগ মেশানো।

কে যেন বলে, আবুল, আবুল।

আস্তে আস্তে আবুল বলে, কী?

ছাদ বেয়ে পাশের বাড়িতে চলে যাওয়া যায়।

একটু ব্যগ্র আবুলের স্বর, তাই নাকি?

হাঁ।

তাহলে একজন একজন করে চলো।

সবার কি যাওয়া সম্ভব!

না, সবাই নয়।

কয়েক লহমা চুপ থেকে আবুল বলে, ঘেরাও করেছে। সবাই গেলে চোখে পড়বে। চাচা থাক আর মাশুক, আর দু-তিনজন।

বুড়ো বলে ওঠে, তোমরা যাও। আমি থাকি, আমার সব সয়ে গেছে। তবে, মাশুক যাক।

আবুল বলে, মাশুক বাচ্চা ছেলে। ওকে কিছু বলবে না। ও থাক।

মাশুক হাত ধরে, আবুল ভাই।

না, তুই থাক।

আস্তে আস্তে পেছনের দরজা খুলে ছায়ার মতো মিলিয়ে যেতে থাকে সবাই। ঘর হঠাৎ হাল্কা বোধ হতে থাকে। নিশ্বাসে ভার লাগে না।

মাশুক বলে, জীবনটা বড়ো দুঃখের না চাচা?

একটু থেমে বুড়ো সস্নেহে বলে, নারে, না। এই তো আমার দিকে দেখ, ষাট বছর পেরিয়ে গেছি। কতো দেখেছি কতো সয়েছি। জীবনটা বুঝলি ধান তোলার মতো। একবার ধান তুলতে পারলে, গোলায় ওঠাতে পারলে সারা বছর নিশ্চিন্তি। না তোলা পর্যন্ত সময়টা বড়ো কঠিন।

আচমকা মাশুক কাঁদতে শুরু করে। তালিমের লাশের উপর পানি ঝরতে থাকে। মৃদু গলার কান্না, বুঝি শেষ নেই অন্ত নেই এমন শোনায়। বুড়ো চুপ করে বসে। একবার চোখ তুলে মাশুককে দেখে। ফের চোখ তুলে তালিমের লাশ দেখে। হয়তো কিছু ভাবে। নিঝুম মনে হয় সবকিছু। শুধু কান্না লাশ

ঘিরে বুড়োর দিকে যাচ্ছে। বুঝি বুড়ো আশ্রয় কিংবা আর্তির জবাব।

বুড়ো মাশুককে কাছে টানে, তোকে ওরা কিছু বলবে না। কিছু হয়তো জিজ্ঞেস করবে। কিছু বলবিনে। তোকে ওরা ছেড়ে দেবে।

মাশুকের কান্না থেমে যায়। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকে, শুধু বলে, আমার কিন্তু ভয় করছে।

বাইরে পায়ের শব্দ ওঠে, মনে হয় সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। সারিবদ্ধ, নিয়মানুগ, উদ্ধত, স্পষ্ট; একটা একটা করে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে; শব্দের অভিঘাত বেজে উঠছে সারা বাড়িটাতে।

বুড়ো আস্তে আস্তে বলে, মাশু।

মাশুক জবাব দেয়, চাচা।

বুড়োর দুচোখে জাগে তালিমের লাশ। শব্দের কোলাহল বাজে কানে। বিড় বিড় করে বকে: ধীরে ধীরে চালাও ছুরি আমারই গলায়। মাশুক চোখ মেলে শোনে, হাত বাড়িয়ে তালিম ভাইকে ছোঁয়, বুঝি সাহসের জন্য। বাইরের দরজায় আওয়াজ ওঠে।

বুড়ো বলেই চলে: কাঁদে না কাঁদে না জয়নাল
কারবালার ময়দানে
কাঁদে না কাঁদে না জয়নাল

মাশুক ফুঁপিয়ে ওঠে, চাচা।

দরজা ভেঙে ছায়ামূর্তিরা সব তাদের ঘিরে ধরে।

“রণক্ষেত্রে”…“দীর্ঘবেলা”…

শহিদুল্লা কায়সার-কে আরো বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেই খুন করা হয়ে গেছে এই খবরটিতো জেনেইছিলাম। দুশ আঠাশ করে মোট চারশ ছাপান্ন পাতার উপন্যাস আবার এদিককার বেঙ্গল পাবলিশার্স আজকাল দুই খণ্ডে বের করছে নাকি, একখণ্ডে হলেও তো দাম সেই সাড়ে ষোল থাকতেও পারত, বইটির নামপত্রে ‘১৯৭১-এ জয়বাংলা পুরস্কার প্রাপ্ত’, আর ‘প্রথম বেঙ্গল সংস্করণ’ এই দুটি পরিচয় মাত্র থেকে শুরু করে প্রতিটি লাইন ও প্রতিটি লাইনের ভেতর দিয়ে দিয়ে যেতে যেতে একেবারে শেষ নাগাদ আমি এই খবরে পৌঁছে যাই শহিদুল্লা কায়সারের ছোটভাই জহির রায়হানেরও কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ আমাদের এই মফঃস্বল শহরে ঠিক সেই দিনগুলিতে আমাকে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেওয়ালে বাজারে, দুটি চোখের সমান্তরাল দুই দরজার ফ্রেমে আটকানো ‘জীবন থেকে নেয়া’ পোট্রেটটার মুখোমুখি হয়ে যেতে হয়। “সব কিছু ছাপিয়ে রাবুর কানে এসে বাজে শুধু একটি কথা—আমি আসব। আমি আসব”—উপন্যাসের এই শেষ লাইনটি ব্রিগেড প্যারেডের মাঠে ছয়ই ফেব্রুয়ারি মুজিবের মিটিং-এর মিটার ধরতে দেরি করিয়ে দেয়। একশ চুয়াল্লিশ লেনিন সরণিতে নামপরিচয়ের আগেই দুই হাত তুলে, কখনো নিচু হয়ে স্বদেশী গানের একটা ফিল্মের পালার সম্ভাব্য চিত্রনাট্যের বর্ণনায় বর্ণনায় জহির রায়হান স্বয়ংযোজিত হয়ে গিয়েছিলেন আমার কাছে, গেল জুনের কোনোদিনে। দুই হাত আকাশে সেই তোলা তাঁর এই নিরুদ্দেশ সমস্ত উপন্যাসখানি জুড়ে ছেয়ে আছে। আর আজই, আটই, ওপরের কটি লাইন লেখা হতে হতে ঢাকাতে ফিরে গিয়ে মুজিবের কণ্ঠ শেষ হয়ে যায় কলকাতা বেতার থেকে আমার এই লাইন কটি ভেবে নিশ্চয়ই, গীতা ঘটকের গলার রবীন্দ্রনাথে—“নেই কেন সেই পাখি, নে-এ-এ-এ-ই-ই কেন”, “যে ফুল ঝরে, সে ফুল ঝরে, ফুল তো থাকে ফুটিতে”—পাখি আর ফুলের সেই সাবেকী বাঙলা অনুষঙ্গ, গা-হাত-পা ঝেড়ে ফেলতে চাই, যতোই না।

সংশপ্তক : শহীদুল্লা কায়সার। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দুই খণ্ড একত্রে : ১৬·৫০

শহিদুল্লা কায়সারের সংশপ্তকের সবকটি পাতা জুড়ে এই অনুষঙ্গটুকু ছড়িয়ে ছড়িয়ে গিয়ে সারা উপন্যাসেরই মূল প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে—আত্মস্থ বাঙালির এই অনুষঙ্গ। আত্মস্থ বাঙালিয়ানায় নতুন রেনেসাঁসের প্রবলতর গতি বাঙালিসমাজের যে অংশকে ইদানীং উনিশ শতক রেনেসাঁসের একশবছর পর, নিজের দিকে মুখ ফিরিয়েছে, শহিদুল্লা কায়সারের উপন্যাসের ঘটনাস্থল, স্বভাবতই, সেই পূর্ববাঙলা, মাত্র সেদিনও যা ছিল পাকিস্তানের পূর্ব প্রদেশমাত্র। যে-বাকু'লয়া গ্রামে উপন্যাসের প্রথম লাইনটি ও যে-কটি চরিত্রে সেই প্রথম-অংশের প্রতিষ্ঠা, শেষেও যে সেই গ্রাম, সেই চরিত্রগুলি ফিরে আসে, মাঝখানে এত এত বছরের ও যুদ্ধের ও দাঙ্গার ও স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা পেরিয়ে পেরিয়ে নতুন তাৎপর্যে—তাতে মনে হতে পারে, আর সত্যও নিশ্চয়, উপন্যাসটিতে শহিদুল্লা একটা বৃত্ত আঁকতে চেয়েছিলেন। বুঝিবা তাঁর একটি ছক ছিল। ছিলও হয়তো। বা থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একটি যুদ্ধ আর মন্বন্তর আর স্বাধীনতা—ঘটনা হিসেবে এর চাপ এতো সংহত যে ছকটার সীমারেখা ঢাকা পড়ে যায়। বা সীমারেখাটা পাঠক হারিয়ে ফেলেন।

উপন্যাসের সমালোচনায় টেকনিকের প্রশ্নে এই প্রসঙ্গটি খুব দরকার হতো, আমার পক্ষে, যদি শহিদুল্লা কায়সার জীবিত থাকতেন। তবু, লেখকের ছক তার বিষয় কি করে ভেঙে দেয়—আমাদের এদিককার বাঙলা সাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে, সেটা খুব শিক্ষাপ্রদ, কারণ এখানে ছকটাই বিষয়কে বদলে বদলে দিয়ে যায়। "নতুন লিখবার মতন আর কোনো বিষয় নেই" কোনো কোনো সৎ তরুণ এই স্লোগান দিয়ে অন্তত ভাষায় বা পরিবেশনে নতুন কিছুর চেষ্টা করেন, কিন্তু বয়স্করা নিজেদের লেখায় বারবার ঐ স্লোগানটি প্রমাণ করেই যান শুধু। কিন্তু এ-উপন্যাসে বিষয়ের চাপ কি অসহ্য, সারা জীবনের গীতি অন্বেষণের পর মালুকে, মালেককে, গাঁয়ে ফিরে বসন্তরোগের মহামারীতে নেমে যেতে হয় যখন তখন কিন্তু সে তার দেশের শ্রেষ্ঠ লোকগীতি গায়কের মর্যাদা ছেড়ে এসেছে, সহজ প্রাপ্ত গায়ক মর্যাদা ছেড়ে দিয়েছে সুরের নতুন অন্বেষণের তাগিদে। মালুর পক্ষে আর কিছু করার থাকে না। বসন্ত মহামারীতেও যে সর্বনাশ তার মুখোমুখি হয়ে যাওয়া ছাড়া, যেমন রাবু শেষ পর্যন্ত আর কী-ই-না করতে পারে, মৃত্যুশয্যা ছেড়ে মেজভাইকে আবার ফিরে পাবার জন্য জেলখানায় পাঠিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া। শহিদুল্লা ভাইয়ের ছক কোথায় উড়িয়ে দিয়ে এই মানুষগুলি উপন্যাসে এমন সত্য হয়ে গেল। এ-উপন্যাস

আর একবার আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় কোন কোন ব্যক্তি উপকরণ পূর্ব-পাকিস্তানকে বাঙলাদেশ করে দেয়। ফরাশী বা রুশ বিপ্লবের প্রধান উৎসে যেমন পাঠককে যেতে হয় উপন্যাস আর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের সংসারগুলোর ভেতর দিয়ে, সাফল্যে ঐ সব উপন্যাসের সন্নিহিত নিশ্চয়ই নয়, তাৎপর্যে "সংশপ্তক"-ও কিন্তু অনুরূপ বাতলে দেয় বাঙলাদেশের মুসলমান সমাজের ইতিহাস।

আসলে ইতিহাসে তাঁর বাধ্যতা এতোই যে মুসলমান সমাজের টাইপগুলোকে এনেছেন প্রায় আলঙ্কারিক বাছাইয়ে। প্রাচীন সামন্ত—ফেলু মিঞা, প্রাচীন সামন্ত থেকে নতুন চাকরিজীবী—সৈয়দ বাড়ি, দালাল যারা জাহাজে বার্মা মুলুক পর্যন্ত ধায়—রমজান, সম্পন্ন মুসলমান বাড়ির অন্নজীবী—মালু, ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজের নানা ধরন—দেওয়ানা মাস্তানাদের ফিকির দরবেশ, আর মালুর বাবা, নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব—জাহেদ-রাবু-মালেক—ইত্যাদি ইত্যাদি, তালিকাটা আরো লম্বা করে দেওয়া যায়। এর ফলেও প্রতিটি আলাদা উপাখ্যান বা অংশ লিখবার গুণে এমন প্রধান যে, উপন্যাসটি একটা কোনো কেন্দ্র খুঁজে পায় না, অনেকক্ষণ, যেন কখনো ফেলুমিয়া, কখনো জাহেদ-রাবু, কখনো মালু—এমন ব্যাখ্যাও মনে আসে বুঝিবা এই সময়টিও কোনো একজনকে কেন্দ্র করে থাকতে পারে না—কিন্তু ঘটনাগুলো এত ঘনঘন এসে যেতেই থাকে যেন শেষ পর্যন্ত এ-সবের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়াটুকুই শুধু চরিত্রগুলোর পক্ষে প্রধান, শুধু চলে যাওয়াটুকু, তখন আর কোনো কৈফিয়তই খাটে না, সত্যি উপন্যাসটির কেন্দ্র নেই, সব ভার যেখানে কেন্দ্রিত, যে-কোনো শিল্পকর্মের প্রথম, বুঝিবা একমাত্র শর্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের গ্রাম, যুদ্ধ দাঙ্গার কলকাতা, স্বাধীনতার পরের ঢাকা, স্বাধীনতার আরো পরের পূর্ববাঙলার গ্রাম—এতগুলি ঘটনাস্থল হয়তো উপন্যাসটিকে খানিকটা আকীর্ণ করে দেয়। এর যে-কোনো একটাই তো সঙ্কটের গর্ভ, সে-সঙ্কট ব্যক্তিরই হোক আর সমাজেরই! এত হাতড়াতে হয় কেন ঔপন্যাসিককে।

উপন্যাসের ধরতাই-এ কিন্তু এই ব্যস্ততা নেই। প্রথম পরিচ্ছেদে লেখককে কতো ধীরে সুস্থে প্রায় প্রত্যেকের চেহারা কাজকর্ম মতলবের বর্ণনা দিতে হয়, একটা মেয়ের কপালে "ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জের নাম আর প্রতিকৃতি অঙ্কিত কলঙ্ক চিহ্ন" লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে, আগুনে পুড়িয়ে—এমন একটি ঘটনার আশ্রয়ে। নতুন পর্দা নেয়া রাবু আর আরিফা, মালুর সঙ্গে বাসুর বাল্যপ্রণয়, রমজানের

দালালি আর লেকু প্রভৃতি গাঁয়ের গরিব চাষাদের জীবন—লেখক অনেক অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ।

লীগের রাজনীতি থেকে লেখক যেন কিছুটা মুশকিলে পড়েন। যখন এ-উপন্যাস প্রথম বেরিয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই সব কথা বলা যেত না। তাই লীগের রাজনীতিকে তার যোগ্য পরিপার্শ্বে লেখক আনতে পারলেন না। বেশ শান্তশিষ্ট সেকেন্দার মাস্টার আধপাগলা হয়ে যেতে থাকে—তা ছাড়া সুস্থ জীবনের বিকল্প কথাটিকে উপন্যাসে আনার আর কোনো পথ লেখকের সামনে, অন্তত লীগরাজনীতির অংশটুকুতে, খোলা থাকে না। আর এই পরিপার্শ্বে ব্যক্তি মানুষগুলি তাদের যথাযথ স্থানে জায়গা পেয়ে যায়, স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট জায়গা, আনন্দ দুঃখ দ্বন্দ্বে নিশ্চিত জায়গাটি।

২০৪ পৃষ্ঠায় মালু প্রকাশ্যে নতুন গান বানিয়ে সেই প্রথম প্রকাশ্যে গাইল, জাহেদ-সেকেন্দারের কাজকর্ম একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল, সৈয়দ বাড়িতে তালা পড়ল, আখরি মারা গেল—এই সব ঘটনাগুলো উপন্যাসের গোড়া থেকেই লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে। এই পর্যন্ত প্রথার দিক থেকে উপন্যাসের একটা গড়ন আছে। কিন্তু তারপর থেকেই মাত্র দুটি একটি প্রতীকী ঘটনা বেছে নিয়ে লেখক সময়ের ভেতর দিয়ে শুধু চলে যেতে লাগলেন, যেমন যুদ্ধে দুর্ভিক্ষের গ্রামে ৩৬ পাতায়, কলকাতা শহরে যুদ্ধেদাঙ্গায় ৬৯ পাতা, ঢাকায় স্বাধীনতার পর ১০০ পাতা, আবার গ্রামে ৬০ পাতা। এ-পাতার হিসেবের উদ্দেশ্য লেখককে কত কম জায়গায় কতো বেশি ঘুরতে হয়েছে, তাই তার পা দুটো যেন কোথাও থিতু হতে পারেনি, অথচ উপন্যাস কি আঙ্গিকে বারবারই ফিরে পেতে চায় না তার সেই আদিমতা, আগুনের শিখায় মুখে মুখে ছায়া আলোর চলৎরেখা ভেঙে গড়ে যায় সুরের ক্ষীণতম গ্রামান্তরে অপরিবর্তিত সেই কাহিনী শুধু ঘুরতেই থাকে কোনো একটি মাত্র বিষয়কে ঘিরে ঘিরে যেন, এগতেই চায় না।

ফলে শহিদুল্লা কায়সারকে ঐ ২০৪ পাতার পর থেকেই সিনেমার টেকনিকে যেতে হয়। "নে, ধর, বন্ধুর নায়ে নীল বাদাম"—এই সংলাপ বাক্যটির ওপর ভর দিয়ে "মালু ধরে এবং গেয়ে চলে।…অশোক ততক্ষণে তবলার গায়ে হাতুরি পিটতে লেগেছে"—এমন ছবির বা কাজের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি মালু কলকাতায়। বা 'স্যার' সেই কখন থেকে বেচারা করিম দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। কে যেন মালুর সাথে দেখা করবে বলে অপেক্ষা

করে আসছে অনেকক্ষণ। "মুখ তোলে না মালু। কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে চলেছে ও। 'পাঁচ মিনিট পরে।' কথাটা বলেই আবার কাগজের তাড়ায় ডুব দেয় মালু। সই চালায় খস্ খস্।"—এই রকম ছবির ওপর ভর দিয়ে দিয়ে আমাদের পৌঁছতে হয় ঢাকা শহরে।

হয়তো লেখক ভেবে নিয়েছিলেন বাকুলিয়ার পর তালতলিতে যুদ্ধের গ্রাম ও চোরাকারবার, কলকাতায় গানের সাধনা, দাঙ্গা আর জাহেদ-রাবুর সম্বন্ধ, ঢাকায় মালুর পেশাদারি সিদ্ধি ও উচ্চ মধ্যবিত্তের নতুন ও পুরনো মূল্যবোধের সংঘাত, রিহানা-মালুর দাম্পত্য জীবন—এমনি ভাগ ভাগ করে দেখাবেন। ভাগগুলো মিলিত ভাবে একটি কোনো সামগ্রিকতাকে গড়ন দেয় নি। এই ভাগগুলো মিলে যাবে কোন কেন্দ্রে—পীরের বৌ রাবু কি করে জাহেদের সহচরী হয়ে ওঠে, গাঁয়ের মালু বায়তি কি করে দেশের শ্রেষ্ঠ গায়ক হয়ে উঠে সে-শ্রেষ্ঠতার পদবী প্রত্যাখ্যান করে, রমজান কি করে কাজী হয় বা ছড়মতি কি করে মেমসাহেব হয় আবার ছডমতি হয়।—এর যে-কোনো একটিকে নিয়েই তো একটা উপন্যাস হতে পারে। কিন্তু এতগুলো প্রসঙ্গ শহিদুল্লা কায়সারকে এই একটি উপন্যাসে আনতে হয়েছে।

কারণ, আজ বুঝছি, তাঁর দরকার ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের মানুষ-গুলোকে, এই সব মানুষগুলোকে, এই স-বা-ই-কেই একত্রে শিল্পের বিষয়ে নিয়ে আসা।

কারণ, এ-উপন্যাস পড়ে মনে না হয়ে পারে না, ঔপন্যাসিক আরো একবার, এই আমাদের ভাষাতেই, ইতিহাসকেই চিনে নিতে পেরেছিলেন ব্যক্তি মানুষের সঙ্কটে বিকাশে।

তাই, বিষয়ে শহিদুল্লা কায়সার মহাকাব্যের (এপিকের) সন্নিহিত। প্রাক্‌যুদ্ধকালের বাঙালি মুসলমান সমাজ। সে-সমাজের একটি অনূঢ়া কিশোরীর বিয়ে হয়ে যায় ষাট বছরের এক পীরের সঙ্গে, ধর্মই তার ব্যবসায় শুধু এই যৌতুকে। আর উপন্যাসের শেষে, সেই মেয়েটি তার ভালোবাসার পাত্রের শিয়রে অবিবাহিত ভালোবাসা নিয়ে রাত পুইয়ে দেয়—ভালোবাসা ছাড়া সে নায়কের দেবার কিছুই নেই, দেশকে বা নারীকে, শুধু এই যৌতুকে। এ-উপন্যাসের শুরুতে একটি বালিকা তার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া পর্দার আড়াল থেকে চুরি করে করে দুনিয়া দেখে। এ-উপন্যাসের শেষে সেই যুবতী বোরখার সীমানায় তার কপাল ঢেকে রাখে—বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে অন্বয়ের তাগিদে

সবাই বুঝতে পারবেন, যে বাক্যটিতে আমি দাড়ি দিয়ে এলাম সেটি বা তার আগেরটি—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। করতে পারা উচিত। কেবল সাধুবাদও তো আমি দিতে চাইছি না। কিন্তু কি হবে এতো কথা বলে? এতো কথা বাড়িয়ে কি লাভ?—যদি এই অসামান্য জীবিত উপন্যাসটি তার চলমান লাইনগুলির ফাঁকে ফাঁকে সেই নিহত লেখকের নিরুদ্দেশ সমাধিটিকে বয়ে নিয়ে যেতে থাকে যেখানে সহকর্মীর ভালোবাসায় আমি কোনোদিন পৌঁছতে পারব না, না এই আলোচনা, বা কোনো ধূপ বা ফুল। সে গীতা ঘটক যতই গান না কেন "ফুল তো থাকে ফুটিতে"। তাঁর রবীন্দ্রনাথের সান্ত্বনায় তো এতগুলো লাইন আমি লিখে ফেলতে পারলাম। কিন্তু যে উপন্যাসের প্রকাশ্য আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ মহাকাব্যের, নামেও তো সেই মহাকাব্যেরই স্মৃতি, যে-সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে নি, যতো দীর্ঘই হোক রণক্ষেত্র বা যুদ্ধকাল। আমি তো আর শহিদুল্লা কায়সারের কাঁধে হাত রেখে এই মহাকাব্যিক উদ্যোগের সংবর্ধনা করতে পারব না।

শহিদুল্লা কায়সারের কঙ্কালটি তো সনাক্ত করা যাবে না। বা জহির রায়হানের। যদি যেত, সেই কঙ্কালের আঙুলে কলম আর ক্যামেরা গুঁজে দিয়ে বলতাম—আপনাদের কঙ্কাল হওয়ার ইতিহাসটা একবার লিখুন, তুলুন, কারণ আপনারাই তো কঙ্কালের মানুষ হওয়ার কাহিনী তুলেছিলেন।

তা যখন হবার নয়, আমার এই অস্ত্র, কলমের নিবটাকে, দুইহাতে শূন্যে তুলে রাখতে দিন, মাথাটা নত করতে দিন, নিহত সহযোদ্ধার স্মৃতিতে এই দেহহীন সমাধিস্তম্ভের সামনে নীরব হতে দিন—এই রণক্ষেত্রে, এই দীর্ঘবেলায়, আপাতত একা।

দেবেশ রায়

বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক কবিতা

বাঙলাদেশের কবিতার সামগ্রিক আলোচনা এখনও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, আমরা অনেক কিছুই জানি না। এছাড়া পক্ষপাতদুষ্ট কিছু জানার বিড়ম্বনার চেয়ে কিছু না জানাই শ্রেয়ঃ। এর মধ্যে বাঙলাদেশের কবিতা সম্পর্কে যতটুকু জানতে পারছি তার উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত মতামত তৈরি করা তাই আমাদের পক্ষে অনুচিত হবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বাঙলাদেশের

কবিতা আর পশ্চিম বাঙলার কবিতার সম্পর্ক এত নিবিড় এবং একই উৎস থেকে উৎসারিত হওয়ার জন্য তা এতই আত্মীয় যে, বিচারের ভুলত্রুটি উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। বিশেষ করে এই সময়ে, যখন বাঙলাদেশ আমাদের মানসিক জগতে রক্তাক্ত বিস্ময়।

"বাঙলাদেশের কবিরা বাঙলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের যথার্থ সৈনিক।"—কথাটি লিখেছেন আবদুল হাফিজ তাঁর সম্পাদিত 'রক্তাক্ত মানচিত্র'-এ। এই অনাড়ম্বর সত্য ও দৃঢ় উক্তির পিছনে লুকিয়ে আছে পঁচিশ বছরের সাধনা। আজ সেই সাধনার আংশিক সিদ্ধি।

আমার মনে হয়েছে, পঁচিশটি বছর বাঙলাদেশের কবিদের অতি সহজে এমন একটা উপলব্ধির জগতে ঠেলে দিয়েছে যা পশ্চিম বাঙলার কবি-মানসের সামগ্রিকতায় এখনও যথেষ্ট অস্পষ্ট। কবিতা ও সমাজ, কবি ও সামাজিক দায়িত্ব, রাজনৈতিক কবিতা ও অ-রাজনৈতিক কবিতা—এই রকম আরো অনেক অর্ধ শিক্ষিত সমস্যা শিক্ষিত ব্যক্তিদের মগজে ভীমরুলের চাকের মতো বাসা বেঁধে আছে। আঘাত লাগলেই বেরিয়ে আসবে তা হুল নিয়ে গুন গুন করে। সামান্য সুযোগ-সুবিধা এলেই আমাদের তার্কিক বুদ্ধিজীবীরা নানা তর্কের অবতারণা করে কবিতার পাঠকদের ঠেলে দিতে চান এক রুগ্ন জগতে। অথচ বাঙলাদেশের কবিরা কেমন সহজে অগ্রাহ্য করে যান এত শঠতাপূর্ণ প্রলোভনগুলিকে, আর একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের সূত্রে অনায়াসে নিজের করে নেন বিষ্ণু দে-র ছন্দের সিদ্ধিকে, সুকান্তের মানবিক আবেদনকে। বিষ্ণু দে-ও তাঁর সম্পাদিত 'বাংলাদেশের কবিতা—এক স্তবক'-এ লেখেন, "পরিবেশ ও মানসগত কারণে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সাহিত্যাবেগের উৎসের তারতম্য"-এর কথা। বিষ্ণু দে ঠিক কি বলতে চেয়েছেন তা যথেষ্ট পরিষ্কার না হওয়া সত্ত্বেও এই কথা অনুমান করা হয়তো বিভ্রান্তিকর হবে না যে, তিনিও দুই বাঙলার সাহিত্যাবেগের তারতম্য স্বীকার করেন।

আমি মনে করি যে, পূর্ব বাঙলার কবিতায় সামাজিক দায়িত্ব এবং কবিচেতনা এক ও অভিন্ন। এবং এরই ভিন্ন পটে দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিম বাঙলার অধিকাংশ কবির জগৎ। সেখানে মেটাফিজিক্যাল ফাজালিম 'প্রজ্ঞা'

১. রক্তাক্ত মানচিত্র—সম্পাদনা : আবদুল হাফিজ। মুক্তধারা। ৭·৫০

২. বাংলাদেশের কবিতা—এক স্তবক—সম্পাদনা : বিষ্ণু দে। মনীষা গ্রন্থালয়। ৬·

৩. আল মাহমুদের কবিতা : আল মাহমুদ। অরুণা প্রকাশনী। ৬·০০

নামে অভিহিত, রুগ্ন পশ্চিমের অনুকরণে অস্বাস্থ্যকর ছটফটানি এবং যৌবনের তথাকথিত বিদ্রোহও যথার্থ আধুনিকতা বলে চিহ্নিত এবং জীবনধর্মী কাব্য-প্রয়াস রাজনৈতিক চিৎকার বলে নিন্দিত।

'আল মাহমুদের কবিতা'র পিছনের মলাটে কবি-পরিচিতি হিসাবে বলা হয়েছে: "আধুনিকতার বিভিন্ন অনুষঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেও তাঁর কবিতা দেশজ অনুপ্রেরণায় উজ্জ্বল, আবহমান বাংলা ও বাঙালির ভাব প্রতিমার ঐতিহ্য-মণ্ডিত।" এই কথা আল মাহমুদের কবিতার সঠিক মূল্যায়নের বেশ কাছাকাছি বলে মনে হয়। কিন্তু এই কথার ভিতর দিয়ে পূর্ববাঙলা এবং পশ্চিম বাঙলার চিন্তাধারার তারতম্যও হয়তো বোঝা যায়। "থেকেও" শব্দটি আসার জন্য, বিশেষ করে "ও"-এর ওপর জোর পড়ার জন্য, আমার মতো হয়তো কারো কারো মনে এই কথা আসা স্বাভাবিক যে, আধুনিকতার বিভিন্ন অনুষঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে দেশজ অনুপ্রেরণা আসা উচিত নয়, কিন্তু আল মাহমুদের কবিতায় তা এসেছে। এটা তাঁর বড় সার্থকতা। অথচ এ কথা তো তর্কের অতীত যে সার্থক কবিতার উৎসই হবে দেশজ অনুপ্রেরণা। সে এমন ভাবে দেশের জল মাটি হাওয়াকে শরীরে জড়িয়ে নেয় যে ভিন্ন ভাষায় তার রূপান্তর সাধন প্রায় অসম্ভব। আমি কবি-পরিচিতির ওই অংশ উদ্ধৃত করেছি এই জন্য যে, ওই ধরনের চিন্তা আমাদের অনেকের মধ্যেই জীবন্ত।

অবস্থা থিতিয়ে গেলে এই ধরনের চিন্তা ও-দেশেও সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আল মাহমুদের চমৎকার ভূমিকায় তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল মাহমুদের ভূমিকা থেকে জানা যায়, ও-দেশে "আধুনিক নগর সভ্যতা তথা সর্বব্যাপী নাগরিক উৎক্ষেপের যুগেও ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীন জীবন ও ধসে পড়া গ্রামকে উত্থাপন করতে" চাইছেন বলে তাঁর প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করার স্বপক্ষে তিনি কিছু যুক্তিও দিয়েছেন। আল মাহমুদ সম্পর্কে সমালোচনার ধারাটি জানা না থাকায় এ-প্রসঙ্গে কিছু বলা অসঙ্গত। তবু এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় নগর কেন্দ্রিকতার আবরণে, নির্বিশেষ নাগরিক মানস আয়ত্ত করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার পিছনে চুপি চুপি পশ্চিমের রুগ্নতা দরজার গোড়ায় আসতে পারে। তখন যথেষ্ট সফিসটিকেটেড না হতে পারার লজ্জা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে এবং দুই বাঙলায় স্বীকৃত কবি হবার বাসনায় আমাদের মতো পড়ে-পাওয়া মানসিক জটিলতার গ্রন্থিমোচনে হয়তো এগিয়ে আসবেন কেউ কেউ।

উচ্চারিত হবে অনেক তত্ত্বকথা, অনেক যুক্তি ও উদ্ধৃতি। এই তত্ত্ব এবং যুক্তির একমাত্র লক্ষ্য থাকবে কবিকে জীবন থেকে, জীবনের বাস্তবতা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। রাজনীতির মতো সাহিত্যেও চক্রান্ত থাকে। রাজনীতির মতো সাহিত্যেও থাকে বন্ধুদের মধ্যে শত্রু। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে একথা বলছি না। হয়তো এই আশঙ্কা অমূলক। তবু এই সাবধান বাণী উচ্চারণ না করা হবে বন্ধুত্বের প্রতি অমর্যাদা।

ব্রিটিশরা যখন আমাদের বুকের ওপর চেপে বসেছিল তখন আমাদের পথ অনেক সহজ ছিল। ও-দেশেও প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ-শাসন মুক্তির পর এসেছিল পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার। তাদের বিরুদ্ধে হয়েছে ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং অর্জিত বিজয়ও সমান ঐতিহাসিক। কিন্তু অবস্থা থিতিয়ে গেলে আবার সব কিছু খতিয়ে দেখতে হবে; আবার মূল্যায়ন, পুনর্মূল্যায়ন। আশা করব, সেই নিষ্ঠুর দিনেও বাঙলাদেশের কবিতা জীবনধর্মিতা, মানসিকতা এবং দেশ-কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আবেদনের দিক থেকে হবে ব্যাপ্ত। সমগ্র মানুষ না হলেও নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত-পাঠক যেন থাকে তার সহযাত্রী। আর তা যেন গ্রহণ-বর্জনের দিক থেকেও অনুকরণীয় রুচিবোধের পরিচয় দেয়।

আল মাহমুদ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল কবি। তাঁর ছন্দের সিদ্ধি এবং বাক্-প্রতিমার সৌষ্ঠব আনন্দ দেয়। তিনি এমন উদার ভাবে তাঁর মানসিক জগতকে উন্মোচিত করে দেন, এমন অনাড়ম্বর সরলতায় নিজেকে প্রকাশ করেন যে আমরা চমকে উঠি হঠাৎ আবিষ্কারের বিস্ময়ে। নিজের জীবনের অনুষঙ্গ থেকে দেশের সামগ্রিক সংবাদকে তিনি অনায়াসে-স্বচ্ছন্দে কবিতায় বিধৃত করতে পারেন। অনাবিল নির্মলতায় নিয়ে আসেন নিসর্গ। তখন মানুষ আর প্রকৃতির কৃত্রিম কলহ আর থাকে না। এক আনন্দময় শুদ্ধতা আমাদের আপ্লুত করে। এ-কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, নিসর্গ সম্বন্ধে ইয়োরোপের দৃষ্টি-ভঙ্গি এবং বাঙলার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অসাধারণ। ধর্মীয় ঐতিহ্যের কথা বিবেচনা করলে হিন্দু ও মুসলিম মানসিকতায় এই নিসর্গ বাইরের কোনো আরোপিত জিনিস নয়, বিশ্ব-চেতনার সঙ্গে তা অঙ্গীভূত। ইয়োরোপের আধুনিকতা নিসর্গ বর্জন করেছে বলে পশ্চিম বাঙলার কিছু কবি তাই করতে যথেষ্ট তৎপর এবং বিব্রত। সুখের কথা আল মাহমুদ তা করেন নি। গ্রামীন শব্দ ব্যবহার আমার কাছে বলিষ্ঠতার স্মারক বলে মনে হলেও একথা বলা সমীচীন যে, কবিতার চরম গঠনে তাঁর ব্যক্তিত্ব কিছু সময় প্রভাবিত বলে মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে শামসুর রাহমান-এর কথাও মনে হয়। তিনিও বাঙলাদেশের এক উজ্জ্বল কবি। কবি হিসাবে দেশের সংকটে তাঁর যে ভূমিকা তা তিনি পালন করে তাঁর অনুজদের কাছে ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। তাঁর খ্যাতিও অনেক দূর পরিব্যাপ্ত। কিন্তু এসব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বলা যায়, তাঁর কবিকৃতি সাহসিকতায় নির্মল। 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতার কথা আগে কানে এসেছিল। পড়ার সৌভাগ্য হয় নি। আলোচ্য দুটি সংকলনেই এই কবিতা স্থান পেয়েছে। আমার কাছে এই কবিতা বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। অনেক সময় এ কথাও মনে হয়েছে যে, শামসুর রাহমান আর যদি কিছু নাও লিখতেন তাহলেও শুধুমাত্র এই কবিতার জন্যে ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে ঋণী থাকত। তাৎক্ষণিকতা এবং চিরায়ত সম্পর্কে পুঁথিপড়া রুগ্ন পশ্চিম থেকে আহৃত বোধ উপেক্ষা করে 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', এমন দৃপ্ত গৌরবে জীবন্ত যে বোধের ভিৎ অবধি তাতে নড়ে ওঠে। কাহিনীধর্মিতা তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কি না বলতে পারি না। তবে সংকলিত কিছু কাহিনীধর্মী কবিতা পড়ে মনে হয়েছে বিশেষ থেকে নির্বিশেষে যাওয়ার অসাধারণ দক্ষতা আছে শামসুর রাহমানের। কবিতাকে তিনি হঠাৎ এমন চমৎকার ইঙ্গিতবহ করে তুলতে পারেন যে তা বেশ মনের মধ্যে নতুন ঢেউ জাগায়। অনুমান করা যায়, তিনি নিজের জোরেই বাঙলা-দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আহসান হাবীব-এর সঙ্গে আমার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। চমৎকার মিষ্টি প্রেমের কবিতা, 'রসিয়া, তোমার ঝরোকা শান্ত', আজ প্রায় ত্রিশ বছর পরে আমার সামনে রহস্যের শরীর নিয়ে আসছে। বিষ্ণু দে সম্পাদিত কবিতায় আহসান হাবীবকে আবার দেখতে পেয়ে ভালো লাগল। এমনি আর একজন কবি হলেন আলাউদ্দীন আল আজাদ। একুশে ফেব্রুয়ারির আলাউদ্দীন আল আজাদ আর আমার স্মৃতির আলাউদ্দীন আল আজাদ একই মানুষ। হাসান হাফিজুর রহমানও আশ্চর্য কবিত্বের অধিকারী। 'হাজার স্বজনের ভেতর' হাসান হাফিজুর রহমান হারিয়ে যান না। আপনস্বভাবে থাকেন ঋজু। বিষণ্ণতার সঙ্গে বোনা প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা তাঁর কবিতায় বিচিত্র স্বাদ আনে। হায়াৎ মাহমুদ, দিলওয়ার, আতাউর রহমান, আসাদ চৌধুরী, আনিসুজ্জমান, আবুবকর সিদ্দিক, নির্মলেন্দু গুণ, আরও অনেক প্রাণবন্ত ও ঈর্ষণীয় কবি ছড়িয়ে আছেন এই দুটি সংকলনে। শুধু এই ধরনের সংকলনের ওপর ভিত্তি করে কবিস্বভাব

সম্পর্কে কোনো কথা বলা নিরাপদ নয়। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, নির্মল ভালোবাসা, ঐতিহ্যবোধ, দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার ওপর বিশ্বাস—মনে হয় বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক কবিতার এই হলো জন্মভূমি।

বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে আব্দুল হাফিজ সম্পাদিত 'রক্তাক্ত মানচিত্র', বিষ্ণু দে-সম্পাদিত 'বাংলাদেশের কবিতা—এক স্তবক' এবং 'আল মাহমুদের কবিতা'-র প্রকাশ তাই সীমিতভাবে হলেও অভিনন্দন-যোগ্য প্রয়াস।

রাম বসু

'দেয়াল দিয়ে ঘেরা'

এই সেদিনও 'বাঙলাদেশ' ছিল দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। মস্ত উঁচু দেওয়াল। কঠিন পাথরে তৈরি। কারাপ্রাচীর। এই বৃহৎ কারাগারের পরিচয় এখন আমাদের কিছুটা জানা। কিন্তু এই বড় জেলের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট কয়েদখানা ছিল। সেখানে পাঁচিল আরো উঁচু, আরো কঠিন। সেখানে মানুষ আনা হতো বাছাই করে। শ্রীমতী মতিয়া চৌধুরী এই বাচাই করাদেরই একজন। পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী তাঁকে বেছে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বড় কারাগার থেকে। রেখেছিল ছোট কারাগারে—যে-কারাগার আকারে ছোট, কাঠিন্যে বড়।

মতিয়া ছিলেন বিনা বিচারে বন্দী। পরে তিনি হলেন বিচারাধীন বন্দী। বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দী মেয়েদের জন্যে হাজতের ব্যবস্থা ছিল না। তাই তাঁকে রাখা হয়েছিল জেলে—যেখানে চোর, হত্যাকারী, গণিকা ইত্যাদি দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সব রকমের অপরাধিনীই ছিল। এটা কোনো সভ্য দেশেই করা হয় না। কিন্তু পাকিস্তানের সভ্য হওয়ার গরজ খুব ছিল না।

অত মেয়ের থাকবার ব্যবস্থা নেই। খোঁয়াড়ের মধ্যে পশুর মতো তাদের রাখা হতো। মারাত্মক রোগীও বহু সময় সহবাসী। খাদ্যবস্ত্র নামমাত্র। আত্মীয়-

দেয়াল দিয়ে ঘেরা : মতিয়া চৌধুরী। কালি কলম প্রকাশনী, ঢাকা—১। ৬'০

স্বজনের সঙ্গে কদাচিৎ কারো সাক্ষাৎ মেলে। আর আছে জমাদারনী ও মেট্রনের পেষণ।

এই অত্যাচারিত নিঃস্ব হতশ্রী মেয়ে-কয়েদীদের কথাই লিখেছেন মতিয়া। এদের প্রত্যেকরই কালো জীবনের অন্তরালে অনেক দুঃখ-বঞ্চনার ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসগুলিকে তুলে ধরেছেন লেখিকা। জমাদারনী-মেট্রনদের জীবনও মধুময় নয়, এদের পশ্চাৎপটেও গাঢ় কত অন্ধকারের ছায়া।

কিন্তু সামগ্রিক পটভূমি সম্পর্কে সবদা সচেতন থাকার দরুণ বইটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি মাত্র নয়। দুর্দশার কারণগু'ল তিনি জানেন। সেগুলিকে উৎখাত করবার জন্য যে সংগ্রাম চলছে, তার আখ্যানও এই বইতে বিবৃত। ব্যক্তি-কাহিনী ও দেশ-ইতিহাস একত্র গ্রথিত এ গ্রন্থে। একটা পরিপ্রেক্ষিত আছে লেখিকার। এই গুণেই এ লেখা 'জরাসন্ধ' নয়, জীবনসন্ধ, সত্যসন্ধ।

সব আখ্যানই বেদনার। কিন্তু আমার সব থেকে মর্মান্তিক লেগেছে কয়েদখানার শিশুজগতটিকে। এদের মায়েরা কয়েদী। তাই মায়ের সঙ্গেই থাকে এরা। জগতে প্রথম চোখ মেলল এরা কয়েদখানায়—বিনা অপরাধে! অপরাধ ব্যাপারটা বোঝবার আগেই পেল অপরাধীর জীবন। কারারক্ষীদের কাছে এরা অনাবশ্যক উৎপাত, এবং কার্যত বেওয়ারিশ। তাই অবহেলা ও অত্যাচারের মধ্যে, এক অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছিত পরিবেশে এরা বড় হয়। জেলই এদের পৃথিবী। এর বাইরে যে কোনো জগৎ আছে তা এরা জানেই না। লেখিকা বেলুন উপহার দিলে এরা হতভম্ব হয়ে যায়, ও বস্তু কোনো দিন চোখে দেখেনি এরা। প্রগাঢ় অনুভূতির চোখে শিশুগুলিকে দেখেছেন লেখিকা।

রুদ্ধ বলেই যে-ফাঁক দিয়ে বহিঃপ্রকৃতিকে যতটুকু দেখা যায়, তাকে তৃষ্ণার্তের মতোই পান করেন মতিয়া। গাছপালা, রোদ, আকাশ—এ সব পর্যাপ্ত-প্রকৃতি ওপার-বাঙলার লেখকদের মধ্যে এমনিতেই বারবার আসে—আমরা এপার-বাঙলায় যা ক্রমেই হারাচ্ছি।

"এখন শিরীষ ফোটার দিন।" এই বলে যখন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হয়, কিংবা পড়ি: "সকালে বিচিত্র বর্ণের সুষমা নিয়ে দোপাটিরা ফোটে, বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে একটি একটি তাদের পাপড়ি খসে পড়ে। জোর বৃষ্টির সময় পাপড়ি-গুলো পানির স্রোতের সঙ্গে এদিক ওদিক ভেসে বেড়ায়, বেলকুড়িগুলো থরথর করে কাঁদে। কাকগুলো জামগাছের ডালে বসে ভিজে চলে।" অথবা দেখি: "শীতের এই দিনগুলোতে মাঝে মাঝে আকাশটা কেমন বিবর্ণ বিষণ্ণতায় ছেয়ে

থাকে। আমার সেই অশ্বত্থ গাছের চূড়াটা আর দেখা যায় না।...হঠাৎ চোখ পড়ল গুলঞ্চ গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে বাঁধানো বিরাট বেদীটার দিকে। শীতের পূর্ণিমার পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় পত্রহীন ডালের ছায়া সকাল বেলায় লেপা ধপধপে বেদীতে পড়ে যেন এক নিপুণ শিল্পীর আঁকা বিমূর্ত ছবি হয়ে গেছে।" —তখন মুহূর্তে মনের ভেতরে অনুভব করি যে একজন বাঙলাদেশের লেখকের সান্নিধ্যে আছি। বুঝতে পারি, মতিয়া শুধু তাঁর কর্ম বা নিকটজনের কাছ থেকেই বিচ্যুত হননি, বঞ্চিত হয়েছেন আকাশের রোদ ও গাছের সবুজ থেকে, এবং সে ক্ষতি তাঁর কাছে কম নয়।

একটি জিনিসের বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। সেন্টিমেণ্টাল হওয়ার বা উচ্ছ্বাস প্রকাশের প্রচুর মওকা ছিল। মেয়েদের কাহিনী, করুণ কাহিনী, লিখছেন মহিলা, এবং তিনি সন্দেহাতীত ভাবে বাঙালি—কিন্তু তাও কোথাও হাপুস-নয়ন নেই। স্পষ্ট, স্বচ্ছ, তথ্যনিষ্ঠ, পরিণত একটি মনকে দেখা যায় এ-বইতে। অথচ প্রতিটি ছত্রই আন্তরিক। প্রতিটি পাতাতেই কাঁচা একটি প্রাণের সজীব উপস্থিতি।

মতিয়া আবদ্ধ অবস্থায় ছটফট করছেন। অন্যায়-ভাবে আটকে রাখা হয়েছে তাঁকে, বাইরের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিতে পারছেন না তিনি। এ-ছটফটানি খুবই স্বাভাবিক। তবু কোনো অভিশাপই হয়তো অবিমিশ্র নয়। দেশকে তিনি আগেও দেখেছিলেন। ভালো করেই দেখেছিলেন। কিন্তু সমাজের সবচেয়ে তলার ঘন অন্ধকারের জায়গাটা তিনি এত কাছ থেকে এর আগে দেখেন নি। এ দেখা তাঁর দেশদর্শনকেই পূর্ণতা দেবে, এবং ভবিষ্যৎকে সাহায্য করবে।

সংগ্রামী মানুষের এমন একটি আন্তরিক কারাকাহিনীর সামনে দাঁড়ালে অন্যান্য দু-একজন কৃতী ব্যক্তির কথা আমার মনে পড়ে।

পি-ডি-এফ আমলে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন। মুক্তির পর স্টুডেণ্টস হল-এ লেখকদের প্রদত্ত সম্বর্ধনা-সভায় সুভাষদা বলেন, "অনেক দিন পরে জেলে গেলাম। বড় ভালো লাগল।"

পরে যখন আমরা কফিহাউসে সুভাষদাকে নিয়ে বসলাম, তখনও তাঁর ঐ কথা: "হ্যাঁ, খুব ভালো। মাঝে মাঝে ওখানে যাওয়া দরকার। খুব দরকার। যাওয়ায় আমার ভালো হয়েছে।"

মনে হলো, সুভাষদা যেন তীর্থস্নান সেরে ফিরলেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আমেরিকান গায়িকা জোন্ বায়েজ ভিয়েতনামে

মার্কিন আক্রমণের প্রতিবাদে আমেরিকায় একটি মিছিল বার করেছিলেন। তাঁর গানের স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীরা এই সঙ্গীতমুখর মিছিলটিতে ছিল। আর ছিলেন জোন্ বায়েজের বৃদ্ধা মা। তখন জোন্-কে গ্রেপ্তার করা হয়। মুক্তি পাওয়ার পরে সাংবাদিকদের কাছে জোন্ বলেছিলেন, "আমাদের প্রত্যেকের মাঝে মাঝে কারাভোগ করে আসা উচিত। জীবনকে বড় বেশি গতানুগতিক ও অভ্যস্ত ভঙ্গীতে দেখি আমরা। অন্য দিক থেকেও দেখা দরকার। আত্মতৃপ্ত সুখী যায়গা থেকে নয়, দুঃখ ও অন্যায় যেখানে পুঞ্জীভূত, সেখান থেকেই জীবনকে দেখা দরকার।"

আর সবচেয়ে মহৎ উচ্চারণ রবীন্দ্রনাথের। হাজত থেকে গোরা আনন্দময়ীকে লিখেছিল: "একা তোমার ছেলের কথা ভাবিয়ো না মা, আরো অনেক মায়ের ছেলে বিনা দোষে জেল খাটিয়া থাকে, একবার তাহাদের কষ্টের সমান ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে; এই ইচ্ছা এবার যদি পূর্ণ হয় তুমি আমার জন্য ক্ষোভ করিয়ো না।... পৃথিবীতে যখন আমরা ঘরে বসিয়া অনায়াসেই আহার-বিহার করিতেছিলাম, বাহিরের আকাশ এবং আলোকে অবাধ সঞ্চরণের অধিকার যে কত বড়ো প্রকাণ্ড অধিকার তাহা অভ্যাসবশত অনুভবমাত্র করিতে পারিতেছিলাম না—সেই মুহূর্তেই পৃথিবীর বহুতর মানুষই দোষে এবং বিনা দোষে ঈশ্বরদত্ত বিশ্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যে বন্ধন এবং অপমান ভোগ করিতেছিল আজ পর্যন্ত তাহাদের কথা ভাবি নাই, তাহাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখি নাই—এবার আমি তাহাদের সমান দাগে দাগি হইয়া বাহির হইতে চাই; পৃথিবীর অধিকাংশ কৃত্রিম ভালোমানুষ যাহারা ভদ্রলোক সাজিয়া বসিয়া আছে তাহাদের দলে ভিড়িয়া আমি সম্মান বাঁচাইয়া চলিতে চাই না।...যাহারা দণ্ড পায় না, দণ্ড দেয়, তাহাদেরই পাপের শাস্তি জেলের কয়েদিরা ভোগ করিতেছে; অপরাধ গড়িয়া তুলিতেছে অনেকে মিলিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ইহারাই। যাহারা জেলের বাহিরে আরামে আছে, সম্মানে আছে, তাহাদের পাপের ক্ষয় কবে কোথায় কেমন করিয়া হইবে তাহা জানি না। আমি সেই আরাম ও সম্মানকে ধিক্কার দিয়া মানুষের কলঙ্কের দাগ বুকে চিহ্নিত করিয়া বাহির হইব; মা, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো, তুমি চোখের জল ফেলিয়ো না।"

এই সংগ্রামী আন্তরিক গ্রন্থটির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে 'কৃত্রিম ভালোমানুষ' মনে হয়, আত্মতৃপ্ত সুখের অপরাধে অপরাধী মনে হয়। কোনোদিন কারাগারে

না-যাওয়া সৌভাগ্যবানকে মনে হয় হতভাগ্য। মনে হয়, জীবনের ঋণ সব শোধ করা হয়নি। জীবন তার অনেক পাওনা নিয়ে আমাদের দিকে অগণ্য হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা আরামে আছি, সম্মানে আছি, আমাদের পাপের শাস্তি ভোগ করছে যে-কয়েদীরা, তাদের কাছে তাদের পাশে মতিয়া ছিলেন বেশ কিছুদিন। যেখানে তিনি দুঃখমোচন করতে পারেননি, সেখানেও দুঃখের শরিক ছিলেন।

শ্রীমতী মতিয়া চৌধুরী 'সমান দাগে দাগি' হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

প্রতিরোধ সংগ্রাম ও রূপকথার নায়ক

রক্ত, অশ্রু, আর্তনাদের মধ্যে বাঙলাদেশে সম্প্রতি নবীন এক জাতি ও রাষ্ট্রের জন্ম-ইতিহাসের যে যন্ত্রণাদীর্ণ পর্বটি শেষ হলো তার পরিপূর্ণ যাথার্থ্য উপলব্ধি এখনি সম্ভব নয়। কারণ বাঁধা বুলি ও ছকের বাঁধা পথ ধরে যাঁদের রাজনীতি চর্চা এতাবৎ চলে এসেছে গত এক বছরের ঘটনাপ্রবাহ শুধু যে তাঁদেরই বহু বদ্ধমূল ধারণা অসার প্রতিপন্ন করেছে তাই নয়, সমসাময়িক ইতিহাসের একাগ্র ও পরিশ্রমী ছাত্রদের মনেও নতুন সব ভাবনার উদ্রেক হয়েছে তার ফলে। এ-পর্বের প্রকৃত ব্যঞ্জনা তাই তাঁদের কাছেও ধরা পড়তে সময় লাগবে, বিশেষ করে যখন তার পক্ষে অপরিহার্য সংশ্লিষ্ট বহু প্রাথমিক তথ্যই এখনো অজানা। ইয়াহিয়া-তাণ্ডবে বিধ্বস্ত দেশে তার তিল তিল সংগ্রহ নিশ্চয়ই যথেষ্ট শ্রম ও সময়-সাপেক্ষ হবে।

বাঙলাদেশের সুপরিচিত মার্কসবাদী কর্মী ও সাহিত্যিক, সত্যেন সেন মহাশয় যে আলোচ্য বইটিতে তাঁদের সেই আশ্চর্য প্রতিরোধ সংগ্রামের আনুপূর্বিক ইতিহাস লিখতে বসেননি, সে-কথা 'মুখবন্ধে'ই জানিয়েছেন। সংগ্রামের চূড়ান্ত জয়লাভের বেশ কয়েক মাস আগেই শেষ হয়েছে তাঁর এই লেখা। তিনি এও আপশোষ করেছেন যে "শারীরিক অচল অবস্থার দরুণ…

১. প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ : সত্যেন সেন। মুক্তধারা। ৬·০০

২. অমর কৃষক নেতা বিষ্ণু চ্যাটার্জী। প্রকাশক : অশোক মিত্র, ১৩৯ লেনিন সরণি। ২·৫০

শ্রীহট্ট, রংপুর, রাজশাহী প্রভৃতি জেলার প্রতিরোধ সংগ্রামের বৃত্তান্ত সংগ্রহ" করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া "মুখে মুখে চলে আসা নানা জনের কাছ থেকে নানারকম খবর শুনে তার মধ্যে থেকে···মালমশলা সংগ্রহ" করার চেষ্টার সীমাবদ্ধতা তো আছেই।

তাই বলে রিপোর্টাজ-এর নামে পশ্চিমবঙ্গের কাগজে অনেক সময়ে যে লঘু ও প্রগলভ 'রম্যরচনা'র ছড়াছড়ি দেখা যায় সত্যেনবাবুর বই কিন্তু আদৌ সে জাতের নয়। তাঁর লক্ষ্য প্রতিরোধ সংগ্রাম তখন উত্তরোত্তর যে ব্যাপক ও সংগঠিত রূপ ধারণ করছিল তার এমন সব বিচ্ছিন্ন অথচ 'টিপিক্যাল' ঘটনার যথাসাধ্য যথাযথ বিবরণ দান যা তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের যুগপৎ উদ্দীপিত ও সুশিক্ষিত করে তুলবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সহযোদ্ধার তারই ঐকান্তিক প্রয়াস। বইখানির সার্থকতা তাই সংশয়াতীত।

একটা কথা গোড়াতেই বলে রাখা দরকার—সত্যেনবাবুর বইয়ে আছে প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রথম চার, সাড়ে চার মাসের ঘটনা। পাকবাহিনীর অতর্কিত নৃশংস আক্রমণের মুখে মোটের উপর সুসংগঠিত মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠতে স্বভাবতই সময় লেগেছিল কিছুটা। কিন্তু সত্যেনবাবুর বই থেকে জানা যায় যে সংগঠিত ও সশস্ত্র শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা করার মতো প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও একেবারে গোড়ার থেকে অনেক জায়গাতেই কমবেশি মাত্রায় দেখা গিয়েছিল প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের চেষ্টা। সে-প্রতিরোধের ভিত্তি রচনা করেছিল পাক-শাসনের বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের আপামর জনসাধারণের অভূতপূর্ব, সর্বব্যাপী অসহযোগ। আর ২৫শে মার্চের পর তার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছিল যে-যেমন হাতিয়ার যোগাড় করতে পেরেছেন তাই নিয়েই সশস্ত্র লড়াইয়ের চেষ্টা। সে-চেষ্টা গোড়ায় হয়তো সাময়িকভাবে জয়যুক্ত হয়েছে, তারপর পর্যুদস্ত হয়েছে সুসংগঠিত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত শত্রুর আক্রমণে কিন্তু তারও পরে স্বতঃস্ফূর্ত সশস্ত্র প্রতিরোধের বদলে ক্রমে গড়ে উঠেছে মুক্তিবাহিনী। সত্যেনবাবুর বইয়ে এই স্বতঃস্ফূর্তি থেকে সংগঠনে পৌঁছবার প্রক্রিয়াটি চমৎকার ফুটে উঠেছে বাস্তব নজীর মারফৎ।

আর একটি ব্যাপারও পরিস্ফুট সত্যেনবাবুর লেখায়: প্রতিরোধ আন্দোলনের ব্যাপকতা ও বিভিন্ন অঞ্চলে ও সময়ে তার বিকাশের অসমতা। সমগ্র বাঙলাদেশ ধরলে দেখা যাবে প্রতিরোধ সংগ্রামে সমাবেশ ঘটেছিল কারখানা বা বন্দরের শ্রমিক, রিক্সাওয়ালা বা মোটবওয়া কুলির মতো সব

মেহনতী মানুষ, গ্রামের কৃষক; বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের ছাত্র, অধ্যাপক ও শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি নানা বৃত্তির মানুষ, ডি. সি, এস. পি সমেত বিভিন্ন স্তরের সরকারী চাকুরে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং এ-সংগ্রামে যাদের বিশেষ একটি ভূমিকা ছিল সেই বেঙ্গল রেজিমেণ্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর কমবেশি সশস্ত্র সিপাহীরা। এর মধ্যে প্রতিরোধ সংগ্রামে উদ্যোগী হয়েছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের মানুষ। যেমন চট্টগ্রাম বা খুলনার মঙ্গলা পোর্টে বন্দর শ্রমিকদের, ঢাকায় পুলিশবাহিনী, বগুড়ায় কলেজ ও স্কুলের ছাত্র এবং কুমিল্লার বড়কামতা গ্রাম, বরিশালের পূর্বনবগ্রাম, এমন কি পাবনা, কুষ্টিয়া বা যশোহর শহরের অবরোধ সংগ্রামে কৃষকজনতার উদ্যোগ বা বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষণীয় সত্যেনবাবুর লেখায়। আর তার সঙ্গে ময়মনসিংহের মধুপুরগড বা পরবর্তী দিনে বরিশাল বা যশোহরের লডাইয়ের তুলনা করলে দেখা যায় যে এগুলিতে সুসংগঠিত মুক্তি-বাহিনীর ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সত্যেনবাবুর লেখায় পাকবাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের বিস্তারিত বর্ণনা নেই, আছে প্রতিরোধ সংগ্রামের আশ্চর্য সব দৃষ্টান্ত যা হৃদয় ও মস্তিষ্ক—দুদিক থেকেই প্রস্তুত করে তোলে তাঁর পাঠককে। এ-কাজ তাঁরই উপযুক্ত।

মুক্তিযুদ্ধের গোড়ার দিকে, ১৯৭১ সনের ১১ই এপ্রিল, খুলনার বিখ্যাত কৃষক নেতা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় মুসলিম লীগ গুণ্ডার হাতে নিহত হন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্মারক-সংকলনটি প্রকাশ করে বাঙলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন। কারণ বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবিত অবস্থাতেই রূপকথার নায়ক 'বিষ্টু ঠাকুরে' পরিণত হলেও তাঁর সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা ছিল যৎসামান্য। এই সংকলনের লেখাগুলি বহুলাংশে সে-অভাব দূর করবে। বিশেষ করে কুমার মিত্র ও রশিদুল কাইয়ুমের লেখা দুটিতে তাঁর জীবনের বহু খুঁটিনাটি খবর জানা যাবে। প্রবীণ নেতা শ্রীপ্রমথ ভৌমিকের লেখাটিও এ-দিক থেকে মূল্যবান। এ-ছাড়া এ-সংকলনে আছে বিষ্ণুবাবুর দিদি ভানু দেবী, প্রবীণ নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, আবদুর রাজ্জাক খান, কৃষ্ণবিনোদ রায় এবং বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেনের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কিন্তু সংকলনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়ের নিজের রচনাটি। সত্যেন সেন ও বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়ের রচনাসংকলন 'মেহনতী

মানুষে' এই 'শোভনার বাঁধ' লেখাটি এর আগেই পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম। একদিকে মার্কসবাদের অখণ্ড দৃষ্টি, অন্যদিকে বাস্তবক্ষেত্রে খুঁটিনাটির উপর এত সজাগ নজর খুব কম নেতারই আছে বলে বোধ হয়। আবার লেখার মুন্সিয়ানাও যথেষ্ট। সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল লক্ষ মানুষের হাসিকান্না, আশা ও নৈরাশ্য, নির্ভীকতা ও ভীরুতা, মহত্ব ও নীচতা, কুটিল লুব্ধ চক্রান্ত আর উত্তাল গণ-সংগ্রাম—এ-সবের নিরন্তর ঘাত প্রতিঘাতের প্রতীক—'শোভনার বাঁধ' যেন দেখতে দেখতে খাড়া হয়ে উঠছে আমাদের চোখের সামনে।

মানুষটি সত্যই অসামান্য। ৬২ বছরের জীবনে ২৪ বছরই যাঁর কেটেছে জেলখানায় ও আত্মগোপনে, যাঁর সম্পর্কে খুলনার কৃষকের বিশ্বাস "বিষ্টুঠাকুর যদি বাঁধে এক কোদাল মাটি দেন বা একবার বাঁধের উপর দিয়ে হেঁটে যান তাহলে বাঁধ অটুট হবে" তিনিই আবার ছবি এঁকে, এস্রাজ বাজিয়ে, ব্যাড-মিণ্টন খেলে চিত্তজয় করেন সহকর্মীদের। আবার কৃষক আন্দোলনের পরিসরেও একদিকে যেমন তিনি তিলে তিলে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন, আন্দোলনের হাজারো সমস্যার সমাধান দেন, সঠিক পথনির্দেশ করেন আন্দোলনের, অন্যদিকে তাঁর সম্পর্কেই এই সংকলন থেকে জানলাম, "কোন জমিতে কি সার দিতে হয়, কুমড়া, মানকচু, কলা ও অন্যান্য কৃষিপণ্য কি প্রকারে উন্নত আকারে উৎপাদন করা সম্ভব, সে সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু চ্যাটার্জীর অভিজ্ঞতা ছিল প্রভূত।···বিষ্ণুদার কাছে শুনেছি খুব সন্তর্পণে অস্ত্রোপচার করে কচিবেলায় ভিতরের বীজগুলি পাখীর পালক দিয়ে নষ্ট করে দিলে একটা মিঠা কুমড়া এক মণেরও অধিক ওজনের হতে পারে। ...বিষ্ণু চ্যাটার্জী এই ধরনের অস্ত্রোপচারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমগাছ, কুল গাছ প্রভৃতির কলম বাঁধবার নানারকম পন্থা তিনি জানতেন।···বিষ্ণু চ্যাটার্জি পশুপালন, পশুপ্রজনন, পশুদের প্রকৃতি নির্বাচন' পশুচিকিৎসা সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান রাখতেন। বুনো গাছগাছড়া সম্পর্কে বিষ্ণু চ্যাটার্জীর অভিজ্ঞতা ছিল অনেক। তিনি শত শত লতা গুল্মাদির নাম জানতেন। মৎস চাষ ও মাছ ধরার নানা রকম কলাকৌশল জানতেন বিষ্ণু চ্যাটার্জি।"

শ্রীপ্রমথ ভৌমিক লিখেছেন "···বিষ্ণুর দৃষ্টিভঙ্গী সব সময়েই ছিল গঠন-মূলক। কৃষকদের জন্য বাস্তব কিছু কাজের ভিত্তিতে সে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে।" তাই বাঁধ বাঁধা, মাইনর স্কুল পত্তন ও তাকে হাই স্কুলে দাঁড় করানো, বয়স্কদের জন্য নৈশ স্কুল এবং বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা

সংসদের পরীক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সমবায় প্রথায় ট্রাক্টর দিয়ে চাষবাসের প্রয়াস। আবার তাঁর সম্পর্কেই শ্রীভবানী সেন লিখলেন: "···কমিউনিজম কি ও কেন তা বুঝতে তাঁর একটুও দেরী হয়নি এবং কৃষকের সংগ্রামী সংগঠন গড়ে তুলে তিনি আমাদের মুক্ত করলেন অসার তত্ত্ব-বাগীশতা থেকে। তিনিই আমাদের হাতে কলমে শেখালেন শ্রেণীসংগ্রাম আর শ্রেণী-সংগঠন গড়ে তোলার কাজ।"

বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে আমরা একজন প্রকৃত কমিউনিস্টের সন্ধান পাই।

চিন্মোহন সেহানবীশ

রক্তাক্ত বাঙলা

মৃত্যুর মাত্র ক'দিন আগে রবীন্দ্রনাথ রূপনারায়ণের কূলে রক্তের অক্ষরে নিজের যথার্থ রূপ চিনতে পেরেছিলেন। কঠোর এবং কঠিন সত্যকে দুঃখ ও বেদনার মধ্যেই লাভ করা যায় এ উপলব্ধিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। 'রক্তাক্ত বাঙলা' নামকরণের মধ্যেই যেন সেই একই উপলব্ধির ইঙ্গিত। এই সঙ্কলনের কিছু রচনা যখন লিখিত হয় তখনও মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয় নি, তবে সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হচ্ছিল। বাকি কয়েকটি লেখা সম্ভবত মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই রচিত। আজ বাঙলাদেশ স্বাধীন। পরাধীনতার বেদনার মধ্যে যে সমস্ত প্রবন্ধ রচিত হয়েছে স্বাধীনতার আনন্দের মধ্যে বসে তার সমালোচনা করা কঠিন। কারণ পরিবেশ একেবারেই পাল্টে গেছে। তবে ভরসা এই যে রচনাগুলির মধ্যেই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আছে। যে সৃষ্টির যন্ত্রণায় গত পঁচিশ বছর ধরে সমগ্র বাঙলাদেশ কাঁপছিল তার মধ্যেই নতুন জন্মের প্রতিশ্রুতি ছিল। এই গ্রন্থের আঠারোটি দীর্ঘ-প্রবন্ধে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক সঙ্কটের যে চেহারা ফুটে উঠেছে তাতে এ কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এই সঙ্কট শেষ পর্যন্ত দূর করতে হবেই। নইলে বাঙলাদেশের মানুষ বাঁচবে না।

আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রবন্ধগুলিকে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম প্রবন্ধটিতে বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভূমিকার বর্ণনা। প্রবন্ধকার গোড়াতেই বঙ্গবন্ধুর

রক্তাক্ত বাঙলা। মুক্তধারা। ১৫'০

নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গিয়ে বলেছেন, "দেশে দেশে নেতা অনেকেই জন্মান। কেউ ইতিহাসের একটি পংক্তি, কেউ একটি পাতা, কেউ বা এক অধ্যায়। কিন্তু কেউ আবার সমগ্র ইতিহাস। শেখ মুজিব এই সমগ্র ইতিহাস। সারা বাঙলার ইতিহাস।" উক্তিটি সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কারণ এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কেউ আপত্তি করবেন না। রণেশ দাশগুপ্তের দীর্ঘ প্রবন্ধ 'পূর্ব বাঙলার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের গতি প্রকৃতি' নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। বাঙলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত অথচ যথার্থ রাজনৈতিক ইতিহাস এখানে বর্ণিত হয়েছে। লেখক নিজে বাঙলাদেশের বামপন্থী রাজনীতির প্রথম সারির নেতা, বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর বিশ্লেষণ যেমন স্বচ্ছ তেমনি বস্তুনিষ্ঠ। বাঙলা-দেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের গতিপ্রকৃতিকে তিনি পাঁচভাগে ভাগ করেছেন এবং সম্ভবত এই সঙ্কলনে তিনিই একমাত্র লেখক যিনি এই মুক্তিযুদ্ধ যে আসলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিযুদ্ধ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণীচরিত্র নির্ণয় ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে এই গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম প্রথম থেকেই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চেহারা পায়। প্রবন্ধের শেষাংশে লেখক মার্কসবাদী দৃষ্টিতে পূর্ববাঙলার মুক্তিসংগ্রামের আন্তর্জাতিকতা নির্ণয় করে দেখিয়েছেন যে পৃথিবীর যেখানেই যখন এই জাতীয় শোষণ ও অত্যাচার দেখা যায় তখনই সেখানকার প্রতিরোধ সংগ্রাম এভাবেই পৃথিবী জোড়া সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। পূর্বপাকিস্তান কেন এবং কিভাবে বাঙলাদেশ হয়ে গেল জহির রায়হানের চমকপ্রদ রচনায় তারই আভাস। প্রখ্যাত শিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালকের এই লেখা (পাকিস্তান থেকে বাঙলাদেশ) যেন ক্যামেরার দ্রুত ছুটে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। টুকরো টুকরো ছবি আঁকবার জন্য দ্রুত অথচ সংক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো পংক্তি :

"দু'টি দেশ। মাঝখানে স্থলপথে দু হাজার মাইল ও জলপথে তিন হাজার মাইল ব্যবধান।

দু'টি দেশ।

তার ভাষা আলাদা।

সংস্কৃতি অলাদা।

আচার আচরণ, ঐতিহ্য আলাদা।

ধ্যান ধারণা অর্থনীতি আলাদা।

দু'টি ভিন্নমুখী দেশ আর জাতিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে একটি রাষ্ট্রে আবদ্ধ রাখা হলো।

উদ্দেশ্যও ছিল একটি।

পূর্ববাঙলাকে পশ্চিমপাকিস্তানী ও ভারতত্যাগী মুসলমান ধনপতিদের অবাধ শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা।" কবিতার মতো লেখা, কিন্তু কি কঠোর বাস্তবের ছবি।

শুধু জহির রায়হানই নন, আরও অনেক প্রবন্ধকারেরও সেই একই কথা। "দুটি ভিন্নমুখী দেশ আর জাতিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে একটি রাষ্ট্রে আবদ্ধ" করার ব্যর্থতা সম্পর্কে সবাই সজাগ। দ্বিজাতিতত্ত্ব যে ভ্রান্ত এ-ব্যাপারে বাঙলা-দেশের বুদ্ধিজীবীদের মনে এখন আর কোনো সন্দেহ বা অবিশ্বাস নেই। তাই আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে, "উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান নামে একটি তথাকথিত ধর্মরাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটেছে। এটাকে কেবল একটা ধর্মের মৃত্যু বলা হলে ঠিক হবে না, এটা একটা অবাস্তব থিয়োরি বা তত্ত্বেরও অপঘাত মৃত্যু।" (দ্বিজাতিতত্ত্বের অপঘাত মৃত্যু।)

লেখক অবশ্য এখানেই থামেন নি। ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ যে সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার ফল চমৎকার বিশ্লেষণ করে তিনি তা দেখিয়েছেন, "মধ্যযুগে যে ঘড়ির কাঁটা অচল হয়ে গেছে, তাকে সচল করার জন্যই যেন বর্তমান যুগে পাকিস্তানের জন্ম। দম-দেওয়া ঘড়ির কাঁটা আর কতদিন চলে? তাই পুরো চাব্বিশটি বছর পার হওয়ার আগেই ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের ঘড়ির দম ফুরিয়ে গেছে। কাঁটা অচল হয়ে গেছে।"

দ্বিজাতিতত্ত্বের অপঘাত মৃত্যু কিন্তু অকস্মাৎ ঘটে নি। সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান নামক ভূখণ্ডের শরীরটি যে অসুস্থ এসত্য আবিষ্কার করতেও সময় লেগেছে। আর এই আবিষ্কার ঘটেছে ভাষা, সাহিত্য আর সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। একটা গোটা জাতি যখন জেগে ওঠে তখন তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেই সর্বপ্রথম সেই জাগরণের লক্ষণ ফুটে ওঠে। সংকলনের কয়েকটি প্রবন্ধে মুক্তিসংগ্রামের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি উজ্জ্বল ভাবে প্রতি-ভাত। রাষ্ট্রভাষা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক (ডঃ আনিসুজ্জমান), বাঙলাদেশের

সাংস্কৃতিক আন্দোলন (শওকত ওসমান), সাংস্কৃতিক বিকাশধারা (প্রসাদ চৌধুরী), মুক্তিযুদ্ধের প্রচ্ছদপট : সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম (সন্তোষ গুপ্ত) এবং বাঙলাদেশ আন্দোলন : সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র (সৈয়দ আলী আহ্সান) এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ভাষা দিয়েই শুরু করা যাক। কারণ বাঙলাদেশের মানুষের মুখের ভাষা কাড়তে গিয়েই পশ্চিম-পাকিস্তানের ধনকুবেররা প্রধানত উপনিবেশটিকে হারালেন। অথচ ওঁরা এটাকেই সবচেয়ে সহজ কাজ ভেবেছিলেন। যেহেতু পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই কারণেই সংস্কৃত-ঘেঁষা বাঙলা নিঃসন্দেহেই পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের মুখের ভাষা হতে পারে না। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মুখপত্র যে ভাষা তাকে নিশ্চয়ই পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানেরা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করবেন। অতএব সবাই নিশ্চিন্ত ছিলেন। আর যাই হোক ভাষার ব্যাপারে পূর্ব-পাকিস্তানে কোনো গোলমাল দেখা দেবে না। কিন্তু আঘাত এল অপ্রত্যাশিতভাবে। খোদ কায়েদে আজমের সভাতেই প্রতিবাদ উঠল। পাকিস্তানের স্রষ্টা ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চের জনসভায় এবং ২৪শে মার্চের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রথম আঘাত পেলেন। তিনি বেশ দৃঢ় কণ্ঠেই ফরমান জারি করেছিলেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, এবং কেবলমাত্র উর্দু। কিন্তু আশ্চর্য, প্রতিবাদ উঠল, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য থেকে আপত্তি উঠল। কায়েদে আজম ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু ছাত্রেরা তাদের দাবিতে অনড়। এর পরই বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষার প্রশ্নে বাঙলার মানুষের আত্মাহুতির পালা। আর সেই আত্মাহুতির অবসান ঘটেছে ১৯৭১ সালের ষোলোই ডিসেম্বর তারিখে। ডঃ আনিসুজ্জামান ঠিকই লক্ষ্য করেছেন, "আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে। ছাব্বিশে মার্চের আগে একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারি শুরু ১৯৪৭-৪৮-এর ছায়াচ্ছন্ন দিনগুলিতে।" রবীন্দ্রনাথ একেই বোধহয় বলেছিলেন, প্রদীপ জ্বালানোর পূর্বে সলতে পাকানোর ইতিহাস। এই সলতে পাকানোর ইতিহাসের পরিচয় রয়েছে আরও কয়েকটি প্রবন্ধে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানের মনে এক জাতীয় হীনম্মন্যতা দেখা যেতে থাকে। তাঁরা আরবী ফারসী ভাষা জানেন না, মক্কা মদিনার সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্ক ক্ষীণ। পশ্চিম-পাকিস্তানের বালুচ, পাঠান বা পাঞ্জাবীরা চিরকালই রাজার জাত, আর বাঙালিরা চিরকালই শাসিত শ্রেণীর। তাছাড়া ইসলাম ধর্মেরও বিচিত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছিল বাঙালি মুসলমানদের সামনে। মুসলীম

লীগ নেতারা ইসলাম ধর্ম বলতে যা বুঝতেন সাধারণ মুসলমানদের উপর তা নির্বিবাদে চাপিয়ে দিতেন। শওকত ওসমান ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, "ইসলামের স্বরূপ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁদের কোন চেষ্টা ছিল না। এই স্বরূপ যত ঘোলাটে থাকে ততই মঙ্গল। রাজনৈতিক মুনাফা-অনুযায়ী তার অদল-বদল চলত। জিন্নাহ্ সাহেব যিনি ভুলেও সহজে পশ্চিম মুখে আছাড় খেয়ে পড়তেন না, তিনি হোলেন মুসলমানদের ইমাম। আর বিশ্বে কোরাণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার বা তফ্‌সীর-কারক মৌলানা আজাদ হোলেন 'শো-বয়'।" বাঙালি মুসলমানের মানস-পটভূমি প্রধানত এই ঐতিহ্যেই সূচনা পূর্বে গড়ে উঠেছিল। আবেগের স্তরে ধর্মের উপস্থিতি তাদের সমস্ত বুদ্ধিচর্চাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কারণ, "মুস্‌লিম লীগের নেতা বা সমর্থকদের মধ্যে বুদ্ধিচর্চায় ব্রতী অনুশীলিত একজন মানুষও দেখা যায় নি।" অবশ্য, বেশিদিন বাঙালি মুসলমানের মুখ বাইরের দিকে ঘুরিয়ে রাখা যায় নি। ঘা খেয়ে খেয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার সাহায্যে বাঙালি মুসলমান শেষপর্যন্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাই শেষপর্যন্ত ভাষা ও সাহিত্য আন্দোলনকে আশ্রয় করেই তাদের জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হল। এর সঙ্গেই এল সংস্কৃতিক সঙ্গীত ও নাটক। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রসঙ্গীত। "প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ অর্থ বাঙলা সাহিত্য একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। ঐক্যের প্রবণতা সাহিত্য সঙ্গীতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের দিকে ঝুঁকে পড়া বিচিত্র নয়। শাসকশ্রেণী প্রমাদ গণল প্রথম থেকেই" (শওকত ওসমান)। তাই প্রথম কোপ রবীন্দ্রনাথের গানের উপর, দ্বিতীয় কোপ তাঁর সাহিত্যের উপর, তৃতীয় আঘাত সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবাঙলার সাহিত্যের উপর। উদ্দেশ্য মহৎ। যে কোনো উপায়ে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে হবে। বদরুদ্দীন ওমর তাঁর বিখ্যাত 'বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্কট' প্রবন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে "উন্মত্ততা" বলে অভিহিত করেছিলেন, "বাঙালী মুসলমানেরা বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এমন কি মাইকেল, রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত নিজেদের তথাকথিত ঐতিহ্য থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁদের ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সে সংস্কৃতি শুধুমাত্র হিন্দু সংস্কৃতি, কাজেই মুসলমানদের পক্ষে বর্জনীয়। এ উন্মত্ততার উদাহরণ অন্য কোনো দেশের ইতিহাসে পাওয়া মুস্কিল।" কিন্তু সৌভাগ্য এই যে এই উন্মত্ততা স্থায়ী হয় নি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই অসুস্থ মানসিকতাকে টিকিয়ে রাখার জন্যও কম চেষ্টা করা হয় নি। "এ উন্মত্ত-

তাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই সরকারী উদ্যোগ আর আয়োজনের ঘাটতি ছিল না। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সরকারী প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে এ উন্মত্ততা লালিত পালিত হয়েছে; প্রগতিশীল শিল্পীদের নির্যাতন ক'রে, গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ক'রে, এমন কি কারাগারে নিক্ষেপ ক'রেও এই উন্মত্ত, কৃত্রিম, সংস্কৃতিকে জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করতে পারে নি।" (আসাদ চৌধুরী : সংস্কৃতির বিকাশ ধারা।)

সৈয়দ আলি আহসান তাঁর প্রবন্ধের (বাঙলাদেশ আন্দোলন : সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে) সূচনাতেই একটি চমকপ্রদ অথচ নির্ভুল উক্তি করেছেন : "১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। আজ ১৯৭১ সালে তাঁদের সকলেই বাঙলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যেই বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের এই মানসিক পরিবর্তন বিস্ময়কর হলেও অস্বাভাবিক নয়। দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ওপার বাঙলার শিক্ষিত মানুষ অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অতএব তখনকার আন্দোলন অনেকক্ষেত্রেই ছিল ব্রিটিশ শাসকশক্তি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-জমিদার ও প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবী অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে অর্থনৈতিক শোষণ দূর হচ্ছে না, বরং তার অস্তিত্বের উপর আঘাত আসছে। যে ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁরা পুষ্ট তাকেই সমূলে উৎসাদিত করবার চেষ্টা চলছে। আর এই সব কিছুই চলছে ধর্মের দোহাই দিয়ে। অতএব মোহভঙ্গ হোতে দেরী হল না। বাঙালী হিসেবে বেঁচে থাকতে পারলে পাকিস্তানকে সমৃদ্ধতর করার চেষ্টায় বাঙলাদেশের মুসলমান বুদ্ধিজীবী নিশ্চয় আত্মনিয়োগ করতেন। কিন্তু তা হবার নয়। যদি আমাদের ভাষার উপর আক্রমণ না আসত, যদি আমাদের সংস্কৃতি-চর্চায় আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম এবং যদি আমাদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী মানসিকতাকে আরোপ করবার অপকৌশল না থাকত তাহলে আমরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভিত্তির মধ্যে বাঙালী হিসেবে বেঁচে থাকতাম এবং পাকিস্তানকে সমৃদ্ধও করতাম। কিন্তু যে ভেদবুদ্ধিকে অবলম্বন করে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিবেচনায় পাকিস্তানের সৃষ্টি সেই তত্ত্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদগণ কখনও বিচ্যুত হতে চান নি।" (সৈয়দ আলী আহসান)।

বুদ্ধিজীবীদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন অনিবার্যভাবেই সাংবাদিকবৃন্দ। তাঁরা ১৯৪৭-এর পর থেকে সংবাদ পরিবেশনের কেবল পেশাদারী কর্তব্যই পালন করেন নি, সমস্ত রকম সংগ্রামেই তাঁরা বিশ্বস্ত সৈনিকের ভূমিকা পালন করেছেন। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এদেশের জাতীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিল, "বাঙলাদেশের সাংবাদিকগণ পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে তাঁদের সেই সংগ্রামী ভূমিকা অব্যাহত রেখেছেন। একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশ ব্যতীত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্থহীন। একথা সাংবাদিকরা শিখেছেন তাঁদের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা থেকে।" (সন্তোষ গুপ্ত : মুক্তিযুদ্ধের প্রচ্ছদপট : সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম।)

মূল্যবান প্রবন্ধ আরও আছে। সবগুলির বিস্তৃত আলোচনা এক্ষেত্রে খানিকটা পুনরুক্তি দোষ হবে বলে মনে হয়। বিষয়বস্তু যাই হোক সবকটিই একসূত্রে বাঁধা। সবকটিই মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা। আবদুল হাফিজ যখন বলেন "বাঙালী জনগোষ্ঠীর সমস্ত মানুষ লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে আত্ম-প্রতিকৃতির সন্ধান পেয়েছে" (বাঙালীর আত্ম-অনুসন্ধান ও লোক-ঐতিহ্যের চর্চা) তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের উৎসে চলে যান। ঠিক তেমনি বুলবন ওসমান বাঙলাদেশ পরিস্থিতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উল্টো দিক দিয়ে প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, "পশ্চিমের ঐতিহ্য যেখানে ইকবাল, শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই, হাল···বাঙলাদেশে রবীন্দ্র নজরুল-সুকান্ত-শরৎচন্দ্র···পশ্চিমের ভাষা, উর্দু, সিন্ধি, বেলুচি, পুশতু ও পাঞ্জাবী, এদিকে বাঙলা। একদল শুকনো দেশের মানুষ, পাহাড়ী অঞ্চলের লোক, অন্যদিকে নদী বিধৌত শ্যামল প্রান্তরের বাসিন্দা। অনুভূতি, চাল-চলন, মানসিকতা ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক উপাদান বিশেষভাবে পৃথক। এই সব পার্থক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্থনীতিক শোষণ।" সুতরাং সব জায়গাতেই সেই এক কথা, একই সিদ্ধান্ত। অর্থনৈতিক শোষণ, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভাঁওতা-বাজি, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর আঘাত। কঠোর ও কঠিন সত্যের ইতিহাস সর্বত্র ছড়ানো। এই কঠিন সত্যকে বরণ করতে গিয়েই এককোটি লোককে দেশছাড়া হতে হয়েছিল, তিরিশ লক্ষ লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে আর শেষ পর্যন্ত সাড়ে সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

স্মৃতিময় বাঙলাদেশ

এই শতাব্দীতে বাঙলাদেশ একবার জেগেছিল প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গ রোধ করবার জন্য, রোধ করেছিল। সেই অগ্নিযুগ সংবৃত হয়েছিল দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে। তৃতীয় দশকের সূচনাতেই কালবৈশাখীর দমকা হাওয়ায় বাঙলার বিপুল প্রাণশক্তি পুনরায় উৎসারিত হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, সেই পরিবেশে উনপঞ্চাশীর ঝটিকা নিয়ে বাঙলাসাহিত্যে দেখা দিয়েছিলেন ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনের কোয়ার্টারমাস্টার হাবিলদার নজরুল ইসলাম। 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধে তিনি ডাক দিয়েছিলেন, "জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে মজুর ভাইরা! তোমার হাতের ঐ লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মতো ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক। আনো তোমার হাতুড়ি, ভাঙো ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ—ধূলায় লুটাও অর্থপিশাচ বলদর্পীর শির। ছোঁড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্তমাখা লালে-লাল ঝাণ্ডা।" চতুর্থ দশকেও বাঙলা অসাড় জীবন যাপন করেনি, কিন্তু পঞ্চম দশক বাঙলার আত্মহননের কালিমালিপ্ত অধ্যায়। বিপ্লবী বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে উদ্যত কার্জনের কালো হাতটাকে যে বাঙলা প্রথম দশকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, সেই বাঙলাই পঞ্চম দশকে বিদেশী রাজশক্তির চক্রান্ত-প্রসূত হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিষে অস্থির হয়ে নিজেরাই উদ্যোগ করে র‍্যাডক্লিফ সাহেবকে ডেকে এনে স্বীয় দেহকে দু-টুকরো করে ফেলল! তার পর থেকে দুই বাঙলার ভিন্ন ইতিহাস। ষষ্ঠ আর সপ্তম দশকে দুই বাঙলার বুকে কত রক্ত আছে তা দেখবার জন্য দ্বিবিধ প্রক্রিয়া চলল; পূর্ব খণ্ডে চলল বর্বর ফ্যাসিস্ট তাণ্ডব, পশ্চিম খণ্ডে কৃত্রিম গণতন্ত্রের প্রহসনের মধ্যে চিরাচরিত আপাত-সভ্য শোষণ-শাসন। অবশেষে অষ্টম দশকের মুখপাতেই পূর্বখণ্ডে এল গণচেতনার প্লাবন, জনশক্তি জাগল, অবহেলিত পদপিষ্টের দল ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে হল উৎক্ষিপ্ত করে দিল—'৭১ সালে ২৫ মার্চের মৃত্যুরজনী প্রত্যক্ষ করবার পর পলিমাটির নমনীয়তায় চিরসহিষ্ণু বাঙলার সর্বংসহ প্রাণ শতধাবিদীর্ণ হল, চৈত্রকঠিন শপথে দামাল ছেলেমেয়ের দল এবার এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলতে উলটে ফেলতে মরণপণ করল। পূর্বখণ্ডের সেই ঝড়ের রাতগুলিতে

আমার জন্মভূমি: স্মৃতিময় বাঙলাদেশ: ধনঞ্জয় দাশ। মুক্তধারা। ৫٠٠

পশ্চিমখণ্ডের মানুষেরা যে এক লহমায় সমস্ত জড়তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাদের দোসর তাদের পরাণসখা হতে পেরেছে, এর চাইতে বড়ো গৌরব আর পুণ্য সমগ্র বাঙালি জীবনে আর কখনো লভ্য হয়নি। খুব বেশি দিন লাগল না, সমগ্র ভারত মিলিতভাবে ধর্মযুদ্ধের অংশীদার হল, বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা (তা সংখ্যায় তাঁরা যত কমই হোন না কেন) এবং বিবেকবান রাষ্ট্রগুলি (এখানে সংখ্যার ক্ষীণতা ছিল বটে!) সমর্থন জানাল উৎপীড়কের প্রাসাদ আর অর্থ-পিশাচ বলদর্পীর শির ধূলায় লুটিয়ে দেবার কাজে জানকবুল মুক্তিযোদ্ধাদের। নটি মাসও পুরো লাগল না। ভূমিষ্ঠ হল বাঙলার বুকে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ-তান্ত্রিক গণতান্ত্রিক এক রাষ্ট্রের যার রূপ দেখে আবারও আমরা বলতে পারি : ওগো মা, তোমার কী মূরতি আজি দেখি রে! তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ধনঞ্জয় দাশ বর্তমানে পশ্চিম খণ্ডের বাঙালি সন্তান, ১৯৫১ সাল পর্যন্ত যিনি ছিলেন পূর্ব খণ্ডের। তাঁর মনপ্রাণসত্তা তিলে তিলে গঠিত পূর্ববাঙলার রূপরসবৈশিষ্ট্যে, তাই বোধ করি রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও যে-মুহূর্তে ধর্মযুদ্ধের ডাক এসেছে ওপার বাঙলার সেই মুহূর্তেই এই লেখক সামগ্রিকভাবে একাত্ম হয়ে গেছেন তাঁর আত্মার আত্মীয়দের সঙ্গে —অন্য কোনোরকম দ্বিধায় দোদুল্যমান থেকে তিনি বৃথা কালক্ষেপ করতে পারেননি। সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা যখন মাতৃভূমির বক্ষ থেকে শত্রুকে উৎখাত করেছেন, তখন কবিরা লেখকেরা তাঁদের প্রাণে যুগিয়েছেন অভয়মন্ত্র, আদর্শের বাণী, ইতিহাসের প্রেরণা। ধনঞ্জয় দাশ মূলত কবি, স্বভাবতই তাই তিনি এই মুক্তিযুদ্ধে শামিল হবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে হাতে তুলে নিয়েছেন কলম। গ্রন্থটির মুখপাতে তিনি স্বরচিত ছন্দে বলেছেন : "চৈত্রদিনে ঝড়ের হাওয়ায় / তুমি এমন করে ডাক পাঠাবে / মাগো, আমি তা ভাবতে পারিনি"।

হয়তো-বা এ আর এক অকালবোধনই বটে, কিন্তু সেই বোধনে যে-পদ্মটি এই লেখক অচিরাৎ মাতৃপূজায় নিবেদন করতে পেরেছেন তার সৌন্দর্য ও সৌরভ এই মহৎ যজ্ঞের উপযুক্তই হয়েছে। দেড়শতাধিক পৃষ্ঠায় যে-ইতিহাস তিনি মুক্তিযোদ্ধা তথা বাঙালি জনমনের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন তা এই মুক্তিযুদ্ধের এক অতি মূল্যবান পশ্চাৎপট। এই ইতিহাস রচিত হয়েছে অতি দ্রুত, সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু হবার ছ-মাসের মধ্যে এই ধরনের ইতিহাস

রচিত হওয়া এবং নানাবিধ প্রতিকূলতা কাটিয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়া যে কত দুরূহ তা পশ্চিমবাঙলার সাহিত্যসাধক ভিন্ন অন্য কেউ বুঝবেন কিনা সন্দেহ। মুক্তধারা প্রকাশন-কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, তাঁরা বাঙলাদেশের মুক্তিলগ্নে এই গ্রন্থটি তো বটেই, তেমনি আরো এমন কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে মুক্তিপাগল মানুষদের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন যা এই সার্থক সংগ্রামে বিপুলভাবে সহায়ক হয়েছে।

বিপ্লবী কবি ধনঞ্জয় দাশ গ্রন্থটি রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে সঙ্কুচিত হয়েছেন এই ভেবে যে আত্মজীবনী লিখবার যোগ্যতা এবং বয়স তাঁর হয়নি। গ্রন্থটি পাঠ করবার পর পাঠক হিসেবে আমাদের কিন্তু প্রত্যাশাভঙ্গ হয়নি কারণ সংকীর্ণ আত্মশ্লাঘা ও জাতীয় তাৎপর্যবিহীন কোনো আত্মবিবরণ এই গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলিকে ভারাক্রান্ত করেনি। বরং পূর্ববাঙলার মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে লেখক সুদীর্ঘকাল যে কতখানি অভিন্ন হয়েছিলেন তা তাঁর এই আবেগপ্রদীপ্ত রচনায় স্বতঃ-উৎসারিত হয়েছে।

গ্রন্থটিতে বিধৃত হয়েছে পূর্ববাঙলার ন বছরের সংগ্রামী ইতিহাস, দেশ-বিভাগ থেকে শুরু করে ১৯৫৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। ছাত্রজীবনেই লেখক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাই তাঁর ইতিহাসে সঙ্গতভাবেই প্রাধান্য পেয়েছে ঐ সময়কার ঐ দেশের কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণা-কার্যকলাপের বিবরণ। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলন যেহেতু ব্যাপক গণজীবনের বৃহত্তম অংশকে সর্বদা ও সর্বথা স্পর্শ করতে সচেষ্ট থাকে সেহেতু কমিউনিস্ট পরিপ্রেক্ষিত জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতকে তুলে না ধরেই পারে না। এই আদর্শ এই গ্রন্থে নির্দোষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করি, গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্যও এই কারণে এর সাহিত্যমূল্যের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে।

'৪৮ সালের গোড়ায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে হঠকারী রাজনীতির আবর্তে কমিউনিস্ট আন্দোলন বিপর্যস্ত হয় এবং উভয় বঙ্গেই কমিউনিস্টদের ব্যাপকভাবে কারাবরণ করতে হয়—শ্রীযুক্ত দাশও '৪৮ সালের মাঝামাঝি খুলনায় গ্রেপ্তার হন। এই দফায় তাঁর বন্দীদশা মাসছয়েকের। এরপর তিনি কিছুকাল কলকাতায় কাটান, এখানেও পুলিশ তাঁর পেছন ছাড়েনি, '৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সি জেলে কয়েক মাস কাটে। পূর্ববাঙলায় প্রত্যাবর্তনের পরে '৫১ সালের এপ্রিল মাসে খুলনা শহরে তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন। মুক্তি পান '৫৪ সালের এপ্রিল

মাসে—প্রকৃতপক্ষে ঢাকার সেণ্ট্রাল জেলে একটানা তিন বছরের এই জেল-জীবনই এই গ্রন্থের মুখ্য আলেখ্য। এই মুক্তি অবশ্য স্থায়ী হয়নি, মাস দুয়েক বাদে পুনরায় শ্রীঘর দর্শন, এবার রাজসাহীর সেণ্ট্রাল জেলে। বছরখানেক সেখানে কাটানোর পরে খুলনা জেলে নীত হয়ে সেখান থেকে '৫৫ সালের জুলাই মাসে মুক্তি কিন্তু পূর্ণমুক্তি নয়, এবার জারী হল অন্তরীণ আদেশ, খুলনা জেলায় ডুমুরিয়া থানার কালিকাপুর নামক এক গ্রামে, এমন গ্রাম যেখান থেকে থানার দূরত্ব নয় মাইল। ঐ অবস্থায় তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটে, চিকিৎসার জন্য তিনি জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে পশ্চিম খণ্ডে চলে আসেন, '৫৫ সালের অক্টোবরে। ব্যক্তিজীবনের উপর্যুক্ত বৃত্তগুলির মধ্যে থেকে লেখক পূর্ববাঙলার সংগ্রামের যে রূপরেখা ফুটিয়েছেন তার মধ্যে সাহিত্যসংস্কৃতিগত আন্দোলনের চিত্রই প্রধানত উপস্থিত। কিন্তু যেহেতু দ্বিজাতিতত্ত্বের কুখ্যাত প্রবক্তা 'কায়েদে-আজম'-গিরির বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানেই পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই বিরোধিতার সূচনা হয়েছিল মাতৃভাষার মর্যাদারক্ষার প্রশ্নে, যেহেতু '৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ববাঙলার মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে সচেতন হতে প্রধান প্রেরণা যুগিয়েছে; সেহেতু আর্থনীতিক আন্দোলনকে প্রতিভাত করতে না পারলেও এই লেখক যে ভাষা-আন্দোলনের মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ নবজাত ছাত্রসমাজ ও সাংস্কৃতিক পটভূমিটি সবিস্তারে তুলে ধরতে পেরেছেন, তার মূল্য কম নয়।

বিশেষ করে ঢাকা ও রাজসাহীর সেণ্ট্রাল জেলে সেই নৈরাশ্যপীড়িত দিনগুলিতে বন্দীরা কি ভাবে কমিউনিস্ট ভাবধারায় বিবর্তিত হয়েছেন, প্রত্যয়ের অপহ্নব এবং নতুন প্রত্যয়ের মধ্যে বুক বাঁধার যে নিবিড় একান্ত চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন তা অনবদ্য। কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিকদের এই ইতিহাস অবশ্যই জানতে হবে। ঢাকা জেলের মধ্যে পাঁচটি সেলে বিভক্ত রাজবন্দীদের মধ্যে অসাধারণ ও সাধারণ বহু কমরেডের অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটনেও লেখক উদার সহমর্মিতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। '৫২ সালের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা-আন্দোলনের সাত দিনের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টি সে-সম্পর্কে যে মূল্যবান দলিলটি প্রস্তুত করেছিল সেটি লেখক তাঁর রচনার অঙ্গীভূত করেছেন এবং এবিষয়ে জেলের অভ্যন্তরে কমরেডরা যা মূল্যায়ন করেছেন তারও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি দিয়েছেন। জেলের মধ্যে লেখক পূর্ববাঙলায় নতুন সাহিত্য-আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে, ১৯৫৩ সালে, রচনা করেছিলেন যে অতি

মূল্যবান তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ—সেটিও এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। গুরুগম্ভীর তত্ত্ব আলোচনার ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে জেল-জীবনের হাসি-গান-ভালোবাসার ইতিহাস, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যে বিশেষ করে নাটকাভিনয়ের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়েছে। সেই '৫৩ সালে জেলখানায় বসে মুনীর চৌধুরী লিখলেন নাটক, ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রথম রচিত সেই বাংলা নাটক 'কবর'-এর প্রথম অভিনয় হয়েছিল ঢাকার সেণ্ট্রাল জেলের কারাগার-মঞ্চে, যার কুশীলব ছিলেন রাজবন্দীরা। সেই 'কবর'-খ্যাত নাট্যকারের কথা পড়তে পড়তে আজ যখন শুনি, ইয়াহিয়ার জল্লাদবাহিনী আত্মসমর্পণের আগের দিন যে-সব বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে তাঁদের মধ্যে ইনিও আজ সেই গণকবরে শায়িত, তখন অন্তরাত্মা শিহরিত হয়।

১৯৫৪ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির ইতিহাসটিও লেখক সংক্ষিপ্ত পরিসরে সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। তেভাগার দাবিতে নাচোল-কৃষক বিদ্রোহের নেত্রী ইলা মিত্রের উপর লীগশাহী যে পাশবিক অত্যাচার করেছিল তারও অগ্নিবর্ষী বিবরণ আমরা এই গ্রন্থে পাই। পশুর অত্যাচারে বিপ্লবী প্রাণ পরাজিত হয়নি বরং সহস্রগুণ শক্তিতে তা উদ্বুদ্ধ করেছে সহস্র তাজা নবীন প্রাণকে যারা '৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রথম সুযোগেই সেই রক্তবীজের ঝাড়কে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিল। এ-সব কথা লেখক প্রাণের ভাষায় সহজ ছন্দে বলতে পেরেছেন বলেই আমরা এমন গ্রন্থকে অভিনন্দন জানাই। গ্রন্থের পরিশিষ্টে লেখক বাঙলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সর্বাত্মকভাবে অগ্রসর হবার জন্য যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন এবং তার যুক্তি হিসেবে '৩৬ সালে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করতে উদ্যত ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে নিখিল বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠনের যে চমৎকার নজিরটি তুলে ধরেছেন তাও আমাদের ভালো লাগে।

অতৃপ্তি শুধু এইটুকু যে লেখক তাঁর চার প্রস্থ জেলজীবনের দীর্ঘতম তৃতীয় অধ্যায়টি ভিন্ন অন্যান্য অধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বিস্তারিত পরিচয় দেননি—হয়তো মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল বেগবান ধারার শরিক হবার প্রয়োজনে দীর্ঘতর আলোচনার অবকাশ তখন ছিল না—কিন্তু এখন তো গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশের সার্বভৌমত্ব অলঙ্ঘনীয়, এখন তো এমন সব গ্রন্থের আদর এপার বাঙলা ওপার বাঙলায় শতগুণ বৃদ্ধি পাবে, এখন তো লেখক ধীরেসুস্থে তাঁর অভিজ্ঞতার অলিখিত অধ্যায়গুলিকে ভরাট করে তুলতে পারেন—পরবর্তী সংস্করণে লেখক সেই কাজে ব্রতী হলে এ গ্রন্থের মূল্য আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

সত্যপ্রিয় ঘোষ

পরিচয়
বর্ষ ৪১ । সংখ্যা ৮-৯
ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৮

সূচিপত্র

সম্পাদক
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল
প্রচ্ছদ : বিশ্বরঞ্জন দে

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

নিয়তিঃ
কেন বাধ্যতে !
বিস্তারিত বিবরণের জন্যে নিকটতম বীমা
এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন :
জীবন বীমা করান
জীবন সুখী করুন।
লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া
ASP/LIC/Z-80A

এই সময়ের অনন্য কাব্যসঙ্কলন

এরই নাম অন্য বাংলাদেশ

তরুণ সান্যাল

মূল্য : চার টাকা

সারস্বত লাইব্রেরী

২০৬ বিধান সরণি। কলকাতা

পরিচয়
বর্ষ ৪১। সংখ্যা ৮
ফাল্গুন। ১৩৭৮

বাঙলাদেশের কৃষি-সম্পর্কিত কাঠামো

রণজিৎ দাশগুপ্ত

বাঙলাদেশ বা পূর্বতন পাকিস্তানের ১৯৪৭-এ যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রায় দুশ বছর ধরে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দায়ভাগ নিয়ে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত-বিভাগের সময়ে এই ভূখণ্ডটির অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল অতি পশ্চাৎপদ, একান্তভাবে কৃষিনির্ভর, আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক প্রকৃতির।

তারপর দুই দশকেরও বেশি সময় গড়িয়ে গেছে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আধা-মুৎসুদ্দি প্রকৃতির ধনিক-ভূস্বামী-আমলাতন্ত্রের কল্যাণে এই দেশটি ক্রমশই প্রধানত মার্কিন নয়া-উপনিবেশবাদের নিগড়ে আবদ্ধ হয়েছে। আবার, নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার পাকিস্তান বা সঠিকভাবে বলতে গেলে পশ্চিম-পাকিস্তান পাকিস্তানী রাষ্ট্রেরই অপর একটি অংশের উপরে চাপিয়ে দিয়েছিল একেবারে ঔপনিবেশিক প্রকৃতির পশ্চিম-পাকিস্তানী শোষণ। ফল হিসেবে অখণ্ড পাকিস্তানের পূর্ব-ভূখণ্ডটির আধা-সামন্ততান্ত্রিক ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে কোনো মূলগত পরিবর্তন ঘটে নি।

বর্তমান রচনায় অবশ্য বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হচ্ছে না। এখানে শুধুমাত্র কৃষি-অর্থনীতি, বিশেষত কৃষিসংক্রান্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

এক

পশ্চাৎপদ, আধা-অচল অর্থনীতি

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল, গত চব্বিশ বছরে বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন

ঘটলেও মোটের উপরে এই দেশের অর্থনীতি আধা-অচল অবস্থাতেই রয়ে গেছে। তালিকা ১-এর থেকে এটি স্পষ্ট। বিগত বছরগুলিতে বাঙলাদেশ বা পূর্ব-পাকিস্তানের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (Gross Domestic Product) গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে তারতম্য খুবই সামান্য। এর ফলে মাথা পিছু বার্ষিক আয়ের কোনো বৃদ্ধিই ঘটে নি। তালিকা ১-এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পরিকল্পনা-পূর্ব বছরগুলিতে মাথা পিছু বার্ষিক আয় ছিল ২৯৭ টাকা, প্রথম পরিকল্পনার সময়ে এটি কমে হয় ২৭৫ টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এটি কোনো রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেড়ে হয় মাত্র ৩০১ টাকা। আর তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বছর ১৯৬৭-৬৮তে এটা দাঁড়ায় ৩১৬ টাকাতে।

কিন্তু এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা বাঙলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিপ্রধান। আর আধা-অচলাবস্থা এই কৃষি-অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব। এটিই প্রতিফলিত হয়েছে গোটা অর্থনীতির ক্ষেত্রে। সে কারণেই কৃষি-অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি ভালোভাবে অনুধাবন করা দরকার।

এক। অন্যান্য অর্ধোন্নত দেশের মতো বাঙলাদেশের অর্থনীতিরও প্রধান অবলম্বন কৃষি। তালিকা ১-এর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, বাঙলাদেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি কৃষিক্ষেত্র থেকেই উৎপন্ন হয়: পরিকল্পনা-পুর্ব বছরগুলিতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষিজাত আয়ের অংশ ছিল ৬৪ শতাংশ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কিছুটা হ্রাস পাওয়ার পরেও এই অনুপাত ৫৮ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনার বছরগুলিতে এই অনুপাতের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।[১]

অবশ্য শুধুমাত্র মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষিজ আয়ের অনুপাতসংক্রান্ত উপরোক্ত তথ্যের থেকে বাঙলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অপরিসীম গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয় না। এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় হল যে, ১৯৫১ সালে বাঙলাদেশের জনসমষ্টির চার-পঞ্চমাংশেরও বেশি অর্থাৎ ৮৩ শতাংশ জীবনধারণের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তীকালে এই নির্ভরশীলতা হ্রাস পায় নি, বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬১-এর জনগণনা-বিবরণী অনুযায়ী এই অনুপাত ৮৫ শতাংশ। বাস্তবিকপক্ষে দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার কোনো দেশের অর্থনীতিতেই কৃষির এই রকম মাত্রায় প্রাধান্য নেই।[২]

দুই। বাঙলাদেশে জনবসতির ঘনত্ব বা density of population খুবই বেশি। ১৯৫১ সালে প্রতি বর্গ মাইলে জনবসতির ঘনত্ব ছিল ৭৭৭ জন,

তালিকা ১ ঃ পূর্ব-পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) উৎপাদন কাঠামো ও মাথা পিছু আয় সম্পর্কে মূল তথ্য

(১৯৫৯/৬০ সালের দামে `০০,০০, ০০০ টাকা)

	প্রাক-পরিকল্পনা ১৯৫০/৫১—১৯৫৪/৫৫	প্রথম পরিকল্পনা ১৯৫৫/৫৬—১৯৫৯/৬০	দ্বিতীয় পরিকল্পনা ১৯৬০/৬১—১৯৬৪/৬৫	তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বছর ১৯৬৭/৬৮	বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১৯৪৯/৫০—১৯৫৪/৫৫	১৯৫৪/৫৫—১৯৫৯/৬০	১৯৫৯/৬০—১৯৬৪/৬৫	১৯৬৪/৬৫—১৯৬৭/৬৮
কৃষি	৮,৬৪৮	৮,৬০৫	১০,১০৪	১১,৭৯০	—	—	—	—
অ-কৃষি	৪,৮৬০	৫,৫২০	৭,৩৭৬	৮,৯৬০	—	—	—	—
(বৃহদায়তন উৎপাদন)	(১৩৫)	(৩২৪)	(৭০১)	—				
অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদন (Gross Domestic Product)	১৩,৫০৮	১৪,১০৭	১৭,৮৮০	২১,৯২২	২.২	১.৬	৪.৪	৫.৭
জনসংখ্যা (লক্ষ)	৪৫৫	৫১৩	৫৮০	৬৯২	২.৩	২.৩	৩.২	৩.৩
মাথা পিছু উৎপাদন	২৯৭	২৭৫	৩০১	৩১৬	-০.১	—০.৭	১.২	২.৩
পূর্ব-পাকিস্তানের মাথা পিছু উৎপাদন পশ্চিম পাকিস্তানের মাথা পিছু উৎপাদনের শতাংশ	৮৬.৬	৭৫.৫	৭৬.৬	—	—	—	—	—
অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদনে কৃষির অনুপাত (শতাংশ)	৬৪.০	৬১.০	৫৭.৮	৫৩.৭	—	—	—	—
মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে বৃহদায়তন উৎপাদনের অনুপাত (শতাংশ)	১.০	২.৩	৪.০	—	—	—	—	—

সূত্র : প্রাকপরিকল্পনা থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনা —Stephen Lewis, Pakistan : Industrialization and Trade Policies, Table 6 2; অন্যান্য—F. Kahnert, H. Stier and others, Agriculture and Related Industries in Pakistan, Tables I-1 and IV-1.

১৯৬১ সালে এটি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯২২ জন, পরবর্তীকালে এর যে আরও বৃদ্ধি ঘটেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

তিন। বাঙলাদেশের মোট ভৌগোলিক আয়তন ৩·৫২ কোটি একর। এর মধ্যে ১৯৬৫-৬৬তে মোট কর্ষিত জমি (Total cultivated Area) অর্থাৎ নীট কর্ষিত জমি ও কর্ষণযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ২·২৩ কোটি একর। আর একবারের বেশি চাষ হয় এমন জমির পরিমাণ ৭৯ লক্ষ একর। এর অর্থ হল যে চাষের তীব্রতা (Intensity of Cropping) অর্থাৎ, নীট কর্ষিত জমির তুলনায় মোট কর্ষিত জমির অনুপাত ১৩৬ শতাংশ। সহজ কথায় বর্তমানে চাষের অধীন রয়েছে এমন জমির ৩৬ শতাংশতে বা এক-তৃতীয়াংশের সামান্য কিছু বেশি জমিতে বছরে একাধিকবার চাষ হয়। এই ক্ষেত্রে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে আদৌ চাষ হয় না এমন নতুন জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার কিংবা নতুন করে চাষের আওতায় নিয়ে আসার প্রায় কোনো সুযোগই নেই। চাষ হয় না অথচ চাষের উপযোগী—এমন জমি প্রায় সম্পূর্ণ নিঃশেষিত।

চার। বাঙলাদেশের কৃষি-অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একটি মাত্র ফসলের উপর নির্ভরশীলতা বা mono-culture। ১৯৬৭-৬৮ সালের হিসেব অনুসারে কোনো না কোনো ফসলের অধীন মোট জমির পরিমাণ (Total Cropped Area) ছিল ৩·৩৮ কোটি একর। এর মধ্যে ২·৪ কোটি একর অর্থাৎ ৭২·৫ শতাংশ জমিই ধান চাষের জমি। বাঙলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান ফসল ও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল পাটের চাষ হয়েছে মাত্র ৭ শতাংশ বা ২৩ লক্ষ একর জমিতে।[৩] এ সবই নানা রকমের ফসল আবাদের মধ্যে দিয়ে কৃষির বৈচিত্র্যকরণের অভাব এবং ফলস্বরূপ কৃষি-অর্থনীতির একটি মৌলিক দুর্বলতারই পরিচয়।

পাঁচ। কিন্তু চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ জমিতে ধানের চাষ হলে কি হবে? বাঙলাদেশে যথেষ্ট খাদ্য ঘাটতি রয়েছে—মোট প্রয়োজনের ১০ শতাংশ পর্যন্ত ঘাটতি রয়েছে।

ছয়। ধানের মোট উৎপাদন এবং জমির একর পিছু ফলনের ক্ষেত্রে আধা-অচল অবস্থা বাঙলাদেশের কৃষি-অর্থনীতির মৌলিক দুর্বলতার অন্যতম প্রকাশ। তালিকা ২-এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ধানের বার্ষিক উৎপাদন ও জমির একর পিছু ফলন সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ছিল। দ্বিতীয়

তালিকা ২ : ধান ও পাটের উৎপাদন এবং ফলন

	১৯৪৭/৪৮ থেকে ১৯৫১/৫২র গড়	১৯৫৪/৫৫	১৯৫৫/৫৬	১৯৫৬/৫৭	১৯৫৭/৫৮	১৯৫৮/৫৯	১৯৫৯/৬০	১৯৬০/৬১	১৯৬১/৬২	১৯৬২/৬৩	১৯৬৩/৬৪	১৯৬৪/৬৫	১৯৬৫/৬৬	১৯৬৬/৬৭	১৯৬৭/৬৮
ধান উৎপাদন															
আউস		১,৯৫৭	১,৭৯৪	২,১৫৯	২,০৮৫	১,৫৬০	২,০৯৫	২,৪৯৭	২,৩২৮	২,২০২	২,৬৫৭	২,৫০১	২,৯১৮	২,৬৭৪	৩,০৬৯
আমন		৫,২৬২	৪,২৫৬	৫,৭৮৯	৫,১৫৪	৪,৯৭০	৫,৯৮৮	৬,৫৭৪	৬,৬৫৩	৬,০৪৬	৭,২৯০	৭,২৬২	৬,৭৯৯	৫,৯১৯	৬,৮১২
বোরো		৩৬৮	৩৩৪	২৬৬	৩৫৯	৩৯১	৩৯৯	৪৫৮	৪৮৫	৪৮২	৫০৯	৫৭৪	৬১৮	৮৩১	১,১১৪
মোট ধান উৎপাদন (হাজার টনের হিসেব)	৭,২৩৩১	৭,৫৮৯	৬,৩৮৪	৮,১৮৪	৭,৫৯৮	৬,৯২১	৮,৪৮২	৯,৫১৯	৯,৪৬১	৮,৭১০	১০,৪৫৬	১০,৩৭৭	১০,৩৩৫	৯,৪২৪	১০,৯৯৫
ধানের ফলন															
আউস		৮'৮	৮'৪	৯'৮	৯'৮	৭'৫	৯'১	১০'৮	১০'৮	৯'৭	১১'০	১০'২	১০'৯	১০'৪	১০'২
আমন		৯'৯	৮'৯	১১'৮	১০'৩	১০'৩	১১'২	১২'৩	১২'৮	১১'৬	১৩'৬	১৩'১	১২'৬	১১'৫	১২'৬
বোরো		১১'৮	১৩'২	৯'৪	১২'০	১২'৫	১১'৮	১১'১	১৩'১	১২'২	১৩'০	১৪'৮	১৪'৮	১৬'৩	১৯'৮
মোট (একর প্রতি মণ)	১০'২২	৯'৭	৮'৯	১১'১	১০'২	৯'৬	১০'০	১১'৮	১২'৩	১১'১	১২'৮	১২'৩	১২'৪	১১'৫	১২'২
পাটের উৎপাদন (হাজার টনের হিসেব)	৯৪৪১	৮'৩২	১,১৬১	৯৮৫	১,১০৭	১,০৭১	৯৯২	৯৭৬	১,২৪৪	১,১২৫	১,০৪৯	৯৫১	১,১৩৬	১,১৬৫	১,২০০
পাটের ফলন (একর প্রতি মণ)	১৭'১২	১৮'২	১৯'৩	২১'৮	১৯'৩	১৯'১	১৯'৬	১৪'৩	১৬'৪	১৭'৮	১৬'৮	১৫'৬	১৪'৮	১৪'৪	১৩'৯

সূত্র : ১ J. R. Andrus and A. F. Mohammed, The Economy of Pakistan, Tables VI and XI
২ Government of Pakistan, The Fourth Five Year Plan, Table 5 [তথ্যটি ১৯৪৯-৫০ এর]
১৯৫৪/৫৫—১৯৬৭/৬৮র তথ্যের সূত্র F. Kahnert, H. Stier etc., Agriculture And Related Industries in Pakistan, Tables 41, 42 and 43.

পরিকল্পনা কালে (১৯৫৯-৬০ থেকে ১৯৬৪-৬৫) এই দুই ক্ষেত্রেই বেশ কিছুটা বৃদ্ধি বা অগ্রগতি ঘটেছে। কিন্তু ১৯৬৩-৬৪র পরবর্তী ৬/৭ বছরে আবার অচলাবস্থা দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই বছরগুলিতে ধান উৎপাদনের পরিমাণে তীব্র ওঠা-নামা ঘটেছে। বাস্তবিকপক্ষে তালিকা ২ অনুসারে আউস, আমন ও বোরো—এই তিনটি ধান ফসলের মধ্যে প্রধান আমনের ক্ষেত্রে পুরো ষাটের দশকে একই সঙ্গে অচলাবস্থা এবং তীব্র ওঠা-নামা খুবই প্রকট।

ধানের ক্ষেত্রে এই যখন পরিস্থিতি তখন পাটের মোট উৎপাদনের ক্ষেত্রে খুবই ওঠা-নামা ঘটেছে আর জমির একক প্রতি পাটের ফলন হ্রাস পেয়েছে।

সাত। উপরে যেসব দিকের উল্লেখ করা হল সেগুলির সঙ্গে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। বাঙলাদেশের কৃষি-অর্থনীতিতে একটি দ্বৈত প্রকৃতির বিনিময় অর্থনীতির প্রসার ঘটেছে। একদিকে রয়েছে বহু সংখ্যক, আনুমানিক ৬৫ লক্ষ, অসংগঠিত বিক্ষিপ্ত ধরনের কৃষি-উৎপাদন একক বা জোত। এদের অন্যতম বিশেষত্ব জীবনধারণোপযোগী স্তরে চাষবাস বা subsistence farming। উৎপন্ন খাদ্যশস্যের তিন-চতুর্থাংশই উৎপাদকের স্তরে ভোগের প্রয়োজন পূরণ করে—বাজারে কেনা-বেচার প্রক্রিয়ার ভিতরে আসে না। আর অন্যদিকে সেই ইংরেজ আমল থেকেই subsistence economyতে ভাঙন ঘটছে, মুদ্রা ও পণ্য অর্থনীতির বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটছে। একই সঙ্গে এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়া কৃষিসংক্রান্ত সম্পর্ক বা agrarian relationsকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে।

উপরে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হল সে সবের থেকে একথা সম্ভবত স্পষ্ট হয়েছে যে, এখানে-ওখানে সামান্য কিছু পরিবর্তন কিংবা অগ্রগতি সত্ত্বেও বাঙলাদেশের কৃষি-অর্থনীতি মোটের উপরে এখনও মুখ্যত ও মূলত পশ্চাৎপদ, নিম্ন ফলন বিশিষ্ট, মান্ধাতা প্রকৃতির কৃষিব্যবস্থা হিসেবে রয়ে গেছে। কৃষির উৎপাদন, বিশেষত উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, উৎপাদনশীল শ্রমের সম্প্রসারণ এবং উন্নত ধরনের বীজ, নিশ্চিত জল, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি আধুনিক উৎপাদন-উপাদান বা input-এর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কৃষির আধুনিকীকরণ ঘটছে না। এর ফলে যে কৃষি-অর্থনীতির বিকাশ ও উন্নয়ন হচ্ছে না শুধু তা নয়। কৃষিই বাঙলাদেশের অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন হওয়ার ফলে সমগ্র অর্থনীতিরই বিকাশ ও অগ্রগতি ব্যাহত ও ক্ষুণ্ন হয়েছে।

আলোচনার এই স্তরে এই প্রশ্ন ওঠা খুবই সঙ্গত যে, পাকিস্তানী আমলে কেন বাঙলাদেশের কৃষি-অর্থনীতির কোনো উল্লেখযোগ্য ও মূলগত প্রকৃতির অগ্রগতি ঘটল না অথবা কেন তা আধা-অচলাবস্থা ও পশ্চাৎপদতাকে অতিক্রম করতে পারল না? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বাঙলাদেশের ভৌগোলিক প্রকৃতি, কৃষির মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীলতা, প্লাবন ও সামুদ্রিক ঝড় থেকে শুরু করে উন্নত ধরনের বীজ, রাসায়নিক সার ইত্যাদি ব্যবহারে কৃষক সমাজের ব্যাপক অংশের আর্থিক অক্ষমতা ও বিত্তবান অংশের অনিচ্ছা, অথবা পাকিস্তানী শাসকচক্রের বাঙলাদেশের কৃষির উন্নয়নের প্রতি অবহেলার মনোভাব ইত্যাদি ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-প্রযুক্তিবিদ্যাগত নানা-বিধ কারণের উল্লেখ করা যায় এবং নিঃসন্দেহেই এ সব কারণ বা উপাদান কাজ করছে।

কিন্তু মুখ্যত ও মূলত যে বিশেষ উপাদান বাঙলাদেশের কৃষির বিকাশের পথকে জগদ্দল পাথরের মতো আটকে রেখেছে তা হল কৃষিসম্পর্কিত কাঠামো বা agrarian structure। এখানে কৃষিসম্পর্কিত কাঠামো বলতে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত, জমির মালিকানা ও বণ্টন, প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত ব্যবস্থা. কৃষিপরিবার-গুলির আয় এবং ঋণ ও বাজার ব্যবস্থা বোঝানো হচ্ছে। এই কৃষিসম্পর্কিত কাঠামোর মূলগত ত্রুটি কৃষি-উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে এবং স্বাধীন বাঙলাদেশে কৃষি তথা জাতীয় অর্থনীতির ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের স্বার্থে এই ত্রুটিগুলিকে সম্পূর্ণ দূর করতে হবে। বর্তমান নিবন্ধের পরবর্তী অংশগুলিতে কৃষিসম্পর্কিত কাঠামোর নানাদিক, বিশেষত মৌলিক ত্রুটি ও অসঙ্গতির বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। তবে বলে রাখা ভালো যে. এ সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা ভিন্ন বর্তমান লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব রয়েছে। সে কারণে এখানে যে মতামত প্রকাশ করা হচ্ছে তা অবশ্যই সংশোধনযোগ্য।

দুই

১৯৪৭-এর ভূমিসংক্রান্ত বন্দোবস্ত

১৯৪৭-এ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সময়ে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে (বাঙলাদেশ) যে ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল, তা হল লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল অসঙ্গতি ও কৃষির বিকাশের

পরিপন্থী বৈশিষ্ট্যগুলিকে ১৯৩০-এর বঙ্গীয় ভূমিরাজস্ব বিষয়ক কমিশনের (ফ্লাউড কমিশন) প্রতিবেদনে সুতীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছিল।

এক / সরকারকে দেয় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে সাধারণভাবে জমিদারেরা কৃষির উন্নতিসাধন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কাজে সচরাচর উদ্যোগী হয় নি।

দুই / জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে ও অ-কৃষি ক্ষেত্রে জীবিকার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ থাকার ফলে কর্ষিত জমির পরিমাণ এবং সেই সঙ্গে কর্ষণযোগ্য জমির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আর, এরই সুযোগ নিয়ে জমিদাররা কৃষকদের উপর খাজনা ও নানা রকমের বে-আইনী আদায়ের বোঝা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিয়েছে।

তিন / জমিদার ও প্রকৃত চাষীর মধ্যে অসংখ্য মধ্যস্বত্ব ও উপস্বত্বভোগী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। আর নিকৃষ্ট স্বত্বসম্পন্ন প্রজা, স্বত্বহীন কৃষক, ভাগচাষী ও উঠবন্দী কৃষকেরা জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বাধিকারীদের নিষ্ঠুর শোষণের শিকার হয়েছে।

চার / নানাবিধ শোষণে জর্জরিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিরাপত্তাহীন গরীব চাষীদের কৃষির উন্নতিবিধানের জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়ার মতো সম্বল বা উদ্দীপনা (incentive) কিছুই ছিল না।

এই সব নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ করে ফ্লাউড কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন এবং সরকার কর্তৃক সমস্ত মধ্যস্বত্ব গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেন। কমিশন এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "কোনো আধা-খেচড়া ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটিগুলির সন্তোষজনক প্রতিকার করতে পারবে না।...প্রকৃত চাষীকে সরকারের অধীনে সরাসরি প্রজাতে পরিণত করাই [এই সংক্রান্ত] নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত।"[৪]

কিন্তু যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী রাজনৈতিক আলোড়নের দরুণ অবিভক্ত বাঙলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের এই প্রস্তাব কার্যকরী হয় নি। ফলে দেশবিভাগ যখন ঘটল তখনও পূর্ব-বাঙলা বা বর্তমান বাঙলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল—কর্ষিত জমির ৭৬ শতাংশ—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় ছিল। এই ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে সরকারকে রাজস্বদাতা এস্টেটগুলির ৯২ শতাংশেরই রাজস্ব ১৭৯৩ সালের রেগুলেশান ৭ অনুসারে চিরকালের মতো স্থিরীকৃত ছিল।[৫]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট এইসব জমিদার এবং প্রকৃত চাষীর মধ্যে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৫০টি পর্যন্ত) খাজনা-

ভোগী স্বত্ব-উপস্বত্বের এক জটিল ব্যবস্থা। খাজনাভোগীদের একাংশের—১৮১৯-এর পত্তনী তালুক রেগুলেশনের দ্বারা সৃষ্ট পত্তনী তালুকদারদের—অধিকার ছিল কার্যত জমিদারদের অনুরূপ। এইসব তালুকদার বা পত্তনীদার, দর-পত্তনীদার প্রমুখ স্থায়ী উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য স্বত্বে অধিকারী ছিল। আর এরাও জমিদারের মতোই অধিকাংশ জমি নিজেদের তত্ত্বাবধানে চাষের জন্য না রেখে খাজনার বিনিময়ে প্রজাবিলিতে দিত। এই প্রজাদের একাংশ আবার প্রথমে ১৮৫৯ ও তারপরে ১৮৮৫র বিখ্যাত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের দৌলতে স্থায়ী স্বত্ব বা রায়তী স্বত্বর অধিকারী হয়েছিল। আর কালক্রমে রায়ত প্রজাদের অনেকেই জমিদার, তালুকদারদের মতো আচরণ করতে শুরু করে।

এই যে ভূমি-বন্দোবস্ত তা মূলত সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের। তার অন্তর্নিহিত মূলগত অসঙ্গতি ও শোষণমূলক দিকগুলি তীব্রভাবে প্রকট হয়ে ওঠে বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও তার অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে। মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজার, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি সব মিলিয়ে অনেক স্বত্ববান রায়তী চাষী দরিদ্র হয়েছে, অনেকে খাজনা, ট্যাক্স সুদ ইত্যাদির দায়ে জমি বেচে ভাগচাষী, স্বত্বহীন চাষী, নিঃস্ব চাষী ও ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে। আর এদেরই জোতজমা কিনে নিয়ে সম্পন্ন স্বত্ববান রায়ত বা প্রজাদের একাংশ জোতদারে পরিণত হয়েছে—জমি-জায়গা, মহাজনী কারবার, ধান-চাল-পাটের ব্যবসা, খাদ্যের মজুতদারী ও কালোবাজার ইত্যাদি গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ক্রমশ এদের আধিপত্য প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তারা পুরাতন ভূস্বামী বা জমিদারদের থেকেও বেশি ক্ষমতাশালী হয়েছে।

যাই হোক, দেশবিভাগ-পরবর্তী পূর্ব-বাঙলার ভূমিবন্দোবস্তের বিষয়ে সরকারী সূত্রে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, আনুমানিক ৮ শতাংশ জমি ছিল জমিদার-তালুকদারদের খাসে—এই জমি পত্তন কিংবা প্রজাবিলিতে না দিয়ে চাকর কিংবা বেতনভোগী নিজস্ব লোক অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক দিয়ে চাষ করানো হত। অবশ্য আনুষ্ঠানিক অর্থে এরা কৃষিশ্রমিক হলেও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নানা রকমের বাঁধনে এরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। ৭০ শতাংশ জমি চাষ করত রায়তী স্বত্ববান প্রজা কিংবা তাদের নিম্নস্থ হরেক স্বত্ব-উপস্বত্বের অধিকারী প্রজারা। এদেরই একাংশ ছিল সম্পন্ন জোতদার।

আর ২২ শতাংশ জমি চাষ করত বিপুল সংখ্যক স্বত্বহীন চাষী—বর্গাদার, উঠবন্দী, ইচ্ছাধীন প্রজা প্রমুখ।[৬]

১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে[৭] জানা যায় যে, কৃষিতে কর্মরত মোট জনসংখ্যা ছিল ১০৭.১৫ লক্ষ। এর ভিতর (ক) ৩৭.৪৩ লক্ষ চাষ করত নিজস্ব মালিকানাহীন জমি, (খ) ৪৩.৩৪ লক্ষ চাষ করত কিছুটা নিজস্ব মালিকানাধীন আর কিছুটা খাজনায় বন্দোবস্ত নেওয়া জমি। আর (গ) ২৫.৪৪ লক্ষ অর্থাৎ কৃষিতে কর্মরত জনসমষ্টির এক-চতুর্থাংশ ছিল একেবারেই ভূমিহীন। এদের মধ্যে ৬.২১ লক্ষ জন চাষ করত শুধুমাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত নেওয়া জমি, ৪.১০ লক্ষ খাজনায় জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করত ও আবার অন্যের জমিতে জনমজুর খাটত, আর ১৫.১৩ লক্ষ ছিল ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে কৃষিতে কর্মরত জনসমষ্টির এই নানা শ্রেণীর প্রত্যেকটির হাতে কর্ষিত জমির কত অংশ ছিল কিংবা উপরে উল্লিখিত (খ) শ্রেণীর চাষের অধীন জমির কতটা নিজস্ব মালিকানাধীন ও কতটা খাজনায় বন্দোবস্ত নেওয়া ছিল সে সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই। তা পাওয়া গেলে তৎকালীন জমি-জমার বন্দোবস্ত বোঝার পক্ষে খুবই সহায়ক হবে।

মোটের উপরে, সে সময়কার পূর্ব-বাঙলার গ্রামীণ জীবনের—জমি-জমার মালিকানা, ঋণব্যবস্থা, ধান-পাটের কারবার, আনুষঙ্গিক অন্যান্য সম্পদ থেকে শুরু করে সমবায় ঋণদান সমিতি, ইউনিয়ন বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, জেলা বোর্ড, থানা-পুলিশ পর্যন্ত—সর্বক্ষেত্রে অবাধ অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতপত্তি-ক্ষমতার অধিকারী ছিল উৎপাদনের বা চাষের দায়-দায়িত্ব-ঝুঁকি বহনে বিমুখ অনুৎপাদক পরগাছা একটি শ্রেণী যার অন্তর্ভুক্ত ছিল পুরনো দিনের জমিদার-তালুকদারেরা, আবার উঠতি জোতদারেরাও। আর চাষ-বাসের কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণকারী প্রকৃত উৎপাদক বা প্রকৃত চাষীদের বড় অংশই ছিল জমির মালিকানাহীন ও চরম দুর্দশাগ্রস্ত। গ্রামাঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনে এদের স্থান ছিল একেবারে নিচে।

তিন

পূর্ব-পাকিস্তানে ভূমিসংস্কার

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রচলিত ভূমিবন্দোবস্ত সংস্কারের প্রথম ও কার্যত শেষ চেষ্টা করা হয় ১৯৫০ সালে। বলে রাখা ভালো যে, মুখ্যত মুসলমান সামন্ত

ভূমিস্বার্থ-মুসলমান ব্যবসায়ী-মুসলমান উচ্চ মধ্যবিত্তের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের কোনো সুনির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচি বিশেষত সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ভূমিসংস্কারের কর্মসূচি, ছিল না। কিন্তু নানা ঐতিহাসিক কারণে পূর্ব-বাঙলার জমিদার, তালুকদার, মহাজন, কারবারীদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। উল্টোদিকে অগণিত শোষিত, উৎপীড়িত কৃষকদের ব্যাপক অংশ ছিল মুসলমান। ফলে গ্রামীণ সমাজের যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার, জোর-জুলুম, নিষ্ঠুর শোষণের জন্য সংখ্যালঘু হিন্দু ভূস্বামী ও বিত্তবানদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিত্তহীন গরীব মুসলমান চাষীর প্রবল ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছিল। অবশ্য বায়তী স্বত্বসম্পন্ন বিত্তবান চাষী ও উঠাত জোতদারদের একটা বড় অংশই ছিল মুসলমান। কিন্তু মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচারের দৌলতে একমাত্র হিন্দুরাই ছিল যাবতীয় সামন্ত শোষণ ও নিপীড়নের প্রতিনিধি। এই কারণে পুরনো জমিদার, তালুকদারের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মানসিকতা ও চাপ দানা বেঁধে উঠেছিল।

তা ছাড়া দেশবিভাগের অব্যবহিত আগে ও পরে পূর্ব-বাঙলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংগ্রামী কৃষক আন্দোলন—রংপুর দিনাজপুর খুলনাতে তে-ভাগার লড়াই, ময়মনসিংহে টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম, শ্রীহট্টে নানকার প্রথার বিরুদ্ধে জঙ্গী আলোড়ন ইত্যাদি—অন্তত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা পুরনো জমিদারী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নটিকে খুবই জরুরি করে তোলে।

আর এই পটভূমিতেই ১৯৫০ সালে প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ববঙ্গ জমিদারী হুকুমদখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করা হয়। এই আইনে প্রধান প্রধান বিষয় ছিল নিম্নরূপ :

১. খাজনাভোগী সমস্ত জমিদারী ও মধ্যস্বত্বাধিকারের অবসান ও সরকার কর্তৃক এই রকম সব জমির দখলগ্রহণ ;

২. সরাসরি সরকারের অধীনে সকল প্রজাকে জমির প্রকৃত দখল প্রদান ;

৩. ভবিষ্যতে জমিতে কোনো রকমের উপস্বত্বের সৃষ্টি কিংবা পত্তন দেওয়া বা খাজনায় বন্দোবস্ত দেওয়া নিষিদ্ধকরণ ; এবং

৪. জোতজমার সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে ৩৩ একর নির্ধারণ।

৫. আইনে একথাও বলা হয় যে, সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত জমি সরকার দখল নিয়ে ভূমিহীন ও গরীব চাষীদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করবেন।

আপাতদৃষ্টিতে এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল ভূমিবন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সুদূর-প্রসারী, গভীর পরিবর্তনসাধন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কি দাঁড়াল?

নিঃসন্দেহেই এই আইনের ফলাফলের কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে। মূলত এই আইন গ্রামীণ সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন পুরনো সামন্ত ভূস্বামীগোষ্ঠীর স্বার্থ-বিরোধী এবং স্থায়ী, উত্তরাধিকারযোগ্য স্বত্ববান প্রজাদের উপরতলার বা বিত্তবানদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল। (ক) এই আইনের বলে বিধিবদ্ধ বা statutory সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক মধ্যস্বত্ব ও বৃহৎ ভূস্বামীত্বের অবসান ঘটল। (খ) সরকার ও স্বত্ববান প্রজাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হল। তাতে মাঝারি ভূস্বামী, জোতদার ও প্রজাদের উপরদিকের অংশ লাভবান হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে, এদের অধিকাংশই মুসলমান এবং এরা সকলেই ছিল মুসলিম লীগের শক্ত খুঁটি। (গ) আইনত ও আনুষ্ঠানিকভাবে খাজনার বিনিময়ে প্রজা বন্দোবস্ত দেওয়া বা জমি লীজ দেওয়া নিষিদ্ধ হল। (ঘ) গ্রামীণ সমাজের সর্বক্ষেত্রে (সমবায় সমিতি, ইউনিয়ন বোর্ড, থানা-পুলিশ, শিক্ষা জগৎ ইত্যাদি) ক্ষমতার বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল।

কিন্তু এই সব পরিবর্তন সত্ত্বেও যা অনস্বীকার্য ও সবিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন তা হল এই যে এই আইন পূর্ব-বাঙলার প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-সম্পর্কিত কাঠামোর মূলে কোনো আঘাত করে নি কিংবা কোনো গভীর, মূলগত পরিবর্তন ঘটায় নি। বাস্তবিকপক্ষে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত ব্যাপক ও শক্তিশালীভাবে রয়ে গেছে। পরবর্তী অংশে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

চার

ভূমিসংস্কারের মৌলিক সীমাবদ্ধতা

পূর্ব-বাঙলায় ভূমিসংস্কারের মৌলিক সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এ-কথাটি প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতের মতোই সেখানেও মধ্যস্বত্ব ও বিধিবদ্ধ বৃহৎ ভূস্বামিত্বের অবসান ঘটানো হয়েছে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদে দিয়ে। চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অন্তত ৩০ কোটি টাকা। ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া চলতে থাকবে।[৮]

দ্বিতীয়ত, আইনত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মধ্যস্বত্বের অবসান ঘটলেও এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না যে সব রকমের মধ্যস্বত্বের প্রকৃতপক্ষে অবসান ঘটেছে কিনা। পাকিস্তানের অর্থনীতির বিষয়ে দুজন বিশেষজ্ঞ জে. রাসেল এণ্ড্রুস ও আজিজআলি মোহাম্মদ ১৯৫৭ সালেও অর্থাৎ উপরে উল্লিখিত আইন পাশ হয়ে যাওয়ার সাত বছর পরে মন্তব্য করেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চূড়ান্ত অবসান ও স্বত্ব-উপস্বত্বের জটিলতা দূরীকরণে কয়েক দশক লেগে যেতে পারে।[৯]

তৃতীয়ত, আইনে বলা হয়েছে যে পুরনো ভূস্বামীরা তাদের খাসদখলে এবং চাষী প্রজা বা cultivating tenant সর্বোচ্চ ৩৩ একর পর্যন্ত জমি রাখতে পারবে। কিন্তু এই চাষী প্রজা বা cultivating tenant কাকে বলা হবে? আইন অনুসারে সরকারকে সরাসরি রাজস্ব দেয় এবং ভাগচাষী কিংবা কৃষি-শ্রমিককে দিয়ে যারা জমি চাষ করায় এমন সকলেই হল 'চাষী প্রজা'।

স্পষ্টতই 'চাষী প্রজা'র এই যে সংজ্ঞা তা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই সংজ্ঞার মাধ্যমে অনুপস্থিত মালিকানা (absentee ownership) ও জমি খাজনায় বন্দোবস্ত দেওয়া বা লীজ দেওয়ার পথ খোলা রাখা হয়েছে। 'চাষী প্রজা'র সংজ্ঞা এই নয় যে তাকে প্রকৃত চাষী হতে হবে। আর আইনে জমি খাজনায় বন্দোবস্ত দেওয়া অর্থাৎ subletting নিষিদ্ধ হলেও ভাগচাষ বা বর্গাপ্রথাকে subletting হিসেবে আদৌ গণ্য করা হয় নি—ফলে বর্গাপ্রথা সম্পূর্ণ আইন-সম্মত।

বাস্তবে অনুপস্থিত মালিকানা ও খাজনা জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রথা বর্তমানেও যে রয়েছে তার স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে পাকিস্তানের সরকারী দলিল 'চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'তে। এতে বলা হয়েছে, "বস্তুতপক্ষে অনুপস্থিত ভূস্বামিত্ব এবং প্রজাবন্দোবস্তের (tenancy) পুনরাবির্ভাবের প্রবণতা রয়েছে।"[১০]

চতুর্থত, উপরোক্ত আইনে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে ৩৩ একর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় যে, আইনের এই অংশকে কার্যকরী করার প্রায় কোনো চেষ্টাই হয় নি, ফলে সিলিং সংক্রান্ত আইন কাগুজে আইনে পরিণত হয়েছে।

শুধু তাই নয়। আয়ুবের সামরিক শাসনের সামাজিক ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করার অর্থাৎ আয়ুব শাসনের প্রতি অনুগত সমর্থক ও দালাল সৃষ্টি করার লক্ষ্য

নিয়ে ১৯৬১-এর পূর্ব-পাকিস্তান প্রজাস্বত্ব আইনে জমির সিলিং ৩৩ একর থেকে বাড়িয়ে ১২৫ একর করা হয়। তদুপরি স্থির করা হয় যে, ১৯৫০-এর থেকেই সিলিংসংক্রান্ত এই নতুন ব্যবস্থাকে কার্যকর করা হবে। ফলে যে সামান্য কিছু ক্ষেত্রে পূর্বতন সিলিং-এর অতিরিক্ত জমি সরকার দখলে নিয়েছিল তাও প্রাক্তন মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই তথাকথিত ভূমিসংস্কারের নানা দিক নিয়ে আলোচনার শেষে এই কথা বলা যেতে পারে যে, এর ফলে পুরনো দিনের সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী বন্দোবস্তের যদিও অবসান ঘটল, মুসলমান মাঝারি ভূস্বামী ও জোতদারদের সম্পত্তিতে অর্থাৎ মুসলমান সামন্ততান্ত্রিক ভূমিস্বার্থে কোনো হাত দেওয়া হল না, বরং তাকে অনেক ক্ষেত্রে আরও পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা হল। আর সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও নিপীড়নে জর্জরিত লক্ষ লক্ষ গরীব নিঃস্ব মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু চাষী যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল।

পাঁচ

প্রাক্-স্বাধীনতা কালে ভূমিসংক্রান্ত কাঠামো১২

উপরের অংশটিতে যেসব নেতিবাচক দিক ও সীমাবদ্ধতার কথা বলা হল তার ফলে ১৯৭১-এ স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে বাঙলাদেশের ভূমিসংক্রান্ত কাঠামো কি রকমের ছিল? এবিষয়ে একেবারে হালের কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। নির্ভরযোগ্য যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা ১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৬৩-৬৪ সনের। সেই সব তথ্যের থেকে যে চিত্রটি পাওয়া যাবে ও যাচ্ছে পরবর্তীকালে তার কোনো বড় রকমের হের-ফের হয়েছে বলে মনে হয় না।

জমির বণ্টন

এই সব তথ্যের থেকে প্রথমেই যা জানতে পাওয়া যাচ্ছে তা হল যে, কৃষি উৎপাদনের প্রধান উপকরণ (means of production) জমির বণ্টনে খুব ব্যাপক ও তীব্র অসাম্য রয়ে গেছে। একথা বললে ভুল বা অতিশয়োক্তি হবে না যে, বাঙলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান সম্পত্তির উপরে কার্যত একচেটিয়া মালিকানা বর্তমান।

১৯৬০ সালের পূর্ব-পাকিস্তানে কৃষিসংক্রান্ত সেন্সাস থেকে পাওয়া তথ্য তালিকা ৩-এ দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা অনুসারে কৃষিজোতের সর্বোচ্চ ৩ শতাংশের নিয়ন্ত্রণে ছিল কর্ষিত জমির ১৯ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ

নিয়ন্ত্রণ করত কর্ষিত জমির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি বা ৩৬ শতাংশ। নিচের দিকে পরিস্থিতিটা কি? ১ একর বা তারও কম জমির মালিক এমন সর্ব-নিম্ন ২৪ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত কর্ষিত জমির মাত্র ৩ শতাংশ এবং ২.৫ একর বা তার কম জমির মালিক কৃষিজোতের ৫১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত অতি সামান্য ১৬ শতাংশ জমি।

জমির মালিকানায় এই যে অসাম্য—তা পরবর্তীকালে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করার মতো কারণ রয়েছে। কারণ পূর্ব-পাকিস্তান পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ১৯৬৩-৬৪ সালে পরিচালিত কৃষিসংক্রান্ত মাস্টার সার্ভে অনুসারে জোতের পরিমাণ ২ একর বা তার কম এমন গ্রামীণ পরিবার সমস্ত গ্রামীণ পরিবারের ৬২.২ শতাংশ—আর এদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কর্ষিত জমির মাত্র ৯.৫ শতাংশ। কারুর কারুর বিবেচনায় মাস্টার সার্ভের তথ্য যথেষ্ট নির্ভর-যোগ্য নয়। কিন্তু তা যদি নাও হয় তবু একথা মনে করার মতো কারণ রয়েছে যে, পাকিস্তানের শাসনে গরীব চাষী আরও গরীব হয়েছে, জমি হস্তান্তরে বাধ্য হয়েছে, জমি হারিয়ে নিঃস্ব ভূমিহীন চাষী ও কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক উপকরণের বণ্টন

দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান সম্পত্তি জমির মালিকানা বণ্টনে যেখানে এত ব্যাপক ও তীব্র অসাম্য ছিল সেখানে উৎপাদনের অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ, যেমন—চাষের বলদ, লাঙ্গল ও চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের মালিকানার ক্ষেত্রেও অসাম্য থাকাটা স্বাভাবিক। আর ছিলও তাই। ১৯৬০-এর জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (দ্বিতীয় দফা) অনুসারে জোতের আয়তনের হিসেবে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পশুর ৩৭ শতাংশের মালিক ছিল। ঐ সমীক্ষা অনুসারে ০.৫ একর ও তার কম জমির জোতগুলির মাত্র ১০ শতাংশ এবং এক একর ও তার সে জমির জোতগুলির মাত্র ২৮ শতাংশ চাষের কাজে নিযুক্ত পশুর মালিক ছিল। আর অন্যদিকে, ১২.৫ একর ও তার থেকে বেশি জমিসম্পন্ন জোতগুলির ৯৫ থেকে ৯৮ শতাংশ চাষের কাজে ব্যবহৃত পশুর মালিক ছিল। এর অর্থ হল যে, তলার দিকের ছোট ছোট জোতজমার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের চাষের বলদ ছিল না, অথচ উপরের দিকের বৃহৎ জোতজমার প্রায় সবগুলিরই নিজস্ব বলদ ছিল।

তালিকা ৩ঃ আয়তন অনুসারে জোতের সংখ্যা, কর্ষিত জমির পরিমাণ ও শতকরা হিসেব

জোতের আয়তন (একর)	জোতের সংখ্যা	মোট জোতের শতাংশ	কর্ষিত জমির পরিমাণ (একর)	কর্ষিত জমির শতাংশ
০.৫-এর নিচে	৮,০২,৬৩০	১৩	১,৩৮,৩৮২	১
০.৫ থেকে ১.০-এর নিচে	৬,৮৯,৮৪০	১১	৪,০১,৬৮০	২
১.০ থেকে ২.৫-এর নিচে	১৬,৭৭,৪১০	২৭	২৪,৬৮,৫৯০	১৩
২.৫ থেকে ৫.০-এর নিচে	১৬,১৫,০২০	২৬	৫১,৫১,১৭৫	২৭
৫.০ থেকে ৭.৫-এর নিচে	৬,৯৮,৪৫০	১২	৩৭,৮০,২৪৫	২০
৭.৫ থেকে ১২.৫-এর নিচে	৪,৪২,৩৬০	৭	৩৭,১৭,০৩৪	১৯
১২.৫ থেকে ২৫.০-এর নিচে	১,৮৭,৭৯০	৩	২৬,৮৮,৯২২	১৪
২৫.০ থেকে ৪০.০-এর নিচে	২১,৩৭০	১	৫,৩৮,৬১৮	৩
৪০.০ এর বেশি	৪,৬১০		২,৫৩,৪৬৩	১
মোট	৬১,৩৯,৪৮০	১০০	১,৯১,৩৮,১০৯	১০০

সূত্র : Population Census of Agriculture for East Pakistan 1960, vol. I, Table 3. Reproduced in Rehman Sobhan, Basic Demoracies Works Programme and Rural Development in East Pakistan, Table 13

চাষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় আর একটি উপকরণ লাঙ্গলের ক্ষেত্রেও অসম বণ্টনের সাক্ষ্য মেলে। উপরে উল্লিখিত ১৯৬০-এর কৃষিসংক্রান্ত সেন্সাসের থেকে জানা যায় যে, ১ একর বা তার কম জমির সমস্ত জোতের মাত্র ১৬.৭ শতাংশের লাঙ্গল রয়েছে। আর ৫ একর বা তার বেশি জমির সমস্ত জোতের শতকরা ১০০ ভাগেরই নিজস্ব লাঙ্গল রয়েছে। উপরন্তু জোতের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জোত পিছু লাঙ্গলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বস্তুতপক্ষে উপরে যে সব তথ্য পেশ করা হল সে সবের থেকে বাঙলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির তিনটি দিক উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। (ক) চাষের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণের মালিকানাকাঠামো খুবই অসম। (খ) কৃষকসমাজের ব্যাপক অংশের চরম দারিদ্র্যের দরুন চাষের বলদ,লাঙ্গল ইত্যাদি

ধরনের মূলধন স্বল্প। (গ) কৃষকদের একটি বড় অংশেরই চাষের বলদ, লাঙ্গলের মতো চাষের কাজে অতি দরকারি উপকরণের অভাব থাকার ফলে এই অভাব পূরণ করতে হয়েছে হয় একেবারে অতি আদিম স্তরের কঠোর কায়িক শ্রমের মাধ্যমে অথবা বিত্তবান চাষীদের কাছ থেকে ভাড়া কিংবা ঋণ নিয়ে।

উপরে যে সব তথ্য দেওয়া হল তার থেকে ১৯৫০-এর জমিদারী হুকুমদখল ও প্রজাস্বত্ব আইনের নানা সীমাবদ্ধতা এবং গ্রামাঞ্চলের উৎপাদন-উপকরণের বণ্টনে অসাম্য সুস্পষ্ট। কিন্তু এই আইনের জোরে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ককে কি ভেঙে ফেলা বা অন্তত গুরুতরভাবে দুর্বল করা সম্ভব হয়েছে? অর্থনীতি-বহির্ভূত জবরদস্তি বা extra-economic coercion-এর কি অবসান ঘটেছে? ধনতন্ত্রের কি বিকাশ ঘটেছে? মজুরি ভিত্তিক কৃষিশ্রমিক দিয়ে চাষের কাজ কি প্রসারিত হচ্ছে?

অর্থনীতি-বহির্ভূত চাপ

দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য যে সব তথ্য ও বিষয় আমাদের দরকার তার অনেক কিছুই জানা নেই। উপরে যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে সে সবের মধ্যেই এ-কথাটি নিহিত রয়েছে যে, সামন্ততান্ত্রিক বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অন্যতম ভিত্তি অর্থনীতি-বহির্ভূত অর্থাৎ রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক বাধ্যবাধকতা বা জবরদস্তি। কিন্তু পূর্ব-বাঙলায় এই সব চাপ কতটা কাজ করছে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কি রূপে কাজ করছে সে বিষয়ে লেখকের জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

তবে অনুমান করা যায় যে, মোল্লা-মৌলভীদের শাসন অতীতের তুলনায় অনেক শিথিল হলেও শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত গ্রামাঞ্চলের গরীব জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক-সামাজিক পশ্চাৎপদতা ব্যাপকভাবে রয়েছে। আর অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদি চিরকালই নিম্নবিত্ত কিংবা গরীব কৃষকসাধারণের উপরে জমি ও গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য সম্পদের মালিকদের তরফ থেকে নানা ধরনের চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার। এ-কথাও অনুমান করা যায় ও জানা রয়েছে যে, ইসলাম বিপন্ন হবে—এই জাতীয় জিগির তুলে নানা শোষণে জর্জরিত বিত্তহীন ভূমিহীন মুসলমান চাষীদের কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক কৃষক-সংগঠন ও আন্দোলনে সমবেত ও সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রয়াসকে ব্যাহত করেছে স্বধর্মাবলম্বী গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থ। আবার, এ কথাও জানা রয়েছে যে, নিম্নবর্ণের গরীব হিন্দু চাষী অন্তত কিছুকাল আগেও ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত

কারণে নানা ধরনের জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েছে। এ-কথাও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা-পুলিশ, মহকুমা বা জেলার সরকারী দপ্তরে প্রভাবশালী জমির বৃহৎ মালিকদের অনুরোধ (!)—হয়তো বিনা পারিশ্রমিকে জমিতে আল বেঁধে দেওয়ার, চাষাবাদে কোনো সাহায্য করার, কিংবা পরবের দিনে ঘর-গেরস্তালির কাজে হাত লাগানোর অনুরোধ (!)—নিঃস্ব ভূমিহীন চাষীর, অনেক ক্ষেত্রে জমির মালিকের কাছেই ঋণগ্রস্ত চাষীর (তা সে মুসলমান বা হিন্দু যাই হোক না কেন) পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভবপর ছিল না। আইনগত চাপ বা আইনের ছিদ্রপথও যে এক্ষেত্রে কাজ করেছে তার নমুনা ইতিপূর্বে উল্লিখিত cultivating tenant-এর অদ্ভুত সংজ্ঞা এবং বর্গপ্রথা সম্পর্কে আইনের বিধান। সব মিলিয়ে এরকম অনুমান করার মতো সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, পূর্ব-বাঙলার গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় চাপ গত ২৪ বছরে খুবই সক্রিয় থেকেছে এবং এই সব চাপের জোরে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যাপকভাবে বর্তমান থেকেছে।

সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অর্থনৈতিক ভিত্তি

সুতরাং অর্থনীতি-বহির্ভূত বাধ্যবাধকতা তো রয়েছেই। উপরন্তু, সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণের অর্থনৈতিক ভিত্তিও পূর্ব-বাঙলায় রয়ে গেছে। (১) কৃষি ও জমির উপরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান চাপ এবং কৃষির বাইরে জীবিকা-সংস্থানের সুযোগের একান্ত অভাব অর্থাৎ মূলত একটি labour surplus economy, (২) পূর্বে উল্লিখিত দ্বৈত প্রকৃতির বিনিময়-অর্থনীতির জটিল সক্রিয়তা এবং (৩) কৃষি-উৎপাদনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ জমির উপরে গ্রামীণ পরিবারগুলির ক্ষুদ্র একটি অংশের কার্যত একচেটিয়া মালিকানা—এই সব অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের যোগফল সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে অব্যাহত রাখতে, ব্যাপক ও প্রবলভাবে জীইয়ে রাখতে সাহায্য করেছে।

এই সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এখনও প্রধানত কোন বিশেষ রূপের (form) মাধ্যমে কাজ করছে? পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা টাকায় রাজস্ব ও খাজনা দেওয়া নানা ধরনের মধ্যস্বত্বের অবসানের সময়েই টঙ্ক প্রথা, নানকর প্রথার মতো উৎকট সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সাধারণভাবে বিলোপ ঘটেছে।

বর্গাপ্রথা

কিন্তু এখনও সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের যে প্রথাটি

ব্যাপকভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়ে গেছে তা হল ভাগচাষ বা বর্গাপ্রথা। বড় বড় জোত-জমা বাঙলাদেশের প্রধানত উত্তর ও দক্ষিণের জেলাগুলিতেই কেন্দ্রীভূত। এসব জেলায় জমির মালিক বা জোতদার ভূ-স্বামী সাধারণত চাষের তদারকির দায়-দায়িত্ব বহন করে না, চাষের খরচও দেয় না। চাষাবাদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব-ঝুঁকি কোনও স্বত্বহীন ভাগচাষীর, সব রকমের খরচ ভাগচাষীর, হাল বলদ চাষের যন্ত্রপাতি ভাগচাষীর। জোতদারেরা জমির উপরে একচেটিয়া মালিকানার অধিকারকে ব্যবহার করে ভাগচাষীকে দিয়ে জমি-চাষ করিয়ে নিচ্ছে, ভাগচাষীর বাড়তি শ্রম নিংড়ে নিচ্ছে, সাধারণ-ভাবে উৎপন্ন ফসলের অন্তত অর্ধেক এবং দক্ষিণে সুন্দরবনের অনেক অঞ্চলে উল্টো তে-ভাগা বা তিন ভাগের দুই ভাগ আত্মসাৎ করে নিচ্ছে অর্থাৎ ফসলে খাজনা আদায় করে নিচ্ছে। এই জোতদারদের প্রবল বাধার দরুণ দীর্ঘ ২৪ বছরেও চাষের জমির উপর ভাগচাষী বা বর্গাদারদের সামান্যতম অধিকার প্রতিষ্ঠা, কিংবা উৎপন্ন ফসলের উপর বর্গাদারদের প্রাপ্য ভাগ কিছুমাত্র বাড়ানো সম্ভবপর হয় নি। অথচ পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠ তাঁদের বিবেচনায় সেখানকার কৃষকদের আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ হল বর্গাদার বা ভাগচাষী।[১৩]

আইনের চোখে আনুষ্ঠানিক অর্থে এই ভাগচাষীরা কৃষিশ্রমিকের পর্যায়-ভুক্ত। কৃষি-অর্থনীতির বিবর্তনের পটভূমিতে ভাগচাষপ্রথা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কে উত্তরণের একটি বিশেষ রূপ। কিন্তু পূর্ব-বাঙলার গ্রামাঞ্চলে কিছু-না-কিছু উৎপাদন-উপকরণের—চাষের সাজসরঞ্জাম, লাঙ্গল, বলদ ইত্যাদির—মালিক ভাগচাষীকে দিয়ে জমি চাষাবাদ করানোর যে প্রথা ব্যাপকভাবে দেখতে পাওয়া যায় তা মূলত আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণেরই অঙ্গ।

ভাগচাষ প্রথা ব্যতীত আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্কের আরও কিছু রূপ বা form রয়েছে। আইনত জমি খাজনায় বন্দোবস্ত দেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু বাঙলাদেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতা শ্রীমণি সিংহের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে জেনেছি যে, ময়মনসিংহের কোনো কোনো অঞ্চলে এক বছরের জন্য নগদ টাকা অগ্রিম দিয়ে জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার 'রঙজমা' বলে পরিচিত এক ধরণের বার্ষিক লীজ ব্যবস্থা রয়েছে। রাজশাহী জেলার কোথাও কোথাও রয়েছে ফুরন' ব্যবস্থা—ফসল হোক না হোক, বিঘা প্রতি ২২/৩ মণ ধান দেওয়া শর্তে

বৎসরান্তে renewal-এর ভিত্তিতে জমি ফুরনে দেওয়া হয়। এ সবের থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নানা ধরনের মৌখিক ও প্রচ্ছন্ন প্রজা-বন্দোবস্ত এখনও চালু রয়েছে। তবে তার মাত্রা ও গুরুত্ব কতটা সে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বলার মতো তথ্যের অভাব রয়েছে।

ধনতান্ত্রিক শোষণ

উপরে যা বলা হল তার অর্থ এই নয় যে, গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন-সম্পর্ক কিংবা শোষণপদ্ধতি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। একথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, পাকিস্তানী শাসনের বছরগুলিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কেরও কিছুটা বিকাশ ঘটেছে, মজুরিভিত্তিক কৃষি-শ্রম দিয়ে জমি চাষ করানোর ধনতান্ত্রিক বন্দোবস্ত কিছুটা প্রসারলাভ করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোতদার-ভূস্বামী তার নিয়ন্ত্রিত জমির কিছুটা চাষ করাচ্ছে ভাগচাষীকে দিয়ে, আবার কিছুটা কৃষিশ্রমিক দিয়ে। সাম্প্রতিক কয়েকটি বছরে উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, পাম্প ইত্যাদির বাবদে পুঁজি লগ্নীর ঝোঁকও কিছুটা দেখা গেছে। তবে অনেক সময়েই মজুরিভিত্তিক কৃষি-শ্রম দিয়ে চাষাবাদের ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি রকমারি প্রাক্-ধনতান্ত্রিক লক্ষণমণ্ডিত।

এছাড়া পূর্ববঙ্গে গ্রামাঞ্চলের জনসমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল মধ্যচাষী গোষ্ঠী। এরা এদের জমি চাষাবাদের ব্যাপারে মজুরিভিত্তিক শ্রমের উপরে কিছুটা নির্ভরশীল—কিন্তু নিজস্ব যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রধানত নিজস্ব ও পারিবারিক শ্রমে চাষাবাদ করাটাই এদের বৈশিষ্ট্য। উৎপন্ন ফসলের বিক্রয়-যোগ্য উদ্বৃত্ত হয়তো এদের খুব বেশি নয়—তবে স্বাভাবিক বছরে নিজেদের জমির উৎপন্ন খাদ্যশস্যে সাধারণত চলে যায়। মোটামুটিভাবে ৫ একর বা তার কিছু কম বেশি জমির মালিককে মধ্যচাষী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ঢাকার মতো কোনো কোনো জেলায় এই মধ্যচাষীই গ্রামীণ জনসমষ্টিতে প্রধান। কিন্তু গোটা দেশের হিসেবে এই মধ্যচাষীর অর্থনীতিও মহাজনী শোষণ ও বাজারের নানা মারপ্যাঁচের দরুন গুরুতরভাবে সঙ্কটগ্রস্ত। সব মিলিয়ে জমিসংক্রান্ত কাঠামো (land relations structure) ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিস্বার্থের অর্থাৎ জোতদার ভূস্বামীদের প্রাধান্য বর্তমান।

ছয়

মহাজনী ও বাণিজ্যিক শোষণ

কিন্তু বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবন সংক্রান্ত আলোচনা খুবই

অসম্পূর্ণ থাকবে যদি ঋণব্যবস্থা ও ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাকে বিবেচনা না করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে বাঙলাদেশের কৃষির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও মৌলিক অগ্রগতির পথে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ব্যাপক ও অতি শক্তিশালী অবশেষ ভিন্ন অপর দুটি প্রধান প্রতিবন্ধক হল প্রাক্-ধনতান্ত্রিক চরিত্রের মহাজনী ও ব্যাপারী (mercantile) শোষণ। গ্রামাঞ্চলের প্রধান সম্পত্তি জমির প্রায় একচেটিয়া মালিকানার ফলে বিক্রয়যোগ্য ফসলের কেন্দ্রীকরণ (concentration), অন্যান্য আনুষঙ্গিক উৎপাদন-উপকরণের বা সম্পদের অসম বণ্টন, ব্যাপারী ও মহাজনী পুঁজির আধিপত্য প্রতিরোধে অক্ষম একটি বহুবিস্তৃত petty production বা খুদে উৎপাদন ব্যবস্থা, খুদে উৎপাদকদের অর্থাৎ গরীব চাষীদের সাধারণভাবে ঘাটতি অর্থনীতি (১৯৬৯র জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অনুসারে গ্রামীণ জন-সাধারণের ৮২.২ শতাংশই প্রধান খাদ্যশস্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না) ও চরম দারিদ্র্য এবং সরকার, ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি ইত্যাদির পক্ষ থেকে উপযুক্ত ঋণ দেওয়ার অভাব—এ সবই মহাজনী শোষণ ও প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ব্যাপারী শোষণের যাবতীয় শর্তকে পূরণ করেছে।

বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করে এখানে মহাজনী শোষণ ও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ব্যাপারী শোষণের প্রধান কয়েকটি দিকের উল্লেখ করা যেতে পারে।

এক, কৃষিজীবীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ঋণগ্রস্ত। ১৯৬০-এর ২য় দফা জাতীয় নমুনা সমীক্ষার থেকে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী বছরের সকল কৃষকদের ৮৮.৭ শতাংশ ঋণ নিয়েছে। বাঙলাদেশ সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রেহমান শোভানের বিচারে সমস্ত কৃষিজীবী পরিবারের প্রায় ৫০ শতাংশের জীবনে ঋণগ্রস্ততা একটি স্থায়ী ব্যাপার।[১৪]

দুই, ১৯৫৯-এর ঋণ অনুসন্ধান কমিশনের হিসেবে গ্রামীণ ঋণের মোট পরিমাণ ৯৩ কোটি টাকা। রেহমান শোভানের হিসেবে ১৯৬৪-৬৫ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৮ কোটি ও ২৮০ কোটি টাকার মধ্যে। পরবর্তী বছরগুলিতে এটা যে আরও অনেক বেড়ে গিয়েছে তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।[১৫]

তিন, এই বিপুল পরিমাণ ঋণের উৎস সম্পর্কে যে সব তথ্য রয়েছে তাতে দেখা যায় যে সরকার বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ থেকে মোট ঋণের অতি নগণ্য অংশ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে নানা রকমের হিসেব রয়েছে। জাতীয়

নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে সরকারের কাছে পাওয়া গেছে মোট ঋণের মাত্র ১.৭ শতাংশ। তালিকা ১-এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সামাজিক অর্থ-নৈতিক বোর্ডের অনুসন্ধান অনুসারে চারটি বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী সূত্রে ঋণ হলো মোট ঋণের ০.৩ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ পর্যন্ত। এই তালিকা অনুসারে সমবায় সমিতিগুলির থেকে পাওয়া গেছে মাত্র ০.৪ শতাংশ থেকে ১.৪ শতাংশ।

বাস্তবিকপক্ষে তালিকা ৩, রেহমান শোভানের বিস্তারিত আলোচনা[১৬], গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত ও ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কুমিল্লা অ্যাকাডেমি অব রুরাল ডেভলাপমেন্টের ডিরেক্টর আখতার হামিদ খান,[১৭] অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ রাসেল এণ্ড্রুস ও আজিজালি মোহাম্মদ[১৮] প্রমুখের মতামত থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, গ্রামীণ ঋণের উৎস প্রধানত তিনটি। (ক) পেশাদার

তালিকা ৩ঃ ঋণের উৎস (মোট ঋণের শতাংশ)

	ঋণের উৎস	নারায়ণগঞ্জ	রংপুর	রাজবাড়ি	ফেণী
১।	আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব	৫৯.৫	৫৮.৬	৫৩.৯	৪১.৩
২।	বিত্তবান গ্রাম্য পরিবার/ভূস্বামী	১৭.৯	২৩.৩	১৩.৭	৩১.৬
৩।	সমবায় সমিতি	০.৪	—	১.৪	০.৪
৪।	সরকার	০.৩	৬.০	৫.৩	৫.৭
৫।	দোকানদার	১২.৮	৪.৫	১৭.৩	১০.৩
৬।	মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী	২.২	৫.২	২.১	১.০
৭।	মহাজন	৩.৯	১.৪	২.৮	৪.৯
৮।	অন্যান্য	৩.০	১.০	৩.৫	০.৮

সূত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক বোর্ডের সমীক্ষা, Russel Andrus and Azizali Mohammed, Trade, Finance and Development in Pakistan, Table 24, P. 135.

মহাজনেরা চিরকালই গ্রামীণ ঋণের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে দেশবিভাগের পর হিন্দু মহাজনদের অনেকেই পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে। কিন্তু সেই শূন্য স্থান বেশ কিছুটা পূরণ করে মুসলমান মহাজন। সমবায় সমিতিগুলি বহুলাংশেই এই সব মহাজনদের কুক্ষিগত। মহাজনদের অনেকেই সমবায় সমিতির থেকে শতকরা ৯ টাকা সুদে ঋণ নিয়ে সেই অর্থ শতকরা ৭০ টাকা বা তারও বেশি সুদে

আবার ঋণ দেয় গরীব চাষীকে। (খ) বিত্তবান কৃষক বা জোতদার-ভূস্বামী ঋণের আর একটি প্রধান উৎস। এই জোতদার মহাজনেরা যেমন গরীব কৃষক, ভাগচাষীদের নগদ টাকাতে ঋণ দেয়, তেমনি আবার নিজেদের উদ্বৃত্ত ফসলের একাংশও কর্জ দেয়। (গ) গ্রামের দোকানদার, ফড়িয়া, দালাল, পাইকারী প্রমুখ বাণিজ্যিক মহাজনেরাও ঋণের কারবারে লিপ্ত। তালিকা ৩-এর 'আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব'-এর আড়ালে এই তিনটি গোষ্ঠীই রয়েছে। এ সবে এটি স্পষ্ট যে, জোতদার ভূস্বামী, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী আর পেশাদার মহাজন—এই তিনের এক জোট গড়ে উঠেছে গ্রামীণ ঋণব্যবস্থার ক্ষেত্রে।

চার, এই জোটটি কৃষকসমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে শোষণ করছে নানা শর্তে।[১৯] সম্পন্ন কৃষক বা জোতদার মহাজন তেজারতি কারবারে অর্থ নিয়োগ করে—বছরে বছরে শতকরা প্রায় একশো টাকা হারে সুদ আদায় করে, আসল আর শোধ হয় না। ১ মণ ধান কর্জ দিয়ে এরা ২½ মণ আদায় করে নেয়।

গ্রাম্য দোকানদারেরা অনেক সময়ে অভাবের মরশুমে ফসল না ওঠা পর্যন্ত গরীব চাষীকে ধারে ডাল, তেল, নুন, পরনের কাপড় ইত্যাদি জোগান দেয়—কিন্তু এ সবই দেওয়া হয় বাজার দামের থেকে অনেক বেশি দামে, আর এর মধ্যেই চড়া সুদ প্রচ্ছন্ন থাকে। অন্য অনেক ক্ষেত্রে আবার পাইকার, ফড়ে, দালাল, আড়তদার প্রমুখ মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা পাট, তামাক, আখের মতো অর্থকরী ফসলের চাষীকে দাদন বা অগ্রিম দেয় এই শর্তে যে, ফসল উঠলে চাষী যে বাণিজ্যিক মহাজন অগ্রিম দিয়েছে একমাত্র তার কাছেই ফসল বিক্রয় করবে পূর্বনির্ধারিত দামে। আর অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, এই পূর্বনির্ধারিত দাম সচরাচর বাজার দামের অনেক কম।

খাতক চাষী অনেক সময়েই মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেয় জমি বন্ধক দিয়ে—এই সব জমি বন্ধকের ক্ষেত্রে একমাত্র হস্তান্তরের অধিকার ব্যতীত বাকি সব অধিকারই মহাজন ভোগ করে। মহাজনের দখলে থাকে জমি—খাতক চাষী পরিণত হয় বর্গাদারে, নিজস্ব জমিতে ফসল ফলিয়ে তার অর্ধেক তুলে দেয় মহাজনের গোলায়।

এই হরেক রকম পদ্ধতির মহাজনী শোষণে ব্যাপক কৃষকসাধারণ সর্বস্বান্ত, কৃষি-অর্থনীতি বিপর্যস্ত। এই সঙ্গেই আবার রয়েছে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ব্যাপারী বা বাণিজ্যিক শোষণ। অভাবের তাড়নায়, মহাজনের চাপে, ফসল ধরে রাখার

মতো সামর্থ্যের অভাবে, ফসল মজুদ ও সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় গরীব কৃষকেরা ফসল উঠলেই গ্রামের মধ্যে বা বড়জোর নিকটতম হাটে ফড়ে কিংবা ব্যাপারীদের কাছে ফসল—তা সে ধান, পাট, আখ, তামাক যাই হোক না কেন—বিক্রি করে দেয় ; ফসল ওঠার অব্যবহিত পরেই দাম পড়ে যায়, কিন্তু সেই দামেই বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া গরীব চাষীর গত্যন্তর থাকে না। পরবর্তীকালে ফসলের দাম বাড়ে, ভোগকারীরা কিংবা চটকল, আখকলগুলি ফসলের বেশি দাম দেয়—আর সেই বেশি দামেই ফসল বিক্রি করে ফড়ে, পাইকার, আড়তদারেরা। কিন্তু তার কোনো সুবিধা উৎপাদক চাষী পায় না—দামের তারতম্যজনিত সমস্ত লাভটুকু, সমস্ত মধুটুকু শুষে নেয় মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা। আর আমরা একটু আগেই লক্ষ্য করেছি যে, এই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা মহাজনী শোষণের সঙ্গেও যুক্ত ও লিপ্ত।

ত্রিমূর্তির জোট

বাস্তবিকপক্ষে পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতিতে জোতদার ভূস্বামী, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী আর মহাজন—এই তিন শোষকের স্বার্থের গ্রন্থিবন্ধন ও সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই সংমিশ্রণের ভিত্তিতে একটি নতুন ধরনের সুবিধাভোগী কায়েমী স্বার্থের জোটের উদ্ভব হয়েছে। এই শক্তিশালী জোটের যারা অন্তর্ভুক্ত তারা একই সঙ্গে আধা-সামন্ততান্ত্রিক জোতদার, প্রধান মহাজন, ফসলের একচেটিয়া কারবারীর ভূমিকা পালন করছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত আখতার হামিদ খান তাঁর দীর্ঘদিনের নিজস্ব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার থেকে বলেছেন যে,[২০] গ্রামাঞ্চলের বিত্তবান অংশ জমি ভাগে দিয়ে কিংবা টাকা কর্জ দিয়ে যে খাজনা ও সুদ পায় তা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতিসাধন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার থেকে দেখা গেছে যে, ভাগে জমি দেওয়া, ফসলের কেনাবেচা এবং নগদ টাকা ও ফসলে কর্জ দেওয়ার থেকে পাওয়া খাজনা মুনাফা ও সুদের হার খুবই চড়া। ফলে এই সব পদ্ধতির মাধ্যমে যে প্রতিদান পাওয়া যায় তা আরও জমি কেনা, মহাজনী কারবার কিংবা বাণিজ্যিক লেনদেনের কাজে নিয়োগ হয়। ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনমূলক পুঁজি বিনিয়োগ ও উৎপাদনী সুযোগসমূহের প্রসার গুরুতর ভাবে ব্যাহত হয়।

এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, উপরে যে ত্রিমূর্তির জোটটির কথা বলা হল পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ রাজনীতিতে এরই আধিপত্য।[২১] গ্রামীণ রাজনীতিতে যারা প্রধান, যেমন আয়ুবের সৃষ্ট বেসিক ডেমোক্রাটরা,

তারা প্রায় সকলেই এসেছে সম্পন্ন পরিবারের থেকে। ১৯৫৯, ১৯৬১ ও ১৯৬৪ —এই তিন বার পরিচালিত সমীক্ষার কথা উল্লেখ করে রেহমান শোভান দেখিয়েছেন যে, বেসিক ডেমোক্রাটদের দুই-তৃতীয়াংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর কিংবা তার বেশি এবং দুই-পঞ্চমাংশের জমি ১২.৫ একর কিংবা তার বেশি। আয়ের হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৫৯-এ শতকরা ৫৫ জন বেসিক ডেমোক্রাটের আয় প্রতি বছর অন্তত ৩ হাজার টাকা, শতকরা ৩৫ জনের আয় অন্তত ৪ হাজার টাকা। যারা বেসিক ডেমোক্রাট হিসেবে কাজ করেছে তারা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে অর্থাৎ বেসিক ডেমোক্রাটদের কার্যকালে তাদের আরও বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে।

উপরন্তু, মার্কিন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিকল্পিত ও মার্কিন সাহায্যপুষ্ট Works Programme এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের তথাকথিত উন্নয়নপ্রয়াসের ফলে লাভবান হয়েছে ত্রিমূর্তির জোটটি। গ্রামাঞ্চলে সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্ক এবং প্রকটভাবেই বিত্তবানদের স্বার্থঘেঁষা সরকারী নীতির দৌলতে গ্রামাঞ্চলের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রের উপর—সেচের সুযোগ-সুবিধা, সারের বন্টন, Works Progamme ও অন্যান্য খাতে সরকারী ব্যয় ইত্যাদি নানা দিকের উপর—উপরোক্ত ত্রিমূর্তির জোটটির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য কায়েম হয়েছে এবং ক্রমশই শক্তিশালী হয়েছে।

সাত

ভবিষ্যতের কর্মকাণ্ড

অনেক রক্ত ও অশ্রুর বিনিময়ে বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এবারের চ্যালেঞ্জ 'সোনার বাঙলা' গড়ে তোলার। বিশ্বের সব থেকে পিছিয়ে পড়া সব থেকে গরীব দেশগুলির অন্যতম এবং নয় মাস ধরে পাকবাহিনীর বর্বরতম তাণ্ডবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত এই নবীন রাষ্ট্রটির সামাজিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের কাজ মোটেই সহজসাধ্য নয়। অর্থনৈতিক তৎপরতাকে আপাতত ২৫এ মার্চের পাকিস্তানী আক্রমণ-পূর্ববর্তী স্তরে অন্তত কিছুটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে; আবার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধাদির উল্লেখযোগ্য প্রসার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার—এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন করতে হবে। এ কাজে দেরি করার কিংবা দ্বিধা দেখানর কোনো অবকাশ নেই।

স্বভাবতই বাঙলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে প্রাণ সঞ্চার করা ও তার সর্বতোমুখী, স্বাধীন বিকাশসাধনের জন্য জরুরি প্রয়োজন। হল সব রকমের বিচারেই সম্পূর্ণ অচল ও অগ্রগতির পরিপন্থী আধা-উপনিবেশিক, আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোটিকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা, আর তার বিকল্প একটি সামাজিক অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের দৃঢ় ও প্রশস্ত ভিত্তি স্থাপন করা। আর কৃষিই যেহেতু বাঙলাদেশের অর্থনীতির অন্তত বর্তমানে প্রধান অবলম্বন সেইহেতু কৃষির দ্রুত, সর্বাঙ্গীণ, প্রাণবন্ত বিকাশ সাধন আজ বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 'আবার, এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিম্নতম ও অপরিহার্য পূর্বশর্ত হল কৃষিসংক্রান্ত কাঠামোর মৌলিক ধরনের বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধন—সামন্ততান্ত্রিক-মহাজনী-বাণিজ্যিক শোষণের শিকড়গুলিকে একেবারে উপড়ে ফেলা।'[৭]

এই ধরনের বৈপ্লবিক, গণতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের কর্মসূচির প্রধান প্রধান দিক হল (ক) কৃষি-উৎপাদনের প্রধান উপকরণ জমির উপর আধা-সামন্ততান্ত্রিক অনুপস্থিত জোতদার ভূস্বামীদের প্রায়-একচেটিয়া মালিকানা ও কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অবসান, (খ) জমির হোলডিং বা জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ ও সেই সীমা-সংক্রান্ত ব্যবস্থার কঠোর নিশ্ছিদ্র প্রয়োগ, (গ) সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত জমি গরীব চাষী, ভূমিহীন চাষী, বর্গাদার বা ভাগচাষী ও কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন এবং (ঘ) জমি খাজনায় বন্দোবস্ত দেওয়ার যাবতীয় বে-আইনী ও প্রচ্ছন্ন ব্যবস্থার কার্যকর নিষিদ্ধকরণ। কিন্তু বাঙলাদেশের মৃতপ্রায় কৃষিতে গতিশীল ও উন্নয়নমূলক উপাদান সঞ্চার করার জন্য কৃষককে জমির মালিক করে দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। কৃষককে (ঙ) সুদখোর মহাজন ও ফাটকাবাজ মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের কবলমুক্ত করতে হবে এবং সে জন্য (চ) চাষের যাবতীয় উপাদান —বীজ-সার, সেচ, চাষের সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি এবং চাষের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ও ঋণ যাতে সব চাষী পায়, ক্ষুদ্রতম চাষীও পায়, তার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে এবং (ছ) উৎপন্ন ফসল ন্যায্য দামে চাষী যাতে বিক্রয় করতে পারে তার ব্যবস্থাও সরকারকেই করতে হবে।

জমির সর্বোচ্চ সীমা কত হবে তা নিশ্চয়ই বৈপ্লবিক চেতনা ও সংগ্রামী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বাঙলাদেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষত শোষিত নিপীড়িত কৃষক, সে-দেশের রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ এবং সরকার স্থির করবেন।[৮] ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেছেন : জমির সিলিং হবে ১০০ বিঘা,

প্রয়োজনে তা আরও কমানো হতে পারে। বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহ্মেদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় আওয়ামি পার্টি ৫০ বিঘা সিলিং-এর জন্য দাবি জানিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে বিবেচনা করা উচিত যে, জাপান ও তাইওয়ানে সাধারণত জোতের আয়তন ২২/৩ একর এবং এসব জোত রীতিমত viable, খুবই লাভজনক। উপরন্তু, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল—কৃষিসংক্রান্ত আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি ও নতুন প্রযুক্তিবিজ্ঞান (যার সারবস্তু হল সুনিশ্চিত জল সরবরাহ, উচ্চ ফলনশীল বীজ, উপযুক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধের কেন্দ্রীভূত ব্যবহার) একান্তভাবেই জোতের আয়তন-নিরপেক্ষ। বাস্তবিকপক্ষে বাঙলাদেশেও কৃষির আধুনিকীকরণ ঘটলে, বিশেষত নতুন প্রযুক্তিবিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ ঘটলে ১৫/৩ একরের জোত সম্পূর্ণ viable বা লাভজনক হতে পারে। এই কথা বিবেচনা করে জমির সর্বোচ্চ সীমা যথেষ্ট কম করে ধার্য করলে (যেমন, পরিবার পিছু ২৫ বা ৩০ একর) গ্রামাঞ্চলের জোতদার কিংবা সম্পন্ন কৃষকদের স্বার্থ নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হবে—কিন্তু তাতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। বরং আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সম্পূর্ণ অবসান, গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমির বণ্টন এবং মহাজনী ও বাণিজ্যিক শোষণের কবল থেকে কৃষকের মুক্তি কৃষির বহুমুখী বিকাশের উৎসমুখ খুলে দেবে।

অবশ্য ভূমিসংস্কার ও কৃষির কাঠামোগত রূপান্তর সাধনের কার্যক্রমকে পরিহার করেও অর্থাৎ প্রচলিত ভূমিবন্দোবস্তের কাঠামোকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও নতুন উৎপাদন-পদ্ধতির প্রয়োগ হয়তো করা যায় এবং তাতে একর প্রতি ফলন ও মোট উৎপাদনও হয়তো বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতের অভিজ্ঞতা হল, আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের প্রয়োগজাত সুবিধাদির বণ্টনে ব্যাপক তারতম্য। নানা সমীক্ষার থেকে জানা যাচ্ছে যে, এর ফলে এক জেলার সঙ্গে আর এক জেলার, একই জেলার মধ্যে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য এক অঞ্চলের এবং একই অঞ্চলের মধ্যে বিত্তবান কৃষকের সঙ্গে গরীব ও বিত্তহীন কৃষকের অসাম্য দ্রুত ও তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংক্ষেপে, এর অর্থ হচ্ছে দেশের কৃষি-অর্থনীতির সামগ্রিক পরিস্থিতির থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু সম্পন্ন অঞ্চল ও সম্পন্ন গ্রামীণ গোষ্ঠীর বিকাশ। আর কৃষি-উন্নতির এই ধারা শেষ পর্যন্ত যে শুধু কৃষির সর্বাঙ্গীণ

বিকাশের পক্ষে অন্তরায় তা নয়, এটা সামাজিক অসন্তোষ ও উত্তেজনার সঞ্চার করে সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে। সে-কারণেই বাঙলাদেশেও আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তিবিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হলে গ্রামাঞ্চলের প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

আধুনিক উন্নত কৃষিপদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কয়েকটি বিষয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বর্তমানে বাঙলাদেশে নীট কর্ষিত জমির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি বহু-ফসলী। বাস্তবিকপক্ষে বাঙলাদেশে বর্তমানে জমি ব্যবহারের ব্যাপকতা ও তীব্রতা যে ধরনের তাতে অকর্ষিত জমিকে কর্ষণযোগ্য করে তোলার অথবা কর্ষিত জমিকে বহু-ফসলী করে তোলার সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ। বাঙলাদেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ শ্রীস্বদেশ বসুর হিসেব অনুসারে প্রধানত বোরো ও রবি ফসল চাষের মরশুমে (মোটামুটি ডিসেম্বর থেকে মার্চ) বড় জোর ৮০—১০০ লক্ষ একর জমিকে একাধিক চাষের আওতায় আনা যেতে পারে। ফলেকৃষি-উন্নয় সম্পর্কিত পরিকল্পনায় বেশি গুরুত্ব দিতে হবে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির উপর।[২২]

কিন্তু একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি অথবা বোরো-রবি মরশুমে কর্ষিত জমির সম্প্রসারণ—এই উভয়ক্ষেত্রেই উচ্চ ফলনশীল বীজ, উপযুক্ত জল সরবরাহ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধের মতো চারটি আধুনিক উপাদানের যুগপৎ প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ-প্রসঙ্গে জাপান ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত যেসব আলোচনা।[২৪] হয়েছে তাতে এটাই মনে হয় যে, উপরোক্ত চারটি উপাদানের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল সুনিশ্চিত জল সরবরাহ। বাঙলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু, মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ধরন ইত্যাদি নানা দিক বিচার করে বলা যেতে পারে যে, এখানে একই সঙ্গে প্রয়োজন (১) অতিরিক্ত বর্ষণ ও বন্যার দরুণ ফসলহানির ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য আমনের মরশুমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও উপযুক্ত বিনিয়োগ এবং (২) শীতকালীন রবি ও বোরো চাষের অধীন জমির পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে জল সরবরাহের জন্য সেচের সুযোগ-সুবিধাদির (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের জন্য অগভীর নলকূপ ও নদীনালার থেকে পাম্পের সাহায্যে সেচের প্রকল্প) প্রসার।

উচ্চ ফলনশীল ধান, গমের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও বীজাণু-নাশক ওষুধ, চাষের নানা যন্ত্রপাতির (অবশ্য ট্রাক্টর ইত্যাদির মতো বৃহৎ ও শ্রমসঙ্কোচমূলক যন্ত্রের কোনো প্রয়োজন বাঙলাদেশে নেই বলেই মনে হয়) ব্যাপক

প্রয়োগ নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু এ-কথা আবারও জোর দিয়ে উল্লেখ করা উচিত যে, অন্য অনেক দেশের অভিজ্ঞতাতে এটা প্রায় সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের জন্য শুধুমাত্র নিয়মিত ও সুনিশ্চিত জল সরবরাহই যথেষ্ট নয়, এর জন্য যা অবশ্যই প্রয়োজন তা হল নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ যখন-যে-পরিমাণে দরকার তখন-সেই-অনুসারে জলের সরবরাহ। আর সেই ব্যবস্থা করার জন্য সরকারকেই উপযুক্ত ব্যবস্থাদি করার কাজে অগ্রণী হতে হবে।

উপরে যে-ধরনের কর্মসূচী ও কর্মনীতির আভাষ দেওয়া হল তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারলে বাঙলাদেশের কৃষিক্ষেত্র সজীব হবে, উৎপাদনশীল হবে, অতি অল্প সময়ে খাদ্য ঘাটতি দূর হবে, কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য আসবে অর্থাৎ সংক্ষেপে একটা কৃষি-বিপ্লব ঘটে যাবে। এর ফলে কৃষিতে শ্রমিকের প্রয়োজন বাড়বে, গ্রামাঞ্চলে বেকার ও আধা-বেকারদের এবং ব্যাপক ভূমি-সংস্কারের পরেও যারা যথেষ্ট জমি পাবে না তাদের অনেকেরই কর্মসংস্থানের, লাভজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। উপরন্তু, কৃষির আধুনিকীকরণ, গতি-শীলতা ও অগ্রগতি শিল্পায়নের পথকে প্রশস্ত করবে।

কিন্তু সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রগতি-অভিমুখী সংস্কার সাধনই হোক আর কৃষিকে আধুনিকীকরণের কর্মকাণ্ডই হোক— সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন শ্রমজীবী কৃষক-সাধারণের ব্যাপক, প্রত্যক্ষ,সক্রিয় অংশ গ্রহণ। সরকারী প্রকল্প, সরকারী আনুকূল্য কিংবা আইনী ব্যবস্থা নিশ্চয়ই প্রয়োজন—কিন্তু বৈপ্লবিক ভূমিসংস্কার ও কৃষিবিপ্লবের শুধুমাত্র সরকারী ব্যবস্থা বা তার উপর নির্ভর-শীলতা মোটেই যথেষ্ট নয়। মূলগত প্রকৃতির সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কার ও কৃষিবিপ্লবকে সফল করে তোলার জন্য চাই মহৎ সামাজিক উদ্যোগ। সরকারী প্রয়াস এবং ব্যাপকতম জনসমষ্টির, বিশেষত কৃষক-সাধারণের উদ্যোগ—এই দুই-এর মধ্যে নিবিড় পারস্পরিকতার সম্পর্ক স্থাপন ও তার যথাযথ বিকাশের উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে বাঙলাদেশের বর্তমান অগ্নিপরীক্ষার ভবিষ্যৎ।

কিন্তু সমস্যা আরও রয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলনিকাশী ব্যবস্থা এবং সেচের সুযোগ-সুবিধাদির সম্প্রসারণের মাধ্যমে জল সরবরাহ এবং উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধের ব্যাপক প্রয়োগ বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল।

এই বিনিয়োগে জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ কোথায় পাওয়া যাবে? ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার মতো অন্যান্য বন্ধু দেশের থেকে এ সব ক্ষেত্রে কিছু-না-

কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ সংগ্রহের জন্য মুখ্যত ও মূলত অভ্যন্তরীণ সম্বলের উপরেই নির্ভর করতে হবে। আর প্রয়োজনীয় বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের মোটা অংশই দেশের ভিতর থেকে, বিশেষত কৃষিক্ষেত্র থেকে, সংগ্রহ করা খুব কঠিন বা অসম্ভব নয়।

ভাগচাষীদের উপর খাজনার ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়ে, চড়া হারে সুদ আদায় করে, দাম ও বাজারের মারপ্যাচ কষে কৃষককে বঞ্চিত করে জোতদার, মহাজন ও মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের ত্রিমূর্তির জোটটি এতকাল যে-বিপুল উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করেছে,তা তারা সম্পূর্ণ অপচয় করেছে— কৃষির উন্নতি ও বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার করে নি। বর্তমান অংশের গোড়ার দিকে কৃষিসংক্রান্ত কাঠামোতে যে-মৌলিক রূপান্তর সাধনের কথা বলা হয়েছে তার ফলে এবং সম্পদ সংগ্রহের উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে বাঙলাদেশ সরকারের পক্ষে সেই উদ্বৃত্ত আহরণ করে কৃষির উন্নতি ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য বিনিয়োগ করা সম্ভবপর। একটি হিসেব অনুসারে একমাত্র এইভাবেই অন্তত ৩০০ কোটি টাকার বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভবপর।[২৪] এ-ভিন্ন বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ও হার বৃদ্ধির অন্যান্য পদ্ধতির কথাও বিবেচনা করা যায়।

সবশেষে বলা যেতে পারে যে, বাঙলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের খুব সীমাবদ্ধ বিকাশই ঘটেছে। ফলে সেখানে ধনতান্ত্রিক বিকাশকে কার্যত পাশ কাটিয়ে যাওয়ার বাস্তব সুযোগ রয়ে গেছে। সেই সুযোগকে কেমন করে কাজে লাগানো হবে তা স্থির করার দায়িত্ব বিপ্লবী সংগ্রামের আগুনে পোড় খাওয়া বাঙলাদেশের জনসাধারণ, নেতৃবৃন্দ ও সরকারের। আর এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদৃষ্টি ও সংগঠন-ক্ষমতা, জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ সক্রিয় তৎপরতা ও উদ্যোগ এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা—এই তিনের মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ও প্রকৃতির উপর ভবিষ্যৎ বিকাশের গতি ও চরিত্র মূলত নির্ভরশীল।

নির্দেশিকা

১. F. Kahnert, H. Stier and others, Agriculture and Related Industries in Pakistan, Table IV-1, P. 150.

২. Rehman Sobhan, Basic Democracies Works Programme and Rural Development of East Pakistan, P. 1.

৩. Kahnert and Others, উপরে উল্লিখিত, পৃষ্ঠা ১৭২-৭৩।
৪. Bengal Land Revenue Commission, Report, P. 42.
৫. J. Russel Andrus and Azizali F. Mohammed, The Economy of Pakistan, P, 118.
৬. ঐ, পৃষ্ঠা ১২০।
৭. Census, 1951. Vol. 1, Tabler 14, ৫নং-এ উল্লিখিত বইতে উদ্ধৃত।
৮. Andrus and Mohammed, উপরে উল্লিখিত, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩।
৯. ঐ, পৃষ্ঠা ১২১।
১০, Government of Pakistan,Planning Commission. The Fourth Five Year Plan, 1970-75, P. 309.
১১. ঐ, পৃষ্ঠা ৩০৮।
১২. জমি ও অন্যান্য উপকরণের বণ্টন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য রেহমান শোভানের উপরে উল্লিখিত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের উপর প্রধানত নির্ভর করা হয়েছে।
১৩. অনিল মুখার্জী, স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি, পৃষ্ঠা ২৫।
১৪. রেহমান শোভান, উপরে উল্লিখিত, পৃষ্ঠা ৯।
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৭।
১৬. ঐ, প্রথম অধ্যায়।
১৭. ঐ
১৮. J. Russel Andrus and Azizali F. Mohammed, Trade, Finance and Development in Pakistan, P. 131-36.
১৯. উপরের ১৫, ১৬, ১৭, ১৮র প্রসঙ্গ নির্দেশ দ্রষ্টব্য।
২০. রেহমান শোভান, পূর্বে উল্লিখিত, পৃষ্ঠা ৬৬-৭১।
২১. ঐ, দ্বিতীয় অধ্যায়।
২২. Swadesh R. Bose, East-West Contrast in Pakistan's Regional Development in E. A. G. Robinson and Michael Kidron (ed.): **Economic Development in South Asia,** Macmillan, India, 1970.
২৩. Shigero Ishikawa, **Economic Development in Asian Perspective,** Chapter 2 ; and Planning Strategies in Agricutture in ECAFE, Economic Bulletin for Asia and the Far East. September, 1969.
২৪. N, K. Chandra, Agrarian Classes in East Pakistan, **Frontier,** January 8, 15 and 22, 1972.

সুখের জন্য তিনজন

অসিত ঘোষ

পুঁটিমাছগুলো রুপোলি পয়সার মতো। মানকচুর পাতা ঢেকে-ঢুকে তাড়াতাড়ি গ্রামের দিকে এগোলো চারুর মা। হাটবার নয় আজ। গাঁ ঘুরে বেচতে হবে। দেরি হলে. পেট পচে গেলে, লোকে নাক সিটকোয়। চারুর মা ওসব সহ্য করতে পারে না। তাজা থাকতে থাকতে বেচে ফেলে। দু-পয়সা বেশি-কম হিসেব করে না। যেসব মানুষ মাছ কিনে খায় দূর থেকেই মাথার ঝুড়ি দেখে বুঝতে পারে মেছুনি আসছে। ডেকে ঝুড়ি নামাতে বলে। মাছগুলো দেখে, দরদাম করে। দরদাম করাটাও চারুর মায়ের পছন্দ নয়। খুব বেশি দামও বলে না সে। তবু ঘোরাঘুরি করতে হয় এপাড়া-ওপাড়া। শেষে একজায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায়। ঘোরারও একটা সীমা থাকে তো! বেলা যেমন বাড়ে, মাছে তেমনি পচন ধরে। মাথার ওপর সূর্যটা কেবল সচেতন করে—বাড়ি ফিরতে হবে, চান-রান্না-খাওয়া রয়েছে। একটা ছোটো মেয়ে শুকনো ডাল-পালা কুড়িয়ে মায়ের প্রতীক্ষায় বসে থাকবে। বেলার সঙ্গে নানারকম চিন্তা করে। বেশি এদিক-ওদিক না করে মানকচুর পাতা মুড়ে মাছগুলো ওজন করে দেয়। খদ্দেরও এমন, কাকে ডেকে মাছগুলো ঘরে পাঠিয়ে উঠে যাবার ভঙ্গিতে দাঁড়ায়, পয়সা দেবার ইচ্ছা নেই, কার সঙ্গে কথা বলে। চারুর মা অস্থির হয়—পয়সা দিয়ে দিলেই সে রওনা দেবে, লোকটার সেদিকে খেয়াল নেই। দু-পয়সার মালিক হলে গাঁ-গেরামে যেরকম মেজাজ হয় ঠিক সেভাবেই লোকটি চারুর মাকে তাচ্ছিল্য করছিল। চারুর মা খুব ভদ্রভাবেই বলে, 'পয়সা কটা দিয়ে দাও, খাবার বেলা হোয়চে!'

'হাটবারে হাট আসচু ত, লিয়ে লিবি!'

'কি মানুষ তমরা, জান এই পয়সা লিয়ে গেলে তবে তেল-নুন কিনব!'

ঝুড়ি এখন শূন্য। টস-টস করে ঘাড়ে জল পড়ে না। ঝুড়ি না ধরে এগোলে টাল সামলানো অসুবিধাজনক, কিছু একটা থাকলে এ-রকম হয় না। ডোবার জলে ঝুড়ি চুবিয়ে পরিষ্কার করে। লোকটার পয়সা না দেওয়ার ফিকিরের কথা ভেবে নিজে-নিজেই হেসে ফেলে। ঝামটে না উঠলে হাট-

বারের প্রতীক্ষা করতে হতো। চালের ওপর ঝুড়িটা ছুঁড়ে ছিটা-হাঁড়ি নিয়ে চান করতে বেরোলো। এই সময় শীতের চড়া রোদ্দুর থেকে পোনাগুলো গাছের ছায়ায় ঝাঁক বাঁধে। গা ডুবিয়ে ছিটা ঠেলে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, মাঝে-মাঝে তুলে ঘুসোপোনা হাঁড়িতে রাখা। এই করে শীতের বেলা শেষ হয়ে আসে। ততক্ষণে নন্দ জ্বালানি সংগ্রহ করে মায় পাড়া বেড়িয়ে ঘরে ফেরে। ঘুসোপোনার হাঁড়িটা নন্দর কোলের কাছে দিয়ে চারুর মা ঠকঠক করে কাঁপে। ভিজে কাপড় ছেড়ে একটু রোদে পিঠ পাতে, কাঁচা-পাকা চুলের গোছা শুকোয়। নন্দ তা দেখে, আর মায়ের ওপর চটে।

শীতে নন্দর ঠোঁট ফেটেছে। সয়ষের তেল লাগায়, আরো বাড়ে বৈ কমে না। সে ঠোঁট নাড়ে, ফিসফিস আওয়াজ হয়। চারুর মা চোখ দেখে আন্দাজ করে, মেয়ে চটছে। ঐ রোগা লিকলিকে হাত দুটো দিয়ে হাঁড়ি আঁকড়ে থেকে শরীরটা দোলানো বড় পরিশ্রমের। মেয়েটা শ্রমকাতুরে। হেসে বেড়াতে খুব পারে। তাছাড়া কখন পান্তা খেয়েছে চারুর মা জানে না। সে অবশ্য সকালবেলা খেয়ে বেরিয়েছে। নন্দ নিজেই খেয়ে নেয়। চারুর মা নন্দর মুখ দেখেই শিশি-বোতল নিয়ে মুদি দোকানের দিকে গেল। একটু পরেই চারু এসে পড়বে। রান্না-বান্না না করে রাখলে চেঁচামেচি করে। চারুর মা খুব তাড়াতাড়িই বাকি কাজ শেষ করে উনুন ধরাতে গিয়ে রাগি নন্দর সঙ্গে কথা না বলতে চেয়েও কথা বলে। 'শুকনা জ্বালুন পাসনু, ভিজাগুলান খালি ধুঁয়াবে ত!'

'তমার তরে রোজ গাছে ডাল শুকি থাকবে, না?'

নন্দ খেঁকিয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে হাঁড়ির ভিতরে জল ছলাৎ করে উঠল। চারুর মা হাসল মেয়ের চোট দেখে। সত্যি, গাঁয়ে আর তেমন গাছগাছালি নেই। যে-চাটান ঝোপঝাড়ে ভরে ছিল তাও তো আজ ক্ষেত-খামার। শ্মসান-মসান সবই চাষের জমি হয়ে গেছে। আগে কত বড় এলাকা জুড়ে শ্মসান ছিল, চোখের সামনে কেবল কালো পোড়া কাঠের গুঁড়ি আর ছাই ভাসত। পাশ দিয়ে যেতে বুক ঢিপঢিপ করত। সে-সব চারুর মায়ের যৌবনকালের কথা। তখন মরণকে খুব ভয় করত। এখন মৃত্যু জলভাত হয়ে গেছে। চারুর মায়ের মা-বাপ মরল, চারুর বাপ মরল। মরণ দেখতে-দেখতে কেমন মৃত্যু সম্পর্কে ভয়ও দূর হয়ে গেছে। ভর দুপুরে এমনকি মাঝ রাতেও শ্মসানের ওপর দিয়ে হুড়মুড় করে চলে আসে। চারু যখন ছোট ছিল,

শ্মশানের বিস্তৃত এলাকা ছাড়া তার খেলা জমত না। গাঁয়ের বাউণ্ডুলে সব এক-জায়গায় জুটত। যেদিন ছাই মেখে এসেছিল, চারুর মায়ের বেশ মনে পড়ে, খুব মেরেছিল। তারপর অবশ্য কোনোদিন মারেনি। এখন চারুই উল্টে মারতে আসে।

ঘুসোপোনার হাঁড়িটা নন্দ দোলাচ্ছে, চারুর ভালোর জন্যে। সেই কখন বেরিয়েছে চিঙড়িপোনা ধরতে। শীলাবতী দয়া করলে তবেই এক-ভাব পোনা পাবে। তার ওপর যারা পোনা নেয় তারা কম পয়সা দিয়ে বেশি পোনা চায়। চিঙড়িপোনার সঙ্গে কিছু ঘুসোপোনা ভেজাল দিলে পরিমাণে বেশি পেয়ে খদ্দের খুশি হয়। তা নয়। চারু ভেজালটি দিতে দেবে না। মানুষ ঠকাবে না। তা না করলে বউ নিয়ে আসার জন্যে যে এক-কাঁড়ি টাকা চাই সেটা কোথা থেকে, আসবে চারুর মা বোঝে না। এ আর ভদ্রলোকের বিয়ে নয় যে ছেলেকে টাকাকড়ি দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবে। চারু অবশ্য মেয়ে ঠিক করেছে নিজেই। চারুর মাও জানে কুসুম খুব ভালো মেয়ে। কুসুমের বাপ মেয়েকে স্কুলেও পাঠাত। কিন্তু কুসুমের বাপের খাঁক মেটানো খুব সহজ নয়। চারুও রোজগার যা করে তা আজ পর্যন্ত খরচই হয়ে যাচ্ছে।

আজ পোনা নিয়ে এসে চৌবাচ্চায় ঢেলে জল আনতে গেলেই চারুর মা ঘুসোপোনার হাঁড়িটা উল্টে দেবে। সেজন্যে একটু আড়ালেই নন্দকে বসিয়েছে। চারু ঘরের ভিতরে ঢুকেই দেখতে পাবে না, জল আনতে বেরোলেই···।

'দাদা এলে তমার ঘুসাপনা ধরা দেখাব!' নন্দ বলে।

চারুর মা আর থেমে থাকে না, রাগ দপ করে ওঠে। নন্দর গালে ঠোনা মেরে তবে রাগ জল হয়। এইটুকু মেয়ে, সে ই পেটে ধরেছিল, দাদার নামে মাকে ভয় দেখায়। নন্দ কাঁদে। চোখের জল গড়ায়। ঠোঁট প্রসারিত হয়। ফেটে চৌচির হয়ে রক্ত ঝরে, চিবুকে এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ে। নন্দ আর কাঁদে না। জিব বুলোয় ঠোঁটে। নোনতা রক্ত চোষে। চিবুক মোছে। চোখ দুটো জলে চিকচিক করে।

'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!' চারুর মা বলে।

নন্দ কিছু বলে না। দাদার একখানা ধুতি টেনে গায়ে জড়িয়ে একদিকে বসে। মাঝে-মাঝে ধুতিতে মুখ মোছে। ছোপ-ছোপ রক্ত লাগে। হাঁড়িটা

আর নাড়ায় না। হাঁড়িটা না দোলালে ঘুসোপোনাগুলো একজায়গায় দলা পাকানো হয়। মরে যায়। চারুর মা দেখল অনেকক্ষণ নন্দ হাঁড়ি দোলাচ্ছে না। রাগে গরগর করে। নন্দকে পুনরায় মারে না, হাঁড়ির মুখে গামছা বেঁধে উপুড় করে ঘুসোপোনা ছেঁকে তোলে। মানকচুর পাতায় রেখে পোকা বাছে। ঘুসোপোনার সঙ্গে নানা ধরনের জলপোকা ওঠে।

'বড়া গিলবে, খুব ভাল লাগে তমার তাই না।'

মায়ের কথা শুনে নন্দ সাবধানে হাসে। আরো অনেকের ঠোঁট ফেটেছে এ-গাঁয়ে। পরস্পর পরস্পরকে হাসাবার চেষ্টা করে। পীড়াপীড়িতে অনেকে হাসে আর রক্তপাত ঘটায়। নন্দ এসব কথায় মজা পায়। চারুর মা নন্দর ভাবনাজনিত উদ্ভাসিত মুখ দেখেই বোঝে সব। ঝামটে ওঠে আবার।

'চোখের মাথা খেয়েচু নাকি, আল জ্বালচুনি কেনে?'

নন্দ আলো জ্বালতে চারুর মায়ের ভাবনা মোড় নিল। চারু এখনো ফেরেনি। অনেক আগেই ফেরে, আজ কেন দেরী হচ্ছে ভেবে পেল না। কোনো কোনো দিন নদীতে বেশি পোনা পাওয়া যায়। ভার পুরো হলে সোজা বেচতে বেরোয় চারু। আবার কোনোদিন একমাইল নদী হাটকালেও পোনা মেলে না। সেদিন জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতে নামে। শীতকালে নদীতে বেশি জল থাকে না। গভীর এলাকা দেখেই মাছ ধরে। ভাগে যে-মাছ পায় তা বেচে দেয় জেলেদের কাছেই। জেলেরা শহরে নিয়ে যায়। তাতেই দু-পয়সা রোজগার করে চারু। ভাত নামিয়ে মালসায় ঘুসোপোনার বড়া করার চড়বড় শব্দ হচ্ছে। নন্দর খুব মজা। ভাতের সঙ্গে এই বড়া আর মুসুরীর ডাল।

'যা না, রঞ্জিত এসচে নাকি দেখে আয়।'

চারুর মা ছেলের কষ্টের কথা ভাবে। শীত কেটে গেলে চিঙড়িপোনার মরসুম আর একবার মাত্র পড়বে। তারপর বর্ষা। বর্ষার শুরুতেই বোয়াল, তার সঙ্গে রুই-মৃগেল ডিম ছাড়ে। সেই ডিম স্রোত থেকে ছেঁকে তুলে নিয়ে এসে ডোবার জলে ফোটাতে হয়। কাজেই ডোবার জল শুকিয়ে চুনোপুঁটি না মারলে ডিম খেয়েই শেষ করে দেবে। হাবজি পোনা আর হবে না। প্রথম বর্ষার চোট কমে গেলে কাতলার ডিম ভাসে। কোনো পাহাড়ি ঢলে উখালি পাথালি লাফায়, ডিম গড়িয়ে যায় স্রোতে। সেই ডিম তোলে হিসেবি মানুষ। ডিম থেকে পোনা। পোনা ব্যবসা করে বেঁচে থাকা। এ-রকম পদ্ধতিতেই

রঞ্জিত ও চারু জীবিকার্জন করে। নদীর স্রোত কখনো কখনো কালস্রোত হয়। কত লোক যে এ-কালস্রোতে প্রাণ দিয়েছে। চারুর মা তা ভাবে, প্রার্থনা করে কালস্রোত যেন পাশ দিয়ে চলে যায়। যেদিন চারু দেরী করে সেদিন সে-ভাবনাই বড় হয়।

নন্দ রঞ্জিতদের ওখানে গিয়েই ফিরে আসে। ঘরের মধ্যে দাদাকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়। রঞ্জিতও ফিরেছে। তখনো দাদার ধুতিটা গায়ে জড়ানো। নন্দকে দেখেই চারু বলে, 'তুই রাঁধতে পারবি? মা বলচে পারবেনি।' একদিকে তালপাতার ঠোঁঙায় লাল-লাল মাংসের টুকরো।

'আমি শুলম, তমরা ভাই-বোনে যা পার কর। আমি ত উসব খাইনি!'

বোনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চারু বলে, 'আমিই করব! তুই ত মাংস খেতে ভালবাস্‌! কুথায় কি আছে বার কর!'

নন্দর ঠোঁট প্রাসারিত হয়। সুন্দর হাসি ফোটে। ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরে। দাদার ধুতিতে মোছে। ছোপছোপ রক্ত লাগে। চারু দেখে। বাইরে বেরিয়ে যায়। নন্দ ডাক্তারের ওখান থেকে ওষুধ নিয়ে আসে। ওষুধ বলতে ভেসলিন একটুখানি। বোনের ঠোঁটে মাখায়।

'রোজ চান করু ত?'

'হুঁ!'

'তবে ঠঁট ফাটে কেনে, চাটুসমু আর!' নন্দর গায়ে ধুতিটা দেখে। 'একখানা চাদর লিয়ে লুব তোর তরে!'

'চাদর লয়, একটা শাড়ি!'

'এতটুকুন মেয়া শাড়ি পরবি কেনে?'

'ঐ কর, সারারাতে মাংস হবেনি!' চারুর মা বিছানা ছেড়ে ওঠে।

'তমার তরে একটা বউ কিনে লুব।' চারু বলে।

'হোয়চে!'

চারুর মা মাংস রাঁধতে বসল। ঘুসোপোনার বড়াগুলো ভাইবোনে এখনি খেতে শুরু করে। চারুর মা গম্ভীর হয়ে মুখ ফেরায়। নন্দ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। 'তমাকে বলে তুব বলতে বড়া করল!' দাদাকে বলে নন্দ।

'অদের কত ভয় করি! খেয়ে-পরে বসে আছি কি-না!'

চারু হাসে, নন্দও। নন্দর ঠোঁট এখন নরম। প্রসারিত হলে চিড় খায়

না। তবে ব্যথা খুব। চারু অনেকবার বলেছে, নন্দ ভয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে পারেনি। এখন অবশ্য ঠোঁটের ভয়টা রয়েছে, হাসলেই ঠোঁটের কথা মনে পড়ে। ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ নামিয়ে দেখার চেষ্টা করে। ঘুসোপোনার বড়া খাওয়ায় নুন লেগে চিনচিন করে, তবে রক্তপাতের মতো সে-ব্যথা তেমন কিছু নয়। মাংস খেলে হয়তো বেশি জ্বলবে।

'মাংস হতে রাত হবে, না দাদা?'

'হঁ, জেগে থাকবি?'

'হ্যাঁ, হারামজাদী ঘুমালে ডাকাত পড়লেও ভাঙবেনি!' চারুর মা বলে।

'ডাকাত তমার ঘরে পড়বে কেনে, মাটিতে পুঁতে রেখেচ নাকি কিছু?'

'অমন কপাল আমার?'

'তবে নন্দর মত তুমিও ঘুমানে পার!'

'ঘুমটা এসবে কুথা থিকে, কত সুখ জীবনে!'

'সুখের অভাবটা কি শুনি!'

'দু-বেলা দু-মুঠা খেতে পেলেই মানুষ সুখে থাকে, না?'

গাঁয়ের লোকে মাংস খায় কম। সবাই খেয়ে-পরে বাঁচে। কখনো-কখনো এ-ঘর ও-ঘর জিজ্ঞেস করে কোথাও একটা খাসি কিনে নিয়ে আসে। সেটা কেটে যে-যার মতো নিয়ে যায়। গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা ছাগল-কাটার নামে চারপাশে ভিড় করে, কাটা মুণ্ডুটা নিয়ে কেউ জল ঢালে. বাঁশপাতা খাওয়ায়। যে-সব ছেলে-মেয়েরা বাপের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন তারা মাংস নেবে কি-না জিজ্ঞেস করতে ছোটে। যে-সব ছেলে জানে বাপ গরিব তারা মায় ভুঁড়ি পরিষ্কার করা পর্যন্ত লোলুপভাবে দেখে। অবশেষে টুকরো টুকরো মাংস নিয়ে চিলের মুখে ছুঁড়ে মারে।

আজ রঞ্জিত ও চারু পোনা না পেয়ে একটা খাসি নিয়ে গ্রামে ঢুকেছিল। নন্দ কিংবা চারুর মা টেরই পায়নি গাঁয়ে খাসি কাটা হচ্ছে। নন্দ অবশ্য জানলে মায়ের কাছে কান্নাকাটি করত, শেষ পর্যন্ত একপোয়া মাংসের জন্যে পয়সা দিত, তার সুযোগ পায়নি আজ। চারু নিজেই নিয়ে এসেছে।

মাংস তৈরি হতে রাত হয়ে গেল। নন্দ বসে-বসে ঘুমিয়ে পড়েছে, চারু খেয়াল করেনি। এতক্ষণ কেবল সুখের কথাই ভেবেছে। চারুর মা হাঁটু মুড়ে নীরবে মাংস ফোটা দেখেছে, মাঝেমাঝে সিদ্ধ হলো কিনা পরখ করেছে। মা-বেটা আর কোনো কথা বলেনি। পাশেই চৌবাচ্চাটা শুকনো পড়ে

রয়েছে। অন্যদিন ওটা জলে ভরাট থাকে, পোনাগুলো ভেসে বেড়ায়। সেগুলো নিয়ে নন্দ আঙুল ডুবিয়ে-ডুবিয়ে খেলা করে কখনো-কখনো। মাংস নামিয়ে চারুর মা ভাত বাড়ে। নিজের জন্যে নিরামিষ তরকারী আলাদা নেয়। নন্দকে ঠেলে তুলে দেয় চারু। ঢুলতে-ঢুলতেই নন্দ খায়। মেটে দেখে নন্দর মুখে তুলে দেয় চারু, চারুর মা এতখানি ভালোবাসা সহ্য করতে পারছিল না, অথচ চারুর সামনে কিছু বলাও যাচ্ছে না। রাগটা মনে-মনেই গুমরোতে থাকল। অতবড় মেয়ের মুখটাও ধুয়ে দিল চারু। কতো খাতির বোনের। শোবার সময় নন্দকে কোনোরকম সাহায্য করতে হলো না। চারুর মা অমন মেয়ের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। জায়গা করার নামে একটা গুতো দিয়ে ঠেলে দিল নন্দকে। অর্থাৎ সব রাগটা গিয়ে নন্দর ওপর পড়ছে। চারু মাঝখান থেকে বিব্রত। একটা কথা তার মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। 'বেলা দুমুঠো খেতে পেলেই মানুষ সুখে থাকে না?' এতো আনন্দের মাঝখানে হঠাৎ একটা ছেদ। চারুর মা নন্দর ঘুমের প্রসঙ্গে ডাকাত পড়ার কথা বলেছিল। আজ সারারাত ডাকাতি চলবে। চারুর ঘুম হবে না। অথচ চারুর মা ঘুমোলো।

চারু অন্ধকারে পাশ ফিরছে। এতদিন কিছুই করা হয়নি। সুখের বেড়া ভীষণ পলকা হয়ে রয়েছে। দুঃখের গরু-বাছুর ঢুকে বাগান তছনছ করে প্রায়ই। উপায় তো নেই। কুসুমের বাবা বিনাপয়সায় মেয়ে ছাড়বে না। কুসুমের ভালোবাসার মূল্য বড়ো ব্যথার, ঠনকো টাকা দিয়ে সেটা বাজিয়ে নিতেই হবে। আড়ালে দুটো কথা বলেও এ-সমস্যা শেষ হয় না। না শেষ হলে কুসুমের ভালোবাসা কোনদিকে ভেসে যাবে ঠিক নেই। চারু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মা বলে ডাকে। মায়ের সাড়া নেই। নন্দর ঘাড়টা কাৎ হয়ে গিয়েছে বোধ হয়। চারুর ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে, নাক ডাকছে। সোজা করে দিয়ে চারু ঘরের বাইরে বেরোলো। মাঠঘাট জ্যোৎস্নায় ছয়লাপ। গরিব-দুঃখীদের কুঁড়েগুলো জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এখনো রাত বেশি হয়নি। ডাক্তারবাবুর ওখানে আলো জ্বলছে। চারু যাবে কিনা ভাবল। একটান বিড়ি টানতে-টানতে গিয়ে বসলে গল্প করবে ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবু নিজে গড়গড়ায় তামাক খায়। চারু গেল না। ডাক্তারবাবু হয়তো বিছানায় যাবে এখন। ঐ আলোটা ছাড়া গাঁ-খানা দেখলে মনে হবে রাত অনেক। আসলে সারাদিন খাটাখাটুনির পর সকলেই তাড়াতাড়ি শোয়।

চারু ঘরের বাইরে শীতের মধ্যেও ঘোরাফেরা করতে থাকল। বিশাল মাঠের একদিক থেকে উজ্জ্বল আলো আসছে। হ্যাজাক মাথায় করে, বাজনা বাজিয়ে বর ও বরযাত্রী আসছে মনে হয়। গাঁয়ের পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় চারু বর দেখল। পাল্কির মধ্যে বর বসে বিয়ে করতে চলেছে। সন্ধ্যের দিকে হলে পাড়ার মেয়েরা বর দেখতে বেরোতো। একবার কুসুম বর দেখেছিল পাল্কির দরজায় মুখ গলিয়ে। হেসে-হেসে সবাইকে বলেছিল, লাজে ঘুমি পড়চে! চারু এ-কথা ভেবে হেসে ফেলে। খানিক পরেই হাসি বিলীন হয়ে গেল। বাজনার শব্দও আর পাওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তারবাবু দরজা বন্ধ করলেন তার শব্দ কানে এল। চারু এবার বুঝল রাত বারটা বেজেছে। কেন-না ডাক্তার-বাবু প্রায়ই বলেন, 'গাঁয়ের সবাই ঘুমি পড়লে তবে দরজা বন্ধ করি।' আজ অন্তত একজন ঘুমোয়নি। চারু জ্যোৎস্নায় মাঠ দেখতে থাকল। পেঁচাগুলো শাদা ডানা মেলে মাঠে নেমেছে। মাঝে-মাঝে ডাকছে। কুসুমদের ঘরটা পাশেই। দেওয়ালে ঘুঁটে দিয়েছে কুসুম। কুসুম গোবর কুড়োয়, ঘুঁটে বিক্রি করে। ঘুঁটে বেচা পয়সায় সে কাচের চুড়ি কেনে। কুসুম যখন ঘাটে নামে তখন হাতের চুড়ির শব্দ হয়। চারু আর রঞ্জিত পুকুরে মাছধরা কালে সেই শব্দ শুনেছে। চারু হয়তো জল ছিটিয়েছে হাসতে-হাসতে, কুসুম হুড়মুড় করে পালিয়েছে।

চারু আবার হেসে ফেলে। কুসুমের পালাবার ভঙ্গিটা অদ্ভুত। কুসুমের বিশ্বাস হাসিতে স্পষ্ট হয়। চারু মানসিক স্থৈর্য পায়। রঞ্জিত মজা করে। 'কারু হাতে যাবার লয়, জালে পড়েই আছে!' চারু সায় দেয়। একটা ঝিনুক পাঁকের মধ্য থেকে তুলে সোজা তালগাছে ছুঁড়ে মারে। তালপাতায় পড়ে শব্দ হলে কাকগুলো সরবে উড়াল দেয়। রঞ্জিত একটা ছোট ঝিনুক তোলে। চারু ওটা ট্যাঁকে গুঁজে রাখে। 'ঘামাচি গালতে রাখলি!'

'শুনেছি অর নাকি খুব ঘামাচি হয়, নন্দকে দিয়ে পাঠি দুব।'

চারুর রাত স্মৃতিময় হয়ে ওঠে। রাত পোহায়। চারুর মা কাঁথাটা পাশে রেখে উঠে বসলে চারুকে বাইরেই দেখে। একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে রয়েছে। মাথায় গামছা পাকানো। গায়ে একটা কাঁথা। এতো শীতেও চারু ঘরের মধ্যে ঢোকেনি। বাইরে দাঁড়িয়ে কেবল ভেবেছে। শেষদিকে এক-দল শেয়াল যেতে দেখেছে সে। তারপর চালের ব্যাপারিদের দেখেছে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে। চারুর মা বাইরে এসে দেখল তখনো সূর্য ওঠেনি।

কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। আমগাছগুলোর নতুন বকুলের ফাঁক দিয়ে কুয়াশা জমাট বেঁধে উড়ছে। মাটি আঁকড়ে আচ্ছন্ন অন্ধকার। মাকে দেখে চারু হেসে ফেলল, 'তমার ঘরে ডাকাত পড়েছিল, আমার ঘুম হয়নি!' চারুর মা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারুকে দেখল। মাঠের দিকে তাকালো। ধানের আঁটি বাঁধছে মজুররা। কুয়াশা ভেজা-ভেজা খড় দিয়ে আঁটি বাঁধতে সুবিধা হয়। বেলা হলে ধানের শিস ভেঙে পড়বে। নন্দকে ঠেলে তুলে দেয়। আজ ধান কুড়োতে যাবে চারুর মা।

ফসল তোলার সময় গরিব-দুঃখী মেয়েরা চেঙারি বগলে, ধামা মাথায় মাঠে-মাঠে ঘোরে। ধান কুড়োয়। নবান্নের সময় নতুন ধান সকলেরই লাগে। পিঠে-পার্বণ নতুন চাল নইলে সম্পূর্ণ হয় না। গতকাল চারুর মা ও পাড়ার অন্যান্য মেয়েরা মাছ ধরতে বেরিয়েছিল। চেঙারি ধামাগুলো একজায়গায় নিয়ে এসে নন্দকে তুলে দেয়। একটু বেলা হতে মায়ে-ঝিয়ে বেরোয়। কুসুম ও অন্যান্য মেয়েরা দল বেঁধে আলপথে মাঠে নেমে যায়। চারু কুসুমের গতি লক্ষ্য করে। সারারাতের হিম মাথায় নিয়ে এখন কেমন যেন মনে হচ্ছে। রঞ্জিত চাদর জড়িয়ে দূর থেকে দেখছিল চারুকে। কাছে এসে বলল, 'মেজাত খারাপ হলো নাকি!'

'এই মাসও ফুরাবে মনে হচ্ছে!'

'টাকা জুমলনি?'

'না!'

রঞ্জিত ও চারু বেরলো। নন্দ নেই। অনেক বেলা করেই ফিরবে সব। হাঁড়িতে পান্তা থাকবে নিশ্চই। ফিরেই খেয়ে নেবে মনে করল। সকালবেলার শিশির-ভেজা ঘাস মাড়িয়ে চলল দুজনে। একটা চাটানে তালপাতার ছাউনি ফেলে ফসল-কাটার মরসুমে তাড়ির দোকান বসিয়েছে। তাড়ির হাঁড়িগুলোর মুখে ফেনা। বিদঘুটে গন্ধ বাতাসে। কিন্তু সাঁওতাল রমণী তাড়ি খেয়ে ঘুরে-ঘুরে নাচছে, গান গাইছে। একটু দাঁড়িয়ে দেখল। আখের ক্ষেত, মটর ও খেসারীর ক্ষেত ছাড়িয়ে শীলাবতীর তীরে চলে এলো রঞ্জিত ও চারু। শীলাবতীর ধারে-ধারে আলুর ক্ষেত? এ-বছর আলু ভালো হবে। কিছু কিছু কপিও দেখা যায়। তাছাড়া বেগুন-টমাটো-লঙ্কা ইত্যাদি রয়েছে। চারু ও রঞ্জিতের প্রবল আশা নদীর ধারে কয়েক বিঘে জমি কেনার। চাষ-বাস করার। বাপ-দাদার আমল থেকে তাদের জমি-জিরেত নেই। কিন্তু সম্ভব

হয় না। আশা আশার মতোই ধিক-ধিক করে জ্বলে। রোজ আনে, খায় দায়। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে সুখ পায় না।

নদীর পাড় দিয়ে আখবোঝাই গোরুর গাড়িগুলো এগিয়ে চলেছে। গাড়োয়ানদের সবাই প্রায় মুসলমান। একটুখানি নূর চিবুকের সঙ্গে লেপটে থাকে। চোখগুলো অদ্ভুত দেখায়। ভ্রুর চুল পেকে গেলে আরো ভালো লাগে চারুর। নাম না জেনেও চারু গাড়োয়ানদের সঙ্গে কথা বলে। 'চৌধুরি ভাই চাকায় তেল শুকিচে!' গোরুরগাড়ির চাকায় শব্দ হয়। জল-বিনা ঢেঁকিতে পাড় দিলে যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমনি। চৌধুরি ভাই হাসে। ডানহাতের পাঁচটা আঙুল গোরুর পিঠে পেতে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কাৎ হয়ে।

'তমাকে চিনলমনি ত!'

'পুখুর থাকলে চিনতে, আমি পনা-ব্যাপারি, চারু!'

'অ রাধানগরে তমাকে দেখেচি, বক্সিদের পুখুরে তুমিই ত··· !'

'হুঁ! কেমন মাছ হোয়চে অদের পুখুরে?'

'খুব! গাঁতিজাল ফেলে দু-একদিন চিঙড়ি চুরি করতে পারি!'

চারু হেসে ওঠে। গাড়ির ওপর একরাশ আখ দেখে। এ-বছর এখনো আখ চিবোয়নি। চারুর গাঁয়ে তো আখের ক্ষেত তেমন নেই। তাছাড়া আখ চুরি করে খাবার লালসাও তেমন নেই। বড় হয়েছে। ছোটবেলায় আখ খাওয়া নিয়ে মারধোর খেয়েছে খুব। চৌধুরি পিছন ফিরে একটা আখ টানে। চারুর দিকে বাড়িয়ে দেয়। 'চাষের আখ, ইটা খাও তমরা!'

'ক-মণ গুড় হবে তমার!'

'এই ত দশ-গাড়ি আখ হোয়চে, আর দু-কিতা বাকি!'

চারু আখটা মাঝামাঝি ভাঙে। চৌধুরি গুড়ের পরিমাণটা বলতে গররাজি। তবে এ-বছর আখ ভালো হয়নি তার ইঙ্গিত দেয়। শেয়ালে প্রচুর আখ নষ্ট করেছে। মাঝখান থেকে চিবিয়ে ফেলে যায়, আখ শুকিয়ে কাঠ হয়। তবু আন্দাজ, সবে মিলে মণ দশেক গুড় হবে। চারু হাঁটে। রঞ্জিত গাড়ির চাকায় আঙুল দিয়ে বালি ঝরায়। ঢালের মাথায় এসে গাড়ি কাৎ হলেই মনে হয় উল্টে পড়বে। কিন্তু উল্টোয় না। গড়িয়ে-গড়িয়ে ঠিকমতো জায়গায় পৌছয়। সেখানে রাশিকৃত আখ, আখমাড়াইয়ের কল, গুড় তৈরি করা জ্বালা, বড় বড় উনুন রয়েছে একটা চালার তলে। আগুনের

হল্কা উঠছে, তার ওপর জ্বালায় রস ফুটছে টগবগ। রস গাঢ় হয়ে ক্রমে লাল হয়ে উঠবে, দানা বাঁধবে। চৌধুরির গাড়িগুলো একদিকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। কুলি-মজুর আখ নামাতে লেগেছে। বলদ দুটো ঘুরছে তো ঘুরছেই। একজন লোক আখগুলো নিয়ে দুটো দাঁতাল চাকার মধ্যে গুঁজে দিচ্ছে, রস গড়াচ্ছে ঝিরঝির করে। টিনটা রসে ভরলে জ্বালায় ঢেলে দিচ্ছে আরো একজন লোক। কিছু লোক রোদে বসে কথাবার্তা বলছে।

'চারু কেমন আছ?' একজন লোক জিজ্ঞেস করল। হয়তো তার কাছে পোনা নেয়। মনে রেখেছে। অপরিচিত লোকটি জিজ্ঞেস করল বলে চারুর আনন্দ।

'কুনুরকমে আছি আর কি!' কথাটা বলেই চমকে ওঠে। মায়ের কথাটির সঙ্গে যেন কোথায় মিল আছে। রঞ্জিত লক্ষ্য করে চারুর ভাবান্তর। কিছু বলে না। গোড়া থেকেই অবশ্য চারুর অস্বাভাবিক ভাবটা চোখে লাগে।

'একগ্লাস রস দাও ত চারুকে!'

লোকটির আখমাড়াই হচ্ছে বোধহয়। পরিচিত লোকদের আখের রস খাওয়ানো আখচাষিদের বাতিক। চারু বলল, 'এক গেলাস নয়, দু-গেলাস!' রঞ্জিত আর চারু আখের রস খেল। কিন্তু রস কিভাবে নিয়ে যাবে ভেবে পেল না। একদিকে বসে রইল দুজনে। অন্যদিকে কয়েকটি শিশু কুকুর বাচ্চা নিয়ে খেলা করছে। কুত্তিটা দাঁড়িয়ে বাচ্চাগুলোকে দেখছে। শিশুরা বাচ্চাগুলো ধরে রেখে কুত্তিটাকে শোয়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, শেষপর্যন্ত মারধোর করার ফলে পালিয়ে গেল কুত্তিটা। রস খাওয়া শেষ করে ঢেকুর তুলল রঞ্জিত।

'কিরে বস্ থাকবি?'

'ভাল লাগচেনি কিছু!'

'বসে থাকলে কুসুমকে নিয়ে এস্তে পারবি, চল গঞ্জের দিকে!'

বোরো বাঁধের ওপর দিয়ে নদী পার হলো। বাঁদিকের নদী শুকনো, ডানদিকে জলে থৈথৈ। নদীর জল মাঠের ওপর দিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। চাষীরা লাঙল নামিয়েছে বোরো চাষের জন্যে। মাঠে নেমে স্বচ্ছ জলে মুখ-হাত ধুলো দুজনে। গঞ্জে পৌছতে পৌছতে বেলা হয়ে গেল, তখন ঘাটের ধারে মজদুররা বসে বিড়ি ফুঁকছে। কোনো নৌকোই ভিড়েনি এসে। বোরো বাঁধের ফলে নদীর এ-দিকটাতে জল নেই। কোলাঘাট থেকে নৌকো আসছে

না। আজকাল আবার পথ-ঘাট হয়ে যাওয়ায় বেশির ভাগ মালই ট্রাকে আসে। জোয়ার আসবে বিকেলে, সে-সময় কাজ পাওয়া যাবে। চারু রঞ্জিতের ওপর ক্ষেপে উঠল।

'শুধুশুধু এতক্ষণ হাঁটালি!'

'হোয়চে টা কি! কাজ পেলমনি বিকাল বেলা পাব! না কাজ করলে তমার জুমবে কি করে। না জুমালে কুসুমকে পাচ্চনি!' রঞ্জিত বুড়ো আঙুল নাড়াল।

'উ আর কার-অ হবেনি।'

'হুঁ! কুসুমের বাপের খাঁই জাননি ত, নেশাও করে শুনেচি!'

'তায় হোয়চে টা কি?'

'খুব বিশ্বাস লয়! ঐ যে কণ্টাক্টেরি করে; চিন ত, কালই কুসুমকে কিনে লিতে পারে!'

চারু আর কোনো কথা বলে না, কাজ করতে হবে। সুখের আয়োজন করতে হবে। কুসুমের মতো একটা মেয়েকে বউ করে নিয়ে আসতে হবে ঘরে। তারপর···। সুখের জন্যে তো অনেক কিছুই করতে হবে। নন্দর বিয়েটাও মাথার ওপর। চারু নন্দর জন্যে কোনো টাকা নেবে না। এ-বছর অনেকগুলো টাকার বই কিনে দিয়েছে সে। নন্দ মন দিয়ে পড়াশোনাও করে। আজকাল গরিব ছেলেরাও তো লেখাপড়া শিখছে। দেখেশুনে নন্দর বিয়েটা দিতে পারলে হয়। পরের কথা পরে ভাবা যাবে। রঞ্জিত ও চারু শুকনো নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল—ঘাটের সিঁড়ি নেমে গেছে অনেক দূর। জোয়ার এলে ভরে উঠবে, নৌকো এসে নোঙর গাঁথবে বালির ওপর। সিঁড়ি আর নৌকোতে পাটা ফেলে বস্তা-বস্তা মাল তুলবে গুদামে। ছেঁড়া বস্তা থেকে ডাল কিংবা চাল ঝরে পড়লে গরিব-দুঃখী মেয়েরা কুড়োবে।

'আজ আর আসবেনি বুজলে দোস্ত।' সমবেত মজুরদের মধ্যে থেকে একজন হিন্দুস্থানি বলে উঠল। সে হয়তো ওদের কথাবার্তা শুনছে। চারু একবার তাকিয়ে কাছে গেল। একটু খোয়নি নিয়ে হাতের তেলোতে চটকাতে চটকাতে বলল, 'তুই থাক, কাল কাজ হয় নাকি খবর লিয়ে যাবি! আমি একটু আখের রস লিয়ে ঘরে যাই! মেজাজ ভাল নাই!'

'তা থাকবে কেনে? ···যাও···!'

ঘরে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। একটা মাটির হাঁড়িতে রস নিয়ে বোনের

কথা ভাবে। মাঠে মাঠে গরিব-দুঃখী মেয়েদের ধান কুড়োনো লক্ষ্য করে। কেউ কেউ গোছা গোছা ধানের শিষ নিয়ে মলে ধান ঝরাচ্ছে। হাতের তেলো লাল হয়ে উঠছে। এ তো আর খোয়নি নয়, রগরগে ধানের খোসা লেগে হাত যেন শুকনো জমির মাটি হয়ে উঠেছে। চামড়া ছড়ে গিয়ে লাল রক্তিম। নন্দ যদি এভাবে করে তাহলে বেচারির হাত কেটে একশা হবে। সারা মাঠে কাউকেই খুঁজে পেল না। কুসুমের হাতও এমন হবে, মায়েরও, আর যারা ধান কুড়োচ্ছে সবারই। এ তো আঁটি নয়, জট আছড়ে ধান ঝেড়ে ফেললেই হলো।. এসব কষ্টের কথা ভাবলে চারুর কষ্ট হয়।

ঘরের মধ্যে রসের হাঁড়িটা মাটির ওপর রাখে। নন্দ খুব খুশি হবে। চারু একটু গড়িয়ে নিয়ে ভাতের হাঁড়ি থেকে ভাত আর গতকালের মাংস নিয়ে পেট ভরাল। তারপর ঘুম। সে-ঘুম ভাঙল নন্দর চেঁচামেচিতে। চারুর মা খুব খুশি। আজ প্রায় এক চেঙারি ধান কুড়িয়েছে।

'বঝা মাথায় তুললেই শিস্ পড়চে অনেক!' চারুর মা বলল।

'ঋরে গেছে হয়ত!'

'তাই!'

চারু মায়ের এ-রকম খুশি-খুশি ভাব দেখে মজা পেল। নন্দর একটুও আনন্দ নেই। এ-বছর পিঠে-পার্বণে নতুন চালের অভাব হবে না। তাছাডা নবান্নের উৎসবেও চাল কিনবে না চারু। নন্দ পুকুর থেকে মুখ হাত ধুয়ে যা-হোক একটা শুকনো কাপড় টেনে মুছল। হাতের তেলো দুটো দেখে মুখ গোমড়া করে সরষের তেলের শিশি ঝেড়ে তেল নিয়ে মস্-মস্ ঘষতে থাকল। তীব্র দৃষ্টি মায়ের ওপর। মাকে কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারছে না। মায়ের সামনে চারুও বলতে পারছে না—'নন্দ আখের রস লিয়েসচি তোর তরে!' তাহলেই সব আনন্দে জল ঢালা হয়ে যাবে। চারুর তাই ফাঁক-ফোকর ছাড়া উপায় নেই। নন্দকে একদিকে ধরে নিয়ে গেল। চুপিচুপি কথাটা বলতেই নন্দ প্রায় আনন্দে নেচে উঠল।

নন্দর ঠোঁট ফেটে চৌচির হয়ে গেল, রক্ত ঝরল। সকালবেলা ভেসলিন লাগাতে ভুলে গেছে। সারাদিনে রোদ পেয়ে ঠোঁট যত শুকিয়েছে জিভ বুলিয়ে ভিজিয়েছে। তারপর ধানমলার সময় ধুলো, মাঠের ধুলো লেগে সে-এক অস্বস্তিকর অবস্থা ঠোঁটের। রক্তপাতে চারু দৌড়ে ঘরে যায়। ভেসলিন নিয়ে এসে লাগায়। চারুর মা চোখ বড়-বড় করে দেখে। রাগে গরগর

করে। ঘাটের দিকে হন হন করে চলে যায়। চারু নন্দর হাত ধরে লুকোনো রসের হাঁড়িটার কাছে যায়। হাঁড়ি চিড় বরাবর চুইয়ে রস গড়িয়েছে। অনেকখানি মাটি ভিজে গেছে। হাঁড়িটা কাৎ করে দেখল সামান্যই বাকি রয়েছে। মায়ের জন্যেও রস ছিল, এখন আর কুলোবে না। নন্দর মুখটা কালো হয়ে গেছে। চারু হতভম্ব। সব মুখই যেন শোষিত ফ্যাকাসে। গেলাসে ঢেলে দু-জনে দাঁড়িয়ে থাকে। কিসের শাসন অনিবার্যভাবে তাদের ওপর আরোপিত হয়ে যাচ্ছে। হাওয়া মুঠো করে ধরার মতো কিছুই ফললাভ হয় না। চারুর মা এক বালতি জল নিয়ে, ঝনাৎ করে আঙটাটা ছেড়ে কাঁচাপাকা চুলের গোছাটা বাঁধে।

'কত সুখ জীবনে, বিবি সাজাতে চায়!'

চারুর কেবল একটাই ভাবনা ঘোরে, 'কেনে সুখ পাবেনি সে?'

সে-সময় নন্দ ঠোঁটে আঙুল বুলোয়, দাদার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরের চালে বাঁশ কাটছে ঘুণ পোকা। মেঝের ওপর ঘুণ ঝরছে গুঁড়োগুঁড়ো। কুরকুর বাঁশ কাটার শব্দই নীরবতায় মুখর হয়ে উঠছে। কখন ধীরে ধীরে ঘরের তিনজনে নিজস্ব চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে। নিজ নিজ কাজে লিপ্ত হয়েছে। অভ্যাস তাদের হাতেপায়ে বেঁধে ফেলেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাঝে মাঝেই নড়েচড়ে ওঠে, কুসুম মরশুমি ফুলের মতো ফোটে, আশার মতো কখনোই ঝরে না। চারু ভাবে, 'আদত আমাদের খুব খারাপ!' দূরে রঞ্জিতকে আসতে দেখে। সুখের কথা আবার মনে পড়ে যায়। সেজন্যেই চারু দাঁড়ায়। বলে, 'খপর ভাল!'

সঙ্গীত দ্বান্দ্বিক

সুতপা ভট্টাচার্য

ছবি ও গান—এই দুই শাখায় নিজেকে প্রকাশ করা তাঁর "কবিতার সহজ প্রবৃত্তি"—'চৈতালী'র ভূমিকায় একথা জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাঙ্গীতিক মায়া যেদিক থেকে প্রত্যক্ষ হয় তাঁর কবিতায় তার সঙ্গে মেলে না 'বিষ্ণু দে-র কবিতার সঙ্গীতময়তা। তার কারণ শুধু এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বিষ্ণু দে-র কবিতায় সঙ্গীতের অনুষঙ্গ অনেক বেশি ব্যবহৃত, এই নয় যে রবীন্দ্রনাথে কেবল হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আর বিষ্ণু দে-তে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের টারমিনলজিও সমান প্রধান। কবিতায় সঙ্গীত-প্রয়োজনের ধারণাতেই পার্থক্যের মূল। যা কোনোমতে বলবার জো নেই—সঙ্গীত দিয়ে তা বলা চলে, অর্থবিশ্লেষে যা যৎসামান্য—সঙ্গীতে তাহ অসামান্য হয়ে ওঠে—রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এইভাবে এসেছিল সঙ্গীতের কথা ('সাহিত্যের তাৎপর্য', 'সাহিত্য')। বিষ্ণু দে ভেবেছেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে, তাঁর পথ দ্বন্দ্বময়তার (ডায়ালেকটিকস) পথ—"শিল্পী জানে, কবি জানে, যেহেতু প্রেমিকা তারা, তাই জানে। দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা" ('শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব', 'অম্বিষ্ট'), সঙ্গীত তাঁর কাছে —"বিরোধ সঙ্গীতে মাত্র সঙ্গত সার্থক উত্তীর্ণ সুষমা / স্বরে মেলে প্রতিস্বর মাধুর্যের বলবান ঝোঁকে" ('জীবনের চেয়ে শিল্পে', 'ইতিহাসের ট্রাজিক উল্লাসে') —বিরোধ অথবা দ্বন্দ্বময়তার রূপায়ণের প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গীতের ব্যবহার। বরং এদিক থেকে এলিয়টের সঙ্গে তাঁর মিল, Music of poetry প্রবন্ধে যে-ভাবে বলেছেন এলিয়ট—"The use of recurrent themes is as natural to poetry as to music. There are possibilities of transitions in a poem comparable to the different movements of a symphony or a quartet ; there are possibilities of contrapuntal arrangement of subject-matter." বিষ্ণু দে-র বড়ো কবিতাগুলিতেও দেখতে পাই বিষয়বস্তু সাজানো অন্যোন্য বৈপরীত্যে, বিবিধ বিষয়ের বহিরাশ্রয়ের মূলে একই থীমের পুনরাবৃত্তি।

বাইরের দিক থেকে বিষ্ণু দে-র কবিতায় দেখা যাবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের

মুভমেণ্ট-এর অনুরূপ চাল : অথবা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আলাপের ধরন যা স্পষ্ট হয় কয়েকটি পংক্তিতে কখনো বা পুরো স্তবক জুড়েই মুক্তদলান্ত শব্দের একই অন্তস্বরের আবর্তনে যেমন—

"শ্রাবণে সে সাতরঙা আবেগে আবেগে
পিকাসোর তুলিতে রেখায় রঙে রঙে রূপান্তর
রঙের সে-মুক্তি কেবা রোখে
মেঘে মেঘে লেগে ক্ষেতে ক্ষেতে ফেটে পড়ে
পাহাড়ে পাহাড়ে উত্তরোল দীঘির ছায়ায়
বানডাকা পাড়ে পাড়ে উদ্গ্রীব আকাশে
মাটির আসন্ন বেগে জলের কলনে
গ্রামান্তের শহরের বিদ্যুৎমন্থনে।" ('অন্বিষ্ট')

কিন্তু এহ বাহ্য। বিষ্ণু দে-র কবিতা-শরীরে সঙ্গীতের স্বভাব আরো নিগূঢ়। একই স্বরাবলি যেমন বিবিধ রূপে ব্যবহৃত হয়ে বিবিধ বিন্যাস রচনা করে, তেমনি বিষ্ণু দে বিশেষ চিত্রকল্পকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনেন, যদিচ ভিন্ন তাৎপর্যে, আবার সেই ভিন্ন তাৎপর্যগুলিও অন্বিত হতে থাকে এইভাবে। হেলেন গার্ডেনার এলিয়ট-সমালোচনায় যা বলেছেন, বিষ্ণু দে সম্বন্ধেও তা প্রযোজ্য—"One is constantly reminded of music by the treatment of images, which recur with constant modifications, from their context, or from their combination with other recurring images, as a phrase recurs with modifications in music." বিষ্ণু দে-র কবিতায় আবৃত্ত চিত্রকল্পগুলির ক্রমান্বিত বিস্তার আলোচনা করে এ-মন্তব্য বিশদ করা যায়। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনীকে দুদিক থেকে ব্যবহার করছেন কবি—১. ভগীরথ গঙ্গা এনে পুনর্জন্ম দিচ্ছেন সগর-সন্তানদের, ২. নদী এসে মিলছে সমুদ্রে। 'পূর্বলেখ'-এর 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় কেবলমাত্র প্রথমদিক থেকে সগর-সন্তানের উল্লেখ—"অন্ধকারে দিশাহারা জিজীবিষু সগর সন্তান।" দুটি দিক সংশ্লিষ্ট হয়ে ব্যবহৃত হলেও 'সাত ভাই চম্পা'র '৭ই নভেম্বর' কবিতায়, রাশিয়ার ঐতিহাসিক বিপ্লবের পটভূমিতে—

"শ্রমিকজনের
সাগর সঙ্গমে আজ উৎসৃজিত রুশ জনগণ!
তোমাদের ভগীরথ—বিশ্বব্যাপী সবারই লেনিন॥"

'সাত ভাই চম্পা' কবিতায় এলো 'কপিলমুনির দ্বীপ', আত্মানুসন্ধানের দ্যোতনায়, 'সন্দ্বীপের চর' গ্রন্থে 'সমুদ্র স্বাধীন' কবিতায় চিত্রকল্পটির পূর্ণ বয়ান দেখা গেল, কবিতার আদর্শসন্ধানের প্রেক্ষিতে :

"অথবা উপমা দেব
নীলকণ্ঠে, শিবের জটায় মন্দাকিনী সহস্র ধারায়
অলকনন্দায় গঙ্গায় পদ্মায় ভাগীরথী স্রোতে
বঙ্গোপসাগরে ধরা অধরার বেগ
অতল অতল মাটির পাতালে সগরমুক্তির
অগম্য সে কপিলগুহায়।"

'কপিল মুনির দ্বীপ' হল 'কপিলগুহা'; বোঝা যায় কবিতার প্রয়োজনে ভৌগোলিক তথ্যকে অতিক্রম করছেন কবি—গুহামুখেই যে ঘটে উৎসার—অন্ধকার থেকে আলোয় মৃত্যু থেকে জীবনে। এরপর 'অন্বিষ্ট' কবিতায় :

"কিংবা যেন বন্যা এক আসি
মহা আড়ম্বরে আর চলে যাই কোথায় প্রবাসী
চৈতন্যের কপিল সাগরে।"—

চিত্রকল্পটি বেদ্য হল "অর্থান্বিত হাজার শ্রুতিতে", এলিয়ট যাকে বলেছেন শব্দের সঙ্গীত, যার সৃষ্টি হয় দুই শব্দের ছেদবিন্দুতে। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এ এসে চিত্রকল্পটি প্রতীক হয়ে উঠেছে—"সবাই সবাই আজ খুঁজে পাক্ কপিলের গুহা" ('বহুবাড়বা'), 'ভাসুক হাসুক কপিলগুহায় অমৃত আষাঢ় হাজার সাগর" ('বারমাস্যা')। 'আলেখ্য' এবং 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত'-এ প্রতীকটি বহুল ব্যবহৃত।

নদী ও সমুদ্রের চিত্রকল্পের আবৃত্তি বড় অবিরাম বিষ্ণু দে-র কাব্যে, সমালোচকের অভিযোগ আছে এ নিয়ে (—যেমন দীপ্তি ত্রিপাঠী, তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়-এ।)

কিন্তু এ-আবৃত্তি কবির অনভিপ্রেত, তেমন অচেতন শিল্পী বিষ্ণু দে-কে বলা কঠিন। আসলে নদী যে সঙ্গীতের মতোই কবির কাছে দ্বন্দ্বময়তার ছবি নিয়ে আসে—

"হাজার বাঁকের পাকে গতির আবেগে
দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে ওঠে জেগে জীবনে তিস্তার
প্রাণের বিস্তার" ('সন্দ্বীপের চর')

"নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক

দুই তট উন্মুখর এক স্রোতে
সাদা হিম দূরে রেখে লবণাক্ত নীলের সন্ধানে
বালিতে পলিতে বানে
ঘাটে ঘাটে ডেকে ডেকে চর রেখে রেখে
সঙ্গীত দ্বান্দ্বিক" ;　　('অন্বিষ্ট')

নদীর চিত্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত করে অন্য চিত্রকল্পকে আরেকটি মাত্রা দিয়েছেন কবি অনেক সময়। এইভাবে "অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান" আবার—

"কিম্বা বুঝি মোহানার গান
হুগলীর নিস্তরঙ্গ সঞ্চয়ী মধ্যাহ্নে
পিছনে অনেক স্মৃতি বহুস্রোত
রূপনারাণের
দামোদর কাঁসাই হলদি রসুলপুরের
দূরের মাতলা মাথাভাঙা আরো দূরে পদ্মার বানের।" ('জল দাও', 'অন্বিষ্ট')

আবার সে আরেক নদী যে "নদীর উৎস যদি জানা থাকে জানাই তো থাকে" ("নদীর উৎস যদি জানা থাকে', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার')। কিন্তু সব নদীকেই তো শেষে সমুদ্রের বুকে আত্মদান করতে হয়, সমুদ্র—সেই সমষ্টির ছবি—যেখানে দ্বন্দ্বের উত্তরণ, ব্যক্তি যেখানে আত্মদানেই খুঁজে পায় আত্ম-পরিচয়। সমুদ্র—কবির আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ; তাই বহুমাত্রিক ব্যবহারে বারে বারে আসে সমুদ্র ; সমুদ্রেও আরেকভাবে সঙ্গীতেরই রূপ দেখেন কবি—

"ঢেউয়ে ঢেউয়ে অগণন ঢেউ
এক ও অনেক পর-পর গায়ে গায়ে
ওঠাভাঙা আয়োজন স্বরের বিস্তারে
একে মেশে অন্য এক···
সপ্তকের অন্যোন্য শ্রুতিতে ঢেউয়ে ঢেউয়ে মীড়বাঁধা অথচ স্পষ্টও
যেন এক মিয়াঁকি মল্লারে," ('নাম রেখেছি কোমল গান্ধার')

—এইভাবে, একাধারে দ্বন্দ্ব ও সংহতি—উভয়েরই রূপায়ণ ঘটল সঙ্গীতে, অন্যতম আবৃত্ত চিত্রকল্পে।

শুধু চিত্রকল্প নয়, শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারেও বিষ্ণু দে অর্থের বিস্তার ও গভীরতা এনেছেন। দুটি শব্দের প্রয়োগ বিশ্লেষণ করে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া

যেতে পারে। "উর্মিল" এবং "বীজকম্প্র" কবির দুটি প্রিয় শব্দ, এ-দুটি শব্দকে প্রথমে পাওয়া যায় পৃথকভাবে। 'সাত ভাই চম্পা'র 'কোডা' কবিতায়— অন্ধকারের বিশেষণ—"বীজকম্প্র সুনীল আঁধার", প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় আসন্ন সমাজের বীজকেই কম্পমান দেখছেন কবি অন্ধকারে। "উর্মিল" শব্দটি পেলাম 'সমুদ্র স্বাধীন' কবিতায়—

"নিয়ে চলো জীবনের নিয়ে চলি উত্তাল উর্মিল
প্রতিশ্রুত স্বপ্নবীজ অবিশ্রাম ভাঙনের সাগরসঙ্গমে"—

'আঁধারে'-এর ছবিতে যে-বীজ ছিল স্থিতিশীল, এবার তা গতিময় হল উর্মিতে উর্মিতে। 'চৈতে-বৈশাখে' কবিতায় "উর্মিল" শব্দটি স্পষ্টতই বিপ্লবের বিশেষণ —"মুক্তিস্নাত সামগান উন্মুখর উর্মিল বিপ্লবে/উন্মুক্ত সম্ভোগে"। এরপর 'অন্বিষ্ট'-এ এসে যখন "হাহাকার"-এর বিশেষণ-রূপে শব্দদুটি পেলাম পাশাপাশি, তখন সে হাহাকার কী অসীম ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠল :

"ওড়াও উর্মিল বীজকম্প্র হাহাকার, স্মৃতি
পাতো মর্মে মর্মে ভিতে ঘনিষ্ঠ সম্বিতে
তোমার নিথর দেহ প্রেয়সী জননী সখী সহকর্মী !
সৃষ্টিময় জীবনের সূর্যে সূর্যে পরাক্রান্ত গান।"

—তাই সম্ভব হল বর্বর নিষ্ঠুরতায় নিহত নিথর নারীদেহের স্মৃতির পাশাপাশি জীবনের পরাক্রান্ত গান। 'অন্বিষ্ট'-পরবর্তী কাব্যধারায় এ-শব্দ দুটি পৃথকভাবে বারবার ব্যবহৃত হতে থাকে, পূর্বপ্রয়োগে অর্জিত অর্থদ্যুতিতে কবিতায় আরেক মাত্রার সঞ্চার করে। 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'-এ 'পাতা ঝরে গান করে মনে আর বনে' কবিতাটিকে মনে হতে পারে নিছক প্রাকৃতিক, কিন্তু একটি বাক্যে সম্পূর্ণ একটি স্তবকে "বীজকম্প্র" শব্দটি যখন চলে আসে—"আর চলে পৌষমাঘের হিম হাওয়া, গাছে গাছে বীজকম্প্র/অবিরাম উত্তরের হাওয়া"—উত্তরের হাওয়াও "বীজকম্প্রে" বিশেষিত হওয়ায় কবিতাটি তখন আর বদ্ধ থাকে না মাত্র প্রকৃতি-বর্ণনার স্তরে। এইভাবে, "উষায় জাগাও উর্মিল হাওয়া সুভদ্র দিনে পাণ্ডু হাসি" ('বারোমাস্যা', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার') অথবা :

"রাত্রিতে সমুদ্রে মেশে মানবিক প্রথম নিখিল
আমরাও মন আর হাওয়া আর উর্মিল শরীর"

('সমুদ্ররেখা', 'আলেখ্য')

ইসব পংক্তিতে "ঊর্মিল" শব্দের অর্থও সম্পূর্ণ হয়, অথবা কবিতাকে সম্পূর্ণতা দেয় পূর্বলব্ধ অর্থ-বিস্তারের অন্বয়ে।

শব্দ, চিত্রকল্প, প্রতীক—এদের ব্যবহারে, একের সঙ্গে অন্যকে অন্বিত করে বিষ্ণু দে এইভাবে সৃষ্টি করেন অর্থের বহুবিধ স্তর। তাই ধ্বনিবিন্যাসে শুধু নয়, অর্থবিন্যাসেও সঙ্গীতময়তা সার্থক হয় তাঁর কবিতায়, 'পূর্বলেখ' থেকে 'নাম রেখেছি কোমলগান্ধার'-এ, কাব্যধারার ঋদ্ধতম পর্বে।

'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত' থেকে দেখা যায় বিষ্ণু দে-র কবিতা বাঁক নেবার মুখোমুখি। এ-কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতায় কয়েকটি মুভমেণ্ট-এ পূর্বে যা বিশেষ রূপের মাধ্যমে প্রকাশিত তাকেই সরাসরি বক্তব্যে পরিণত করছেন কবি। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর 'রথযাত্রা-ঈদমুবারক' নামে অসাধারণ কবিতাটির কাব্যব্যাখ্যা 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত'-এর শেষ অংশ; 'অন্বিষ্ট' কবিতায় রাজার মেয়েকে (৩ সংখ্যক কবিতা) ঘিরে রূপকথারই অনুষঙ্গ, আর 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতে'-এ "রাজার মেয়ে আজ আফিসে খাটে/রাজার ছেলে খোঁজে কাজ" প্রথমটির শেষ অংশ—

> "তাই এ এদিকে জ্বালানি কুড়ায় পাতা
> কাঠ কাটে আর কখনও বা দেয় আগুন
> আর ও ওদিকে একা গেয়ে গেয়ে মাতে
> দালানে দালানে—ফেটে পড়ে ফাল্গুন"—যেখানে সার্থক

কাব্য-রূপায়ণ, দ্বিতীয়টির শেষ অংশ—

> 'এরা যে ভালোবাসে, তাই তো ঘৃণাতে
> আগুনে জ্বালে দেহমন।
> এদের অভাবের অগ্নিবীণাতে
> জীবন পেল যৌবন"

—বক্তব্য মাত্র। কেন এমন হল? এমন তো নয় এ-কবিতায় কবির আততি অনুভব করাই যায় না? এর কারণ মনে হয় এই যে, এখানে এমন এক মধ্যম পুরুষ কবির উদ্দিষ্ট, যে কবির সঙ্গে এক সমতলে দাঁড়িয়ে নেই—"তোমরা নবীন, এ উদাস/বিষাদ কি তোমাদেরও চেনা?"—ফলে কবিতার স্বরে এসেছে পরিবর্তন। এই পরিবর্তিত স্বর কাব্যের আরো দু-একটি কবিতায় দেখা যাবে। 'ভাষা' কবিতা তার আর-এক নিদর্শন। কবিতার ভাষার কথা বলতে গিয়ে "শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব", "দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা" তাই

এখানে অনুচ্চারিত। দ্বন্দ্বের দিন যেন পেরিয়ে এলেন কবি—"ঘুম থেকে জাগা যেন রাত্রি আর দিন দ্বন্দ্বহীন" ('চড়ক, ঈস্টার, ঈদের রোজা')। হয়তো—তাই 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত' থেকে তার পরবর্তী কাব্যে সঙ্গীতময়তাও ক্রমশ অপনীত হল।

'সেই অন্ধকার চাই' কাব্যটি থেকে বিষ্ণু দে-র কাব্যধারা খাত পরিবর্তন করেছে। বড়ো কবিতা, যা বিশেষভাবেই সাঙ্গীতিক—এখন প্রায় অনুপস্থিত; ব্যতিক্রম—'শীলভদ্র পঞ্চমুখ'। কিন্তু এই কবিতায় সঙ্গীতের বহির্লক্ষণ মেলে মাত্র, মেলে হয়তো সিম্ফনির চাল, আলাপের চলন; সঙ্গীতের অন্তঃস্বভাব যে মেলে না—তা ধরা পড়বে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' বা তৎপূর্ববর্তী অন্য বড়ো কবিতার সঙ্গে তুলনা করলে। এ-কবিতায় সেইভাবে সম্পর্কিত হয় নি একটি চিত্রকল্প পাশাপাশি আরেকটির সঙ্গে, ধ্বনিত হয় নি অর্থের সঙ্গীত, নদীর ছবি খুব দীর্ঘ সময় ধরে প্রলম্বিত, এমনকি 'সমুদ্র' শব্দটি ব্যবহৃত যেন নদীরই প্রতিশব্দ রূপে, শেষ মুভমেন্ট-এ তেপান্তর হওয়া অরণ্যের নিরেট ইতিহাস—সুর খেলার মতো ফাঁক বড়ো নেই। সাধারণভাবেও 'সেই অন্ধকার চাই' এবং পরবর্তী আর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'সংবাদ মূলত কাব্য' এবং 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে'-র বাতাবরণই পৃথক (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় 'সংবাদ মূলত কাব্য'র 'ডানায়' কবিতাটির কথা)। একই শব্দ বা শব্দবন্ধের প্রায় স্তবক-জোড়া আবর্তন, স্বরধ্বনি, বিশেষত আ বা এ-র মতো খোলা স্বরের দীর্ঘ অনুপ্রাস, যমক,—যার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "সভীর অস্থির অস্থি বিশ্বময় দুহাতে ছড়ায়"—ইত্যাদি যা সব আগের পর্বে ছিল অবিরল—এ পর্বে তা প্রায় মেলেই না। ছন্দের দিক থেকে দেখা যায় এ পর্বে মাত্রাবৃত্তের মাত্রাপ্রয়োগে তত বৈচিত্র্য নেই, এবং অক্ষরবৃত্তের প্রয়োগে আগের পর্বের মুক্তদলান্ত শব্দের আধিক্যের পরিবর্তে এ পর্বে রুদ্ধদলান্ত শব্দের আধিক্য। বলা বাহুল্য, এ পরিবর্তন সূচিত করে—সঙ্গীতের প্রয়োজন কবির ফুরিয়েছে। এবং তা নিশ্চয়ই মাত্র প্রকরণগত নয়। আগের পর্বের কবিতায় বিষয় হতে বিষয়ান্তরে কবির ছিল অবিরাম যাওয়া-আসা—বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে, জীবন থেকে স্বপ্নে, হতাশা থেকে আশায়, সমাজ থেকে ব্যক্তিতে, নদী থেকে সমুদ্রে; সে আসা-যাওয়া সহজ হয় গানের টানে টানে। কিন্তু এই পর্বের কবিতায় হতাশার কথা হতাশাতে শেষ (দৃষ্টান্ত—'নির্জলাভূলোক', 'সংবাদ মূলত কাব্য'), আশার কথা আশাতেই ('পৃথিবীর মানবিক সব অভিলাষ', 'সেই অন্ধকার

চাই')। অথচ কবির প্রত্যয়ে যে ফাটল ধরে নি, তা প্রতীত হয় প্রতীকপ্রয়োগে অভিনবত্ব থেকে, সেই গরম বৃষ্টির বৈপরীত্ব, সেই কপিল-গুহা, সেই শারদীয়া অপর্ণা এখানে এসেছে ফিরে ফিরে। তাই মনে হয়, কবি শুধু টুকরো করে দিয়েছেন তাঁর সংহত প্রত্যয়কে, তাঁর মানুষের প্রতি ভালোবাসা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, বর্তমানের যন্ত্রণা স্বতন্ত্র হয়ে ছড়িয়ে গেছে ছোট ছোট কবিতায়। কেন এই ছড়িয়ে যাওয়া? দু-একটি কারণ নির্দেশ করাও যেতে পারে। প্রথমত, এলুয়ার এবং আরাগঁর মতো বিষ্ণু দে-রও প্রত্যয়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রেম—দম্পতির প্রেম—তাকে ঘিরে আর সব কিছু, কিন্তু 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত' থেকেই লক্ষণীয়, তাঁর প্রেমের কবিতায় চণ্ডীদাস বা দান্তের নাম আসছে; ফলে পরবর্তী পর্বে প্রত্যয়ের সেই কেন্দ্রবিন্দু যেন অপস্থত। দ্বিতীয়ত কবির আততির ছিলাও আর টানটান নয়, আমাদের রাজনীতি সংস্কৃতি সমাজ-জীবনের ঘনীভূত মন্দা হয়তো তার কারণ।

'সংবাদ মূলত কাব্য' গ্রন্থে 'নদীকে চেন তুমি' কবিতায় নদীর চিত্রকল্পে আপন মানসজীবনের পরিণতি ব্যক্ত করেছেন কবি। আগে যে নদী "ফুলে ফুলে প্রচণ্ড আবেগে" দুই কূলে ছিল দ্বন্দ্বময়, যে নদীতে ছিল দামিনীর উদ্দামতা অথবা শ্রীবিলাসের যন্ত্রণা, সে এখন;

> "অঘ্রাণের অপরূপ প্রখর আকাশে
> স্বচ্ছ নদী, উপরে ও তলে তলে প্রায় এক,
> সোনাখচা বালিদেখা সূর্যের মতন
> স্রোতে স্রোতে মাছ খেলে, সারসেরা মন্থর উৎসাহে।
> আজকে সে যৌবনের বন্যা এক বিশুদ্ধ হৃদয়।"

আবেগের এমন অবসান ঘটেছে বলে, কবি অনেক কবিতায় নিজের কথাই বলেন 'সে'-র ভূমিকায়, আবার অনেক সময় প্রথম পুরুষই হয় তাঁর উদ্দিষ্ট, তার ফলে কবিতার স্বরভঙ্গীতে এক ধরনের নির্লিপ্তি ফুটে ওঠে, যা সঙ্গীতময়তার বিপরীত।

তাই কবির এখনকার কবিতায় নাটক অনেক নিরেট। 'অন্বিষ্ট'-র 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' "স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত'-এ নেমে এসেছিল বাস্তবের কঠিন মাটিতে, তারাই আরো মূর্ত হয় 'অঞ্জন ও রঞ্জনা' নামে, 'সেই অন্ধকার চাই' কাব্যে। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যে কিছু কবিতায় দেখেছি ব্যক্তির জীবননাট্য কীভাবে ব্যাপ্ত হয় সঙ্গীতের নৈর্ব্যক্তিকতায় 'দিনগুলি, রাতগুলি'

কবিতায় মহিম, রহিম, সুরেশ, অনামিক খনিমজুর-শিল্পী—এদের সবার বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা অবিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে তোলে যেন এক "অর্কেষ্ট্রা বিরাট" ; কিংবা 'পাঁচপ্রহর'-এ মা ও মেয়ের নাট্য-সংলাপ 'চণ্ডালিকা'র অনুষঙ্গে কবির আপন স্বরোৎসারিত "আনন্দের অসীম রেশ" নিয়ে মিলে যায় শেষে "কোয়ার্টেট যেন কোনো অতন্দ্রিত অপরাজেয় গ্রোস ফুলের তানে"। 'সেই অন্ধকার চাই' থেকে নাটক এভাবে আর নীত হয় না সঙ্গীতে। 'মাঝরাতে বাপ ফেরে' অথবা 'পোলিং স্টেশন' —'সংবাদ মূলত কাব্য' বইটির এইসব কবিতা তার দৃষ্টান্ত। বরং নাটক এখন যেন অনেক সময় সঙ্গীতের ভূমিকা নেয়। 'চেনা মুখের আদল' ('ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে') কবিতায় একটি বিশেষ নাট্য-মুহূর্তে দেখি চেনা মুখে ধরা পড়ে "বাংলার আপ্লুত আদল", অমনি এক মুহূর্ত সৃষ্টি হয় 'এদের যে মনে হওয়া' ('সেই অন্ধকার চাই') কবিতার প্রথম স্তবকে, পরের স্তবকগুলিতে তার সূত্রে বক্তব্যের প্রসারণ। তাই তখন কবির চোখে "প্রতিটি সকাল বরযাত্রী" ('কোনও যুক্তি নেই', 'সংবাদ মূলত কাব্য') অথবা 'রৌদ্র-বৃষ্টি' 'পৃথিবীর প্রথম প্রেমিক' ('বৃষ্টি বিষয়ক টুকরো চিন্তা, 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে')।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় এইভাবে এক ঋতুবদল লক্ষ্যগ্রাহ্য হয়। হয়তো আবার আসবে আরেক নতুন ঋতু, আমরা হাতে পাবো কিছু তুলনাহীন কবিতা। "দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ধন্য" এই কবি সৃষ্টিমুখর আজও।

"অসম্পূর্ণের যন্ত্রণা যাবে কোনকালে, সে কোন অভ্যাসে ?
দুর্বোধ একালে অমানুষিক বিচ্ছেদ এই একাত্মের, মানুষে মানুষে।"
('বৈরাগ্যে বিধুর,' 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে')

এ-প্রশ্নের উত্তর-অন্বেষণ কবির চিরকালীন।

গর্ভিনী গাঙ দক্ষিণের ঝড়

মুকুল রায়

কৌখালির গাঙ। দক্ষিণের চিরশত্রু পিয়ালীর সাথে যোগ। কখন কি ঘটে স্বয়ং ঈশ্বরও জানে না। তবুও সবাই পণ্ডিতকে পাকড়ায়। বলে, একটি বার বলি দাও হে পণ্ডিত, ঠিক করি বলো, অনুমান করি কও কেমন বারিপাত হবে ইবার!

অনুমান! পণ্ডিত অস্থির হয়ে ওঠে। অনুমান বড় খারাপ। সুন্দরবনের আকাশে যে জমাট বাঁধা কালো মেঘ। তবে যে এত রক্ত দিলোম? রক্তের দাগ রয়েছে এখনও মাটির উল্টো দিকে। নিজের জমি নিজে চাষ করলোম। শেষকালে কিনা পরকিতিই আঙ্গারে ডুবাবে। পরকিতির কাছে হার মানব পণ্ডিত!

গাঙভেড়ির উপর থেকে নিজের জমিটুকু দেখল পণ্ডিত। এপারে কৌখালির ভয়ঙ্কর গাঙ। রোষে ফুঁসছে। মাত্র কদিন আগে তো অনেক লাশ ভেসেছিল ওখানে। জমির লড়াই। লাঙল যার জমি তার। সে কেমন পণ্ডিত? ফকির শুধিয়েছিল। রাতের অন্ধকার ভেঙে খানখান করে সমস্ত সুন্দরবন যেন আর্তনাদ করে উঠল। সারা রাত-দিন লাঙলের ফলাগুলো মাটিকে চিরে চিরে খানখান করল। তবু মেঘ। তবু দুর্যোগ। ভগবানের অভিশাপ—না, পণ্ডিতের অনুমান এর কোনোটায় সায় দেয় না। সাতদিন আগে সেই যে জমির আলের কিনারায় রক্তমাখা সূর্যখানা ডুবে যেতে দেখেছে পণ্ডিত, সে আর ওঠেনি। সাতদিন আকাশ ভরা শুধু ধোঁয়া। জমাট বাঁধা কালো।

আনমনে নিবিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছিল যমুনা। ফকির কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক-একবার তাকিয়ে দেখছিল যমুনাকে, যেমন করে জমিতে লাঙল দেবার সময় আকাশ অথবা ভরাগাঙকে দেখে। গর্ভবতী ভরা গাঙও এমনি উথলে ওঠে কোটালে কোটালে। লাঙল ঠেলতে ঠেলতে মাঝে মাঝে পণ্ডিতকে বলে, জমি· বটে তুমার পণ্ডিত। এমন নরম দেখতে লাঙলের ফলাখানা ক্যামন তর তর করে এইগে চলেছে। ভাগ্যবান বটে পণ্ডিত। এমন জমি যার ফকিরের চোখে সেই তো প্রকৃত ভাগ্যবান। সুন্দরবনের

প্রায় সকলেই ফকিরের মতো। তবুও ফকির সুখী। বিড়িটা মুখে রেখেও টানতে ভুলে গেছিল ফকির। কখন যে নিভে গেছিল। থু থু করে সেটাকে মুখ থেকে ফেলে দিয়ে ফকির আনমনে নিজের কথাগুলো বলছিল। বিড়িটা নির্ঘাৎ গত-রাতের বৃষ্টির ছাটে সেঁতিয়ে গেছিল। অনেকগুলো কাঠি খরচ করে আর-একটা বিড়ি ধরাল ফকির। মনে মনে যমুনার রূপ আর গর্ভের প্রকৃতি দেখে তারিফ করল। হ্যাঁ, পণ্ডিত সুখী বটে। আরও সুখী হবে পণ্ডিত যখন ঘরে একটা ফুটফুটে বাচ্চা জন্মাবে পণ্ডিতের। সে কেমন হবে। পণ্ডিতের মতো অমন করে কি ফকিরকে ভালোবাসবে।

যমুনার দৃষ্টি ছিল অন্যকিছুতে। হেঁসেলের পিছনে একধারে কতগুলো ভাঙা হাঁড়িকলসি ছাইগাদার ওপরে জড়ো করা। বহুদিন থেকে একটা পেঁপেগাছের চারা উঠি উঠি করে উঠতে পারছে না। ছাইগাদার এক ধারে গর্ভিনী বিড়ালটা দিনরাত শুয়ে থাকত। মাত্র দুতিনদিন হ'ল ওর অনেক গুলি বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাগুলোকে সযত্নে তুলে রাখে মাদী বেড়ালটা। পুরুষ বেড়ালটা খাবার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে। আজ আর ওদেরকে দেখতে পেল না যমুনা। না দেখা অবধি বুকের ভেতরে একটা অদৃশ্য যাতনা অনুভব করল। তবে কি গতকাল রাতে খটাশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল না সত্যিসত্যিই কাল ঝড়ের টানে ওরা হয়তো···। এক-একদিন ওকে উদ্দেশ্য করে ফকির বলে, শালীর কাণ্ড দেখ পণ্ডিত। খেতি পায় না বিয়োতি পারে।

পণ্ডিত অমনি করে বলত, এই সুন্দরবনের মাটিও ছেল অমনি। যিদিন গঙ্গার গভ্‌ভ থেকে উঠেছিল। এখন এসব কথা ঠিকমত বিশ্বাস হয় না। মাটি দিন দিন কেমন তেজ হারিয়ে বন্ধ্যা হয়ে আসছে। একটা না একটা অভিশাপ বা দুর্যোগ ফি বছর লেগে রয়েছে। এখন কেবলই মনে হয়, এ মাটি বড় শয়তান। এর ভেতরে পাপ রয়েছে। না হলে এত খুনখারাপিই বা হবে কেন।

একটা শুকনো নারকোল পাতা গত রাতের ঝড়ে উড়ে পড়েছে পণ্ডিতের উঠোনে। আগাটা মাটির ভেতরে গেঁথে গেছিল। ওটাকে তুলতে গিয়ে কাঁটার মতো কি যেন বিঁধল। তাকাতেই চোখে পড়ল একটা যমরাজ স্বচ্ছন্দে বাইছে। বড় জাতের কালো সোঁয়াপোকাকে যমরাজ বলে ওরা। গায়ে লাগলে আর রক্ষে নেই। ভাগ্যি যমুনার গায়ে ওঠেনি। ফকির আশ্বস্ত হল।

ফসলের গন্ধ পেয়েছে বুঝি। ফসলের গন্ধে যত রাজ্যির বিষাক্ত পোকারা

এসে ভিড় করে। ফকির বলে, আসলে এগুলো হল যমরাজের দূত। ফসল নয়, শুধু মানুষের প্রাণটুকু খেতে এসেছে। ঠিক মাইবিবির হাটের মহাজনদের মতন। ফসলের গন্ধ পেয়ে এসে ভিড করে। দুহাত ভর্তি টাকা। যত খুশী ন্যাওনা কেন। আস্তে আস্তে সব কিছু বিকোতে থাকে। ফসলের গোলা, খেতখামার মায় বাস্তভিটেটুকু। এ-অভিজ্ঞতা ফকিরের নতুন নয়। বাঁহাতে যমরাজকে কায়দা করে ধরেছিল ফকির।

মাটির নীচেয় পুঁতি ফেল, সোনা হবে।

তা বটে। ফকিরের মন সায় দেয়। যমরাজকে কবর দিলে সোনা ফলে।

গাঙের জলে ভাসিয়ে দাও ফকির। এবার সুন্দরবনের ফসল নয়, যমরাজের চরগুলো চালান হবে শহরে, তবু ফকিরের মায়া হয়, প্রাণ বটে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা মনে পড়ে। মাইবিবির আকাশ কেন লাল। রাতের অন্ধকারে আকাশ এমন লাল হয় কি করে। আলো নয়, আগুন। আগুন লেগেছে মাইবিবির হাটে। গোলা পুড়ছে। সর্বনাশ। এর চেয়ে সবনাশের আর কি আছে পণ্ডিত? ফকিরের স্বর কাঁপছিল। এ কাজ কে করল। কে আবার। যমরাজের চর। এবার সব ফসল চালান হয়ে যাবে শহরে। উঁহু তা হয় না। সবাই রুখে দাঁড়াল। লাঠি সড়কি বল্লম দা কুড়ুল নিয়ে সবাই ছুটে চলল। এ-গোলা আমাদের।

পুলিশ গুলী আর মানুষের আর্তনাদ। সে দৃশ্য ফকিরের চোখের সামনে ভাসে আজও। আজও ফকির তাকালে দেখতে পায় মাইবিবির আকাশের আগুন আর ধোঁয়া। কৌখালির গাঙ মানুষের রক্তে লাল।

যমরাজকে মাটির নীচেয় কবর দিল ফকির। পণ্ডিত ঠিকই বলে। এখানে মাটির নীচেয় অনেক সোনা রয়েছে। খুঁড়লে হয়তো সোনার খনিও মিলতে পারে। লাঙল টানতে টানতে অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন জাগে ফকিরের মনে। অনেক জমিদার আর দস্যুর লুন্ঠিত দ্রব্য এখানে মাটি নীচেয় পোঁতা। এক একদিন লাঙলের ফালে রত্নের বদলে নরকঙ্কাল ওঠে। ফকিরের কোন পূর্বপুরুষের কঙ্কাল বুঝি। সুন্দরবনের মাটির কথা কেউ সঠিক বলতে পারে না।

যমুনার গর্ভের দিকে চেয়ে কোনো কিছুই অনুমান করতে পারে না ফকির। কেমন অতিথ আসছে পণ্ডিতের ঘরে।

একদিন পণ্ডিত হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দিল, এখানে মাটির নীচে নাকি তেল পাওয়া গেছে। অবিশ্বাস্য হলেও পণ্ডিতের মুখের এই কথায় সকলে

অবাক হয়েছিল। এমন সৌভাগ্য কি এখানকার মানুষের কপালে আসবে। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলো। এবার তো ঘর-বাড়ি সব ছাড়তি হবেক। খনি হবেক। যন্ত্রপাতি বসবেক।

তাহলি তো চাকরি পাবো। চাকরি ফকিরের দুটো স্তিমিত চোখও, অন্ধকারে বিড়ির আগুনের মতো জলজল করে উঠল। চাকরি মানে নিশ্চয়তা। নিশ্চয়তা মানেই তো সুখ—যা সুন্দরবনে মানুষের জীবনে এখনও আসেনি।

উঁহু, চাকরি মানেই দুঃখ। পণ্ডিতের মুখে হাসির বদলে মেঘ, কপালের সেই ভয়ঙ্কর রেখাগুলো ফুটে উঠল। দাসত্ব। সেতো এখানকার মানুষের ধাতে নেই।

তবে এই ভাল। সকলেই মত পাল্টাল।

বড় বড় যন্ত্র এসে বসল রাইদীঘি আর কঙ্কনদীঘির মাঠে। কৌখালির গাঙ হল উদ্বেল। মাটি কাঁপল। ব্যস। ঐ পর্যন্তই। সুন্দরবনের মানুষ যেমন ছিল তেমনিই আছে। ফকির হতাশ হয়ে আকাশ পানে চাইল। আকাশে মেঘ। রোদ নেই। সূর্য বুঝি আর উঠবে না।

একটা কেন্নো কুণ্ডলী পাকিয়ে দাওয়ার একধারে পড়েছিল। যমুনা কেন্নো দেখলে কেমন করে। ঘিন ঘিন করে গায়ের ভেতরটা। উঠোনটা জলে কাদায় এখনও পিচ্ছিল। সতর্ক করে দিয়েছিল ফকির। উঠোনে নামলে পা হড়কাতে পারে। পা হড়কালে একটি প্রাণের নির্ঘাৎ মৃত্যু। হা ঘরে শামুক একটা দেয়ালের ধার বেয়ে বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করছিল। অন্যদিন হলে ফকির হয়ত ওটাকে তুলে আছড়ে ফেলত। কিন্তু আজ যেন ফকির কোনো কিছু নষ্ট করতে পারছে না। পণ্ডিতের ঘরে নতুন অতিথ আসছে যে।

পণ্ডিত এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। মানুষটা যেন ফকিরের কাছে রহস্যে ভরা। এ-রহস্যের চাপডাটা তুলে ফেলতে পারছে না ফকির। লাঙলের তকতকে ধারাল ফলাখানা ওখানে এসেই ঠোক্কর খাচ্ছে কেবল। যমুনাও ফকিরের চোখে আজীবন রহস্য। এ-রহস্যের কিনারা করতে পারে না। নিজের জীবন রহস্যের মতো মেঘের অন্তরালে ঢাকা থাকে। কেবল দূরে থেকে একটা জীবন ফকিরকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তখন এ-জীবন ছেড়ে পালাতে চায় ফকির। কেবল যমুনার উত্তাল যৌবন, কৌখালির ভরা গাঙের মতো পণ্ডিতের জীবনের সার্থকতা ফকিরকে পিছু টানে। মাত্র কদিন আগেও পণ্ডিতের সাথে গাঙভেড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে দেখেছিল ফকির। কৌখালির অতবড় গাঙ

শুকিয়ে খটখট করছে। গরুর গাড়িগুলো এখন সচ্ছন্দে ওপার থেকে ধান-চাল এপারে নিয়ে আসছে। নৌকো ডোঙাগুলো উপুড় করা একধারে পড়ে রয়েছে।

এবার কাটরা চাষ সুবিধের নয় পণ্ডিত। দেখতেছনি গাছগুলি পর্যন্ত শুইকে লাল। আসেপাশে কোথাও একটা পুকুর পড়ে না চোখে। খরা নির্ঘাৎ। এবার খরায় হয়তো অর্ধেক লোকই মরে যাবে। আকাশে শকুন উড়ছে। তবুও পণ্ডিত কেমন নির্বিকার। ফসল এবাব ফলবে, তা যেমন করেই হোক। খবরের কাগজে পড়ে পণ্ডিত—মানুষের মরণের আয়োজন সম্পূর্ণ। চারিদিকে বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হচ্ছে। সে-গ্যাস পৃথিবীর হাওয়ায় মিশে মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে এসে ঢুকছে। খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটছে। তবুও মানুষ বেঁচে রয়েছে।

এত ঝড় ঝঞ্ঝা দুর্ভীক্ষ মহামারী তবুও সুন্দরবনের মানুষ মরেনি। কেবল যাতনায় ছটফট করে। গত রাতের যে ভয়ঙ্কর যাতনার অভিজ্ঞতা হ'ল পণ্ডিতের, এ-অভিজ্ঞতা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে পণ্ডিত। এ-অভিজ্ঞতা চাষীর জীবনে নতুন নয়। ফকির জানতে চাইছিল, মানুষের মতো মাটিরও বুঝি গর্ভকাল রয়েছে। তখন মাটি ফুলে-ফেঁপে ওঠে, তাই না!

পৃথিবীর সব রহস্য পণ্ডিতের জানা নেই। লোকে বলে সুন্দরবনের ভেতরে অনেক রহস্যই রয়েছে। তার সবটুকু এখনো মানুষই পারেনি খুঁজে বের করতে। তবুও যেটুকু পারে অনুমান করে পণ্ডিত। ফকিরকে অনেক কথা শোনায়। ভূমিকম্প কি জানিস? উঁহু মাথা নাড়ে ফকির। যেটুকু জানে তা হল সর্পরাজ বাসুকি কাঁধ বদলায়। এসব আজগুবি কথা। সুন্দরবনের মানুষ অনেক আজগুবি কথায় বিশ্বাস করে। মেয়েমানুষের মতো মাটিরও আছে গর্ভকাল, ভূগর্ভের নিচেয় ধরিত্রী জননীর শিরা-উপশিরায় রক্তের প্রবাহ। আগ্নেয়গিরির কথাও পণ্ডিতের মুখে শোনা। মৃত আগ্নেয়গিরি আর সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। মাটির গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে অফুরন্ত লাভাস্রোত, মাটির তাজা রক্ত। অনেক নতুন পৃথিবী জাগে আবার ডুবে যায়। এমনি করে হয়তো সুন্দরবনটাই জন্ম নিয়েছিল। এসব পণ্ডিতের কাছে শোনা।

এবারেও সকলের অনুমান ব্যর্থ করে পণ্ডিতের কথাই ফলল। খরা নয় প্লাবন। উপচে উঠল গাঙ। বান ডাকল কৌখালি গাঙে। সারাদিন সারা রাত আকাশ জুড়ে গহিন কালো মেঘ। দক্ষিণের প্রবল ঝড়। কিন্তু এসবকেও তুচ্ছ করেও যমুনার গর্ভে প্রাণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠল। বলো দিকি পণ্ডিত তোমার ঘরে কে আসতেছে, নর না নারী!

এ-প্রশ্নের সঠিক সমাধান জানা ছিল না পণ্ডিতের। নর অথবা নারী, অথবা নর। মানুষের এই অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের কিনারা কোনো চাষীই করতে পারে না। গাঙভেড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে একটি যাতনাকে উপলব্ধি করতে চায় পণ্ডিত। যমুনার গর্ভে যে আসছে তাকে না চিনলেও তার অস্থিমজ্জা নিজেরই রক্ত দিয়ে গড়া। তবুও পণ্ডিতের বুকে আশঙ্কা জাগে। এমনি আশঙ্কা জাগে ফসল তোলার মুখে। মাইবিবির হাটে মহাজনের ভিড়। পণ্ডিত জানে কিসের আশায় ওরা ভিড় করে।

উঠোনের কাজ শেষ করে দাওয়াতে উঠে এল ফকির। যমুনা খুঁটিতে হেলান দিয়ে একধারে বসেছিল। ফকির আরও একটা বিড়ি ধরাল। পণ্ডিতের আজ দেরী হচ্ছিল ফিরতে। হয়ত কোনো নতুন খবর নিয়ে আসবে আজ। কৌথালির গাঙ হয়তো উপচে উঠেছে। পণ্ডিতের খেতের ফসল নষ্ট করেছে। এসব দেখেশুনেও পণ্ডিত নির্বিকারভাবে হয়তো বলবে, এসব তো নতুন নয়। এ যেন পণ্ডিতের অনেক আগেই জানা ছিল। পণ্ডিত ফিরে না আসা অবধি বেরোতে পারে না ফকির।

বিশেষ এ-সময় যমুনাকে একা রেখে যাওয়া নিষেধ। অগত্যা দাওয়ায় বসে জাল বুনতে লাগল ফকির। মাছ কোথায়! সুতোর লাটাইটা পাক খেতে খেতে ওঠা নামা করছিল। গত বছর এসময় যমুনাকে নিয়ে একসাথে খালে কত মাছ ধরেছে ফকির। এ-বছর মাছের দেখা নেই। সব যেন নিমেষে উধাও হয়ে গেছে। গোটা সুন্দরবনের ওপরেই যেন এবারে কোনো অপদেবতার দৃষ্টি পড়েছে। যমুনার চোখে মুখে গতরাতের যাতনার চিহ্ন। সেদিকে না লক্ষ্য করেই ফকির আপন মনে বলছিল, গেল রাতে স্বপ্ন দেখলোম পণ্ডিতির ঘরে অতিথ এয়েছে। কি ফুটফুটে অতিথ গো।

যমুনার হাসি পেল। স্বপ্ন নয় অনুমানে বুঝতে পারে যমুনা আর দেরী নেই।

ফিরে এল পণ্ডিত বেশ বেলা করেই। ফকির অনুমানে বুঝতে পারল আজ পণ্ডিতের মেজাজ ভালো নয়। তবে কি কৌথালির গাঙ উপচে উঠেছে। পণ্ডিতের গাম্ভীর্য ফকিরের কাছে বড় ভয়ঙ্কর লাগে। মানুষটা যেন কেমন। কেবল লোকের দুর্ভাগ্যটাই চোখে দেখতে পায়। এক-একদিন রাগ হয় ফকিরের। ইচ্ছে করে মানুষটাকে অস্বীকার করে। সকলকে ডেকে চেঁচিয়ে শোনায়, পণ্ডিতের সমস্ত কথাই মিথ্যে, সুন্দরবনের সুদিন আসতেছে।

কি দেখেল পণ্ডিত, কৌখালির গাঙ বুঝি সুবিধের লয়।

পণ্ডিত নীরব। অগত্যা ফকির দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে এল। যাবার আগে পণ্ডিতকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, তাহলি একবার স্বচক্ষে দেখি আসি পণ্ডিত।

ঘর থেকে বেরিয়ে অনেকটা রাস্তা হেঁটে গেলে দেখা যায় কৌখালির গাঙভেড়িটা। ওপারে পাথরপ্রতিমা এপারে মোল্লার-চক। মাঝখানে গাঙ। জমির আল ধরে ধরে হাঁটতে হয়। যাবার পথে অনেকের সাথে দেখা হয়। সকলের সাথে কথা বলে না ফকির। আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গাঙভেড়ির ওপরে এসে ওঠে। পণ্ডিতের অনুমান ঠিকই। জলে থৈ থৈ গাঙ। ভেড়ির কানায় কানায় জল।

কি দেখতিছিস ফকির!

দেখতিছি বাঁধ কবে ভাঙবে! সেদিন মাকির প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিয়েছিল ফকির।

মাকি, ফকিরের প্রতিবেশীনী, যুবতী খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, বাঁধ ভাঙলি তোর কি রে?

সব জমি যে জলে ডুবে যাবে।

যাক না কেন। মাকির হাসিটা সবসময় বুঝতে পারে না ফকির। গাঙের ধারে সে মাছের সন্ধানে আসে। ফকিরকে দেখলেই ছুটে আসে। বলে, দে গো একটা বিড়ি দে।

মেয়েছেলের বিড়ি খাওয়া পছন্দ করে না ফকির। বলে, তুই বিড়ি খাস কেন রে?

উত্তরে মাকি বলে, বেশ করি খাই, তোর তাতে কি। তুই কি আমারে বে করবি!

মাকির এই প্রগলভতা ফকিরের ভালো লাগে। এক-একদিন মনে হয় পণ্ডিতকে শুধায়। শুধিয়ে দেখে জমির মতো মেয়েছেলের মনের কোন খবর রাখে কিনা পণ্ডিত। শুধানো হয়নি। তার আগেই মাকি বলেছিল, তুই আমারে ঘরে লিবি ফকির?

ঘর তো আমার নাই। উত্তর দিয়েছিল ফকির।

তবে চল কুথায় পাইলে যাই।

পালাতে চাইছিল ফকির। সুন্দরবনের হাওয়া তেমন সুবিধে নয়।

শহরের অনেক খবর রাখে পণ্ডিত। এখান থেকে ফি-বছর অনেকেই পালিয়ে যায় শহরে। সেখানে গতর খাটালে পয়সা আসে। মাকিকে নিয়ে সুখে থাকতে পারবে ফকির।

ফকির-এর সে-সাধ মেটেনি। তার আগেই সে পালিয়ে গেছিল শহরে। কেউ বলে মাকি নাকি কৌখালির গাঙে ডুবে গেছে। কেউ বলে মাইবিবির হাটে চালের লরিতে করে সে চালান হয়ে গেছে শহরে।

গাঙের মুখোমুখি দাঁড়ালেই ফকিরের মনে পড়ে সে কথা। দুঃখ হয়। এ-দুঃখ বেদনার কথা পণ্ডিতকেও বলতে পারে না ফকির। এ-জীবন কেমন যেন বিস্বাদ লাগে। এর চাইতে মাকিকে নিয়ে ঘর বাঁধলে মন্দ হতো না। পণ্ডিতের মতো তার নিজের জীবনে হয়তো খানিকটা সুখ খানিকটা আশা উঁকি দিত।

এখনও বিকেল হলেই, বিশেষ করে হাটবারে মাইবিবির হাটে এসে দাঁড়ায়। লাট আবাদ অঞ্চল থেকে ডোঙা বোঝাই ধান চাল কাঠ মধু বোঝাই হয়ে আসে। গাঙ ভেড়ির সড়কে দাঁড়িয়ে থাকে সারবাঁধা লরি। ওদের কাউকে কাউকে ফকির চেনে। ওদের সাথে কথা বলে। শহরের হালচাল। ওরা বলে, সুন্দরবনের সেরা মধু কোথায় মেলে বলতে পারো? ফকিরের রক্ত চনমন করে, বিশেষ করে মাকির কথা ভেবে। এখন কেউ কোথাও নেই। মাইবিবির হাটের চালাগুলো ফাঁকা। ফকির বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। আজ রান্নার পালা বুঝি তারই। পণ্ডিতের ঘরে যখন অতিথ আসবে।

অনুমান মিথ্যে নয়। ফিরে এসে দেখল ফকির পণ্ডিত উদাস নয়নে আকাশ পানে তাকিয়ে বিড়ি টানছে আর যমুনা দাওয়ার একধারে ধাঁদলা বিছিয়ে টান হয়ে পড়ে রয়েছে। এমন দিনে পণ্ডিতের এই উদাস ভাবখানা ফকিরের মনঃপুত হয় না। বলে, রাখো তুমার অনুমান পণ্ডিত, আগে পেট ভরি খেয়ে নাও দিকি। নতুন অতিথি আসতেছে ঘর সাজাও। পোয়াতিরে একটু আমানি খাইয়ে দাও।

হেঁসেলে গত রাতের পান্তা ভাত ঢাকা ছিল। নিজে হাতে বের করে আনল ফকির। পণ্ডিতকে নিয়ে একরকম জোর করেই বসল খেতে। খেতে খেতে বলল, আজ বেলাবেলি রান্না সেরে নেব পণ্ডিত। বিকেলে বোধ-হয় আবার শুরু হবে। গতকাল বিকেল থেকেই ঝড় উঠেছিল। ফকিরের

আজও তাই অনুমান। দাইবুড়িকে বলি রেখেচ তো ?

পণ্ডিত তেমনি নিরুত্তর। ফকির, আই দেখ, তুমি না চাষা পণ্ডিত। কেমন করি ফসল তুলতি হয় তাও তোমাকে বলতি হবে।

আকাশে হঠাৎ একটা আওয়াজ হতেই দুজনে চমকে উঠল। নড়ে চড়ে উঠল যমুনা। বিনা মেঘে বজ্রপাত কি বলো পণ্ডিত। উঁহু মেঘ তো ছিলই। উপমাটা মনঃপুত হল না। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা কেন্নো তরতর করে যমুনার ঝাঁদলায় বাইছে। ওটাকে মুঠো করে নিয়ে বলল, এত কেন্নো জন্মায় কি করে বলতো পণ্ডিত ? একটু ঝড়ের দোলায় চালের বাতা থেকে টপাটপ ফলপাকড়ের মতো ঝরে পড়বে। পচা খড় থেকেই ওগুলো জন্মায়। যেমন জন্মায় রাশিরাশি কোঁড়ক, কেউ বলে ব্যাঙের ছাতা। যমুনা ওগুলি ভালোবাসে খেতে। এক-একদিন চালের ওপরে উঠে ওগুলি তুলে আনে ফকির। যমুনার সামনে ফেলে দিয়ে বলে, ভাল করি প্যাঁজ-রুশুন দিয়ে করো দিকি। খেয়ে পণ্ডিতকেও তারিফ করতি হবে।

তারিফ করে ফকির নিজেও। বলে, আঙ্গাদের আঁধুনিটে কিন্তু পাকা কি বলো পণ্ডিত। যমুনা হয়তো খুসি হয়। ফকিরের খাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে মনে হাসে, হাসে পণ্ডিতও। তুই একটা রাঁধুনি আনলিই পারিস। ফকির খুসি হয়। মাকির কথাটা সাথে সাথে মনে উদয় হয়। একথা ওরা কেউ জানে না তাই বুঝতে পারে না ফকিরের হাসির পিছনে কতটুকু ব্যথা বিদ্যমান। ফকির দেখে সহসা আকাশের মেঘগুলি যেন সচল হয়ে উঠেছে। এ-বজ্রপাত হয়তো তারই সূচনা। এক্ষুনি শুরু হবে তোলপাড়। আকাশ মাটি গাছ পালা একাকার হয়ে উঠবে।

অনুমান মিথ্যে হল না। দুপুর থেকেই দক্ষিণের ঝড় উঠল। সর্বনেশে ঝড়। হু হু করে রাশিরাশি মেঘ উড়ে এসে আঁধার করে ফেলল আকাশখানা। এ যেন যুদ্ধের আগে রণসজ্জা। ফকির ভয় পেল। ভয় পেয়েছিল পণ্ডিতও। সুন্দরবনে এ-দুর্যোগ নতুন নয়। তবুও আজ দুজনেই দেখে এসেছে কৌখালির গাঙ ভরপুর। আজ হয়তো উপচে উঠবে। ঝড়ের বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে। একটু আগের থমথমে গাছপালাগুলো যেন সহসা তাড়া খেয়ে সজাগ হয়ে উঠল। পণ্ডিত, তুমার অনুমান বুঝি ফলবে। আকাশের দিকে চেয়ে ফকির আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল। সন্ধের কাছাকাছি সময় সত্যিসত্যি ভেঙে পড়ল আকাশখানা। পণ্ডিত কিসের আশঙ্কায় ক্রমশ কঠিন হয়ে আসছে। তাকানো

যায় না। কি যেন এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ফুটে উঠছে মুখে। দক্ষিণের ঝড় বড় সাংঘাতিক। পণ্ডিতের মুখে শোনা কথা। ঘন ঘন বাজ পড়ার শব্দে ঘরের ভেতরে কেঁপে উঠল যমুনা। তবে কি এমনি দুর্যোগের মুখে সে আসবে।

সত্যিই বুঝি গর্ভের ভেতর কেঁপে উঠল আতঙ্কিত প্রাণ। একটু আগে পণ্ডিতের ঘরখানাই ঝড়ে দুলছিল। এখন দুলুনি থামলেও বৃষ্টির ঘায়ে কাঁপছিল। চালের খড় ভেদ করে দু-একজায়গায় বৃষ্টি টপছিল। শীত-শীত করছিল যমুনার। হঠাৎ মনে হল দেহটা ভেতর থেকে যেন কেঁপে উঠছে ক্রমশ। পণ্ডিত একধারে বসে মালসায় ফুঁ দিয়ে আগুন ধরাচ্ছিল। ফকির সেই আগুনে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে বলল, গতিক সুবিধের লয় গো পণ্ডিত। এতক্ষণে সব একাকার হয়ে গেল। পণ্ডিত নিরুত্তর। হয়ত এ-ভয়ঙ্কর প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজে না পেয়েই নিরুত্তর। সন্ধে থেকে রাত অবধি এমনি সকলেই নিরুত্তর। শুধু মাঝে মাঝে আকাশে বাজ পড়ার শব্দ হচ্ছিল। কখনও কখনও গাছের ডাল ভেঙে পড়ার শব্দও কানে আসছিল। এদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ফকিরের। শুধু সে কান খাড়া করে শুনছিল গাঙের জল উপচে ওঠার শব্দ। কারও চোখে ঘুম নেই। দুর্ভেদ্য অন্ধকার রাত। যমুনার শীত বাড়ছিল। ক্রমশ সমস্ত দেহ অবসাদে নিথর হয়ে আসছিল।

মাঝরাতে অস্পষ্ট ঘুমের ভেতরে কি এক আর্তনাদ শুনে জেগে উঠল পণ্ডিত। মিথ্যে নয়। সত্যিসত্যিই যাতনায় কাৎরাচ্ছিল যমুনা। বাইরে দুর্যোগ সমানেই চলছে। ফকির ঠিকই বলছিল, পণ্ডিত নির্ঘাত দেখি নিও. আজ তোমার অতিথ আসবে।

পণ্ডিত বুঝল এ-যাতনা গতরাতের মতো অলীক নয়। সত্যিকারের মাটির গর্ভযাতনা অনুভব করেছে পণ্ডিত। মাটি নয়, এবারে যথার্থই মানুষের গর্ভ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য আকুতি অনুভব করে পণ্ডিত। ভাঙা হ্যারিকেনের আলোটা প্রায় নিভে আসছিল। পণ্ডিত পলতেটাকে তুলে দিতেই কেঁপে উঠল আতঙ্কে। বাইরে আবার কাছাকাছি কোথাও বুঝি বাজ পড়ল। সমস্ত দেহটাই যমুনার কেঁপে উঠে কুঁকড়ে আসছিল। কেন্নোর মতো নিজের দেহটা নিয়ে কেবলই কুণ্ডলী পাকাচ্ছিল সে। কৌখালির গাঙের ওপার থেকে যেন অসংখ্য মানুষের আর্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল পণ্ডিত। বাঁধ ভেঙেছে বুঝি, এত-দিনের প্রতীক্ষিত আশঙ্কা তাহলে ফলেছে। যমুনার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠছে। পরণের কাপড়টাও বুঝি একধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে।

গর্ভিনী গাঙ আজ উত্তাল। পণ্ডিত স্পষ্টই অনুভব করল নতুন প্রাণ আসছে। কিন্তু কেন? সুন্দরবনের আকাশে বাতাসে যেন শয়তানের বিষাক্ত নিঃশ্বাস। ঝড় নয়। এ যেন লক্ষ কোটি শ্বাপদের হিংস্র আস্ফালনের মতো কৌখালি গর্ভিনী গাঙের বুকে এসে আছড়ে পড়ছে।

আগড় ঠেলে বাইরে এল পণ্ডিত। ফকির বাইরের কুটুরীতে জেগেই ছিল। পণ্ডিতের আওয়াজ পেয়ে বাইরে এল। অন্ধকার ঘোর। মুখোমুখি দাঁড়িয়েও পণ্ডিতের মুখের চেহারা অনুমান করতে পারল না। কেবল বলল, তাহলি অতিথ আসতেছে পণ্ডিত। দাইবুড়িকে খবর দিই। অন্ধকারে তালপাতার সার্দিটা মাথায় চাপাল ফকির। একটা লাঠি নিয়ে উঠোনে পা বাড়িয়ে একবার থমকে দাঁড়াল। আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিকে দেখল চারিদিকে জলের স্রোত। তুমি ঘরে যাও পণ্ডিত, আমি এক্ষুনি আসতিছি।

অন্ধকার বড় দুর্ভেদ্য। পৃথিবীর যাবতীয় অন্ধকার যেন আজ পণ্ডিতের উঠোনে এসে জড়ো হয়েছে। পণ্ডিতের অনুমান হয়তো ঠিক। কৌখালির গাঙও বুঝি বাঁধ ভেঙেছে। চারিদিকে তাই এত জলের শব্দ। মানুষের চীৎকারও বুঝি শোনা যাচ্ছিল। দক্ষিণের ঝড় সমানে বইছে। ফকিরের সর্বাঙ্গ ভিজেছে। তবুও ফকির অন্ধকারে এগিয়ে চলল। এক হাঁটু জল ঠেলে হাঁটতে অসুবিধে হয়। তবুও ফকির এগিয়ে চলে। ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে রাস্তার উপরে এসে পড়েছে। ওগুলি সরিয়ে দিয়েও এগিয়ে চলল ফকির। এত দুর্যোগ এত অন্ধকারের বুক চিরেও মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় পথ দেখতে পেল ফকির। আর সময় নেই। যেমন করেই হোক এক্ষুনি দাই বুড়িকে নিয়ে ফিরতে হবে, না হলে পণ্ডিতের অনুমান সত্যি হবে। বড় দুর্যোগ। কোনো ফসলই হয়ত চাষীর ঘরে আসবে না। এত যে রক্ত, সব ধুয়েমুছে নিয়ে যাবে শয়তানী কৌখালির গাঙ। প্রকৃতির কাছে ঘটবে মানুষের পরাজয়। ফকির নিজের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে সে পরাজয় ঘটতে দেবে না।

দুটি কবিতা

শামসুর রাহমান

কী ক'রে লুকাবে ?

কী ক'রে লুকাবে বলো এই সব লাশ ?
এই সব বেয়নেট-চেরা
বিশ্রম নাপাম-পোড়া লাশ ?
এ-তো নয় বালকের অস্থির হাতের
অত্যন্ত প্রমাদময় বানানের লিপি,
রবারে তুমুল ঘ'ষে তুললেই নিশ্চিত
মুছে যাবে। অথবা উজাড় ঠোঙ্গা নয় মিষ্টান্নের
কিংবা খুব ক্ষ'য়ে-যাওয়া সাবানের টুকরো
অথবা বাতিল স্পঞ্জ দূর
ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই বেবাক
চুকে বুকে যাবে।
কী ক'রে লুকাবে বলো এত বেশি লাশ ?

জানতে কি তোমরা
এত লাশ আপাদমস্তক মুড়ে ফেলবার জন্যে
ক'হাজার গজ
লাগবে মার্কিন,
পোড়াতে ক'মণ কাঠ ? ভেবেছিলে এই সব লাশ
গাদাগাদি মাটির অত্যন্ত নিচে পুঁতে রাখলেই
অথবা নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিলেই
তোমাদের হত্যাপরায়ণ
দিনরাত্রি মুছে যাবে বিশ্বস্মৃতি থেকে।
যখন রাস্তায় জঙ্গী জীপ ছুটে যায়,

আগলে দাঁড়ায় পথ মৃতদের ভিড় সবখানে—
নিরস্ত্র নিরীহ যারা হয়েছে শিকার
মেশিনগানের, মর্টারের। অশ্বারোহী
যেন ওরা, হাওয়ায় সওয়ার,
আবৃত সুনীল বর্মে, পেতে চায় করোটির ট্রফি।

আদালতে সরকারী দপ্তরে
বেরোয় দেয়াল ফুঁড়ে অবিরল গুলিবিদ্ধ লাশ,
ঝুলে থাকে গলায় গলায়।
দোকানি সম্মুখে মেলে দিলে
কাপড়ের থান,
আলোকিত মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে লাশ,
যেন বা লুকিয়ে ছিল কাপড়ের ভাঁজে।
অথবা বিদেশী প্রতিনিধিদের ভোজসভায় হঠাৎ
প্লেটে ডিশে চিকেন স্যুপের পেয়ালায়
ন্যাপকিনে নিহত পুরুষ নারী শিশু
উদ্ভিদের মতো লেগে থাকে সারাক্ষণ,
রক্তাক্ত নাছোড়।

কী ক'রে লুকাবে বলো এত বেশি লাশ
শোকার্ত মাটির নিচে, গহন নদীতে ?
২।১০।৭১

গেরিলা

দেখতে কেমন তুমি ? কী রকম পোশাক আসাক
প'রে করো চলাফেরা ? মাথায় আছে কি জটাজাল ?
পেছনে দেখতে পাবো জ্যোতিশ্চক্র সন্তের মতন ?
টুপিতে পালক গুঁজে অথবা জবরজং ঢোলা
পাজামা কামিজ গায়ে মগডালে একা শিস দাও
পাখির মতন কিংবা চাখানায় বসো ছায়াচ্ছন্ন।
দেখতে কেমন তুমি ?—অনেকেই প্রশ্ন করে, খোঁজে

কুলুজি তোমার আঁতিপাঁতি। তোমার সন্ধানে ঘোরে
ঝানু গুপ্তচর, সৈন্য, পাড়ায় পাড়ায়। তন্ন তন্ন
ক'রে খোঁজে প্রতি ঘর। পারলে নীলিমা চিরে বের
করত তোমাকে ওরা, দিত ডুব গহন পাতালে।
তুমি আর ভবিষ্যত যাচ্ছ হাত ধ'রে পরস্পর।

সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি, দুঃখ-তাড়ানিয়া,
তুমি তো আমার ভাই, হে নতুন, সন্তান আমার!
২২।১০।৭১

তবু জ্বালামুখ খোলে না কিছুতে

তুলসী মুখোপাধ্যায়

জ্বালামুখ খোলে না কিছুতে—কিছুতে খোলে না
অতল পাতাল ফেড়ে বেরিয়ে আসে না প্রজ্জ্বলিত লাভা—
পৃথিবী বিধ্বংসী অমোঘ আগ্নেয় প্রপাত।
জ্বালামুখ খোলে না কিছুতে—হায়! কিছুতে খোলে না।

যদিও হাজার চিতার আগুন বহ্নিমান প্রখর জ্বালায়
তীব্র ফণার মতো সমুদ্ধত ঘৃণা ও ধিক্কার
অবিরাম ফুঁসে উঠছে সংহার মূর্তির মতো ক্ষমাহীন ক্রোধ
যদিও ভেতরে ভেতরে প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত -
তবু কী স্থাণুর মতো দিবানিশি নিদারুণ বশ্য হয়ে আছি
কাপুরুষ খাতক যেমন মহাজনপুরুষের পায়ে সমর্পিত।
আর পায় পায় স্বেচ্ছাচারী ঘাতকের প্রমত্ত শাসন
মাইল মাইল শস্যক্ষেত্রে পরাক্রান্ত লালসার লাশ
পতিতালয় ক্রমে ঘিরে ফেলছে ফুলের বাগান
প্রকাশ্য দিবালোকে বাদুড় ও বাদুড়ীর প্রজনন লীলা!

তবু জ্বালামুখ খোলে না কিছুতে—কিছুতে খোলে না।

ঢোল-সহরৎ

স্বদেশ সেন

চোখের চামড়া এবার বোয়ালের দাঁতে রেখে এসেছি
ইঁদুরে অন্ধকারের খোলে এখন ঠাশ দিয়ে গোবরমাটি গড়বে :
আসা হোক একজন, দুজন, তিনজন ক'রে।
আমরা মানে হাপরের কজায় চ্যালা কাঠ
যেমন বঁড়শিতে উড়ুক্কু মাছ
গল্পের শেষের নটেগাছটি।
সে যাই হোক—এবার বেনেবাড়ির মচ্ছব শেষ
ঘুনঘুনে রাশ চলবে না সম্বৎসর
এই আমরা শেষবার কুয়োর জলে হাত ধুয়ে নিলাম, নিয়ে
ডিক্রি জারি করে যাচ্ছি। এই শেষ ঢোল-সহরৎ। এই রইল
কোম্পানির ঝাণ্ডা। সাধু সাবধান

ছ'ড়ে যাওয়া পুরনো ঘায়ে রিলিফ-বাম বেশ চালিয়ে গেলে কিন্তু!
নীতি-কথার মেল-মেলায় কোন কোণা থেকে আসছে মোদো গন্ধ
সেইটেই আজ আমরা জানতে চাই।
আতুরালয়ের পাছ-দুয়ারে যে নিটপিটি হদ্দ চোরগুলো থাকে
ওদের আমলকীর মতো কেউ না কেউ আমাদের ঝুলিতে তুলবে ;
এবার ফুল বললেই কেউ মূর্চ্ছা যাবে না, নকল দাঁত যে একটু বেশি সাদা
সেটা আমরা যাবার আগে কনুই দিয়ে বুঝিয়ে দেব ;
ধুল-পুরনো কংক্রিটের বইগুলোয়
একটা ক'রে দরজা জানালা বসিয়ে দিও হে মিস্তিরি।

তারপর সেই জগঝম্প তালে কোন ঢুলী বাজাবে জয়ঢাকটা—বাজাও ;
ধুনো দিয়ে, সিঁদুর মাখিয়ে, ফুল-বেলপাতা ছড়িয়ে
ডাক দিলেই
একজন, দুজন, তিনজন ক'রে এসে পড়ব।

ইচ্ছেগুলো উর্বর মাটিতে বোনা হোলো

সত্য গুহ

আমরা উদ্ধার চাই নারকীয় পরিবেশ থেকে
মরু হরিণের মতো রুটি রূপা শিকারের শেষে পুণ্য স্নেহের ছায়ায়
অক্ষত মুখশ্রী নিয়ে সন্তানের ঘরে ফিরে আসা প্রতিদিন
আমাদের রক্তের প্রত্যাশা
আমাদের সাধ আর জীবনে বয়স ডাকা বাসন্তী মেয়েরা
বুকের গোপন কথা ঝর্ণার সমান ব'লে যেতে
আড়াল নির্জন খুঁজে উজ্জ্বল নক্ষত্র রেখে মুখোমুখি সন্ধ্যার আঁধারে
হৃদয় রাজার কাছে বলুক দাখিব পারে গঙ্গার কিনারে কিনারে
ফুলবনে একান্ত নির্জনে সারা অস্তিত্বেই শিহরণ তুলে
ন্যান ক'রে প্রতিদিন ছন্দপ্রজাপতিদের খুশি
এই সব প্রেমভালোবাসা আমরা সাহিত্যে চাই এবং দেখতে চাই, আহা,
আমরা গর্বিত চোখে রূপশ্রী ও ঘরে
শিশুরা সর্বাঙ্গে মেখে পোশাকের চেয়ে স্নিগ্ধ সোনাসোনা ধূলো—ঘাস—ঘ্রাণ
পৃথিবীর খুশি সব ব'য়ে নিয়ে সমবেত গানে
হাত ধরাধরি ক'রে অনন্ত আলোকে যায় চ'লে

নরকে বসন্ত আসে শরৎ ঋতুও নাকি অরুণ চরণ ফেলে ঘাসে
উৎসব ঘোষণা দিয়ে যায়, আমাদের দুঃখ, বুঝতে পারি না
পরণকথার গল্পে মুখ শুকনো ক'রে রোজ বসে থাকা ছেলেমেয়েদের
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী দিলেন খুব উত্তপ্ত সন্দেশ
তবু মুখশ্রী উতাল দেয়া হাসি নাই খুশি ঝরা নাই
আমরা দেখতে চাই বাস্তব জীবনে
চাঁদের বুড়ির ভিটে আলো ক'রে আকাশের তারার অধিক সব শিশু
নতুন গল্পের তরে পাণ্ডুলিপি আয়োজন ক'রে ব'সে আছে
আবেগে থথর কাঁপে কুঁড়িতে জোনাকি-শোষা নির্মল শিশির

এবং আমরাও
অর্থাৎ আমি ও শিউলি আকাশবাণীর শেষ রবীন্দ্রসঙ্গীতে গলা মিলিয়ে তখন
সুরের ভেতর দিয়ে দেখতে ইচ্ছুক
লালকমল নীলকমল সহযোদ্ধা দুই ভাইয়ে মিলে
দাঁতাল রাক্ষসগুলো হত্যা ক'রে রক্তক্লান্ত ঘুমিয়ে পড়েছে
অনন্ত ময়দান মধ্যে, গগনবীথির ফুলে ঘ্রাণে ঘাস ধ'রে গেছে এবং বাতাস

আহা যদি হয়—এরকম যদি দেখা হয়
তখন কে নরনারী ঘুমোতে যাবার কথা কল্পনায় আনে
আমরা তো বাঁধন সব ছিঁড়ে ফেলে তক্ষুনি ছুটে চলে যাব
জীবনের অভ্যন্তরে—অত্যন্ত গভীরে আর আত্মহারা আনন্দে আবেগে
যে যেখানে ঘরগেরস্ত, সবাইকে ডাক দিয়ে এনে প্রত্যেকের পাশে
হাতে হাতে সবাই একযোগে
নরককুণ্ড সাফ করতে লেগে যাব—বড় সাধ, এরকম হয়
কুশল প্রশ্নের শেষে বলি ভোরবেলা
'এখন দারুণ ব্যস্ত—সাংঘাতিক কাজ চারদিকে
এখন তো উৎসব সমারোহ (কিছু প্রিয় হাসি লাগে ঠোঁটে)—তাই—'
এবং ইচ্ছেই হবে যামিনী রায়কে তাঁর শিল্পের ভেতরে গিয়ে ধ'রে
অকৃত্রিম আব্দারের সুরে শুধু সন্তানের উৎপন্ন উৎসবে ডেকে আনা
এই কথা ব'লে
'আপনাকেই এক উঠোন আল্পনা কেটে দিতে হবে'

এখন সময় হোলো, আমাদের ইচ্ছেগুলো এখন বুঝি বা কিছু উর্বর মাটিতে
বোনা হোলো।

বৃষ্টির ভিতরে বৃক্ষ হয়ে

দীপেন রায়

আনন্দ এখানে বড় একা একা !
অমাবস্যার রাতে সারাক্ষণ অন্ধকার এমন নিশ্চুপ
আকাশপ্রদীপ যে কেউ জ্বালালে জ্বলে কিন্তু হৃদয়ের তাপ।
মিছিলের এত সঙ্গ স্লোগানে উত্তাল—ফিরে এসে
তবু কার কাছে কড়া নেড়ে চুপচাপ
হাওয়ার ভিতরে হাত রেখে বাঁচা সে কি এমন কঠিন
ভাবতে হয় কথা মেরে মেরে—উত্তাল জ্বালিয়ে নিজে
জ্বলে যাওয়া যে আনন্দে
এমন উৎসব কেন হয় না প্রতিদিন মানুষের নিজের ভিতরে !

বলো কোনদিন সে কোন দরজা থেকে
ডাক দিয়ে সমুদ্রের গর্জনের মতো
মাতাল হাওয়ার মধ্যে মাথা খুলে এলোমেলো চুলে
ভাসাবে দক্ষিণ আমার যৌবনের : আমি যার হাতের মুঠোয়
এই শূন্যতার থেকে ভরা মাঠ ফসলের মতো
হাওয়ার নিঃশ্বাস নিয়ে সোনা মুখোমুখি
তালসুপুরির মতো খাড়া মানুষের কোদাল ও নিড়ানি হাতে
রূপকার যে রূপশিল্পীর দেওয়া রাজন্য মানুষ
মাটিতে পা ঠোকে
আমি তার অবিচ্ছেদ্য ধারাজলে
আবাল্য খরার বিরুদ্ধে চাপ অন্ধকার মাটিকে উলটিয়ে
খুঁজি প্রতিষ্ঠা জীবনে দূর নদী থেকে জল আলো টেনে
এবং বলেও দাও বাঁচো আর বাঁচার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ
ভাঙো তাকে চাঙড় ওলটানো মাটি
যে ভাবে গুঁড়োয় সাদা ধুলো হয়ে বিস্তীর্ণ পৃথিবী।

আনন্দ এখানে বড় একা একা—
সে কেন খোলে না তবে
তার ওই হৃদয়ের আকাশ পাতাল—
না আমি চাই না পেতে সিকিভাগ উদাসীনতায়
কোন পুরাতন স্মৃতিপত্রের ক্ষতিকর ভবিষ্যতে
মাথা দিতে রাজী নই
　　　　　　না পেলে সম্পূর্ণ স্বদেশ,
বৃষ্টির ভিতরে বৃক্ষ হয়ে ভিজে যাচ্ছি আমূল প্রস্তাবে।

মা-র কাছে

প্রশান্ত রায়

জ্যোৎস্নার আঁচলে বিযাক্ত অঙ্গার
কোল পাতো মা—বুকের গভীরে তৃষ্ণা—এই ছাখো
আমার ছুচোখে নিদাঘ-পোড়া জমির চৌচির ফাটল
মাগো, শান্তি দাও, চোখ বেয়ে ঘুম—

ওঃ! চোখ বুঝি ছিঁড়ে পড়ে
কানে আনে দাঁতে দাঁত পেষা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর
বর্শার মতন শাণিত
গূঢ় ষড়যন্ত্রের ঘাই　　　এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়
আমার চলার পথ
ভাইয়ের হৃৎপিণ্ডের রক্তে পিছল···

এখন বিক্ষুব্ধ শিরা-উপশিরায় গর্জে ওঠে
সিংহের কেশরের মতন সোনালি সাহস
অঘ্রাণের উদাত্ত ধানের মতন সত্তার নিবিড় খাঁজে খাঁজে
।বছসার নৃশংস কীট কোথায়?

মা, তোমার উজ্জ্বল মুখ স্মরণ করি:
আমার উত্তপ্ত স্নায়ুতে স্নায়ুতে　　　কোষে কোষে
চন্দনের মতন শীতল সুরভিত অনুভূতি·· তোমার
পবিত্র আঙুল!

বন্ধ্যা বামপন্থার বিপর্যয়

গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবাঙলার বিধানসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল গভীর বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার নেতৃবৃন্দ যদিও সংখ্যাধিক্য লাভ সম্পর্কে প্রথম থেকেই দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করে এসেছেন তথাপি তাঁদের মধ্যেও যাঁরা খুব আশাবাদী তাঁরাও এই বিপুল সাফল্যের কথা ভাবতে পারেন নি। অপরদিকে বামফ্রণ্টের নেতারাও সংখ্যাধিক্য লাভ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। তাই মাত্র ২০টি আসন লাভ তাঁদের বিমূঢ় করেছে। বামফ্রণ্টের নেতাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই ধরনের বিপর্যয় ঘটা নিতান্তই অসম্ভব। নির্বাচনের ফলাফল দেখে তাই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে নির্বাচনে কংগ্রেস দল আমলাতন্ত্র ও পুলিশের সহযোগিতায় ব্যাপক কারচুপি ঘটিয়ে নির্বাচনের ফলাফল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার অনুকূলে এনেছে। "সৎভাবে অবাধ নির্বাচন'' হলে এখনও ফলাফল তাঁদের পক্ষে যাবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এই নির্বাচনকে বাতিল করে পুনরায় নির্বাচনের দাবি তুলেছেন। মোদ্দা কথা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা যে-রাজনীতির ভিত্তিতে সংখ্যাধিক্য লাভের সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছিলেন তাকে এতই তাঁরা নির্ভুল বলে মনে করেন যে নির্বাচনের ফলাফল যতক্ষণ না তাঁদের সংখ্যাধিক্য এনে দিতে পারে ততক্ষণ তাঁদের বিচারে কোনো নির্বাচন "সৎ ও অবাধ'' হতে পারে না।

ভোটে সর্বব্যাপক কারচুপির অভিযোগ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার আগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যে-রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন তা বিচার করে দেখা সঙ্গত। কারণ নির্বাচন একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম। রাজনীতি ভুল থাকলে নির্বাচন যতই "সৎ ও অবাধ'' হোক না কেন ভরাডুবি থেকে কোনো দলকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা প্রথম থেকেই এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে আসছেন যে ভারতবর্ষে বিপ্লব তো দূরের কথা এমনকি কোনো প্রগতিশীল পরিবর্তন আনার দায়িত্বও একমাত্র তাঁদের পার্টির উপরেই এসে পড়েছে।

এখনও উপসর্গের মতো অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি আছে বলেই তাঁদের সঙ্গে ঐক্য করতে হচ্ছে। এই উপসর্গগুলির অবসান যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনের আগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা প্রথমে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে আসন বণ্টনের প্রশ্নে একটা সমঝোতার প্রস্তাব তোলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের নিয়ে একটা বামপন্থী মোর্চা গড়তে রাজী হন। ইতিমধ্যে তখনকার কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলাকংগ্রেস গড়ে উঠেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাকংগ্রেসকে মোর্চার অন্তর্ভুক্ত করে তাকে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মোর্চার রূপ দেবার প্রস্তাব করে বাংলাকংগ্রেস ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই এই আওয়াজ তুলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বাংলা-কংগ্রেসকে মোর্চায় নিতে কার্যত অস্বীকার করেন। ফলে কংগ্রেসবিরোধী বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নীতিনিষ্ঠ অবস্থান থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক, বলশেভিক পার্টি ও বাংলাকংগ্রেসের সঙ্গে মোর্চা গঠন করে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অন্য ১৬টি বামপন্থী দলকে নিয়ে মোর্চা তৈরি করে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা নিশ্চিত ছিলেন যে সমস্ত কংগ্রেসবিরোধী মানুষের সমর্থন পেয়ে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেন। "কংগ্রেসের বি-টিম" বাংলাকংগ্রেসের সঙ্গে মোর্চা গঠন করে কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বলশেভিক পার্টি নির্বাচনে দারুণভাবে পরাজিত হবে। নির্বাচনের ফলাফল কিন্তু তাঁদের হিসাবের বিপরীত হল। বাংলাকংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের মোর্চা অপর মোর্চার চেয়ে বেশি আসন লাভ করল। সমগ্র নির্বাচনী প্রচারে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এই মোর্চাকে প্রগতিশীল জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য জঘন্য কুৎসা ও অপপ্রচারের আশ্রয় নিয়েও তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারে নি। পশ্চিমবাঙলার প্রগতিশীল মানুষের একটা বড় অংশ বাংলাকংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতির মোর্চাকেও প্রগতিশীল মনে করেছে এবং সমর্থন করেছে। নির্বাচনের আগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পরিস্থিতির যে বিশ্লেষণ করেছিল নির্বাচনের ফলাফল তা ভুল প্রমাণ করল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁরা এই ভুল স্বীকার করলেন না অথচ কংগ্রেসের দোসর বাংলাকংগ্রেসের মোর্চার সঙ্গে নির্বাচনের পরেই

তাঁরা হাত মেলালেন। দুই মোর্চার মিলনের ফলে যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হয়।

কিন্তু ঐ সরকার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সংকীর্ণ রাজনীতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে তারা সরকারে থেকে সর্বদাই যন্ত্রণাবোধ করেছে এবং সুস্পষ্টভাবে সরকার পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। তাদের আচরণের জন্যই মাত্র আট মাসের মধ্যে মন্ত্রিসভার দারুণ সংকট সৃষ্টি হয় এবং ১৯৬৭ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। মন্ত্রিসভায় অন্যান্য কয়েকটি দলের প্রচেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন বটে কিন্তু মন্ত্রিসভার মধ্যে মতবিরোধ কারও নিকট আর অজানা থাকে না। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব মন্ত্রিসভা খারিজ করার জন্য প্রথম থেকেই অজুহাত ও সুযোগ খুঁজছিল। মতবিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে তারা কিছু দিনের মধ্যেই অন্যায়ভাবে মন্ত্রিসভা ভেঙে দিল।

১৯৬৭র শেষভাগ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় পর্যন্ত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বাংলাকংগ্রেস সহ অন্যান্য ১৩টি পার্টির যুক্ত মোর্চার মধ্যে থেকেছেন। প্রাদেশিক স্তরে তাঁরা অন্যান্য পার্টির সঙ্গে মোটামুটি ভালো সম্পর্ক রাখলেও জেলা এবং অন্যান্য স্তরে এই সম্পর্ক মোটেই ভালো ছিল না।

কংগ্রেসবিরোধী বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির ব্যাপকতম ঐক্যের ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে পশ্চিমবাঙলার প্রগতিশীল জনতার অধিকাংশ ১৪ পার্টির মোর্চা যুক্তফ্রণ্টকে বিপুলভাবে সমর্থন জানায়। নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্ট ২৮০টি আসনের মধ্যে ২০৮টি আসন লাভ করে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ৮৩টি আসন লাভ করে সর্ববৃহৎ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ঐক্যকে আরও বৃহত্তর ঐক্য গড়ার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার পরিবর্তে একদলীয় প্রভুত্ব কায়েমের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। কারণ তাঁরা মোর্চার শরিকদলগুলিকে প্রগতিশীল পরিবর্তনের পক্ষেও প্রতিবন্ধক মনে করেছেন। অথচ এই মোর্চার সাহায্যে যুক্তফ্রণ্ট সরকার অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকগুলি প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এ সত্ত্বেও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি শরিকদলগুলিকে বিধ্বস্ত ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল। মার্কসবাদী

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের এই সর্বনাশা নীতি বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে বটে কিন্তু তা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে বৃহত্তর বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল তাকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করতে পারে নি।

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব-অনুসৃত জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ যে-কঠোর আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছিল তা কংগ্রেসের ভিতরকার গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকেও ঐ সকল নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে উৎসাহিত করে এসেছে। এরই পরিণতি হিসাবে ১৯৬৯ সালের শেষভাগে কংগ্রেসের ভিতরকার গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিগুলি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নবকংগ্রেসরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে কংগ্রেসের এই ভাঙন এক যুগান্তকারী ঘটনা।

কংগ্রেসের ভাঙনের পরে নবকংগ্রেসের ভিতরকার প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে নবকংগ্রেসের বাইরের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা কতকগুলি প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণের এক নূতন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কালবিলম্ব না করে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার কৌশল গ্রহণ করে। তাই কংগ্রেসের ভাঙনের পরে নবকংগ্রেস যখন লোকসভায় সংখ্যালঘু দল হয়ে পড়ে তখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে কোণঠাসা করে রাখার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি শ্রীমতী গান্ধীর সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু এই সমর্থন সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি নবকংগ্রেসের জনবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লোকসভার ভিতরে ও বাইরে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছে ও আন্দোলন সংগঠিত করেছে। তখনকার অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির এই নীতি ছিল স্পষ্টতই ইতিবাচক ও সৃজনশীল বামপন্থী রাজনীতির প্রয়োগ। তাই ১৯৬৯-৭১ সালের মধ্যে নবকংগ্রেসের সরকারকে দিয়ে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করানো সম্ভব হয়েছে যার প্রগতিশীল তাৎপর্য এমনকি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাও একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি।

এই সব ঘটনার ফলে কংগ্রেসের অনুগামী জনতা নূতন উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস লাভ করতে থাকে এবং তারা বিপুল সংখ্যায় নবকংগ্রেসের পশ্চাতে জমায়েৎ হতে থাকে। ফলে নবকংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষে আবার বিপুল প্রভাবের অধিকারী হয়ে ওঠে।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং এই রাজ্যের অন্য কয়েকটি দল কংগ্রেসের

ভাঙনের এই তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেনি। কংগ্রেসের ভাঙনকে এই সব দলগুলি কংগ্রেসের বিলুপ্তির পূর্বাভাষ বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা নবকংগ্রেস ও আদিকংগ্রেসের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে চাননি। বরং ক্ষমতাসীন নবকংগ্রেসকে তাঁরা আদিকংগ্রেস ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দল অপেক্ষা বেশি বিপজ্জনক বলে মনে করেছেন। তাই তাঁরা ১৯৬৯ সালের পর থেকে নব-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী দলগুলির সঙ্গে গোপন এমনকি প্রকাশ্য সমালোচনায় আসতেও দ্বিধা করেন নি। অর্থাৎ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নীতি একদিকে যেমন বামপন্থা ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যে বিঘ্ন ঘটিয়েছে অন্যদিকে তেমনি দক্ষিণপন্থা ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিকে উৎসাহ জুগিয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নীতি তাই শুধু দেশের প্রগতিশীল পরিবর্তনের পক্ষেই ক্ষতিকারক নয় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙলাদেশ মুক্তিসংগ্রামে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এই বিপদ নগ্নভাবে ধরা পড়েছে। বিশুদ্ধ বামপন্থার দোহাই দিয়েই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্য কয়েকটি বামপন্থী দল এসব করে এসেছে।

কংগ্রেসের ভাঙন ও তজ্জনিত দ্রুত বিলুপ্তির পরে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি হবে এই ধারণা থেকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তদানীন্তন পরিস্থিতিকে নিজেদের একাধিপত্য কায়েমের অপূর্ব সুযোগ বলে গ্রহণ করেন। এই ধারণা থেকেই তাঁরা এমন কি যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলগুলিকে বিধ্বস্ত ও নিশ্চিহ্ন করবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। নেতিবাচক রাজনীতির সাহায্যে যখন তাঁরা এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হন তখন নির্বিচারে সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ করেন। তাঁদের এই সন্ত্রাসের নীতি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এক বিভীষিকার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে তাঁদের কয়েকটি স্তাবক দল ভিন্ন অন্য সব দলই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এই নীতির বিরোধিতা শুরু করে। কিন্তু তাতে কোনোই ফল লাভ হয় না, বরং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নীতি আরও উগ্র হয়ে ওঠে। এরই ফলে ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে যুক্তফ্রণ্ট ও যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙে যায়।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট ও যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের পরে নবকংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে নূতন ভিত্তিতে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের এক নূতন সম্ভাবনা বর্তমান ছিল। এই ঐক্য একদিকে যেমন

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিকে বিধ্বস্ত করতে পারত অন্যদিকে তেমনই পারত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মারাত্মক নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদলগুলি নবকংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে একটি নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করলে এই সম্ভাবনা বাস্তব রূপ লাভ করত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই ধরনের উদ্যোগও গ্রহণ করেছিল কিন্তু অন্যান্য বামপন্থীদলের পুরনো কংগ্রেস-বিরোধী গোঁড়ামির চাপে এই উদ্যোগ ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। এর আর-একটি কারণও ছিল। রাজ্য কংগ্রেসের মধ্যে এখনও পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কমিউনিস্ট পার্টিকে এটাও দ্বিধাগ্রস্ত করতে সাহায্য করেছে। উপরোক্ত সম্ভাবনা বাস্তব রূপ লাভ না করার ফলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তার দৌরাত্ম্য চালিয়ে যাবার সুযোগ পায় এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি সমস্ত উদ্যোগ হারিয়ে ফেলে এবং প্রায় নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। ঐ সময়কার ঘটনাবলী স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে পুরনো অন্ধ কংগ্রেস-বিরোধী গোঁড়া বামপন্থী রাজনীতি ক্রমশ বন্ধ্যা হয়ে পড়ছে। বামপন্থী রাজনীতির সৃজনশীল প্রয়োগ একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন পশ্চিমবাঙলায় সৃজনশীল বামপন্থী রাজনীতি প্রয়োগের এক নূতন সুযোগ এনে দেয়। কমিউনিস্ট পার্টি এবার বলিষ্ঠভাবে নবকংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতীত অন্য সব বামপন্থী দলের মিলিত মোর্চার আওয়াজ তোলে। কিন্তু অন্যান্য বামপন্থী দল অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতার গোঁড়া রাজনীতি পরিবর্তন করতে রাজী হয় না। ফলে পশ্চিমবাঙলার বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বিভক্ত থেকে যায়। এই বিভেদের সুযোগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে বহু সংখ্যক আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে মাত্র ৩১% ভোট পেয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ১১১টি আসন লাভ করে। কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাবিত মোর্চা গঠিত হলে এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সন্ত্রাস না থাকলে ১৯৭১ সালেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি খুব বেশি হলে ৪০/৫০টি আসন লাভ করত। অন্ধ কংগ্রেসবিরোধী গোঁড়া বামপন্থী রাজনীতির অসারতা তখনই লোকের কাছে স্পষ্টই হত।

১৯৭১ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য কয়েকটি বামপন্থী দল একদিকে কংগ্রেসবিরোধী ও অন্যদিকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী

যে মোর্চা গঠন করেছিল তার দারুণ বিপর্যয় ঘটে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবিত জনতা ছাড়া অন্যান্য অংশের জনতা কংগ্রেসবিরোধী গোঁড়া বামপন্থী রাজনীতির থেকে সরে যাচ্ছিল বলেই এই মোর্চার দারুণ বিপর্যয় ঘটেছিল।

১৯৭১ সালে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠন পশ্চিমবাঙলার রাজনীতিতে এক নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। নবকংগ্রেস এই সরকারের প্রধান দল ছিল। স্বল্পস্থায়ী ঐ সরকার তাদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে পুরনো কংগ্রেস সরকারের থেকে পার্থক্য জনসাধারণকে বোঝাতে পেরেছিল। এর ফলে কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন লোকেরা আরও বেশি কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে। এই প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসাবেই শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাকংগ্রেস, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রের নেতৃত্বে এস. পির একাংশ ও শ্রীবিদ্যুৎ বসুর নেতৃত্বে পি. এস. পির একাংশ নবকংগ্রেসে যোগদান করেছে।

১৯৭১ সালের বৃহত্তম ঘটনা হল বাঙলাদেশ-মুক্তিসংগ্রাম। এই সংগ্রামে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকার যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার ফলে কংগ্রেস-বিরোধিতা দুর্বল হয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতি-বাচক মনোভাব ও কার্যকলাপ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এক অংশ ও সমর্থককে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পূর্ববাঙলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে এটা লক্ষণীয়।

মোট কথা ১৯৭১ সালের ঘটনাবলী কংগ্রেসের জনসমর্থন বাড়াতে এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জনসমর্থন কমাতে সাহায্য করেছে।

এই সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও তার সৃজনশীল বামপন্থী নীতি বলিষ্ঠভাবে প্রয়োগ করেছে। তাতে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের মধ্যে হতাশা কেটে আস্থার ভাব ফিরে আসতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৭২ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কংগ্রেস ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মোর্চা গঠন করার ফলে মোর্চার প্রগতিশীল চরিত্র আরও স্পষ্ট হয়েছে। এতে দুই দলের কর্মীরাই শুধু উৎসাহিত হয় নি, ব্যাপক সংখ্যক লোক যারা কোনো দলভুক্ত নয় তারাও উৎসাহিত হয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মারাত্মক নীতি—যা গত কয়েক বছরে মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল—তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবাঙলার

প্রায় ৬০% জনতা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চাকে সমর্থন করেছে। এটাই মোর্চার বিপুল জয় সম্ভব করে তুলেছে।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তার অন্ধ কংগ্রেসবিরোধিতার গোঁড়া রাজনীতি দিয়ে স্বভাবতই নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারে না। তাদের এই বন্ধ্যা রাজনীতিই তাদের অন্য ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য করেছে। আর এই ব্যাখ্যা হল নির্বাচনে সর্বব্যাপক কারচুপি।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সৎ ও অবাধ নির্বাচন কখনোই সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে যেসব নির্বাচন হয়েছিল তা সৎ ও অবাধ হয়েছিল এ-কথা কি কেউ বলতে পারেন? অথচ ঐ নির্বাচনের দ্বারাই ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্যই এবার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। অপরপক্ষে তাদেরই শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

উপসংহারে "সৎ ও অবাধ" নির্বাচন সম্পর্কে একটি মন্তব্য না করে পারছি না। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাসের দ্বারা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের কতকগুলি এলাকাকে তাদের পার্টির জন্য মুক্ত করে নিয়েছিল। ঐসব এলাকায় যারাই তাদের বশংবদ নয় তাদের কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে ঐসব এলাকায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোনো দল কোনো নির্বাচনী প্রচার চালাতে পারে নি। "সৎ ও অবাধ" নির্বাচন চালিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনের ফলাফল তাদের পক্ষে নিতে পেরেছিল। মুক্ত এলাকা না থাকলে ১৯৭১ সালের নির্বাচনেও ঐসব নির্বাচন-ক্ষেত্রের অনেকগুলিতে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরা পরাজিত হতেন। ১৯৭২ সালে ঐসব এলাকার অনেকগুলিই আজ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মুক্ত এলাকা নেই। তাই তাঁরা নির্বাচনের ফলাফল ঐ সকল কেন্দ্রে নিজেদের পক্ষে নিতে পারেন নি। নির্বাচন তাঁদের কাছে তাই "সৎ ও অবাধ" নয়। নির্বাচন "সৎ ও অবাধ" হয় নি বলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পুনরায় নির্বাচন দাবি করেছে। পুনরায় নির্বাচন হলেও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন হবে না। আর তাঁরা ১৯৭১ সালের মতো "সৎ ও অবাধ" নির্বাচনের সুযোগও পাবেন না। তাই পুনরায় নির্বাচনের ফলাফল তাঁদের পক্ষে যাবে না।

সুতরাং বন্ধ্যা বামপন্থী রাজনীতিই নির্বাচনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের ফ্রন্টের শরিকদের বিপর্যয় ডেকে এনেছে। পশ্চিমবাঙলায় ব্যাপক বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ার ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় যে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

Shadow of the Bear (ED) A. P. Jain, Published by P. K. Deo, M. P. 4, South Avenue Lane, New Delhi, Pp. 176, Rs. 15·00

ভারত-সোভিয়েত চুক্তি সম্পর্কে দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলি গত ৫ই সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে যে সেমিনারের আয়োজন করেছিল,সেই সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা ও তত্ত্বমূলক নিবন্ধগুলি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে এবং এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এমন একটা সময়ে, যে-সময়টা এই গ্রন্থ প্রকাশের পক্ষে সবচেয়ে অনুপযোগী। শ্রীমতী গান্ধীর অত্যন্ত ফলপ্রসূ মস্কো সফরের ঠিক পরে-পরেই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। এই সফরের ফলে পূর্ববাঙলার সমস্যা সম্পর্কে দুই দেশের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি খুব কাছাকাছি এবং শিল্পগত ও বৈজ্ঞানিক বিকাশের নতুন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য একটি যৌথ আন্তঃসরকারী কমিশন গঠিত হয়। তারপর চুক্তির নবম ধারা অনুযায়ী (এক দেশ আক্রান্ত হলে বা এক দেশের ওপর আক্রমণের আশঙ্কা থাকলে অন্য দেশ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে ; সহকারী সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিরুবিনের সফরের সময় ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আলাপ আলোচনার পর যুক্ত ইস্তাহারে এই ঐক্যমত্যের কথা ঘোষণা করা হয়। এসব সত্ত্বেও যারা এই চুক্তিকে "অস্পষ্ট", "অনাবশ্যক" এবং "ভারতের পক্ষে সহায়ক নয়" বলে মনে করে—তাদের এই পক্ষপাতদুষ্ট বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন না। তারপর দুমাসও অতিক্রান্ত হয় নি, এরি মধ্যে উপমহাদেশের রাজনীতিতে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুক্তির বিভিন্ন বাস্তব দিক পর্যালোচনা করা এই সেমিনারের সংগঠকদের এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের আসল উদ্দেশ্য ছিল না। অবশ্য সম্পাদক দাবি করেছেন পর্যালোচনাটা সেভাবেই হয়েছে। আসলে ভারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তল্পিবাহক হতে অস্বীকার করায় তারা সরকারবিরোধী হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত পি. কে. দেও হলেন এই গ্রন্থের প্রকাশক এবং তিনি তাঁর মনোভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে কোথাও রাখঢাক করেন নি। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন "আমেরিকার অপর দিকটা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। নিকসনের আমেরিকা যেমন আছে, তেমনি কেনেডির আমেরিকাও আছে। চীনা আক্রমণের

সময় জন এফ. কেনেডি ৮ কোটি ডলার মূল্যের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ভারতকে সাহায্য করেছিল।”

অবশ্য আমরা কেনেডির আমেরিকাকে কি করে ভুলব ? গোয়ায় পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাতে ভারত যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল কেনেডির আমেরিকাই কি তার নিন্দা করেছিল ? প্রেসিডেন্ট কেনেডি নেহরুর যুক্তরাষ্ট্র সফর সম্পর্কে যে-অসম্মানসূচক উক্তি করেছিলেন তাঁর বইতে শ্লেসিঙ্গার তার উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, “সবচেয়ে ওঁচা রাষ্ট্রপ্রধানের সফর।”

আর চীনা আক্রমণের পর (৭ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র দানের প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু পি কে. দেও বলেছেন ৮ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র দানের, তা ঠিক নয়) যে-সামরিক সাহায্য দানের কথা ছিল সে সম্পর্কে বলা যায় যে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ৫০ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র দিতে অনুরোধ জানিয়েছিল। তার পরিবর্তে যাতায়াত ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য কিছু যন্ত্রপাতি দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজি হল। তাঁর জীবনী-লেখককে তথ্য পরিবেশন প্রসঙ্গে তদানীন্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওয়াই. বি. চ্যবন জানান যে আম্বাঝারিতে প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের জন্য আমেরিকা কিছু যন্ত্রপাতি দিতে ১৯৬৪ সালে রাজি হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৫ সালে যখন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হল তখন সে-প্রতিশ্রুতি আর রক্ষিত হল না।

টি. টি কৃষ্ণমাচারি এবং ভূতলিঙ্গম মিশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন সুপারসনিক বিমান সংগ্রহ করতে গিয়েছিল তখন অপমানিত হয়ে যেভাবে তাদের খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছিল সে-কাহিনী এখন অনেকেরই জানা আছে। এমনকি চ্যবনও প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের কিছু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার অনুরোধ জানাতে মার্কিন মুলুকে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকেও খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছিল। আমেরিকানরা চ্যবনকে জ্ঞান দিয়ে বলেছিল, এফ-১০৪ বিমানের ব্যয়বাহুল্য ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর হবে। চ্যবন ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে লোকসভায় বলেন যে, ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে মাত্র ৩৬.১৩ কোটি টাকা মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে। অথচ যে-পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল এটা হল তার মাত্র ৪৫ শতাংশ।

আলোচনার আরেকটা দিকও আছে। (অবশ্য চুক্তির সঙ্গে তার কোনো সঙ্গতি নেই)। এ. জি. নুরানি প্রমুখ একদল অংশগ্রহণকারী এটা দেখাবার চেষ্টা করেন যে বন্ধু হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। চীনা আক্রমণের সময় সোভিয়েত সহায়তার কথা বলাতে ফ্র্যাঙ্ক ঠাকুরদাসের সঙ্গে নুরানির বাক্‌যুদ্ধ বেঁধে গেল। তার অভিযোগ হল, সে-সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন যে আমাদের সাহায্যই করে নি তা নয়, পরন্তু চীনা আক্রমণের কথা তারা আগে থেকেই জানত। তার বক্তব্যের সমর্থনে নুরানি ১৯৬২ সালের ৮বা নভেম্বরের 'পিপলস ডেইলি'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উল্লেখ করেন। অবশ্য নুরানি যে-সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথা বলেছেন সেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ১৯৬৩ সালের ৮ই নভেম্বর 'পিকিং রিভিউ'তে বেরিয়েছিল। এবং এই প্রবন্ধ আগাগোড়া পাঠ করলে এই ধারণাই হবে যে ভারতের পক্ষ সমর্থনের জন্য এতে সোভিয়েত ইউনিয়নকেই অভিযুক্ত করা হয়েছে।

১৯৬৩ সালের ১৯এ সেপ্টেম্বরের 'প্রাভদা'য় চীনকে সমালোচনা করে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেজন্য উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমালোচনা করা হয়েছে এবং সোভিয়েত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে তাঁরা প্রকাশ্যেই ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষ সমর্থন করছেন।

আলেকজাণ্ডার ডাল্‌লিনের-এর মতো কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মার্কিন বিশেষজ্ঞও তাঁর 'কমিউনিস্ট ডাইভারসিটি' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে-চীন-সোভিয়েত বিরোধের একটা প্রধান কারণ হল ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন; "১৯৫৯ সালে ভারতের বিরুদ্ধে চীনকে সমর্থন না করার সোভিয়েত নীতির ফলে দুই কমিউনিস্ট শক্তির মধ্যে প্রকাশ্যে অভিযোগ ও পালটা অভিযোগ শুরু হয়।" ১৯৬০ সালে বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত রুমানিয়ান পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে চীনের নেতৃবৃন্দের বিতণ্ডার কথা এখন আর কারো অজানা নেই। অনেক নির্ভরযোগ্য মহলের এ-রকম ধারণা আছে যে, একতরফাভাবে চীনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পেছনে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর হাত ছিল। 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ভিকটর জোজা লিখেছিলেন যে, সোভিয়েত চরমপত্রের ফলেই সম্ভবত যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে ব্রিগেডিয়ার রাখি সনি এবং আরেকজন সমরবিশেষজ্ঞ জেনারেল বান্না-র উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা স্বীকার করেছেন যে,

দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়েছিল। এই চুক্তির ফলে প্রতিরক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে—এই অভিযোগ তাঁরা অস্বীকার করেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে চুক্তি না করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়ে ব্রিগেডিয়ার সনি বলেছেন যে, বেশির ভাগ আধুনিক ও উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ভারত পাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে। তাছাড়া সে-দেশে আমাদের রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। আর আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলোতে ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ দিন দিন কমছে। জে. ডি. সেথির দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা বাস্তবধর্মী। এই চুক্তি কাজে লাগিয়ে তিনি দেশকে শক্তিশালী করে তুলতে বলেছেন। ডঃ আপ্পাডোরাই বলেছেন যে, ভারত-সোভিয়েত চুক্তির ফলে ভারত গোষ্ঠিনিরপেক্ষ নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে—এই যুক্তি ধোপে টেকে না।

এম. আর. মাসানি, পিলু মোদি, এইচ. এম. প্যাটেল, বলরাজ মাধোক, অটলবিহারী বাজপাই, আচার্য কৃপালনী এবং সুচেতা কৃপালনী প্রভৃতি অধিকাংশ বক্তাই তাঁদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনুযায়ী ভাষণ দিয়েছেন। তাঁরা লাল ভালুকের ছায়া দেখিয়েছেন, ব্রেজনেভ-তত্ত্ব ও পরিকল্পনার ভয়াবহ চিত্র এঁকেছেন। এবং এসব করা হয়েছে সোভিয়েত কূটনীতিকে বীভৎস বর্ণে রঞ্জিত করে।

দেবেন্দ্র কৌশিক

ভৎকণ্ঠ শবরী। মণিভূষণ ভট্টাচার্য। স্বপক্ষ প্রকাশন, নৈহাটি। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বেশ কয়েকবছর চলে গেছে মণিভূষণ ভট্টাচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের জন্য আমাদের প্রতীক্ষা ক্লান্ত হবার আগেই যে তিনি তাঁর উপস্থিতিকে উজ্জ্বলভাবে প্রমাণ করলেন এজন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। ইতিমধ্যে পত্রপত্রিকায় তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি অনেকটা শিথিল হয়েছে। যে কোনো কবিতা সঙ্কলনেই 'আমিও আছি' বলার লোভ তাঁর ঘুচে গেছে। কবিতাতেও এসেছে এক প্রত্যয়-গাম্ভীর্য, সঙ্গে মিশে রয়েছে বন্ধ্যা মধ্যবিত্তের নানান 'ফ্যাসাড' সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, আর, আমার মনে হল কোথাও যেন অর্জিত হয়েছে একটা চাপা অভিমান। অর্থাৎ এতদিনে

মণিভূষণ আর কবিতা লিখতে পারার অহঙ্কারেই কবি থাকছেন না, তিনি সেই অনুভূতি, আবেগ এবং অস্তিত্বের প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বকে নিজের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন। এই সমগ্র চেতনার বলেই তাঁর কবিত্ব হতে পেরেছে তাঁরই প্রতিনিধি। এবং সেই তিনিও জীবন নামক ব্যাপারটাকে পূর্ব-নির্দিষ্ট ঠিকানায় খুঁজে পাবেন এমন ধারণার কাছে বিকিয়ে বসে নেই বলেই তাঁর ভ্রমণ এবং পৌঁছনোয় কবিতা পাওয়া গেল।

'উৎকণ্ঠ শর্বরী'র কবি শব্দের আধারে সৃষ্টি করেছেন আপন অভিজ্ঞান। তিনি যে-সময়ে কবিতা লিখছেন সে-সময়ে বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল প্রমুখ কবিরা তরুণ-তরদের উপর রীতিমতো প্রভাব রাখছেন। তা পৃথকভাবে দোষেরও নয়, গুণেরও নয়। তরুণতর কবিরাও এ-সব প্রভাব আত্মস্থ করেই একদিন স্বকণ্ঠ-ভাষী হবেন। এখানে যেটি বিশেষ করে বলার তা হল 'উৎকণ্ঠ শর্বরী' নিঃসন্দেহে একজন কবির স্বভাষণ। তাঁর শব্দ সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতারই ভাষা। এই কবির অভিজ্ঞাত জীবন এঁর মধ্যে কী আকার পরিগ্রহ করেছে তা মূর্ত হয়েছে তাঁর শব্দচেতনায়। শব্দেরা কবির অভিজ্ঞতারই আকার। শব্দেরা অনেক সময় মৃদু চরণে আমাদের মনের শিয়রে এসে দাঁড়ায়। লক্ষ্য করতে অনুরোধ করছি 'ভাইফোঁটা' কবিতার "কবে যেন প্রান্ত ঘিরে অস্ত গেছি নিশীথ জ্যোৎস্নায়"এই চরণের "প্রান্ত ঘিরে" শব্দ যোজনাকে, অথবা 'মহালয়া' কবিতায় "লোমশ কবজির নিচে লুণ্ঠনের বিস্ময়ের ঘোর" অথবা 'তিন রকম বিদায় সম্ভাষণ' কবিতার তিন নম্বরটি (শুধু স্তাকরা শব্দের চন্দ্রবিন্দুটাকে ধরে নিলাম ছাপাখানার ভূতের নাসাস্বর), বা 'শনিবার রাত্রে' কবিতাটিতে কবির অভিজ্ঞতার রূপায়ণকে। "দহন কি আর তেমন গূঢ়, যেমন তোমার গহন রুচি"—কবিতার ছন্দ ভাষার সমর্থনেই হতে পেরেছে ভাবাত্মক। সেই শব্দ-দক্ষতাই 'নিঃসঙ্গ পুরুষ' কবিতায় সৃষ্টি করেছে এক বাঞ্ছিত গুরুত্ব গাম্ভীর্য।

> "গা শির শির সান্ধ্যশীতে গরম জামায় নীল সিঁড়িতে
> দাঁড়িয়ে, নতুন বান্ধবীদের চিবুক তুলে, নিত্য নতুন খোঁপার ভিতর
> তিমির খুলে, বলব, 'আমার শেষ হয়েছে', তারা বলবে 'বেশ হয়েছে'—
> মধ্যশীতের শহর জুড়ে কাছে ও দূরে পাতা ঝরার শুষ্কতাকে
> ছড়িয়ে দিয়ে শুনব আমি 'বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে'।"

এই অংশে কবির জীবনবোধের টানেই উজ্জ্বল হতে পেরেছে কবিতাটির

রূপরীতি। যে কোনো কবির জীবনার্থই রসগত তাৎপর্যের সন্ধান করে রূপান্বেষায়। মণিভূষণ সেই কাব্যিক সত্যেরই সন্ধানী, যে-সত্য জীবনের ভূমিতে লগ্ন। তাই এই কবির প্রেমের কবিতাগুলিতে পাওয়া যায় এক পাতাঝরা মাঘের বিধুরতা, সেই হাসি. যার উল্টোপিঠে থাকে অনেক উপলব্ধির বেদনা। অথচ এ কবি প্রতীক্ষা বা প্রত্যাখান নিয়ে মাথা ঘামান না, প্রত্যাশাকে অযথা প্রশ্রয় দেন না। তবু প্রেম, প্রেমই, সে মণিভূষণের কবিতায় শিশিরের মতো মৃদু অথচ অনুপেক্ষণীয়। রাত্রিশেষের নক্ষত্রের মতো অনুচ্চার, কিন্তু তার বিদ্যমানতায় কোনো সন্দেহ নেই।

'উৎকণ্ঠ শর্বরী'র অনেক কবিতায় ছায়া ফেলেছে কবন্ধেরা, ছিন্নশীর্ষ শবদেহগুলি। বৃথা ক্রোধ নয়, ভুয়ো দার্শনিকতা নয়—এ সব ধ্বংস আর ভগ্নস্তূপের মাঝখানে কবি জীবনের খেই হারিয়ে ফেলেন না। বরং এই সবের ঘেরাও অবস্থার মধ্যে থেকেই তিনি আয়ত্ত করেছেন এক হার্দ্য অন্তরঙ্গ অথচ ঋজু বাচনভঙ্গি। কথার ব্যক্তিক ভঙ্গিকে তিনি মেলাতে পেরেছেন বক্তব্য-প্রধান এক গাম্ভীর্যের সঙ্গে। 'এই বইয়ের কম্পোজিটারকে'—সে জাতীয় কবিতা। এই সঙ্কলনের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম হিসাবে এই একোক্তিটির নাম করা চলে।

> "তুমি অক্ষর পাল্টাও, আমি শব্দ পাল্টাই, আসলে কিন্তু
> আমরা—এক, অক্ষর দিয়েই তো শব্দ! কিন্তু আমাদের পাল্টাচ্ছে
> কারা, জানো? যতই আমি লিখি আর তুমি
> কম্পোজ করো, আসল ব্যাপারটাই আমাদের হাতে না।
> তুমি দেখো একপাতায় কয় লাইন যাবে, আর আমি ভাবি এক লাইনে
> কজন আসবে; লাইন বলেই কথা, ভাই, লাইনের বাইরে কিছু নাই।"

'সাহিত্য একাডেমিকে খোলা চিঠি' কবিতাটিও মনে করা চলে। একটা তিক্ত বিদ্রূপের স্বর কবিতাটির পরিহাসোজ্জ্বল সুরকে ঢাকা না দিলে এর স্নিগ্ধতায় আমরা একজন সর্বদর্শী যুবার নিরাসক্তিকে পেতাম। সেই ভূয়োদর্শী যুবা যে একই সঙ্গে বিড়াল আর বিড়ালের মুখে ধরা ইঁদুরকে হাসাতে পারে এই কবির চেতনায় সেই যুবার সাক্ষাৎ ঘটেছে। 'কম্পোজিটারকে' কবিতায় যদি শ্রেণীবোধ অযথা মাথায় চড়ে না বসত, 'দিনলিপি' কবিতার শেষ চরণে চরণ ছাড়া চটি তিনি যদি না ছুঁড়তেন তাহলে সেই যুবার সাক্ষাতের ফল আরো বেশি উপভোগ্য হত। এই কবিকে আমার অনুরোধ—চারিদিক এত উত্তেজক বলেই আপনাকে অনেক বেশি শান্ত হতে হবে। আপনাকে আমাকে সবাইকেই।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা রূপকল্প ও অন্যান্য। কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়। মুখমণ্ডিল, কলকাতা। পাঁচ টাকা

পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছুদিন ধরে কবিতার উপরে বিশিষ্ট গবেষকগণ নানা ধরনের বই প্রকাশ করেছেন। এখনও বহু বের হচ্ছে। আমাদের দেশে আধুনিক কবিতার আঙ্গিক, রূপকল্প ইত্যাদি নিয়ে খুব একটা বই বের হয় নি, যদিও বাঙলা সাহিত্যে কবিতার স্থান যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ।

ইংরেজি কবিতা ওদেশে পাঠকসাধারণ পড়ুক বা না পড়ুক, একটি কবিতা কি ভাবে গড়ে ওঠে, কবিতার বিভিন্ন দিকগুলিই বা কি-কি—এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ আছে। জনৈক আধুনিক সমালোচক তো দুঃখ করে বলেইছেন: কবিতার উপরে বক্তৃতা পাঠ করা কবিদের জীবিকার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবিতার 'ক্লোজড রিডিং' এখন নাকি কবিতা পাঠক সমাজে খুবই জনপ্রিয়। সাম্প্রতিক কবিদের অস্বিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে কবিতার গঠনভিত্তিক দিকগুলি। বক্তব্য আর কবিতার যেন অন্যতম মূল বিষয় নয়, কেমন ভাবে কবিতা হয়ে উঠল সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

একটি রচনা কেন কবিতা হয়ে ওঠে এ নিয়ে বিচারের অন্ত নেই। মেলোপিয়া, লোগোপিয়া, ইমেজিজম প্রভৃতি পাউণ্ডীয় মত, অথবা 'আবেগগত অভিজ্ঞতার সংগঠন'ভিত্তিক এলিয়টীয় বিচার, কিংবা 'নির্জ্ঞান থেকে মুক্তির লক্ষ্যে উৎসারিত' বলে হর্বাট রীডের ব্যাখ্যা বা আর্কিটাইপ-প্রতীক-শব্দের সমান্তরভাবে মনের গোপনলোক উদ্ঘাটনের য়ুং কথিত আলোচনা, সব কিছু নিয়ে আধুনিক কবিতাকে চুলচেরা বিচারের মধ্যে লেবরেটরির বিচার্য করে ফেলা হয়েছে।

আমাদের দেশে মন্দের ভালো, এখনো কবিতায় কবিকেই অন্বেষণ করা হয়। 'ক্লোজড রিডিং'-এর ঝোঁক আমাদের দেশের কবিতাকে এখনও খুব একটা কাটা ছেঁড়া করে উঠতে পারে নি। অবশ্য তার ইঙ্গিত যে পাওয়া যাচ্ছে না, এমন নয়। আমাদের কাছে কবিতার গড়ে ওঠার বিষয়টির সঙ্গে কবিব্যক্তিত্বও কম জরুরি নয়।

শ্রীকৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কবিতা রূপকল্প ও অন্যান্য' বইখানি নিয়ে প্রথমেই মনে হয়েছিল, গ্রন্থকার বোধহয় 'ক্লোজড রিডিং'-এর মধ্যে আমাদের নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য অন্যবিধ। তিনি বিভিন্ন সময়ে ভাষার আদিরহস্য, বাঙলা কাব্যভাষার বিবর্তন ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ

লিখেছেন। তাঁর বিষয়বস্তুর মধ্যে কি ভাবে ভাষার আদিইঙ্গিতময়তা কবিতার রূপকল্পে এসে বিশেষিত রূপ পেয়েছে—বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্র রূপকল্পের উপরে গ্রন্থকার ইতিপূর্বে গবেষণা করেছেন। মাইকেল মধুসূদন এবং জীবনানন্দের কবিতায় রূপকল্পের ব্যবহার নিয়ে এ বইখানিতেও আলোচনা আছে। এতে ছটি প্রবন্ধ আছে: 'ভাষার আদি রহস্য' 'বাংলা শব্দের ধ্বনি চিত্র' 'বাংলা কাব্যভাষার বিবর্তন' 'কাব্য রূপকল্প: মাইকেল মধুসূদন' 'কবিতার রূপকল্প' ও 'কাব্য রূপকল্প: কল্লোলপর্ব: জীবনানন্দ'।

গ্রন্থকার 'ভাষার আদি রহস্য' আলোচনায় যুক্তি মনে করেছেন ভাষা-জন্মের উৎসে আছে "আনন্দ বেদনা ও বিস্ময়ানুভূতি" এবং বলেছেন "ইঙ্গিতময় অব্যয়ধ্বনিগুলি ভাষার ইতিহাসে হয়ত প্রাচীনতম।" অর্থাৎ "when primitive acts were performed in common, they would therefore naturally be accompanied with some sounds which would come to be associated with the idea of the act performed and stand as a name for it." [Eric Patridge.] অবশ্য গ্রন্থকার পাভলবীয় তত্ত্ব অনুসারে ভাষার দ্বিতীয় ইঙ্গিতময়তার বিষয়ে আলোচনা করেন নি; এমনকি কিভাবে ভাষা মূলত মেটাফরিক্যাল, এবং সামান্য ভাষার ব্যাপক প্রয়োগে কিভাবে ভাষার পার্টিকুলার দিক বর্জিত হয়ে জেনেরাল দিকটি বেশি বেশি উন্মোচিত হচ্ছে, এবং উন্মোচনের প্রয়োজনেই শব্দের আদি অর্থ ছাড়িয়ে ব্যবহারিক অর্থের বিকাশ ঘটছে, অবশেষে সেই ব্যবহারিক অর্থের বিশেষ সংস্থাপনে রূপকল্প গঠনের মাধ্যমে আদি অনুভবের মেটাফরে প্রত্যাবর্তন কবিতায় বিশেষ ভাবে সম্ভব হচ্ছে, এ সব ব্যাখ্যা করেন নি। এমনকি শব্দের সিনথেটিক রূপ, ব্যাকরণগত শব্দবিন্যাসের মধ্য দিয়ে ভাষার বিশেষিকরণ—এ সব তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেন নি। অথবা যৌথ-শ্রমের তাৎপর্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে কি ভাবে ভাষা গড়ে উঠেছে তার ব্যাখ্যাও রাখেন নি।

গ্রন্থকারের বিশেষ ঝোঁক শব্দগঠনের ক্ষেত্রে ধ্বনিময়তার দিকটি। 'বাংলা শব্দের ধ্বনি চিত্র' প্রবন্ধটিতে তার বিশেষ নিদর্শন রয়েছে। ধ্বনি-চিত্র ব্যাখ্যায় তিনি বিশেষভাবে দ্বিত্ব উচ্চারণের তাৎপর্যই ব্যাখ্যা করেছেন। এই ধ্বনিচিত্র-ভাষাকে তিনি বাঙালির কাব্যভাষার প্রাণ মনে করেছেন।

আর এ ধারণা ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন 'বাংলা কাব্য ভাষার বিবর্তন' নিবন্ধটিতে।

তিনি সঠিকভাবেই ধরেছেন "বাঙলা কাব্যে দুটি সমান্তর কাব্যভাষা ছিল", একটি সংস্কৃতানুগ অপরটি প্রাকৃত। বাঙলা কাব্যভাষা ব্যাখ্যায় তিনি বারফিল্ড-এর তত্ত্বকে অনুসরণ করেছেন। বারফিল্ড-এর ঝোঁক রূপকের দিকে, মেটা-ফরের দিকে। শব্দই তার কাছে মুখ্য। গ্রন্থকার বিশেষভাবে প্রতীক উল্লেখের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন আমরা বিশেষভাবে খুশি হই যখন তিনি বাঙলা কাব্যভাষার ব্যাখ্যায় বলেন, "বাংলা কাব্যভাষার আকর যেমন সংস্কৃত কাব্য অলঙ্কারশাস্ত্র তেমনই সমানভাবে 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' 'গাথা সপ্তশতী' প্রভৃতি সঙ্কলন। ভাষার আদি উৎসকে যদি মানবচেতনায় প্রতিফলিত বস্তুজগৎ বলে মনে করি তবে অবশ্যই কবিকে মাটির কাছাকাছি থাকতে হবে ও তাঁর কবিমানসের বনস্পতিটিকে মাটির রসেই সরস করতে হবে।"

'বাংলা কাব্যভাষার বিবর্তন' এ বইখানির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। গ্রন্থকার বিজয় গুপ্তের 'মনসা-মঙ্গল' থেকে সম্প্রতিকালের কবিতা পর্যন্ত কাব্য-ভাষার বিবর্তনের রূপরেখাটি দেখাতে চেষ্টা করেছেন এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছেন। লৌকিক শব্দ দিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা শুরু এবং তিনি লক্ষ্য করেছেন বিজয় গুপ্তে আছে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রনির্দিষ্ট উপমার বিরলতা, অপর দিকে তাঁর ভাষা গীতিধর্মী ও 'কান্ত কোমল'। গ্রন্থকারের মতে মুকুন্দরাম "বাংলা কাব্যভাষার গ্রামীণ ও নাগরীরীতির সংযোগ সেতু।" ভারতচন্দ্র সেই 'নাগরী বিদগ্ধ রীতি'কেই প্রসারিত করেছেন এবং "সংস্কৃত পারসিক ও প্রাকৃতজ বাংলা শব্দ মিলিয়ে মিশিয়ে" তাঁর ভাষা; মধুসূদন "সার্থকভাবে সংস্কৃত পাশ্চাত্য মহাকাব্যের বর্ণনাত্মক রীতি ও নীতিকাব্যের আবেগাত্মক রীতি" এই উভয় রীতিতে পরীক্ষা করেছেন। মধুসূদনের আর্কায়িক শব্দ ব্যবহারের বিশিষ্টতা সহ লোকমুখে প্রচলিত শব্দের সহাবস্থান কবিতাকে যে বিশেষ সুষমা দিয়েছে তা গ্রন্থকার লক্ষ্য করেছেন। গ্রন্থকার "রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষায়···বাংলার কথনরীতি, বাংলার লোকপ্রয়োগ শৈলী ও প্রাচীন মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যভাষার ঐতিহ্যের লুপ্ত চিহ্নকে আবিষ্কার" করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন আধুনিক কবিরা "কবিতাকে গতানুগতিক ডিকশনের বাইরে এনে লৌকিক করে তোলার চেষ্টা" করে যাচ্ছেন গত চল্লিশ বছর ধরে। কল্লোল-

পর্বের কবিতায় ও জীবনানন্দে, বিশেষভাবে ইমেজ রচনায় তিনি পেয়েছেন লোকায়তেই প্রত্যাবর্তন।

শ্রীকৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বইখানির বিশিষ্টতা এই লৌকিক দিকের ঝোঁক। অর্থাৎ মানুষের নিত্যব্যবহার্য শব্দাবলীর মধ্যেই যে কবিতার জীবিত ভাষা রয়ে গেছে, তিনি ভাষার আদি জন্ম থেকে, কবির হাতে ভাষার দ্বিতীয় জন্মে—সেই এক লৌকিক ইঙ্গিতময়তাকে প্রাগ্রসর ভূমিকা দিয়েছেন এজন্য বইখানি বাঙলা কবিতা সমালোচনার ইতিহাসে একটি বিশেষ দিকে পথিকৃতের দাবি জানাতে পারবে।

বইখানির মুদ্রণপ্রমাদ বিরক্তি উৎপাদন করে। তবু বাঙালি কবিতা-ভাবুকদের কাছে যে তিনি ভাবনার উপকরণ দিয়েছেন, সেজন্য তাঁর বইখানি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্যই বিবেচিত হবে।

তরুণ সান্যাল

রাজার বাড়ি অনেক দূরে। দিব্যেন্দু পালিত। [illegible] প্রকাশন, কলকাতা। তিন টাকা

রচনাকৌশল অবশ্যই কবিতার ক্ষেত্রে একটা বড় ব্যাপার, এবং এ বিষয়ে মুন্সিয়ানার চিহ্ন কোন কোন সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কেউ এমন প্রশ্ন করলে আমি তাকে নির্দ্বিধায় অন্যতম উদাহরণ হিসেবে দিব্যেন্দু পালিত প্রণীত 'রাজার বাড়ি অনেক দূরে' কবিতা সঙ্কলনটির নাম উল্লেখ করব।

বিতর্কের ঝুঁকি নিয়েও যাদের বলা হয় পঞ্চাশের কবি, দিব্যেন্দু তাঁদেরই একজন। শব্দ ব্যবহারের দক্ষতায়, বাক-চাতুর্যে, রকমারি ছন্দের অনুশীলনে, ঋজুরেখ পংক্তির পর পংক্তি রচনায়, ব্যক্তিগত ভাবনা প্রকাশের নৈপুণ্যে এবং সর্বোপরি কাব্যিক চমৎকৃতি উস্কে তোলার ব্যাপারে আধুনিক বাঙলা কাব্যধারায় এই দশকের অনেক কবিই স্মরণীয় ভাবে পদসঞ্চার করেছিলেন; কেউ কেউ এখনও করছেন। উপরোক্ত বিষয়গুলির কম বেশি আদল 'রাজার বাড়ি অনেক দূরে' সঙ্কলনের অধিকাংশ কবিতাতেই পাওয়া যায়।

এই কাব্যগ্রন্থে যে গুণটি আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে, তা হল কবির পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা। আমরা জানি দিব্যেন্দু একজন কৃতী গল্পকার, কিন্তু তা ভুলে গিয়েও এই নৈপুণ্যের দিকটি তুলে ধরা উচিত। যাঁর তন্ন তন্ন করে

দেখার চোখ আছে, তিনিই দেখতে পান "রান্নাঘরের গুমোটে দাঁড়িয়ে / হাতের ময়লা তোয়ালেতে ঘাম মুছতে-মুছতে / আধবুড়ো বাবুর্চি-কে।" তাঁর চোখে পড়ে, "লোকেশ ছিলো না। তার একপাটি জুতো, / কিংবা পাঞ্জাবির ঝুল একপাশে বেশী কাত⋯" অথবা, "হাতুড়ে ডাক্তার, ভ্রূণ হত্যা যার বাঁ হাতের কাজ—/ গোপন বেঞ্চির নিচে লুকানো গামলায় / তেল-তেল রক্ত তুলো রক্ত কার রক্ত যেন কার।"

কিছু প্রসন্ন লিরিক দিব্যেন্দু এই কাব্যগ্রন্থে আমাদের উপহার দিলেও তাঁর ঝোঁক বেশি বক্রভাষণে। ফিটফাট নাগরিক মেজাজের পাতায় মুড়ে তিনি পাঠকের হাতে দেন আত্মবীক্ষণের উপাদান, যা কখনো কখনো আত্মনিগ্রহের পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছয়। আঞ্চলিকতাকে পরিহার করে নানা দেশের নানা মর্জির সমাহারের সযত্ন প্রয়াস বইটির অনেক জায়গাতেই বড়ো ভাবে চোখে পড়ে, হয়তো কবি সব জায়গায় না চাইলেও। এর ফলে কবিতায় নতুন গন্ধ আসে, স্বাদের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য বাড়ে বৈকী। দিব্যেন্দু অনর্থক এ্যামবিশাস নন, তিনি মোটামুটি তাঁর সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন। ফলে কাব্যগ্রন্থটির বহু-ক্ষেত্রেই একটি স্থিত, বয়স্ক মনকে ক্রিয়াশীল দেখা যায়। বেশ সাবলীল ভাবে বলতে পারেন তিনি, "সকালে চায়ের কাপে, রেস্তোরাঁয় দশটা পঁচিশে / তেলে জলে অবিকল মেশে—/ যে হেতু রক্তে আমি পেয়ে গেছি পঞ্চমের স্বাদ ; / বেঁচে থাক কালিদাসপ্রসাদ ; / এখনো প্রেমের নামে চতুর্দশপদী লেখা হয়! / কিংবা সময় হ'লে ভাবা যাবে ঈশ্বর এখনো / আত্মহত্যা করেন না কেন!" একই সপ্রতিভ চটপটে ভঙ্গিতে তিনি বলে যান, "একাকী উদ্যান পেলে দেখে নেবো জ্যোৎস্নার ক্ষমতা" অথবা "সবার কুশল জানি।⋯কে কাকে মারলো ল্যাং, ঈর্ষায় জ্বললো কার বুক, / দিশি মদ গিলে কার দাঁত-মাড়ি খ'সে পড়ল ঝাপসা বেসিনে, / পকেটে ডলার ভ'রে গোপনে কে হলো বুদ্ধিজীবী, / কোন যুবতীর স্তন হাউসের অন্ধকারে প্রতিদিনই দুধে ভারি হয়।"

দিব্যেন্দুর কবিতায় প্রায়শ চাপা নাটকীয়তা চোখে পড়ে, কিন্তু নাটুকেপনা নয় ; সাধারণ ভাবে অনুভবের প্রকাশে কখনোই তিনি প্রচণ্ড আবেগ তাড়িত, কম্প্র ও ব্যগ্র নন। বরং সব কিছুকে থিতিয়ে কেটে কেটে দেখানোর তিনি পক্ষপাতী। এতে অবশ্য কখনো কখনো একটা অসুবিধে ঘটে যায়। সমস্ত কিছুকেই অংশ হিসাবে আলাদা করে বিচার করার প্রবণতার আধিক্যে টোটালিটি গড়ে উঠতে পারে না। যাকে তুচ্ছ বা অ-দরকারী মনে হতে

পারে, যা কাব্যিক সম্বাদ নয়, কবি তাকেও তুলে ধরার ইচ্ছে দমন করতে পারেন না। নচেৎ দিব্যেন্দু কেনই বা লিখবেন এহেন, "রজনীগন্ধার / অভাবে মাথায় রক্ত তেড়ে উঠলে একটি চামিনার/জ্বালতে গিয়ে দ্যাখে ঘরে কোনোখানে দেশলাই নেই" অথবা "যে-হেতু মরণ / যতোই বাঞ্ছিত হোক, আসে না সহজে, এই সত্যটিকে তারা / চিনেবাদামের খোসা ভেবে নিয়ে পার্কের পেউড়ে / জ্যান্ত আঙুলে ভাঙে···।"

প্রেমের কিছু তন্ময় কবিতা বইটিতে আছে। ঐ রচনাগুলির ক্ষেত্রে কবি অনাড়ম্বর, স্বল্পবাক ও আন্তরিক। আবার তারই পাশাপাশি আছে এমন কিছু কবিতা, যা শুধুই আমাদের লঘু সৌখীনতার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। ফলে 'বান্ধার বাড়ি অনেক দূরে' সমস্ত রচনা কুশলতা সত্ত্বেও অনেক সময় দ্বিধা-বিভক্ত, বি-সম অভিজ্ঞতায় আমাদের চঞ্চল করে। এবং এ-চাঞ্চল্য বাড়ে তখনই, যখন দেখি শুশ্রূষাকারীর আত্মনিবেদন অন্তর্জাত করে দিব্যেন্দু এমন ঝর্ণার জলের মতো বহতা অনুভবের প্রকাশে সাবলীল, "তবুও মায়ের কথা মনে পড়ে রাত্রি গাঢ় হ'লে। / অন্ধকার বিছানায় মনে হয় তোমার জরায়ু / স্ফীত হলো, যেন আমি পুনর্বার সুস্থ হতে পারি।" অথবা "আরো বেশি দুঃখ দিতে পারো। / আরো বেশি অন্ধকার, ঘরে / যখন আমূল ডুবে যায় / স্মৃতিহীন প্রহরে প্রহরে / যাকে ভালোবাসি, তার মুখ— / যেন তার ভীষণ অসুখ।"

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আকাশ-মাটী। মহাদেব সরকার। গ্রন্থায়ন, কলকাতা। সাড়ে তিন টাকা

সদ্য প্রকাশিত আকাশ-মাটী কাব্যগ্রন্থটি অসতর্ক পাঠকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমার যতটুকু মনে হল তাতে তিরিশের যুগ থেকে আজ সত্তরের যুগ পর্যন্ত বাঙলা কাব্যে যে সব নতুন ভঙ্গি বা ভাবের আবির্ভাব ঘটেছে তার প্রায় সব কটিই যেন এতে পাওয়া যায়। এর ফলে আকাশ-মাটীর কবিতাগুলি বিশেষ কোনো পর্যায়ের বিশেষ কোন ভাব বা ভঙ্গির পরিশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে নি। এ দিক দিয়ে কবি অনেকটা স্বচ্ছন্দবিহারী, বা বলা যাবে স্বাধীনচেতা—কিন্তু তা সত্ত্বেও এই স্বাধীনতা সর্বত্রই যে তাঁর স্বকীয়তার চিহ্ন বহন করছে একথা বলব না। বরং, এটা বলাই হয়তো সঙ্গত হবে যে, গত

চল্লিশ বছরের বাঙলা কবিতার ভাব ও আঙ্গিকের সঙ্গে মহাদেববাবু পরিচিত, এবং তার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর নিজের কথা সহজ উদ্দীপ্তির সঙ্গে বলতে পারেন।

আকাশ-মাটীতে মোট ষোলটি কবিতা আছে, এর মধ্যে আটটি আকাশ অংশে, এবং আটটি মাটী অংশে। একটু লক্ষ্য করলেই এই বিভাগের অর্থ বোঝা দুষ্কর হয় না ; 'আকাশ'অংশে কল্পনা বা অভীপ্সার স্থান যতটা, প্রাত্যহিক বাস্তব ততটা নেই ; অন্যদিকে 'মাটী' অংশে বাস্তবের দৈনন্দিনতা যতটা স্থান পেয়েছে, আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনা ততটা স্থান পায় নি। তা হলেও কবিতার ভাবের দিক দিয়ে এ বিভাগ যে খুব সুস্পষ্ট সীমানির্ধারক তা কিন্তু নয়, হয়তো কবিতার বেলায় তা সম্ভবপরও নয়। বিশেষত এই গ্রন্থের সব কবিতায়ই একটা তীব্র যুগযন্ত্রণার অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়—এই যন্ত্রণা প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পর্যন্ত হয়তো পৃথিবীর সকল দেশের, এবং এক বিশেষ রূপে ভারতবর্ষের। হিজলী বন্দীশালায় বন্দী-হত্যা বা পূব বাঙলার বর্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনের কবিতায় পরিবেশগত ছাপ যতটা সুস্পষ্ট, অন্য কবিতায় তা এতটা নেই। কিন্তু সব কবিতাই একটা অস্থির যুগকে অবলম্বন করে এবং কখনো কখনো তার প্রকাশও অস্থির ছন্দে—

অবাধ আকাশে ধ্বংসাচারের ঘূর্ণি হাওয়া
ছুটাও ছুটাও—হে বৈশাখী স্বেচ্ছাচারী !
অলস আকাশে উপপ্লবের ঘূর্ণিপাখা
উড়াও উড়াও, উধাও উড়াও,
ঝড়সোয়ারী হে বৈশাখী।

(হে বৈশাখী)

আকাশ-মাটীর কবিতাগুলির লক্ষণীয় দিক হল এর বলিষ্ঠ আশাবাদ— এই আশাবাদ মৃত্যু দুঃখ যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে এক সোনালী প্রভাতের স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু তা বলে কবিকে স্বপ্নবিলাসী বলার সাধ্য নেই কারো—প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায়ই তিনি বিশ্বজনীন দুঃখের মুখোমুখি হয়েছেন, দুঃখের বিপুলতায় স্তব্ধ হয়ে না থেকে তাকে অতিক্রম করেছেন। এর জন্য যন্ত্রণাতুর কবিকে বিদ্রোহী হতে হয়েছে—তাঁর সে বিদ্রোহ সমাজের বিরুদ্ধে, ভগবানের বিরুদ্ধে—

সে বিপ্লবে সঙ্গী হতে চায়

ক্ষুব্ধ বিশ্বপ্রাণ!

ঊর্ধ্বে অধেঃ কোথা তুমি

সৃষ্টি-অহংকারে মত্ত ধৃষ্ট ভগবান্!

(অগ্নিগর্ভ)

আগেই বলেছি, কবির চিত্ত ভবিষ্যতের স্বপ্নবিভোর। কখনো কখনো এই স্বপ্নকল্পনার চিত্র এক অপরূপ স্নিগ্ধ সৌষম্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে—

ঝড়ের বাসরে ফুলেরা কাঁদবে—একথা ভুল।
সূর্য হাসবে, আবার আসবে ফুলের ঢেউ,
নতুন পৃথিবী জাগবে, জাগবে নতুন প্রাণ!
আমাদের আশা অপঘাতে বাধা পায় না, জেনো।

(অবিসম্বাদ)

এই কাব্যগ্রন্থের আলোচনা হয়তো এখানেই শেষ করা যেত, কারণ এই-টুকুতেই আধুনিক কবিতা থেকে আমাদের যে প্রত্যাশা তা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আমরা বলেছি, আকাশ-মাটীর কবিতাগুলি ভাব ও আঙ্গিকের দিক থেকে তিরিশ থেকে সত্তরের যুগ পর্যন্ত বাঙলা কবিতার বিরাট ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কবির সৃষ্টিকর্মের একটা সূক্ষ্ম, হয়তো বা কিছুটা অস্পষ্ট, বিবর্তনের ইতিহাসও যে এতে একেবারে পাওয়া যাবে না তা নয়। বিষয় বিচারে যতটুকু বুঝতে পারা যায়, তাতে মনে হয় উনত্রিশ-ত্রিশের কালসন্ধিতে এই কবিতার জন্মবীজ উপ্ত হয়েছিল। সময়ের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই বইয়ে সব চেয়ে আগের কবিতা হয়তো 'যৌবনহত্যা' যা হিজলী বন্দীশালায় গুলিচালনার উপলক্ষে রচিত। কবিতাটির বিষয় এবং তার বহুপর্বিক দীর্ঘ চরণের ছন্দ সহজেই সে যুগের বিজয়লালের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু বিজয়লালের সমধর্মী কবিতায় যে সহজ ঔজ্জ্বল্য আছে মহাদেববাবুর এই কবিতাটিতে তা অনুপস্থিত। 'যৌবনহত্যা'—এই গুরুগম্ভীর নাম সত্ত্বেও কবিতাটি নেহাতই মৃত্যুজনিত একটি বিষণ্ণ কবিতা। মনে হল, এই বিষণ্ণতার ঝোঁকটা এই কবির কাব্যে কিছুটা দূর-প্রসারী হয়েছে। এই সঙ্কলনে 'যৌবন-হত্যা'র পরের কবিতাই 'সমাধি'—তাতে মৃত্যুর বেদনা কবির সমগ্র অনুভূতির রাজ্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—

পৃথিবীর মহাসিন্ধু ভরে গেছে লোনা অশ্রুজলে,
আকাশের মহাশূন্য ছেয়ে গেছে তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে—

পৃথিবীর অধিবাসী আকাশের প্রতিবেশী আমি
একাকী দাঁড়ায়ে স্তব্ধ অনন্ত এ বেদনার কূলে···

(সমাধি)

কিন্তু আশার কথা, এ বেদনা থেকে ত্রাণ পাবার জন্য কবির একটা সচেতন প্রচেষ্টা রয়েছে। 'চরৈবেতি' এই সঙ্কলনের একটা উল্লেখযোগ্য কবিতা হলেও এতে যে বেদনার রূপ আমরা দেখলাম তা কিছুটা কল্লোলযুগীয় তারুণ্যের বেদনা। 'প্রথমা'য়, 'অমাবস্যা'য়, 'বন্দীর বন্দনা'য় দেখা গেছে, এবং সম্ভবত দেখা গেছে নজরুলেও। কিন্তু আবিষ্কার করতে ভালো লাগল, 'চরৈবেতি'র বেদনা রূপ পেল এক গভীর জীবন-বৈরাগ্যে এবং তার শেষ পরিণাম যতীন সেনগুপ্তীয় দুঃখবাদে।

গ্রন্থের 'আকাশ' অংশেই কবি এই দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছেন একটি কবিতায়। কবিতাটির নাম 'অপারূপ'—সমগ্র সঙ্কলনে এটি একটি অসাধারণ কবিতা। কবি অনুভব করছেন, সৃষ্টির মূলে যে আনন্দ ও বেদনা তা অবিচ্ছেদ্য।

সঙ্কলনের 'মাটী' অংশের সূচনায় Ernst Toller থেকে একটু উদ্ধৃতি রয়েছে; তার শেষ অংশটুকু হচ্ছে—Whoever is silent in this crisis is a traitor to humanity. এতে পাঠকের চিত্ত সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিশোত্তর যুগের সাম্যবাদী কবি অডেন, স্পেণ্ডার, ডে লিউইস্-এর কাব্যজগতের মুখোমুখি হয়ে পড়বে. বাঙলা কবিতায় এঁদের কাব্যের ঠিক সচেতন অনুসরণ না থাকলেও ১৯৩৬-এ স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় থেকে কবিতার এই ভাব ও রীতি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের কাব্য আন্দোলনেরই একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। বাঙলা কবিতায় ১৯২০-২১ থেকে ১৯৫০-৫১ পর্যন্ত এই তিন দশক কালের কবিতায় এই অস্থিরতা ও বিক্ষোভ নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এর আরম্ভ হয়তো অসহযোগী যুগে নজরুলে, তারপর তা ক্ষীণ ধারায় কল্লোলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সুভাষ-সুকান্ত পর্যায়ে এসে পশ্চিমী কাব্য-আন্দোলনের এই বিশিষ্ট ধর্মের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে। বলা বাহুল্য কবিতার এই রীতি যতটা বিক্ষুব্ধ ততটা আত্মস্থ নয়. আত্মস্থ নয় অনুভবের দিক থেকেও আঙ্গিকের দিক থেকেও।

মহাদেববাবুর বইয়ের 'মাটী' অংশের কবিতায় এই সাধারণ লক্ষণগুলি পুরোপুরি রয়েছে। কিন্তু ঘৃণায় ক্রোধে অস্থির হলেও কোনো কোনো কবিতায়

কবির বেদনাহত রোম্যান্টিক চিত্তের কোমল অনুভূতি অসামান্য সৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়েছে। এদিক থেকে 'ঘোষণা' বা 'গ্রাম-কণ্ট্রোল' ভাবে ভঙ্গিতে যেমন উচ্চকিত ও সোচ্চার, 'অবিসম্বাদী' 'দায়ভাগ' তেমনি করুণ-কোমল। 'লগ্নভ্রষ্ট' আধুনিক হলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের বাঙলা কবিতার কবিধর্মের সমগোত্রীয় নয়, হয়তো এতে বাঙলা কবিতায় সুধীন দত্তীয় রীতির বিষণ্ণতার অনুস্মৃতি রয়েছে।

গ্রন্থের শেষ দুটি কবিতা 'মুকাবিলা' ও 'রক্তের রাখী' বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষে রচনা। এখানে একটা বিষয় আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করার যে, অকস্মাৎ একটা প্রবল বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হয়ে, তাকে রূপ দিতে কবিতার আধুনিক আঙ্গিক যেন পরাস্ত হয়ে গেল। মহাদেববাবুর 'মুকাবিলা' নজরুলের উর্দু-ফার্সী শব্দবহুল প্রলম্বিত ঝোঁক যুক্ত (undulating Stress) ছন্দে রচিত হয়েছে :

হর্ ঘরে ঘরে হুকুমৎ যায়,
তামিল্ তামিল্ সোর ওঠে ভাই,
বাংলা দেশের হিম্মত্ দেখি,
মুজাহিদ্-হাতে হাশিল কাম্!
—লাল সালাম্, নে—লাল সালাম্।

(মুকাবিলা)

সবশেষ কবিতা 'রক্তের রাখী'তে কবি যেখানে দুই বাঙলার অচ্ছেদ্য বন্ধনের কথা ঘোষণা করেছেন, সেখানেও পরাভূত আধুনিক আঙ্গিককে বর্জন করে তাকে তাঁর কবিকর্মের আরম্ভ-যুগের পথপ্রদর্শক নজরুল-বিজয়লালে ফিরে যেতে হয়েছে।

গ্রন্থের প্রচ্ছদটি সুপরিকল্পিত মনে হল। একটি প্রায়-চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের উপরি-অর্ধ আকাশ—তাতে মেঘ, বিদ্যুৎ; নীচের অংশ মাটি—তাতে ফুল ফুটেছে, কিন্তু মাটির রঙ লাল। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা ও অঙ্কন শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলে গ্রন্থে বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

সুবোধ চৌধুরী

ভিয়েতনাম : উৎসবের আহ্বান

ভিয়েতনামে মার্কিন-প্রশাসনের বর্বরতা সহ্যের সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে।

ছোট্ট একটা দেশের ওপর বছরের পর বছর সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তি যে-নারকীয় অত্যাচার চালাচ্ছে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে যে-হিংস্রতার কোনো তুলনা মেলে না—সাম্প্রতিক মার্কিন আগ্রাসনের তীব্রতা ঘাতকদের এতদিনের সেই 'কীর্তি'কেও ম্লান করে দিয়েছে!

জননীর গর্ভের লজ্জা প্রেসিডেন্ট নিকসন মাত্র সেদিন 'শান্তির সন্ধানে' চীন সফর করে এলেন। মাত্র সেদিন তিনি 'মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী' চীনের প্রাচীর 'ভেঙে ফেলা'র 'ঐতিহাসিক আবেদন' জানিয়েছেন।

আর উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে অন্যায় অযৌক্তিক এবং জবরদস্তি চাপানো কাঁটাতারের বেড়াটি ভেঙে পড়ছে দেখে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি করেছেন ভিয়েতনামযুদ্ধের তীব্রতা। উত্তর ভিয়েতনামে আবার মৃত্যুবর্ষণ শুরু হয়েছে। প্যারিস শান্তিবৈঠক বানচাল করে দিয়ে আমেরিকার পাশবশক্তি তার সমস্ত পরাক্রম নিয়ে গোটা ভিয়েতনামের ওপর নতুন উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

অথচ নিকসন বলেছিলেন শান্তি আনবেন। যেন জলপাইশাখা ঠোঁটে করে তিনি ভিয়েতনামের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন দেশে উড়ে এলেন। লাল কার্পেটে মোড়া পিকিং বিমানবন্দরে রাজকীয় সংবর্ধনার উত্তরে শান্তির জয় গাইলেন। চৌ নিকসন বিবৃতি প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যে ভিয়েতনামযুদ্ধের তীব্রতা বাড়িয়ে বর্বররা এইভাবেই কথা রাখছে।

নিকসন বলেছিলেন ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করবেন। তিনি এমনকি একটা 'ভিয়েতনামীকরণ' তত্ত্বই খাড়া করে ফেললেন। বললেন, ধাপে ধাপে মার্কিন ফৌজ প্রত্যাহার করে তিনি প্রমাণ করবেন দক্ষিণ ভিয়েতনামের 'সরকারী সৈন্যবাহিনী'ই 'মুষ্টিমেয়' মুক্তিযোদ্ধার আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম!

পরিহাস একেই বলে। ভিয়েতনামের মাটিতে যার পা নেই, মার্কিন সৈন্যবাহিনীর বেয়নেটের ডগায় যে-সরকারের 'সিংহাসন'—তার 'সৈন্যবাহিনী'

নাকি মুক্তিবাহিনীর মোকাবেলা করবে ! কায়েমী স্বার্থ, মার্কিনি অপসংস্কৃতির হাতছানি এবং ডলারের স্বর্ণমারীচ যে-মুষ্টিমেয় দক্ষিণ ভিয়েতনামীকে তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে প্ররোচিত করেছে—তারা নাকি দেশপ্রেম ও বীরত্বের নতুন দিগন্ত সৃষ্টিকারী দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ও মুক্তিফৌজকে ঠেকাবে !

রসিকজন বলবেন তাঁর 'ভিয়েতনামীকরণ' তত্ত্বের মধ্য দিয়ে নিকসন 'ভিয়েতনাম ভিয়েতনামীদের জন্য' এই সহজ সত্যের পরোক্ষ স্বীকৃতি না দিয়ে পারেন নি। গোটা পৃথিবী জুড়ে, বিশেষত আমেরিকায়, ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি তুঙ্গে উঠেছিল। মার্কিন সৈন্যদের মধ্যেও ক্ষোভ দানা বাঁধছিল : মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মার্কিন হতাহতের সংখ্যা নিয়তই বাড়তে থাকায় নিকসন-প্রশাসনের ওপর জনমতের চাপ ক্রমশই তীব্র হয়ে ওঠে। তাছাড়া সামনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তাই 'ভিয়েতনামীকরণ' তত্ত্বের মুখোশটা অনিবার্য ছিল।

কিন্তু কে না জানে তাঁবেদার দক্ষিণ ভিয়েতনামী ফৌজের ওপর যুদ্ধের দায়িত্ব দিলে এক দিনের মধ্যে পৃথিবীর এই ভূখণ্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাই নিকসন-প্রশাসন ভিয়েতনামে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার এক সর্বনাশা ফন্দি এঁটেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের তাঁবেদার সরকারের আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা তথা গোটা সমরব্যবস্থাকে যন্ত্রীকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ মার্কিন সৈন্য নয় আমেরিকান কমপিউটারই হাইলি সফিসটিকেটেড আর্মস দিয়ে যুদ্ধ করবে। এই স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধ শুরুও হয়ে গেছে। আর তার ফল, মার্কিন পত্রপত্রিকার মতেই, ভয়াবহ।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের শাসনাধীন। দক্ষিণের এই বিস্তীর্ণ স্বাধীন অঞ্চল এবং উত্তর ভিয়েতনাম গণ-প্রজাতন্ত্রে মার্কিন বিমানবাহিনী প্রায়শই সামরিক-অসামরিক অঞ্চলের ভেদাভেদ না মেনে মৃত্যুবর্ষণ করেছে। এখন নিকসন কর্তৃক যুদ্ধের 'ভিয়েতনামীকরণ' তথা মার্কিনী যন্ত্রীকরণের ফলে সমগ্র ভিয়েতনামেই আমেরিকা আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে সামরিক এবং অসামরিক বাছবিচারকে লুপ্ত করল। কারণ যন্ত্রের চোখে তো সবই সমান, বিশেষত সে-যন্ত্রের বোতামে যদি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৈশাচিক আঙুল সদাই স্থাপিত থাকে।

এবং ফলে ভিয়েতনামের বুকে সংমাই মাইলাইয়ের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

আমেরিকা ১৯৭১ সালে ভিয়েতনামে ৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টন টি এন টি ব্যবহার করেছে। হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমার তুলনায় ৪০ গুণ বেশি শক্তিশালী বিস্ফোরক ভিয়েতনামে ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য।

গ্যাস আর রসায়ন প্রয়োগ করে ভিয়েতনামের স্বর্ণপ্রসূ মাটিকে বন্ধ্যা করে দেওয়া হচ্ছে যাতে স্বাধীন মুক্ত ভিয়েতনামকে ভবিষ্যতে না-খেয়ে মরতে হয়। হ্যাঁ, 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য।

ভিয়েতনামের জলে আকাশে বাতাসে বিষ ছড়ানো হয়েছে। এমনকি মাতৃগর্ভেও শিশুরা নিরাপদ নয়। ভিয়েতনামের অসংখ্য জননী বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব শুরু করেছেন। হ্যাঁ, 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্যই।

পৃথিবীর সব থেকে 'ধনী' দেশ হয়েও যে-আমেরিকায় দারিদ্র্য আছে, অনাহার আছে; পৃথিবীর সব থেকে 'উন্নত' দেশ হয়েও যে-আমেরিকায় নিগ্রোদের দাসের জীবন যাপন করতে হয়; পৃথিবীর সব থেকে 'অগ্রগামী' সংস্কৃতির ধারক হিসেবে যে-আমেরিকা মানবজাতিকে পারমাণবিক বোমা, পপ সং, মারি যুয়ানা আর বীট জেনারেশন উপহার দিয়েছে; বিশ্ব-গণতন্ত্রের 'আছি' যে-আমেরিকায় আত্মহত্যা মানসিক ব্যাধি আর ক্রাইম একেবারে জল-ভাত, যে-দেশে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পথে খুন হয় এবং টেলিভিশনে সেই খুনের দৃশ্য ও খুনীকে হত্যার দৃশ্য চমৎকার দেখানো যায়···গণতন্ত্র যেখানে এতই অবাধ—সেই রাষ্ট্রযন্ত্র ভিয়েতনামে গণতন্ত্রের পতাকাকে উড্ডীন রাখার জন্য মাতৃগর্ভকে কি রেহাই দিতে পারে? শান্তি ও মুক্তিকামী হাজার লক্ষ আমেরিকানকে যারা নিজ বাসভূমে পরবাসী করে রেখেছে বা দেশের বাইরে ঠেলে দিয়েছে, যারা মানবসভ্যতার আতঙ্ক, যুদ্ধ এবং শোষণ যাদের অস্তিত্বের ভিত্তি, সমরাস্ত্রবিক্রেতারা একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যাদের অদৃশ্য পরিচালক সেই মার্কিন-প্রশাসন কত লক্ষ ডলারের যোগফল তা কি কোনো কমপিউটারই হিসেব করে বলতে পারবে?

কিন্তু ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে মানুষ অপরাজেয়। সে প্রকৃতি-বিজয়ী। সে নতুন সভ্যতার নির্মাতা।

এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে রুশদেশে ফ্যাসিবাদের কবর খোঁড়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদের কবর তৈরি হচ্ছে। ধন্য আমাদের

জীবন— আমরা এই আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী হতে পারলাম।

ছোট্ট দেশের ছোট্ট মানুষগুলোর মধ্যে পৌরাণিক কল্পনা মূর্ত রূপ নিচ্ছে। নীলকণ্ঠ ভিয়েতনাম শুধু নিজের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে না—পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদের হলাহল অঞ্জলি পেতে নিয়ে পৃথিবীকেও রক্ষা করছে, আমেরিকার মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে 'অন্য আমেরিকা'।

নীলকণ্ঠ ভিয়েতনামের এক হাতে সংহার অন্য হাতে সৃষ্টি। এক হাতে সে সাম্রাজ্যবাদের কোমর ভেঙে দিচ্ছে। অন্য হাতে চাষ করছে স্কুল গড়ছে ভালোবাসছে সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। তৃতীয় নয়নে তার নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকে পর্যায়ক্রমে ফরাসী জাপানী আবার ফরাসী তারপর খোদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যাদের ধারাবাহিক লড়াই করতে হয়েছে সেই দেশ মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই তার সমগ্রতার সাধনাকেও অব্যাহত রেখেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যে-শিশু জন্মেছিল, যুদ্ধাবস্থায় বড় হয়ে আজ যে যুবক, মার্কিন বোমারু বিমানের ইস্পাতে তৈরি আঙটি যে তার প্রণয়িনীকে উপহার দেয়—সে কিন্তু গান গায়, ছবি লেখে, নাচে। শেকস্পীয়ারের নাটক, পল রোবসনের গান, সোভিয়েত ব্যালে, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নেরুদার কবিতা, নিগ্রো লোকগীতি· কিছুই তার কাছে বিদেশী নয়।

এই ভিয়েতনামকে পরাস্ত করবে কে? এই ভিয়েতনামের সামনে বাবু নিকসনের সাধের 'ভিয়েতনামীকরণ' তত্ত্বও মিথ্যে হয়ে গেছে।

তাই এখনও প্রায় এক লক্ষ মার্কিন সৈন্য ভিয়েতনামে বহাল আছে। তাছাড়া টনকিন উপসাগরে পাহারারত সপ্তম নৌবহরের শক্তিকে দ্বিগুণ করা হয়েছে। বিমানবাহী জাহাজ এবং ডেস্ট্রয়ার এসেছে। ভয়ঙ্কর বি-ফিফটি টু আর জেট বোমারু বিমানের সংখ্যাও দ্বিগুণের বেশি করতে হয়েছে। এবং, জ্যাক এ্যানডারসন সাক্ষ্যপ্রমাণসহ ফাঁস করে দিয়েছেন—আমেরিকা ভিয়েতনামে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের পরিকল্পনা করছে। সে-অস্ত্রের নামটি ভারী সুন্দর—'ন্যুকস'। অনায়াসে ভাবা যেত 'কোক'-এর মতোই মার্কিন কালচার বুঝি পৃথিবীকে এক নতুন পানীয় উপহার দিচ্ছে।

এই মারাত্মক হুমকি এবং বিগত কয়েকদিনের ভয়াবহ আক্রমণের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিয়েতনাম কি করছে?

সে মার্কিন সমরশক্তির মীথ সপ্তম নৌবহরকে সোজা আক্রমণ করেছে।

এ-এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তাছাড়া প্রতিদিনই আঁকশি দিয়ে কুল পাড়ার মতো কয়েকটা বি-ফিফটি টু বিমান মাটিতে টেনে নামাচ্ছে। আর মার্কিন ও তাঁবেদার বাহিনীর হাত থেকে প্রায় ঝড়ের বেগে একটার পর একটা ঘাঁটি দখল করে সায়গনের দিকে ধেয়ে চলেছে। ভিয়েতনামের আকাশে নক্ষত্রের অক্ষরে এখন একটিই লেখা : "শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড।"

ভিয়েতনামের প্রশ্নে মার্কিন সমরশক্তি পৃথিবীকে পারমাণবিক যুদ্ধের কিনারে ঠেলে দিচ্ছে।

অথচ এই সঙ্কটমুহূর্তে বিশ্ববিপ্লবের 'ঝটিকাকেন্দ্র' চীন আশ্চর্যভাবে নীরব।

মাও সে তুঙ ও তাঁর অনুগামীদের পাপের কোনো সীমা নেই। বিগত কয়েক বছরে লক্ষ কোটি টন কাগজ খরচ করে এবং শক্তিশালী বেতারযন্ত্রের সাহায্যে এবং এমনকি কূটনৈতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমসহ সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে চীন ন লক্ষ নিরানব্বই হাজার উনপঞ্চাশতম বিবৃতিতে প্রমাণ করতে চেয়েছে সোভিয়েত ও আমেরিকা দুই সহযোগী শক্তি হিসেবে পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল ও অন্য নানা উপায়ে পৃথিবীকে ভাগ করে নিতে চায়।

আমেরিকা যেমন পৃথিবীতে গণতন্ত্রের স্বয়ংনিয়োজিত অছি, চীনও গত দশ বছরে তেমনি বিপ্লবের অছি হিসেবে নিজেই নিজেকে নিয়োগ করেছে।

ফল ? বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ভাগবিভাগ। পরিণামে পৃথিবীর প্রতিটি মুক্তিযুদ্ধকে কী অপরিসীম মূল্যই না দিতে হল !

উগ্র জাত্যাভিমান বোনাপার্ট ও ট্রটস্কির বিচিত্র কম্বাইন এই মাওচক্র গত দশ বছরে পৃথিবীর যে-ক্ষতি করল তার তুলনা হয় না। আর এ সব কিছুই করল সৃজনশীল মার্কসবাদ তথা মাওবাদের নামে, লাল পতাকার নামে, বিপ্লবের নামে।

ক্রমে ক্রমে জানা যায় আমেরিকা পশ্চিম জার্মানি এবং অন্য কোনো কোনো দেশের সঙ্গে এই বিশুদ্ধ বিপ্লববাদীদের দিব্য লেনদেনের সম্পর্ক আছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে চীনা পররাষ্ট্রনীতি রহস্যময় ভূমিকা অবলম্বন করে। কিন্তু সাম্প্রতিক বাঙলাদেশের প্রশ্নে চীনের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে যায়। এখন ভিয়েতনামযুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতিতে চীনকে দেখাচ্ছে যেন পার্ট ভুলে যাওয়া অসহায় ভাঁড়, যার ভূমিকা ছিল যোদ্ধার এবং কোমরে আছে তলোয়ার।'

হ্যাঁ, মার্কিন-সোভিয়েত ব্ল্যাকমেইল থেকে পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্যই তো

চীন পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পিং পং পলিটিকস এবং মিস্টার ও মিসেস নিকসনের হনিমুন চায়না স্টাইলের পর চীনের এ-মোহমুগ্ধ অবস্থা কেন? বিশ্ববিপ্লবের অছি মাও সে তুঙ প্রতিবেশী একটা জাতির যন্ত্রণা ও সংগ্রাম সম্পর্কে এত নির্বিকার থাকেন কি করে? উঠতে বসতে যারা বিবৃতির বন্যা বহাত, তারা একটা কার্যকরী প্রতিবাদ জানাতে কেন এত সঙ্কোচ বোধ করছে? নাকি ধ্যানস্থ মাও সে তুঙ একেবারে মুখ খুলবেন ভিয়েতনামের শোধনবাদী নেতৃত্ব সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিতে? এখন কি তারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন?

মুখ খুলেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের হুমকির জবাবে বলেছে : হ্যাঁ, ভিয়েতনামকে আমরা সব রকম সাহায্য দিচ্ছি এবং দেবো।

ভিয়েতনামের যুদ্ধ নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। প্রাথমিক সাধারণ গেরিলাযুদ্ধের স্তর সে অনেকদিন অতিক্রম করেছে। সেখানে বর্তমানে উন্নত মার্কিন অস্ত্রের মোকাবেলা করছে উন্নত সোভিয়েত অস্ত্র। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই শতাব্দীর বৃহত্তম লড়াই লড়ছে ভিয়েতনাম, তাকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং রক্তপতাকার শুদ্ধতা এইভাবেই রক্ষিত হচ্ছে।

আর, ভিয়েতনামের এই ন্যায়ের সংগ্রামের পক্ষে সমগ্র পৃথিবীর বিবেক ও মনুষ্যত্ব এক হয়েছে।

পৃথিবীগ্রহের যেখানেই মানুষ আছে—সেখানেই ভিয়েতনামের সমর্থনে শপথ উচ্চারিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি ও শান্তির জন্য মানবজাতির এমন যুক্তফ্রন্ট ইতিপূর্বে মাত্র একবার হিটলারের ফ্যাসিস্ট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে আমরা ইতিপূর্বেই ভিয়েতনামের জন্য রক্তের প্লাজমা পাঠিয়েছি, ওষুধ এবং অন্যান্য উপহার।

ভারতবর্ষের মানুষের মনেও ভিয়েতনামের প্রশ্নে বিপুল আপসার্জ দেখা গিয়েছে।

ভারতবর্ষের শিল্পী-সাহিত্যিকরাও ভিয়েতনামের পক্ষে সদর্থকভাবে তাঁদের সৃষ্টিশক্তিকে নিয়োজিত করেছেন।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রশক্তিও ভিয়েতনামের পক্ষে ক্রমে ক্রমে ইতিবাচক ব্যবস্থা অবলম্বন করছে।

ভিয়েতনাম ও ভারতবর্ষের মধ্যে রক্তের রাখি বাঁধা হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন: "ভিয়েতনামের জনগণের জয় অনিবার্য।"

বলেছেন: "ছোট্ট একটি রাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের মোকাবিলা করেছে—মানুষের অদম্য মনোবলের এ এক মহা গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।… ভিয়েতনামের জনগণের জয় যে বেশি দূরে নয় সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তাঁদের আত্মত্যাগ কখনোই বৃথা যাবে না। বৃহৎ শক্তিকে তাঁরা এটা বেশ ভালোভাবেই সমঝে দিতে পেরেছেন যে পরের ব্যাপারে নাক গলানোর ফল ভালো হয় না। এশিয়াবাসীদের নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দেওয়ার নীতি সহ্য করা হবে না।"

প্রধানমন্ত্রী বিশ্লেষণ করে বলেছেন: "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও এশিয়ার কোন-না-কোন অংশে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই যুদ্ধ হচ্ছে। এর অধিকাংশেরই কারণ হল—দখলদারি ছেড়ে যেতে সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছা।"

আমেরিকার ভিয়েতনামযুদ্ধকে তিনি বলেছেন "নবরূপে পুরনো উপনিবেশবাদেরই জলজ্যান্ত উদাহরণ।"

ইতিহাসের কি পরিহাস! যে-ভারত সরকারকে রেডিও পিকিং "আমেরিকার পোষা কুত্তা" বলেছিল, তার প্রধানমন্ত্রীর মুখে যখন এমন প্রতিবাদ—তখন মাও সে তুঙ বা চৌ এন লাইয়ের চোখেমুখে নতুন বন্ধুদের কীর্তিদর্শনে শুধুই "অস্বস্তি"।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভিয়েতনামের প্রশ্নে ভারতবর্ষের মনের কথাই বলেছেন। ভারত সরকার যে অচিরে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবে, এ-বক্তৃতা তারই পূর্বাভাস।

লক্ষ্য করেছি বাঙলাদেশের জনগণও ভিয়েতনামের সমর্থনে মিছিল করেছেন। চীন ও মার্কিন অস্ত্রে বিধ্বস্ত শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বাঙলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের বিশিষ্ট মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা তাজুদ্দিন এবং কমিউনিস্ট নেতা মণি সিং পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ভিয়েতনামের সমর্থনে শপথবাক্য উচ্চারণ করেছেন।

আমেরিকাসহ পৃথিবীর দেশে দেশে একই দৃশ্য। আমেরিকায় স্মরণকালের মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এমন প্রবল ও সংগঠিত বিক্ষোভ দেখা যায় নি।

ভিয়েতনামের পরশমণির ছোঁয়ায় দিকে দিকে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে।

ভারতবর্ষের মার্কিন লবি বিপন্ন, কিন্তু নিষ্ক্রিয় নয়। অবাধ গণতন্ত্রের মিথ্যে ছলনায় এখনও তারা কিছু লোককে ভুলোতে পারছে। কিন্তু বাঙলাদেশ ও ভিয়েতনামের রক্তমাখা এই হাতগুলোকে ঐ ব্যক্তিরা এখনও স্পর্শ করেন কি করে!

ভারতবর্ষের চীনাপন্থীরা বিপন্ন, কিন্তু নিষ্ক্রিয় নয়। তবে বাঙলাদেশ ও ভিয়েতনামের প্রশ্নেই তাঁদের বিরাট অংশের মধ্যে নানা প্রশ্ন জেগেছে। আমরা একে স্বাগত করি। মার্কসবাদ মানুষের পক্ষে। যারা তাকে মৃত্যুর মন্ত্রে পরিণত করতে চায়—তাদের পাপের সীমা নেই। মাও সে তুঙ ও তাঁর অনুচরদের জন্য ইতিহাসের প্রচণ্ড শাস্তি অপেক্ষা করছে—এ-সত্য যেন না ভুলি। ঐ মৃত্যুপূজারীদের সমর্থন মানেই মৃত্যুকে সমর্থন। এটা মানুষের কাজ নয়।

মানুষের কাজ মৃত্যুকে পরাস্ত করা। মৃত্যুব্যবসায়ী ও মৃত্যুপূজারী—যে-ছদ্মবেশেই তারা আসুক না কেন—মনুষ্যত্বের শত্রু। মানুষের কাজ মনুষ্যত্বের শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করা।

ভিয়েতনামযুদ্ধের অবসান আসন্ন। নীলকণ্ঠ ভিয়েতনামের কাছে মৃত্যু পরাস্ত হচ্ছে।

আজ পৃথিবী জুড়ে তাই উৎসবের আহ্বান। মানুষের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য অমৃতের সন্তানগণ মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। জীবনে মননে সত্য হন। ভিয়েতনাম-জননীর মাতৃগর্ভকে নিরাপদ করার জন্য আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুধটি দানবদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হোক। সেই হবে ভিয়েতনাম-বিজয়-উৎসবের যথার্থ সূচনা!

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-বাঙলাদেশ : মৈত্রীপথের নতুন দিগন্ত

উনিশ শ বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস ভারত ও বাঙলাদেশের মানুষের জীবনে ঐতিহাসিক দুটি ঘটনা উপহার দিয়েছে। তার একটি ঘটেছে ২০এ মার্চ—এই দিন বাঙলাদেশ-প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন; আর ২৬এ মার্চ পালিত হয়েছে বাঙলাদেশ নামের নবজাত রাষ্ট্রের প্রথম স্বাধীনতা দিবস। ২০এ মার্চের সকালে ঢাকার

বঙ্গভবনে যে-চুক্তি স্বাক্ষরিত হল তার মূল কথা ও সুর ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর একথা বলা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে ২৬এ মার্চের বাঙলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের দিনটির সঙ্গে এই চুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির যোগ এক মহান সম্ভাবনার দ্যোতনা করেছে।

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আজ যে বিশাল কর্মধারা বয়ে চলেছে, যে অমোঘ পরিণতির দিকে পথযাত্রা করতে গিয়ে এই গ্রহের মানুষ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে, এই দুটি ঘটনা সে কর্মকাণ্ডের সেই যাত্রাপথের দুটি উল্লেখ্য দিক্‌দর্শক হয়ে থাকবে। বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ভেঙে পড়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ঔপনিবেশিক পাপচক্রের বুকে এক বিরাট আঘাত। তাই তার স্বাধীনতা দিবসের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের দিনে সারা দেশ জুড়ে যখন মুক্তির পতাকা উড়তে থাকে, যখন ঔপনিবেশিক পাপবুদ্ধির ফলে জাত দুই দেশের মধ্যেকার কৃত্রিম অবিশ্বাস সন্দেহ ও বৈরীভাব দূর হয়ে গিয়ে শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার বাণী উচ্চারিত হয়, তখন কেবল মাত্র আমাদের মনেই খুশির হাওয়া বয় না—সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী জনতার প্রাণেও 'নতুন সমাজ' গড়ে ওঠার সম্ভাবনার হাওয়া লাগে।

এই মুহূর্তে নিকট অতীতের সেই দিনগুলির কথা পর্যালোচনা করা বোধ-হয় অবান্তর হবে না। ১৯৪৭ সালের আগস্টে—র‍্যাডক্লিফের খড়্গে দ্বিজাতি-তত্ত্বের বিষ মাখানো ছুরি যেদিন বাঙলা তথা ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করল সে দিন—সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে এ দেশের দুই ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মধ্যযুগীয় অন্ধকার আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব ধরে নাড়া দিল। উপনিবেশ-বাদী ইংরাজ ও সামন্তরাজাদের শোষণে দীর্ণ, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা আর দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট এই ভারতভূমির মানুষের অভিশপ্ত জীবনে দেশভাগের মধ্য দিয়ে এসে গেল শৃঙ্খলমোচনের মুহূর্ত—১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল। তখন খাঁচায় বন্দী ভারতবাসীর সামনে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির প্রতীক র‍্যাডক্লিফ সাহেব, পশ্চাৎপটে দ্বিজাতিতত্ত্বের পীঠস্থান কলকাতা, বিহার, লাহোর। দুই ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম অবিশ্বাস, দ্বেষ এবং জিঘাংসা।

আজ আর পিছনে চলার দিন নেই, দুই রাষ্ট্রেই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছে। ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দুই রাষ্ট্রই এগিয়ে চলার কথা ঘোষণা করেছে: "আমরা শান্তি, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় সঙ্কল্পবদ্ধ এবং যতদূর

সম্ভব পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা নিজ নিজ দেশের উন্নতিবিধানে দৃঢ় সঙ্কল্প। উভয় দেশের মধ্যকার মৈত্রী সম্পর্কের বিস্তার ও সংহতি-সাধনও আমাদের লক্ষ্য। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় যে, উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হলে তা উভয় দেশের জাতীয় স্বার্থের এবং এশিয়া ও বিশ্বে স্থায়ী শান্তি রক্ষার সহায়ক হবে।

"বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার শক্তি বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক উত্তেজনার প্রশমন এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণ বৈষম্য ও সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত অবসানই আমাদের লক্ষ্য।"

পঁচিশ বছর আগে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য যে দুই পৃথক রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং স্বার্থান্বেষী শক্তি সমন্বয়ে বার বার যে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রাখা হয়েছিল সেই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আগামী ২৫ বছরের জন্য রাষ্ট্রগত ভাবে সুদৃঢ় মৈত্রীর বন্ধন স্থাপিত হয়েছে। দুই দেশের প্রধানদের চুক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে দুই দেশের সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা: "আমরা উভয় দেশে শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। এই আদর্শের বাস্তব রূপায়নের জন্য আমরা মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছি এবং রক্ত ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের মৈত্রীবন্ধনকে সুদৃঢ় করেছি। এরই ফলে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছে। আমরা উভয়েই আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব এবং সৎ প্রতিবেশীর সম্পর্ক রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ এবং আমাদের উভয় দেশের মধ্যকার সীমান্ত অবিনশ্বর শান্তি ও মৈত্রীর সীমান্তরূপে গড়ে তুলতে দৃঢ় সঙ্কল্প।"

১৯৪৬ থেকে আজ পর্যন্ত আমরা একটি শব্দকে বড় বেদনার সঙ্গে ব্যবহার করে এসেছি, সেটি হল 'ভ্রাতৃঘাতী'। এবার তার জায়গায় ব্যবহার করছি 'সৌভ্রাতৃত্ব'। এই যে পরিবর্তন, এই পরিবর্তনই প্রয়োজনে "এক নদী রক্ত" বইয়ে দিয়েছে, আর সেই রক্তধারায় বাঙলাদেশের মা, ভাই, বোনের প্রবাহিত রক্তস্রোতের সঙ্গে এ-দেশের বীর জওয়ানদের রক্তও মিশেছে। বাঙলাদেশে মুক্তির লড়াই নিপীড়িত জনতার সংগ্রাম। শোষণে জর্জরিত বাঙলাদেশবাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক সামরিক শাসকের এবং তার সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজির রক্ষকদের মুখ ভালোভাবেই চিনেছিলেন। আর তাই শোষণমুক্তির সংগ্রামের যে ধাপে তাঁরা পা ফেললেন তা ধ্রুপদী সংগ্রামের মহিমায় উজ্জ্বল।

এই বাঙলাদেশ ভূগোলের সীমান্তের হিসাবে নিশ্চয়ই পৃথক রাষ্ট্র। অর্থনীতি, সমাজগঠন, এমনকি সাংস্কৃতিক বিকাশের হিসাবেও সে আলাদা। তার সংগ্রাম তার সমস্যা গত ২৫ বছরে তাকে নতুন রূপ দিয়েছে। গত ২৫ বছরের ব্যবধান অর্থাৎ এক পুরুষের ফারাক সর্বক্ষেত্রে তাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। নবীন বাঙলাদেশ আমার ভাই, আমার প্রতিবেশী। তাই কেউ যদি ভাবেন যে দু-দেশের সীমানা মুছে দেওয়া যায় তবে তা হবে মারাত্মক ভুল, এ জন্যই চুক্তিতে বলা হয়েছে, "আমরা জোট-নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগিতার মৌলিক নীতিতে দৃঢ় আস্থাশীল, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরোধী এবং উভয় দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।"

২০ মার্চের এই ঐতিহাসিক চুক্তির পাঁচ দিন পরেই ছিল নবজাত রাষ্ট্রের প্রথম স্বাধীনতা দিবস। এক বছর আগে এই ২৬ মার্চেই বাঙলাদেশের মানুষ শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে সামরিক শাসনের বর্বরতার প্রতিবাদে স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের জন্য ঘোষণা করেছিল। ২৫এ মার্চের রাত্রির মিলিটারি আক্রমণের নিষ্ঠুরতা মাথায় নিয়ে এক বছর আগে বাঙলাদেশের যৌবন বাঙলাদেশের শ্রমশক্তি বাঙলাদেশের কর্মজীবী আর বুদ্ধিজীবীর মিলিত চেতনা বুঝতে পারল যে ২৫ বছর আগের ১৪ আগস্টের দিনটি ছিল ভুয়া— পাকিস্তান নামের আড়ালে শোষণের রকমফের মাত্র। আর তাই চরম মুহূর্তে— অত্যাচারীর তীক্ষ্ণ নখরের সামনে রুখে দাঁড়াল অমিত বিক্রমে অবিনশ্বর এক মূর্তি, জনতার মহান সংগ্রামী চেতনা। জন্ম হল নয়া রাষ্ট্রের, নয়া জমানার।

অনেক অশ্রু রক্ত আর প্রাণের বিনিময়ে, অনেক বর্বরতার মোকাবিলা করে, অনেক পিশাচের লুব্ধতার শিকার হয়েও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী জনগণ তাঁদের স্বাধীনতা ঘোষণার মর্যাদা রেখেছেন। আর তাই এবার ২৬এ মার্চ দেশের কর্ণধার শেখ মুজিবর রহমান জাতির উদ্দেশে বললেন, "এই দেশের প্রগতিবাদী ও নির্যাতিত মানুষের জন্যই আজকের এই স্বাধীনতার লক্ষ্য হচ্ছে সকলের জন্য এক সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যত গড়ে তোলা। এবার আমাদের এই মহান জনগণ দেশ পুনর্গঠনের কাজে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।"

'দেশ গঠনের কাজে সংগ্রাম' চালিয়ে যাবার শপথ নিয়েছেন বাঙলাদেশের ছাত্ররাও, শপথ নিয়েছেন সমগ্র জনগণ।

আমরা জানি, বাঙলাদেশের শত্রুরা আপাতত চুপ থাকলেও সুযোগ

খুঁজছে দেশের প্রকৃত হিতকে ব্যাহত করার। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত করার জন্যও নানা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক স্তরে চলছে নানা ষড়যন্ত্র: যারা বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময়ে তাকে বানচাল করার জন্য নানাভাবে সক্রিয় ছিল সেইসব দেশ ঘা খাওয়া পাগলা কুকুর হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। আর তাই এই দুই দেশের সম্পর্ককে অটুট রাখার এবং বাঙলাদেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখার মধ্য দিয়ে ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে হবে। তাই ভারত আর বাঙলাদেশের দুই দেশের মানুষের মহান কর্তব্য হবে এদের লুকনো বাঘনখগুলির ওপর প্রতিনিয়ত নজর রাখা। কারণ একথা কখনোই যেন আমরা ভুলে না যাই যে, "Imperialist bourgeoisie is prepared to go any length of savagery, brutality and crime in order to preserve perishing capitalist slavery." (V. I. Lenin)

এজন্যই আজ ভারত-বাঙলাদেশ মৈত্রীচুক্তির নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি মনে রাখা উচিত:

"চুক্তিকারী উভয় পক্ষ এমন কোনো সামরিক চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করবে না যা অপর পক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হতে পারে। চুক্তিকারী প্রতিপক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে এবং নিজ ভূমিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে দেবে না যার ফলে অপর দেশের কোন প্রকার সামরিক ক্ষতি ঘটতে পারে বা তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।" (অষ্টম অনুচ্ছেদ) "তৃতীয় কোন পক্ষ চুক্তিকারী কোন দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হলে অপর পক্ষ অনুরূপ তৃতীয় পক্ষকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দান থেকে বিরত থাকবে।

"চুক্তিকারী একটি পক্ষ যদি অপর কোন শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় বা আক্রমণের আশঙ্কার সম্মুখীন হয় তা হলে ঐ আশঙ্কার নিরসন করে উভয় নিরাপত্তা সুস্থির করার উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষ অবিলম্বে যথোপযুক্ত কার্যকরী দেশে শান্তি ও ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য পারস্পরিক আলোচনায় মিলিত হবে।"

(নবম অনুচ্ছেদ)

এই অনুচ্ছেদ দুটির দিকে চোখ রেখে আমরা যদি বাঙলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের সময় ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তিরও ঠিক অষ্টম এবং নবম অনুচ্ছেদ দুটি স্মরণকরি তবে বোধহয়

স্বাধীনতা রক্ষা ও দেশগঠনের সংগ্রাম করতে আমাদের অনেক সুবিধা হবে।

মলয় দাশগুপ্ত

অর্থনীতিবিদ সাইমন কুজনেটস্

সাইমন কুজনেটস্ অর্থশাস্ত্রজগতে একটি বিশিষ্ট নাম। 'অর্থনৈতিক উন্নতির ঘটনা-ভিত্তিক ব্যাখ্যা' দেওয়ার জন্য তাঁকে ১৯৭১ সালের নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। প্রখ্যাত নোবেল প্রাইজ দাতার স্মৃতি রক্ষার্থে সুইডিশ ব্যাঙ্ক এই পুরস্কার দেওয়ার প্রথা চালু করেন বছর কয়েক আগে। কুজনেটস্ হলেন দ্বিতীয় আমেরিকান এবং চতুর্থ অর্থনীতিবিদ যাঁকে এভাবে সম্মানিত করা হল। যে-কজন মার্কিন অর্থনীতিবিদ এ কথা স্বীকার করেছেন যে মূলধন জনিত আয়-এর চেয়ে শ্রমিক জনিত আয় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষিত শ্রমিক হল অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শুধু জরুরি নয়, একটি বিশিষ্ট উপাদান—কুজনেটস্ তাঁদেরই একজন।

জার আমলের রাশিয়ার খারকভ শহরে কুজনেটস্-এর জন্ম। রাশিয়ার 'নব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' (New Economic policy) চালু হওয়ার কিছুদিন আগেই ২০ বছর বয়সে কুজনেটস্ আমেরিকায় চলে যান। কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটি থেকে ১৯২৩ সালে উনি বি. এস. সি. পরীক্ষা পাশ করেন এবং ১৯২৬ সালে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ১৯৬০ সালে হারভার্ড য়ুনিভার্সিটিতে যোগদান করবার আগে উনি পেনসিলভেনিয়া এবং জন হপকিনস বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৪ সালে তাঁকে আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশন-এর সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সভাপতির ভাষণে কুজনেটস্ ব্যক্তিগত আয়ের বণ্টনের চরিত্র এবং কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "এই প্রবন্ধটির সংখ্যাশাস্ত্রীয় ভিত্তি ৫%, বাকি ৯৫% নিছক কল্পনা—বলা যায় আশাবাদী কল্পনা! এমন দুর্বল ভিত্তির ওপর এমন একটি বিরাট পরিকল্পনা খাড়া করা হল কেন এ কথা যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে কারণ হিসেবে বলতে হবে যে এই বিষয়ের গভীর আগ্রহের দরুনই এই পরিকল্পনাটি সম্ভব হয়েছে—ব্যক্তিগত আয়ের বণ্টন সম্পর্কে আরো গভীর এবং বিস্তারিত জ্ঞানের প্রয়োজন, যার অভাবে সামাজিক জীবনের গতি সম্পর্কে আমরা কোনো পরিষ্কার ধারণাই করতে পারব না। তাছাড়া এই

বিষয়ে জ্ঞানলাভ করলে আমরা অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে যত নতুন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত আছে, তাদের মূল্যায়ন করতে পারব। এর জন্যে আমরা যাকে আপাতত অর্থনৈতিক গণ্ডী বলে মনে করি সেই গণ্ডী ছাড়িয়ে তার বাইরের জগতে প্রচুর আনাগোনা করবার প্রয়োজন আছে।" এই বাইরের জগতকে লক্ষ্য করে কুজনেটস্ বললেন, "সংশ্লিষ্ট সমাজতথ্যগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পারলে আমাদের পক্ষে খুবই সুবিধে হবে। এর ফলে আমরা জানতে পারব জনসংখ্যাবৃদ্ধির রূপরেখা, শিল্পক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণ এবং নীতি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে-উপাদানসমূহ প্রভাবিত করে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে মানবিক ব্যবহারপদ্ধতির একটি পরিকল্পিত রূপরেখা যেখানে মানুষকে খানিকটা প্রাণীজগতের এবং খানিকটা সামাজিক জগতের অংশ বলা যেতে পারে। এই বিষয়ে ভালোভাবে কাজ করার অর্থ হবে বাজার অর্থনীতির সীমারেখা ছাড়িয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক অর্থনীতির গণ্ডীতে প্রবেশ করা।"

১৯২৭ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ইকনমিক রিসার্চের সভ্য থাকাকালীন কুজনেটস্ তাঁর রিসার্চের প্রধান অংশ শেষ করেন। তাঁর প্রথম জীবনের লেখাগুলির মধ্যে 'উৎপাদন এবং দামের অতিদীর্ঘকালীন গতি' (Secular Movements in Production Prices) ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। এখানে ব্যবসা-চক্রের আর্থিক ব্যাখ্যাটিকেই সমর্থন করা হয়েছে। একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন উন্নতির হিসেব করবার জন্য কুজনেটস্ একটি চক্ররেখা আঁকেন যাতে শতকরা উন্নতির ক্রমহ্রাসমান অনুপাত এবং শূন্য থেকে সর্বাধিক পরিমাণ পর্যন্ত উৎপাদনের বৃদ্ধি ধরা পড়তে পারে।

জাতীয় আয়ের বিষয়ে কুজনেটস্-এর একটি প্রবন্ধ ১৯৩৩ সালে 'Encyclopaedia of the Social Sciences'-এর একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে কুজনেটস্-এর নিজের মত হল যে এটি কিন্তু কোনো বিশ্লেষণমূলক লেখা নয়। বরং একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নধর্মী লেখা। এই লেখাটিকে কলিন ক্লার্ক-এর 'অর্থনৈতিক উন্নতির শর্তসমূহ' নামক প্রবন্ধের পূর্বসূরী বলা চলে। এখানে কুজনেটস্ ভারতবর্ষ সমেত ১৫টি দেশের জাতীয় আয় একত্র করেন এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যগুলি স্পষ্ট করেন। এই প্রবন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য হল তাঁর ব্যক্তিগত আয়-বণ্টনের অংশটুকু। এখানে উনি প্যারেটো সূত্রের কথা উল্লেখ করেন এবং আয়-বণ্টনের অসামঞ্জস্য নির্ধারণের

বিভিন্ন উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু ১৯৩২-৩৩ সালে কাজ করতে গিয়ে সংখ্যাশাস্ত্রীয় প্রমাণের দারুণ অভাবের দরুন তিনি একটা দেশের মধ্যে আয়-বন্টনের পার্থক্য, অথবা এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের তুলনা করতে গিয়ে বেশ অসুবিধের মধ্যে পড়ে যান। তার পর থেকে কিছুটা কুজনেটস্-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের দরুন আর কিছুটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ার দরুন, জাতীয় আয়—এই বিষয়টি সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'জাতীয় আয় ও মূলধনের সমাবেশ' লেখাটিতে কুজনেটস্ দেখান যে জাতীয় আয় হল বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদনসমূহের সমষ্টি। বিভিন্ন উৎপাদন-উপকরণগুলির মধ্যে আয়-বণ্টন এবং ব্যবসায় সঞ্চয় সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। তিনি আরো দেখান যে উৎপাদনের যে-অংশ শ্রমিক সম্পত্তির মালিক ও উদ্যোগপতির হাতে যাচ্ছে, তা যেমন একই শিল্পজোটের মধ্যে বিভিন্ন হতে পারে তেমনি বিভিন্ন শিল্পজোটের মধ্যেও বিভিন্ন হয়ে থাকে। একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হল জাতীয় আয়ের যে-অংশটি শ্রমিকের ভাগে যাচ্ছে তাতে সামান্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং এর কারণ হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পজোটের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ফলেই মজুরদের ক্ষতিপূরণের আপেক্ষিক অংশ স্পষ্টতই নেমে চলেছে।

প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত কুজনেটস্-এর আরেকটি লেখা হল 'সামগ্রী-সরবরাহ ও মূলধনের সমাবেশ'। এর বেলাতেও সংখ্যাশাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাবে লেখককে প্রচুর অসুবিধে ভোগ করতে হয়। এখানে, শেষ ক্রেতারা যে-মূল্য দিচ্ছেন সেই মূল্যে তাঁদের কাছে কি পরিমাণ সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে তিনি গবেষণা করেন, অবশ্য আমদানি ও রপ্তানি করা সামগ্রীর অংশটুকু বাদ দিয়ে। এটি করতে গিয়ে তিনি 'দ্বিবাৎসরিক শিল্পোৎপাদন পরিসংখ্যান' নামক সরকারী বিবরণীতে প্রকাশিত তথ্যসমূহ ব্যবহার করেন। প্রথমে তিনি উৎপাদনগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেন—উৎপন্ন সামগ্রী এবং আধা-উৎপন্ন সামগ্রী। যে-ক্ষেত্রে এই দুটি একত্রে আছে সে-ক্ষেত্রে তিনি তাদের অনুপাত নির্ধারণের ব্যবস্থা করেন। তারপর কম উল্লেখযোগ্য সামগ্রী-গুলি এর ভেতর ঢোকান এবং তাঁর হাতে যেসব তথ্য ছিল তার ওপর নির্ভর করে এদের মূল্য পরিবর্তনের সামঞ্জস্য যত ক্ষুদ্রসংখ্যক সামগ্রীর মধ্যে করা সম্ভব তা করেন। পরের ধাপে তিনি এইসব মূল্যের সঙ্গে শেষ ভোগ-

ব্যবসায়ীদের এই সব সামগ্রীর জন্য যে মূল্য দিতে হয় তার পার্থক্য অনুসন্ধান করেন। এই সম্বন্ধে তিনি অবশ্য বহন খর্চা এবং বিতরণকারীদের পারিতোষিক, ভোক্তাদের দেয়-মূল্যের মধ্যে ধরে নিয়েছেন।

১৯৫৫ সালে অর্থনৈতিক পরিবর্তন, ব্যবসায়-চক্র, জাতীয় আয় এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে প্রবন্ধ-চয়নিকা নামে কুজনেটস্-এর একটি বিশিষ্ট রচনা প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা প্রবন্ধগুলি কুজনেটস্-এর বহুমুখী প্রতিভার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। 'শিল্প প্রসারে বাধা' (Retardation of Industrial Growth) নামক প্রবন্ধটি 'বিশেষ বিশেষ শিল্পের প্রসার-পদ্ধতি' নামক মৌলিক গবেষণার সংক্ষিপ্তসার। প্রাণীজগতে অনুকূল পরিস্থিতিতে যেভাবে জীবের সংখ্যা প্রথম দিকে ক্রমশই বাড়তে থাকে, তারপর সুস্থির হয় এবং এইভাবে কিছুদিন চলার পর এই সংখ্যা কমে যায়, শিল্পে নূতন সামগ্রীর বেলায়ও কুজনেটস্ অনুরূপ গতিপথ আবিষ্কার করলেন। প্রথমে এই উৎপাদন অতি দ্রুত হয়, পরে একটা সাম্যের অবস্থা চলতে থাকে এবং শেষে এটা কমে আসে। আরেকটি রচনা উৎপাদন-উপকরণ এবং চরম সামগ্রীর মধ্যে সম্পর্ক ত্বরণ-সিদ্ধান্ত এবং এর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসমর্থতার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। এটি লেখা হয়েছিল এখন থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে। কিন্তু accelerator-সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আজও এর সমকক্ষ রচনা হয়তো আর নেই। বইটিতে অন্যান্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে রয়েছে, স্থিতি ও গতি (Statics and Dynamics) এবং ভারসাম্য ও ব্যবসায় চক্র (Equilibrium Trend & Cycles), জাতীয় আয় এবং কল্যাণের অর্থ (Meaning of National Income & Welfare), অর্থনীতির বর্তমান গতি (Present Economic Tendencies), মার্কিন অর্থনীতির ওপর বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রভাব (Impact of Foreign Economic Relations on the United States Econony) ইত্যাদি।

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'যুদ্ধোত্তরকালে অর্থনৈতিক উন্নতি' (Post-War Economic Growth) বইটিতে কুজনেটস্ দেশের আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্নতা দেখিয়েছেন। এক অর্থে জাতীয়তাবোধের বৃদ্ধির ফলে ছোট ছোট আত্ম-কেন্দ্রিক জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। এরা এক হয়ে থাকলে আধুনিক অর্থ-নৈতিক বিকাশে এদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত হতে যতটা সুবিধে হতো তা

খর্ব করেই তারা নিজেদের এইভাবে বিভাজিত করে ফেলেছে। ঐতিহাসিক যুগে যেসব দেশে অর্থনৈতিক বিকাশ হয়েছিল সেই তুলনায় বর্তমানে ছোট ছোট জাতিভিত্তিক বিকাশ অনেকখানি ব্যাহত হয়েছে এবং এর জন্য তাদেরকে উত্তরোত্তর সরকারী নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। কুজনেটস্ দেখিয়েছেন যে শুধুমাত্র ১৯৫০ দশকে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে জাপান, জার্মানি এবং ইটালির অর্থনৈতিক উন্নতির হার সবচেয়ে বেশি ছিল, কিন্তু আমরা যদি একটা দীর্ঘকালীন দৃষ্টি গ্রহণ করি এবং ১৯৩০ থেকে ১৯৬০ দশকের প্রথমাংশ পর্যন্ত সময়টা ধরি তাহলে দেখতে পাব যে উল্লিখিত দেশ-সমূহের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিকাশের হার অনেক বেশি ছিল। আসলে বিশ্বযুদ্ধে হেরে যাওয়ার দরুন যে-ক্ষতি হয়েছিল এবং তার ফলে যে-উন্নতির হার অনেকটা বন্ধ্যা হয়ে পড়েছিল, সেই ক্ষতিপূরণ করবার জন্যই পূর্ববর্তী গোষ্ঠীর দেশগুলোর এত চেষ্টা এবং তার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত আবিষ্কার ও উন্নতির। দ্রুততালে এই ক-টি দেশ পা ফেলে চলার ফলে দেখা গেল যে ১৯৬০ শতকের গোড়ার দিকে বিজয়ী এবং পরাজিত দুই দেশই আবার প্রায় সমান অর্থনৈতিক অবস্থা লাভ করলেন। অথচ, কুজনেটস্ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, ল্যাটিন আমেরিকা এবং পুরনো উন্নত দেশগুলি সেই ১৯৩০ দশক থেকে প্রায় একই অবস্থায় আছে। আবার আফ্রিকা এবং এশিয়া, কিন্তু তুলনামূলক ভাবে অন্তত, তাঁদের পূর্ববর্তী গৌরবও রক্ষা করতে পারেন নি।

এতক্ষণ যা বললাম, এ তো গেল সংখ্যাশাস্ত্রভিত্তিক বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের দুনিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির বিবরণ। সংখ্যাশাস্ত্রের কোনোরকম সাহায্য না নিয়েই কুজনেটস্-এর আরেকটি সমসাময়িক রচনা হল 'অর্থনৈতিক উন্নতি ও কাঠামো' (Economic Growth & Structure)। এটিকে একধরনের সাধারণীকরণ বলা চলে। এইভাবে সাধারণীকরণ করতে গিয়ে কুজনেটস্ আবিষ্কার করেন যে কোনো দেশই, সে যত উন্নতই হোক না কেন, পুরোপুরিভাবে উন্নত নয়। তার কারণ, কোনো দেশই কোনো সময় তার সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করতে পারে না এবং তাই কমবেশি পরিমাণে সব দেশকেই 'অনুন্নত' বলা যেতে পারে। কার্যকরী ভাবে বলা যেতে পারে যে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশকেও নিজের উন্নতির মান বজায় রাখবার জন্য নিত্যনতুন নিয়োগ করতে হবে এবং তার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়ের সব সময় প্রয়োজন। কুজনেটস্-এর এই সিদ্ধান্ত মানতে হলে যুদ্ধোত্তর কালের

সেই সিদ্ধান্তগুলিকে আর স্বীকার করা যায় না, যেগুলো বলে যে উন্নত দেশগুলি থেকে অনুন্নত দেশগুলিতে বেশ কিছু পরিমাণ মূলধন গিয়ে জড়ো হবে। কুজনেটস্ অত্যন্ত আশাবাদী—তাঁর কাছে উন্নতির কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার যেমন শেষ নেই, নিত্যনতুন প্রয়োজনেরও যেমন যেমন অভাব নেই, তেমনি তেমনি সেই প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য নতুন আবিষ্কার ও তার জন্য মূলধন নিয়োগ করবারও কোনো বিরাম নেই। আর এই অবিরাম গতি যদি বাধা না পায় তবে যে কোন দেশ কতটা উন্নতি করবে তা কেউ নির্দিষ্ট ভাবে বলতে পারে না। তবে এখানেও ছোট্ট একটি 'যদি' আছে—যদি বাধা না পায়। এই প্রসঙ্গে উনি ব্যক্তিগত উদ্যমের ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্তি এবং বড় বড় যৌথকারবার ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। ওঁর নিজস্ব মত (অবশ্য এই মত বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবীই পোষণ করেন) হল, "যেহেতু সরকার একটি একক সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাপক, তাই সুব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করে সরকার অতি দ্রুত একটি উন্নততর অবস্থায় দেশকে নিয়ে যেতে পারেন। ব্যক্তিগত উদ্যমের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে হয়তো এটা সম্ভব হতো না।"

উন্নতির পর্যায়ে পৌঁছে যাবার পর বিভিন্ন দেশগুলি বিভিন্ন হারে উন্নতি করে। এই দেশগুলি সম্পর্কে সাধারণীকরণ করতে গিয়ে কুজনেটস্ আবার কতকগুলি সংখ্যা পেয়ে গেলেন। যে দেশগুলির মাথাপিছু আয় বছরে ১% করে বাড়ে, তারা ৫০ বছরে তাদের প্রাথমিক স্তরের ১৬০% অবস্থায় এসে দাঁড়াবে ; আর যাদের মাথাপিছু আয় বছরে ১·৫০% করে বাড়ে তারা প্রায় একই সময়ে তাদের প্রাথমিক স্তরের ২১১ অবস্থায় এসে পড়বে। আধুনিক দেশগুলির গতির রূপরেখা আঁকতে গিয়ে দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমত যত দেরি করে একটি দেশ প্রাক-শিল্পস্তর থেকে শিল্পস্তরে যাওয়ার মধ্যবর্তী যুগে পা দেয়, ততই এই ব্যবধানটা বাড়ে। জাপান ও রাশিয়ার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির দ্রুত উন্নতির কারণ হচ্ছে এই যে তাদের মনে ভয় ছিল যে এই ব্যবধানকে কমাবার চেষ্টা করতে গেলেই তাদের পক্ষে পরিস্থিতি খুব নিরাপদ হবে না। আর, দ্বিতীয়ত, শিল্পোন্নয়নের পথে নতুন পথিকের—যেমন জাপান, রাশিয়া এবং চীনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের শিল্পোন্নয়নের রূপের যা পার্থক্য, জার্মানি অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যারা এই পথ অনেক আগেই অতিক্রম করেছে, তাদের পার্থক্য অনেক কম। শিল্প-বিপ্লব যে-দেশে যত দেরিতে হানা দেয়, সে-দেশে সরকারী হস্তক্ষেপ ও কড়াকড়ি যেন একটু বেশি মাত্রায় থাকে।

গীতা লালওয়ানী

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের বয়েস সত্তর বছর পূর্ণ হল (জন্ম ২৮ মাঘ ১৩০৮, ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯০২)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস-পুরুষ হিসেবে যে-মনীষীদের মুখ আমরা নিয়ত স্মরণ করি, গোপালদা নিঃসন্দেহেই তাঁদের সার্থক উত্তরসূরী। আবার, ভারতবর্ষের একজন অগ্রগণ্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসেবে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও আচার্যস্থানীয় হিসেবেই গণ্য হবেন। মননে কর্মে গোপালদা যথার্থ বাঙালি সংস্কৃতির অতীত ও ভবিষ্যতের সদর্থক যোগসূত্র। ভারতবর্ষ আর আধুনিক বিশ্বের সেতুবন্ধ নির্মাণেও তাঁর অবিস্মরণীয় ভূমিকা।

যা কিছু মানবিক তাতেই তাঁর আগ্রহ। মানববিদ্যার বিবিধ শাখা উপশাখায় তাই তাঁর অবাধ সঞ্চরণ। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের তিনি কতভাবেই না ঋণী করেছেন!

কৈশোরেই সন্ত্রাসবাদী দলের সংস্পর্শে আসেন। তারপর কৃষকসংগ্রামের সূত্রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হন, সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কিছুদিন 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা পরিচালনা করেন। তারপর জগৎজোড়া ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। আজ, এই একাত্তর বছর বয়েসেও তিনি সেই পথেরই অক্লান্ত পথিক।

তাই স্বাধীনতার আগে ও পরে রাজনির্যাতন তাঁকে কম ভোগ করতে হয় নি।

এই প্রথিতযশা অধ্যাপক-সাংবাদিক-সাহিত্যিক ও বিদ্বান মানুষটি চল্লিশের কোঠায় পা দিয়ে নিজেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যোগ্য করার জন্য প্রায় তপস্বী হয়ে ওঠেন। সে-যুগে এমন দৃষ্টান্ত অনেক ছিল।

গোপালদা কৃষক আন্দোলন করেছেন, শ্রমিক আন্দোলন করেছেন, কমিউনিস্ট সাংবাদিকতা করেছেন, পার্টির পুস্তক-প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন, সর্বোপরি শিক্ষা ও সংস্কৃতি আন্দোলনে গত তিরিশ বছর ধরে

তীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর্থিক প্রতিকূলতা, ভগ্নস্বাস্থ্য, কিছুই তাঁকে দমাতে পারে নি। শহরে গাঁয়ে অগণিত সভায় নানা ধরনের সভা, মিছিলে হেঁটেছেন—নানা ধরনের মিছিল। তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় কি পশ্চিমবঙ্গের অধুনালুপ্ত উনিস্ট সদস্য হিসেবেই তাঁর ছিল অতি বিশিষ্ট ভূমিকা। .প ও সরকারী কাজেকর্মে বাঙলাভাষাকে যথাযোগ্য ার জন্য তিনি অনলস সংগ্রাম করেছেন। সেই সঙ্গে ... রাজ্যে এবং বিদেশে, বিশেষত সমাজতান্ত্রিক জগতে, গোপালদা আমাদের বেসরকারী সাংস্কৃতিক দূতের কাজ করেছেন, এখনও করেন।

এই উদ্দেশ্যেই তিনি বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন, ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি মধ্যযুগ ও উনবিংশ শতাব্দীকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, ভারতবোধের স্বরূপ আবিষ্কারে লিখেছেন অজস্র মূল্যবান প্রবন্ধ। আমাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মার্কসবাদকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে গোপালদা নিয়েছেন অন্যতম পথিকৃৎ ও আচার্যের ভূমিকা। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' বাঙালি মানসকে নতুন দীক্ষা দিয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতেও দেখেছি একই হাতে লেখা হচ্ছে 'বর্ণপরিচয়' এবং সংস্কৃত ও ইংরিজি ক্লাসিকস-এর সহজ সুখপাঠ্য বাঙলা রূপান্তর।

একই হাতে গোপালদাও লিখেছেন 'ভারতীয় ভাষা', বাঙলা ইংরেজি ও রুশ সাহিত্যের ইতিহাস, 'সংস্কৃতির রূপান্তর'।

গোপালদার বাঙালিয়ানা, ভারতীয়ত্ব এবং বিশ্ববোধের মধ্যে কোনোদিনই বৈরীমূলক বিরোধ উপস্থিত হয় নি। একমাত্র প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই পারেন মানবসভ্যতার যথার্থ উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করতে, অগ্রসর করতে। একমাত্র প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই পারেন ঐতিহ্যের যথার্থ রূপটিকে চিনে নিতে, তার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার সত্য ধারাকে মেলাতে। একমাত্র প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই হন সমগ্রতার সাধক, সন্ধানী। সেই সমগ্রতা গোপালদারও অন্বিষ্ট।

তাই গ্রীক ট্র্যাজেডি, রোমান্টিক কবিতা, রুশ বাস্তববাদী কথাসাহিত্য··· সবেতেই তাঁর আগ্রহ। ফ্রয়েড-এ্যাডলার-ইয়ুং পেরিয়ে পাভলভে তাঁর স্বস্তি।

অথচ তাঁর চৈতন্যের শেকড়টি দেশের মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত। মানবসভ্যতা ও আধুনিক মননের এক বিশ্বকোষ আমাদের গোপালদা যে আদতে 'নোয়াখালির বাঙাল'…'আড্ডা' বইটি তারই অকাট্য সাক্ষ্য। প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা এবং কমিউনিস্ট মতাদর্শ যে মানুষকে পুরো মাপের মানুষ করে জীবনরসিক করে 'বনচাঁড়ালের কড়চা' আর 'আড্ডা' তার অভ্রান্ত নিদর্শন। গোপালদা এখানে মনুষ্যত্বের সেই স্তরে উত্তীর্ণ যেখানে নিজেকেও তিনি ঠাট্টা করতে পেরেছেন।

গোপালদা স্মৃতিকথা লিখেছেন। 'রূপনারাণের কূলে' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে বছর কয়েক আগে। দ্বিতীয় খণ্ড কবে বেরুবে জানি না। গোপালদাকে জানার পক্ষে বোঝার পক্ষে তাঁর নানা ধরনের প্রবন্ধাবলী ও এই স্মৃতিকথা অপরিহার্য উপাদান।

কিছুটা পরোক্ষ হলেও, ভিন্ন এক উপাদান আছে—সে তাঁর কথা-সাহিত্য। দুর্ভাগ্য আমাদের যে গবেষক তাত্ত্বিক ও বিদ্বান পরিচয় গোপালদার কথাসাহিত্যিক পরিচয়কে বেশ খানিকটা নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। গোপালদাও তার জন্য কম দায়ী নন। নিজের গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে বরাবরই তাঁকে কুণ্ঠা এবং অর্ধমনস্কতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

কিন্তু, আপাতত আর সব গল্প-উপন্যাসের আলোচনায় বিরত থেকেই বলছি তাঁর 'একদা' বাঙলা সাহিত্যে দিক্‌চিহ্ন হয়ে থাকবে। আধুনিক ইণ্টেলেকচুয়াল উপন্যাস হিসেবে বাঙলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে 'একদা'র স্থান সন্দেহাতীত ভাবে অনন্য। কেউ কেউ মনে করেন 'গোরা' 'পুতুলনাচের ইতিকথা' 'একদা'র পথ বেয়েই বাঙলা উপন্যাসের মুক্তি।

এই নিবন্ধের গোড়াতেই আমরা রেনেসাঁস-পুরুষের কথা স্মরণ করেছি। একই সঙ্গে তাঁরা জনশিক্ষার জন্য প্রাথমিক পুস্তিকাদি রচনা করেছেন আবার গভীর অর্থে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। একই সঙ্গে তাঁরা বিদেশের কাছে দেশের ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, আবার বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে দেশকে পরিচিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁরা ছিলেন ভাবুক এবং কর্মী।

উনবিংশ শতাব্দীতে সে ছিল আমাদের এক অর্ধসত্তব নবজাগরণ। কিন্তু বিশ শতকের এই দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের যে-রেনেসাঁস আসবে—তাতে উনবিংশ

শতাব্দীর খণ্ডতা থাকলে চলবে না। এই বিপ্লবের অন্যতম স্থপতি হিসেবেই গোপালদা লেখেন 'সংস্কৃতির রূপান্তর', লেখেন 'একদা'। সন্ত্রাসবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের মহাকথা লেখেন গোপালদা, লেখেন চেতনার রূপান্তরের কাহিনী। ত্রিশ বছর ধরে কলম ধরেন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পক্ষে, সোভিয়েতের পক্ষে। কারণ তিনি জানেন "এই পথেই মানুষের ক্রমমুক্তি হবে।"

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার শতায়ু হোন। কারণ, এখনও তিনি কাজে ডুবে আছেন। 'বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ'—সম্পাদনা তার অন্যতম।

গোপালদা শতায়ু হোন। কারণ এখনও তাঁর অনেক কাজ বাকি আছে। তিনি নিজেই জানেন, নিজেই বলেন।

গোপালদা সকলের, কিন্তু বিশেষভাবে 'পরিচয়'-এর। কখনো লেখক কখনো সম্পাদক কখনো উপদেশক হিসেবে দীর্ঘ দীর্ঘকাল তিনি 'পরিচয়'-এর সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা আছেন।

গত বছর 'পরিচয়'-এর চল্লিশ বছর পূর্তি হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম উৎসব করব, পারি নি। গোপালদার জন্মদিনও সবার অগোচরেই চলে গেল। শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীসুশোভন সরকার প্রমুখ 'পরিচয়'-এর পুরোধারা আগেই সত্তর বছর পেরিয়ে গেছেন। শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র সত্তরের নিকটবর্তী। এঁদের ঘিরেও আমাদের উৎসব-পরিকল্পনা অপূর্ণ থেকে গেছে। অবস্থার ফেরে এই মহান পত্রিকার দৈনন্দিন পরিচালনার ভার পড়েছে আমাদের মতো সীমিতসাধ্য স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর।

কিন্তু আমরা ভরসা পাই আমাদের শিক্ষক অগ্রজ ও নেতা গোপালদাদের দিকে তাকিয়ে। তাই নিজেদের স্বার্থেই আমরা গোপালদা এবং আমাদের অগ্রজদের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বিয়োগপঞ্জী

গ্রেট বৃটেনের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী তাত্ত্বিক এমিল বার্নস।
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশিষ্ট ভারতবিদ, বাঙলা ভাষায় সার্থক বঙ্কিম-গবেষণার জন্য রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাবন্ধিক, 'পরিচয়'-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভেরা নভিকোভা।

অগ্নিযুগের অন্যতম নায়ক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়।
পরাধীন ভারতবর্ষে রাজদ্রোহী সাহিত্যসৃষ্টির অভিযোগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক কারারুদ্ধ প্রথম ভারতীয় সাহিত্যিক বিধুভূষণ বসু।
অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরী।

শিল্পাচার্য যামিনী রায় আর নেই। আমাদের সংস্কৃতিজগতে ইন্দ্রপাত ঘটেছে। নব্য ভারতীয় চিত্রকলার এই পিতামহ, ভারতবর্ষ এবং ইয়োরোপের চারুকলাঐতিহ্য আর বাঙলা লোকায়তের যোগসূত্র, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধক এই যুগপুরুষের স্মৃতির প্রতি শোকনম্র চিত্তে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। পরবর্তী সংখ্যায় যোগ্যজনেরা তাঁর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

পরিচয়
বর্ষ ৪১ । সংখ্যা ১০-১১
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯

সূচিপত্র

বিয়োগপঞ্জী

গণশিল্পী পৃথ্বীরাজ স্মরণে। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৯৫

কবি ডে-লেউইস। কৃষ্ণ ধর ১০০১

ভেরা নভিকভা। অনিমেষ পাল ১০০২

এমিল বার্ন্স। ১০০৫

ডেনিস নাওয়েলস (ডি. এন.) প্রিট। দিলীপ বসু ১০০৭

ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন। তারাপদ সাঁতরা ১০০৯

সরোজকুমার রায়চৌধুরী : ১৯০৩-১৯৭২। গৌরাঙ্গ ভৌমিক ১০১২

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদ : বিশ্বরঞ্জন দে

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতা বাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৪১ । সংখ্যা ১০-১১
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯

আমাদের সংস্কৃতি

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমাদের আবহমানকালের ধারণা ভারতবর্ষ আর্যদের দেশ, আর্যরাই ভারতবর্ষের আদি অধিবাসী বা প্রকৃত অধিবাসী, তারা আর কোনো দেশ থেকে আসেনি, তারা কোনোদিনই বহিরাগত ছিল না, ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ হয়েছে তাদের সঙ্গেই, তাদের পূর্বে নয়, ভারতের সংস্কৃতির মূল হচ্ছে বেদ, বেদে সব কিছু আছে, বেদজ্ঞ যাঁরা তাঁরা সর্বজ্ঞ, বেদ যে ভাষায় রচিত সে ভাষা হচ্ছে দেবভাষা, আর-সব ভাষা সে ভাষার সন্তান অথবা তার তুলনায় নিকৃষ্ট, সংস্কৃতভিত্তিক সংস্কৃতিই ভারতীয় সংস্কৃতি, তাকে হিন্দু সংস্কৃতিও বলা যায়, যে হিন্দু সে ভারতীয়, যে ভারতীয় সে হিন্দু, মুসলিম বা ইউরোপীয় বহিরাগত বলেই অভারতীয় তথা অহিন্দু, তাদের বাদ দিলেও ভারতের সংস্কৃতির সম্পূর্ণতাহানি হয় না, হাজার বছর আগেই ভারতের সংস্কৃতি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে, তার পরে যদি সে ক্ষীণ হয়ে থাকে তবে সেটা বিদেশী ও বিধর্মীদের অনধিকার প্রবেশের ফলে, এখন যেটা চাই সেটা হলো তার পুনরুজ্জীবন বা রিভাইভাল, তাতে মুসলিমের বা পাশ্চাত্যের কোনো ভূমিকা নেই, পশ্চিমের মতো একটা রেনেসাঁস হয়েছে বা হওয়া উচিত যারা বলে তারা ভ্রান্ত, ভারত কারো ধার ধারে না ও ধারবে না, ভারতীয় সংস্কৃতি পুরাতন তথা সনাতন, সুতরাং নূতন হবে কী করে ?

উপরে যে ধারণার কথা বলা হলো তার বিরুদ্ধে গত দুশো বছরে অসংখ্য প্রমাণ জমেছে। ভারতবর্ষ প্রধানত অনার্যদের দেশ, অনার্যরাই তার আদি অধিবাসী, তাদের কেউ বা অষ্ট্রিক, কেউ বা মঙ্গোল, কেউ বা দ্রাবিড়, আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে, আর্যরা যেমন ভারতে এসেছে তেমনি ইরানে গেছে, ইউরোপে গেছে, আর্য সভ্যতা ভারত থেকে আয়ারল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত, এখন তো আমেরিকা পর্যন্ত,আর্যরা যেখানেই গেছে সেখানেই আর্যপূর্ব সভ্যতার সঙ্গে

বিরোধ বেধেছে, পরে সন্ধি হয়েছে, সন্ধির ফলে আর্যরা অনার্যীকৃত ও অনার্যরা আর্যীকৃত হয়েছে, মিশ্র সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছে, সংস্কৃতিও হয়েছে দেশোচিত ও কালোচিত, যুগে যুগে তার পরিবর্তন ঘটেছে, আর্যেতর ভূভাগ থেকে খ্রীস্টধর্ম ও সংস্কৃতি এসে ইউরোপের গ্রীক রোমক ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করেছে, হাজার বছর পরে রেনেসাঁসের কল্যাণে সেই আচ্ছন্নভাবটা কেটে গেছে, লোকে আর বিশ্বাস করছে না যে বাইবেলে সব কিছু আছে বা যাঁরা বাইবেলজ্ঞ তাঁরা সর্বজ্ঞ, জ্ঞান বিজ্ঞান ও যুক্তিতর্কের বন্ধ দুয়ার খুলে যাওয়ায় মধ্যযুগের অন্ধকার ঘুচে গেছে ও আধুনিক যুগের আলোয় দশদিক উজ্জ্বল হয়েছে, লাটিন হটে গেছে, ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি এগিয়ে গেছে।

ভারতের ইতিহাস নতুন করে লেখার সময় এসেছে। এদেশ আর্যদের অধিকারে আসার আগে যাদের অধিকারে ছিল তারাও বহু পরিমাণে সভ্য ছিল। তারা যে কী পরিমাণ উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার প্রমাণ মোহেনজোদরো ও হরপ্পার নাগরিক সভ্যতা। খননকার্য এখনো সমাপ্ত হয়নি, হলে দেখা যাবে যে সিন্ধু উপত্যকার সেই দুটি নগরের মতো আরো কত নগর অন্যান্য নদীকূলে বা সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল। আর্যদের আগমনের কাল খ্রীস্টপূর্ব বিংশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী বলেই অনুমান করা হয়। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তার আগেই পূর্ণতা লাভ করেছিল। ওরকম একটি সভ্যতা হাজার বছরের কমে পূর্ণতা লাভ করে না। কৃষি থেকে শুরু করতে হয়। তার সঙ্গে যোগ দেয় কারুশিল্প। বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। তার উপযোগী যানবাহন আবশ্যক হয়। নদী পথে নৌকা। স্থল পথে গাড়ি বলদ হাতি ঘোড়া উট। পণ্য বিনিময় থেকে ভাব বিনিময় আসে। লিপির উৎপত্তি, মুদ্রার উৎপত্তি ঘটে। সভ্যতা থেকে সংস্কৃতিতে পৌছনো যায়। রন্ধন, বেশভূষা, মাটির পাত্র, ধাতু নির্মিত অস্ত্র থেকে লোকসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতির থেকে উচ্চতর সংস্কৃতি, কবিতা সঙ্গীত নাট্য নৃত্য চিত্রকলা ভাস্কর্য স্থাপত্য দর্শন ধর্মশাস্ত্র।

আমার অনুমান আর্যদের আগমনের পূর্বেই ভারতের নদী ও সমুদ্রকূলে ছোট বড়ো শহর গঞ্জ বন্দর গড়ে উঠেছিল, গ্রাম গড়ে উঠেছিল আরো আগে। লোকসংস্কৃতি তো বিবর্তিত হয়েছিলই, সঙ্গীত নৃত্য নাট্য কবিতা প্রভৃতি উচ্চতর সংস্কৃতিরও বিবর্তন ঘটেছিল। আর্যরাই এসে এসব প্রবর্তন করে এমন নয়। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্যদের আগমনের পূর্বেই বহুদূর প্রগতি করেছিল। আমার তো মনে হয় বাংলাদেশের আর্যপূর্ব সভ্যতা

ও সংস্কৃতিও বঙ্গোপসাগরের অপর পারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। পাণ্ডববর্জিত দেশ বলে এ দেশ সভ্যতা বা সংস্কৃতিবর্জিত ছিল না। আর্যরা কবে আসবে না আসবে তার জন্যে দেশের সভ্যতা বা সংস্কৃতি অপেক্ষা করে বসে থাকেনি। নিজেই উদ্যোগী হয়ে সিংহলে গেছে যবদ্বীপে গেছে। আর্য দেবদেবীর চেয়ে লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যা ও প্রভাব এ দেশে তখনো বেশি ছিল, এখনো বেশি। বেদের চেয়ে তন্ত্রের প্রভাব বেশি এ দেশে। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য দেড় হাজার বছরের আগে ছিল না। তার পূর্বে বৌদ্ধ প্রাধান্য জৈন প্রাধান্য ছিল। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় বাংলাদেশ একটা প্রদেশে পরিণত হয়নি। ভারতকেও দেশ বলা হতো না। "বর্ষ" প্রায় মহাদেশের মতো।

আর্যপূর্ব সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক আর্য সংস্কৃতির বহমান ধারা সম্মিলিত হয়ে যে যুক্তবেণী রচনা করে রামায়ণ মহাভারত তারই সৃষ্টি। ততদিনে আর্য ও অনার্য বহুল পরিমাণে বিমিশ্র হয়েছে। তাকে আর অমিশ্র করবার উপায় নেই। তবু বর্ণশুদ্ধির জন্যে ও বর্ণসাঙ্কর্যের ভয়ে যত রকম কঠোর বিধান জারী করা হয়। আর্যপূর্ব যুগেও কতক লোক পৌরোহিত্য করত। কতক লোক করত রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ। কতক লোক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত। এরাও আর্যদের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়। গোড়ার দিকে এই তিন বর্ণের মধ্যে বিবাহ চলত। এই তিন বর্ণ অর্থাৎ দ্বিজাতি একদিকে ও চতুর্থ বর্ণ শূদ্র অন্যদিকে। শূদ্ররা সাধারণত আর্যপূর্ব সমাজেরই বৃহত্তর অংশ। চাষী আর কারিগর আর মজুর শ্রেণীর লোক, যাদের না হলে জগন্নাথের রথ চলে না। অথচ চালক তারা নয়। তারা চালিত। আমেরিকার দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের মতো ভারতের দরিদ্র আর্যরাও তাদের সঙ্গে ছিল। উচ্চতর সংস্কৃতিতে তাদের ভাগ সামান্য হলেও লোকসংস্কৃতিতে অসামান্য।

ভারতের আর্যোত্তর সংস্কৃতির উচ্চতর স্তর মোটের উপর আর্য ও আর্যপূর্ব পুরোহিত সৈনিক ও বণিকদের নেতৃত্বে চালিত ও বিকশিত "এলিৎ" সংস্কৃতি। রামায়ণ মহাভারতের কল্যাণে সে সংস্কৃতি সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়। আর বৌদ্ধ জৈন ধর্মের শিক্ষায় সে সংস্কৃতি দীন হীন পতিত পাতিত শূদ্র ও অন্ত্যজকেও দুই হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নেয়। বৈদিক দেবতাদের উপাসকদের মধ্যেও ক্রমে ভক্তিবাদের প্রাবল্য হয়। তখন ভক্তির তরঙ্গ উঠে জাতিবর্ণের বেড়া ভেঙে দেয়। তবে সমভূম করে না সমাজকে। পরবর্তীকালে যাকে হিন্দু বলে

অভিহিত করা হয় তার যেটি উদারতর ধারা সেটি বৌদ্ধ সাধনার মতো ভারতের বাইরেও প্রসারিত হয়। তার গতিবেগ চীন জাপান মালয় ইন্দোনেশিয়া তিব্বত মধ্য-এশিয়া বর্মা ইন্দোচীনেও অনুভূত হয়। কিন্তু প্রসারণের পরে আসে সঙ্কোচনের যুগ। সব সভ্যতার ইতিহাসে এটা দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্যপ্রভাবিত দ্বিজাতি পরিচালিত বৈদিকবৌদ্ধ উদারনৈতিক সংস্কৃতভিত্তিক সংস্কৃতি একদা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসে, থেমে আসে, আপনাকে গুটিয়ে আনে। চূড়ান্ত পর্যায়ের কাল আমাদের ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ। গুপ্তবংশীয় রাজাদের যুগ। এই যুগে সাগরপারের ভারতীয় সভ্যতা তার সুদূরতম সীমায় পৌঁছয়। হিমালয়-পারের ভারতীয় সভ্যতাও।

এর পরের অধ্যায় কূপমণ্ডুকতা। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। হিমালয় অতিক্রম করাও তাই। হিন্দুসমাজের নিয়মকানুন দিন দিন আরো কড়া হয়। কেউ তো বিদেশে যাবেই না, বিদেশ থেকে কেউ এলে তাকেও সমাজে নেওয়া হবে না। যেমন গ্রীকদের শকদের কুশানদের হূনদের নেওয়া হয়েছিল। এই কূপমণ্ডুক অবস্থায় ভারতের দুর্বলতা ইসলামকে সহজে পথ ছেড়ে দেয়। সংস্কৃতভিত্তিক সংস্কৃতির ঘরে নূতনত্বের অভাবও ছিল, সেটা ভরাবার জন্যে আরব্য তথা পারসিকভিত্তিক সংস্কৃতির প্রয়োজনও ছিল। আরো পরে ইংরেজীভিত্তিক সংস্কৃতির।

ভারতের মধ্যযুগ শুরু হয় ইউরোপের মধ্যযুগেরই প্রায় সমসাময়িককালে শেষ হয়ও তেমনি সমসাময়িককালে। 'প্রায়' সমসাময়িক বলেছি এই জন্যে যে ভারতের মধ্যযুগ শ-দুই বছর বিলম্বে আসে, শ-দুই বছর বিলম্বে যায়। আমাদের মধ্যযুগের প্রথম আধখানা জুড়েছিলেন রাজপুত রাজন্যরা, আর দ্বিতীয় আধখানা তুর্ক ও মুঘল সুলতান ও বাদশাহরা। ভারতের মুসলিম শাসন গোটা মধ্যযুগটা অধিকার করেনি। ইংরেজ অধিকার তো তার তিনভাগের একভাগ। তবে যত কম সময়ই থাকুক না কেন ইংরেজরাই এসেছিল আধুনিক যুগের বার্তা নিয়ে। ওরাই প্রবর্তন করে ভারতের আধুনিক যুগ।

মধ্যযুগীয় হিন্দু তথা মুসলিম শক্তিতে নিশ্চয়ই তফাৎ ছিল, কিন্তু উভয়েই মধ্যযুগীয়। অপর পক্ষে ওদের সঙ্গে ইংরেজদের তফাৎ শুধু যে ধর্মে ধর্মে, ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে তফাৎ তাই নয়, যুগে যুগে তফাৎ। সে তফাৎ আল-

বিজ্ঞানের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অজ্ঞানের। ইংরেজরা যে সময় এই উপমহাদ্বীপে আসে তার আগেই তাদের মহাদেশের পশ্চিমাংশে রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেণ্ট ঘটে যায়। এই দুটি আলোকবর্তিকা থাকে তাদের হাতে। তাদের মশাল থেকে আমরাও আমাদের মশাল জ্বালিয়ে নিই। তখন আমাদের এখানেও ঘটে রেনেসাঁস তথা এনলাইটেনমেণ্ট। তবে তেমন উজ্জ্বলভাবে নয়। তার কারণ কি আমাদের পরাধীনতা, না আমাদের অতীতমুখীনতা? পুরাতনকেই আমরা সনাতন বলে ভাবি, নতুনকে ক্ষণিকের বলে উড়িয়ে দিই! এটা কী হিন্দু কী মুসলমান উভয়েরই মজ্জাগত। ইউরোপের ছোঁওয়া না লাগলে, দোলা না লাগলে, ধাক্কা না লাগলে আমরা যে তিমিরে ছিলুম সেই তিমিরেই থাকতুম। আমাদের প্রতিবেশী চীন জাপানের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। তেমনি ইরান তুর্ক আরব প্রতিবেশীদের সম্বন্ধেও। সাম্রাজ্যবাদী হয়ে যারা আমাদের আঘাত করেছে তারাই প্রগতিবাদী হয়ে আমাদের জাগিয়েছে।

তুর্ক মুঘল প্রভৃতি ইসলামপন্থীদের আগমনের পূর্বেই আমাদের সংস্কৃত-ভিত্তিক সংস্কৃতি বস্তুজ্ঞান হারিয়েছিল। বস্তুজ্ঞান না থাকলে কি ব্রহ্মজ্ঞান থাকে? ব্রহ্মজ্ঞান থাকলে আরো কয়েকখানি গীতা উপনিষদ্ লেখা হতো, রাশি রাশি টীকাভাষ্য নয়। আরো কয়েকটি দর্শনের উৎপত্তি হতো, রাশি রাশি ভক্তিগ্রন্থ বা পুরাণের নয়। ভক্তিও মহামূল্য নিধি, ভক্তিকে খাটো করা উচিত নয়, তবু একথাও মানতে হবে যে জ্ঞানবিজ্ঞান তথা মৌলিক সৃষ্টির দিক থেকে সংস্কৃত সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে পায়চারি করতে থাকে। এমন সময় হাজির হয় পারসিক বা ফারসীভিত্তিক সংস্কৃতি, তার সঙ্গে আরব্য সংস্কৃতি। আরব্য সংস্কৃতি যে কোরানসর্বস্ব ছিল তা নয়। তার অঙ্গে অঙ্গীভূত গ্রীক দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ। আরবী ফারসী শিক্ষার দ্বার হিন্দুদের কাছেও মুক্ত ছিল। যারা টোলে চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ পেতো না তারা মক্তবে মাদ্রাসায় প্রবেশ পেতো। শূদ্ররা সংস্কৃত থেকে বঞ্চিত ছিল। আরবী ফারসী থেকে বঞ্চিত হলো না। রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানের হাতে সেখানে সংস্কৃত তেমন অর্থকরী নয়, ফারসী যেমন। কায়স্থ প্রভৃতি জাতের ছেলেরা এই প্রথম মাথা তোলার সুযোগ পায়। তুর্ক ও মুঘল শাসনে হিন্দুদের ভাগ্যে যেসব পদ জোটে সেসব আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের একচেটে নয়, হিন্দু সমাজের নিম্নতর অংশও তার শরিক হয় ও প্রতিযোগিতায় আরো উচ্চে ওঠে। মুসলিম শাসন এদিক থেকে বৈপ্লবিক। ব্রিটিশ শাসনও।

আরো একদিকে প্রগতিশীল ছিল, তবে শুধু মুসলিম শাসন নয়, অবশিষ্ট হিন্দু শাসনও। সর্বত্র দেখা যায় সংস্কৃত কোণঠাসা হচ্ছে, তার জায়গা নিচ্ছে বাংলা হিন্দী মরাঠী তামিল তেলেগু প্রভৃতি অসংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। সংস্কৃত থেকে ভাবানুবাদ হয়ে যায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থের, লোকে তাদের জন্যে সংস্কৃতের মুখাপেক্ষী হয় না। সংস্কৃতি এইভাবে সবস্তরে ছড়িয়ে যায়। বেদ কিন্তু গুহায় নিহিত থাকে, কোরানও। তার জন্যে আরো একটা বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। ইংরেজী শিক্ষার। বেদ ও কোরান ইংরেজীতে তর্জমা হয়ে যায়। তার থেকে আসে বাংলা হিন্দী ভাষায় মূলের অনুবাদ বা অনুবাদের অনুবাদ।

আর্যপূর্বেরা যেমন করে আর্যীকৃত হয়েছিল, আর্যরা যেমন করে আর্যপূর্বীকৃত হয়েছিল, হিন্দুরাও তেমনি করে মুসলিম প্রভাবিত হয়, মুসলিমরাও তেমনি করে হিন্দু প্রভাবিত, উভয়েই পাশ্চাত্যপ্রভাবিত তথা আধুনিকত্বে উপনীত। এই যে উপনয়ন এটা হাজার কি বারো শ বছর পরে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ। আরবী ফারসী শিক্ষার চেয়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রতিপত্তি ও প্রসার বেড়ে যায়। ইউরোপের সঙ্গে গভীরতর গ্রন্থিবন্ধন হয়। সে গ্রন্থি ব্রিটিশ অপসরণের পরেও ছিন্ন হয় না। এখন তো সংস্কৃত শিক্ষার উপর কোনোরকম বাধানিষেধ নেই, তবু লোকে ইংরেজী শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দেয়। যেখানে অর্থকরী নয় সেখানেও। 'এলিট' বলতে একদা সংস্কৃতশিক্ষিত বোঝাত, পরে আরবী ফারসী শিক্ষিত, আরো পরে ইংরেজী শিক্ষিত। এখনো তাই। যেদিন বাংলাশিক্ষিত কি হিন্দীশিক্ষিত বোঝাবে সে দিনের কত দেরি!

উচ্চতর সংস্কৃতি এখনো "এলিট" কিন্তু সেই "এলিট" নয়। সংস্কৃতির যে অংশটা লোকসংস্কৃতি সেটার সঙ্গে উচ্চতর সংস্কৃতির বিভেদ আদিযুগেও ছিল, মধ্যযুগেও ছিল, আধুনিক যুগেও রয়েছে। এ বিভেদ কি শিল্পায়ন তথা নগরায়নের দ্বারা দূর হবে বা হ্রাস পাবে! নতুন কোনো "এলিট" উঠবে, না ওই শ্রেণীটাই লোপ পাবে? ওদের স্থান কি জনগণ নিতে পারবে?

আর্যপূর্ব সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক আর্য সংস্কৃতির বহমান ধারা সম্মিলিত হয়ে যেমন একটি যুক্তবেণী রচনা করেছিল তেমনি আর একটি যুক্তবেণী রচনা করত মুসলিমপূর্ব হিন্দু সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক মুসলিম বা পারসিক আরব্য সংস্কৃতির বহমান ধারার সম্মিলন। সেদিকে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর আর অগ্রসর হওয়া গেল না। ইউরোপ এসে পড়ল।

ইংরেজপূর্ব হিন্দু মুসলিম মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক পাশ্চাত্য তথা আধুনিকযুগীয় সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গমও কিছুদূর অগ্রসর হয়। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। নইলে আরো একটি যুক্ত-বেণী রচিত হতে পারত। তিনটি যুক্তবেণীর রচনা সমাপ্ত হলে ভারতীয় সংস্কৃতি হতো তিনজোড়া সংস্কৃতির ত্রিবেণীসঙ্গম। আর্যপূর্ব আর আর্য মিলে প্রাচীন হিন্দু। হিন্দু আর মুসলিম মিলে মধ্যযুগীয় ভারতীয়। ভারতীয় আর আধুনিক পাশ্চাত্য মিলে আধুনিক ভারতীয়।

যে দুটি বেণীরচনা অসমাপ্ত থেকে গেল সে দুটি কি চির অসমাপ্ত থেকে যাবে? না, আবার চেষ্টা করা যাবে যাতে সমাপ্ত হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের আরব্ধ অথচ অসমাপ্ত কাজ আমাদের উপরেই বর্তায়। আমরা না পারলে আমাদের উত্তরপুরুষদের উপর। একদা আমার ধারণা ছিল যে হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তথা ইন্দোপারসিক স্থাপত্যে তথা উর্দু সাহিত্যে বিমূর্ত হয়েছে। তা ছাড়া বেশভূষায় আদবকায়দায় চাল চলনে অভিজাত মহলের হিন্দু মুসলমানের একত্ব ঘটেছে। কিন্তু সে ধারণা একেবারে ভুল না হলেও একদম ঠিক নয়। ভারতীয় মুসলমানদের একজোড়া উত্তরাধিকার। একটা তো ভারতীয়, আর একটা মধ্যপ্রাচ্য। তাদের সেই মধ্যপ্রাচ্য উত্তরাধিকারের অল্পই হিন্দুরা পেয়েছে। তেমনি হিন্দুদের উত্তরা-ধিকারের যেটা প্রাচীনতর অংশ তার ভাগ মুসলমানরা অল্পই পেয়েছে। অল্পের সঙ্গে অল্প মিলে কতটুকু মিলন ঘটাতে পারে! অজ্ঞতার সঙ্গে অজ্ঞতা মিলে তার চেয়ে বহুগুণ অমিল ঘটিয়েছে।

প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোম সম্বন্ধে আমরা অল্পই জানি। তেমনি খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান পরিমিত। তাদের বাদ দিয়ে আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের মিলন কি সম্ভব? অথচ এই ছিল আমাদের ধ্যান। এ ধ্যান ব্যর্থ হয়েছে। প্রাচীনের সঙ্গে প্রাচীনের ও আধুনিকের সঙ্গে আধুনিকের মিলনই সম্ভব ও সঙ্গত। এখন তারই ধ্যান করতে হবে।

ভারতীয় সংস্কৃতি বরাবরই মেলাবার সাধনা করেছে। কখনো পেরেছে, কখনো পারেনি, কিংবা খানিকটে পেরেছে। আর পরিপূর্ণতার জন্যে বাকিটার প্রয়োজন আছে। তাই তার পক্ষে আত্মসন্তুষ্ট হওয়া সাজে না।

আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সংস্কৃতি পাঁচটি মহান যুগ অতিক্রম করে এসেছে। প্রথমটি উপনিষদ্ বৌদ্ধ জৈনধর্মের আদিপর্ব। আর্য আগমনের

হাজার বছরের মধ্যে এই উচ্চতায় ওঠা যায়। দ্বিতীয়টি রামায়ণ মহাভারতকে গ্রথিত করার ও বৌদ্ধধর্মকে সুদূরপ্রসারী করার যুগ, যে যুগে ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতি এশিয়ার অধিকাংশ দেশে পরিব্যাপ্ত হয়। এমনি করে আরো এক হাজার বছর কাটে। তৃতীয়টি গুপ্ত সম্রাটদের স্বর্ণযুগ। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের যুগ। অজন্তার যুগ। এ যুগ পাঁচশো বছরের মধ্যে শেষ হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতিও নিঃশেষিত হয়ে যায়। বাইরে থেকে প্রেরণা সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল। সে প্রেরণা একদিক বা আরেকদিক থেকে আসত। প্রথমে এল মধ্যপ্রাচী থেকে। এশিয়ার সেই ভূখণ্ডও ভারতের মতো বহুকালের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন। আর্য ও সেমিটিক ধারা মিলে সেখানেও যুক্তবেণী রচনা করেছিল।

মধ্যপ্রাচী থেকে নতুন প্রেরণা পেয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি আবার পুষ্পিত হয়। চতুর্থ মহান যুগে উপনীত হয় ভারতের ইতিহাস। সে যুগ আকবর শাহজাহানের যুগ। নানক কবির চৈতন্যের যুগ। চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি মীরাবাই তুলসীদাসের যুগ। বাংলা হিন্দী মরাঠী গুজরাটি প্রভৃতি সাহিত্যের বিকাশের যুগ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের গৌরবের যুগ। কিন্তু এ যুগও নতুন প্রেরণার অভাবে প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তখন অভিনবতর প্রেরণা আসে সাগরপার থেকে। কখনো কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি অর্বাচীন দেশ কালক্রমে সুসভ্য ও সুসংস্কৃতিমান হয়ে ভারতকে চীনকে জাপানকে প্রেরণা জোগাবে। এটা যে সম্ভব হলো তার কারণ এসব দেশের রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেণ্ট। ভারতে ঠিক এই জিনিসটির অভাব ছিল। চীন জাপানেও।

পঞ্চম মহান যুগ আমাদের উনবিংশ তথা বিংশ শতাব্দীর নব জাগরণ। এ যুগ এখনো সমাপ্ত হয়নি। যে জাগরণ এসেছে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু শেষ প্রতিভূ তিনি নন। মাত্র দুশো বছরে একটা মহান যুগের অবসান হয় না। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সম্ভাব্যতা এখনো নিঃশেষিত হয়নি। হতে পারে যে মধ্যবিত্তরা অবক্ষয়গ্রস্ত। কিন্তু তাদের অবসাদ তো সারা দেশের জনগণের অবসাদ নয়। জনগণের দিকে তাকালে আমি অসীম সম্ভাবনা দেখতে পাই। সুতরাং পঞ্চম মহাযুগ এখনো অসমাপ্ত। এখন শুধু পশ্চিম ইউরোপ থেকে নয় পৃথিবীর সব দিক থেকে প্রেরণা আসছে। আমাদের সৃষ্টি বাইরে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

বাঙলা সংস্কৃতির স্বরূপ ও তার উত্তরাধিকার একটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন। আমরা আশা করি পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা এই আলোচনায় যোগ দেবেন। —সম্পাদক

মানবতন্ত্র

আবুল ফজল

কবিতায় আদর্শের ধারণা সকলের এক নয়। সাহিত্যিকের কাছে সত্যই বড় কথা। সত্যের সঙ্গে যদি জাতীয় আদর্শ, ধর্ম বা শাস্ত্রের বিরোধ ঘটে, নিঃসন্দেহে বিনাদ্বিধায় সাহিত্যিক সত্যের পক্ষাবলম্বন করবে। সাহিত্যিকের যদি কোনো আল্লাকে মানতে হয় তা হলে সে আল্লাহ হচ্ছেন "আল্ হক্কুন" অর্থাৎ যিনি হক বা সত্য। প্রচলিত অর্থে আল্লার গুণাবলী নিরানব্বই হোক কি তেত্রিশ কোটি হোক তাতে কিছু এসে যায় না—তা যে হক্ বা সত্যের রকমফের, এ-উপলব্ধি যার নেই তার পক্ষে মুখে আল্লার নাম নেওয়া শয়তানের ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তিরই সমতুল্য। সত্যের এ-বোধটুকু না থাকলে সাহিত্যিক যেমন হওয়া যায় না তেমনি হওয়া যায় না সাহিত্যের বিচারক বা সমঝদারও। প্রসঙ্গতঃ বলতেই হচ্ছে আমার 'রাঙা প্রভাত' নামক উপন্যাস পড়ে জনৈক অধ্যাপক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জাতীয় আদর্শ বিরোধী, পাকিস্তান বিরোধী, ইসলাম বিরোধী ইত্যাকার বহু সাংঘাতিক অভিযোগে বইটাকে অভিযুক্ত করেও ক্ষান্ত হতে পারেন নি। শুনেছি তিনি প্রদেশের স্বরাষ্ট্রবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করবারও চেষ্টা করেছেন। জাতীয় আদর্শ খুব একটা মস্ত বড় বস্তুও যদি হয় ,তা হলেও জিজ্ঞাসা করা যায় তা রক্ষা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব কি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ? ঐ বিভাগের কর্মচারীদের ঐ সম্পর্কে জ্ঞানের বা মূল্যায়নের দৌড়ই বা কতটুকু ? সাহিত্য বিচারের ভার শেষ পর্যন্ত যদি স্বরাষ্ট্রবিভাগের উপরই ন্যস্ত হয় তা হলে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হওয়ার কারণ ঘটে না কি ? আশ্চর্য, সাহিত্য শিল্পের উপর স্বরাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় বলে এঁরাই আবার সোভিয়েত রাশিয়ার নিন্দায় পঞ্চমুখ। এঁদের মতে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের যে ধর্ম—মানবতার চেয়ে তা বড়। এ মত আমি বিশ্বাস করি না, মানিও না। কথাটা হয়তো 'রাঙাপ্রভাত'-এ কিছুটা সোচ্চার হয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব -পাকিস্তানের কয়েকটি জায়গায় যে অমানুষিক কাণ্ড ঘটে গেলো তাতে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে। এ-সবে যারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধার্মিকের

অভাব ছিল না—এদের অনেকে হাতের ধারাল ছোরাটা উদ্যত করেছে ঈশ্বর ও আল্লার নাম নিয়েই। ঈশ্বর ও আল্লার পরিবর্তে এদের দিলে যদি কণামাত্রও মানবতার ছোঁয়া লাগত তা হলে এমন কাজ তাদের দ্বারা কখনো সম্ভব হতো না। এদের সম্বন্ধেই বার্নাড শ-র বিখ্যাত উক্তি Beware of that man whose God is in heaven. একটু বদলিয়ে বললে কথাটা আরো প্রত্যক্ষ হয়: যাদের আল্লা শুধু ঠোঁটে আর তসবিতে তাদের থেকে সাবধান!

ধর্ম আর সিকুলারিজম আজ স্রেফ মুখের বুলিতে পর্যবসিত। ধার্মিক না হয়েও ধর্মের নামে গদগদ হওয়া, আর মনে সিকুলার না হয়েও সিকুলারিজমের নামে মুক্তকচ্ছ হওয়া তেমন কোনো বিরল দৃশ্য নয় আজকের দিনে। যদিও সিকুলারিজমের অর্থ করা হয় 'ধর্ম নিরপেক্ষতা', আসলে ওটাও একটা পোশাকি ধর্ম—সাম্প্রদায়িকতার আর একটি নতুন নাম। এ-ও একরকম 'নটিংকা কাপড়া,' রাজনৈতিক ভোল বদলের বেশি এর কোনো মূল্য নেই। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ কি খুলনায় যারা অশান্তি ঘটিয়েছে তারাও তো ইসলাম ধর্মাবলম্বী, যে-ইসলামের অর্থ শান্তি। ধর্মকে এ-স্ববিরোধিতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে মানুষের দৃষ্টি ধর্মের দিক থেকে মনুষ্যত্বের দিকে ফেরাতে হবে।

কোনো রকম ধর্মতন্ত্র নয়, মানবতন্ত্রকেই করতে হবে আজ সবদেশের ও সব রাষ্ট্রের আদর্শ। ব্যক্তি বা সমাজজীবনেও এর থেকে বড় আদর্শ আমার মনের দিগন্তে আমি খুঁজে পাই না।

খাঁটি অর্থে কোনো ধর্মের পক্ষেই আজ তার নিষ্কলুষ আদি স্বরূপ রক্ষা করা সম্ভব নয়—সম্ভব নয় সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া—বিশেষ করে পাকিস্তান-হিন্দুস্থানে। না পাওয়ার একটা বড় কারণ রাজনীতি—রাজনীতি আর ধর্ম আমাদের দুই দেশে আজ এক। রাজনীতিবিদের মুখে এখন ধর্মের যত বুলি শোনা যায় স্বয়ং ধর্মপ্রবর্তকদের মুখেও কোনোদিন তত ধর্মবুলি শোনা যায় নি। কারণ তাঁরা বুলির চেয়ে ধর্মপালনে ছিলেন অধিকতর বিশ্বাসী। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। বিজ্ঞানের অগ্রগতিও হয়তো অন্যতম কারণ—ধর্মের অনেক বিশ্বাস যার সঙ্গে নৈতিক বোধ ও সামাজিক ন্যায়চেতনা জড়িত তা আজ এক রকম ধূলিসাৎ। যা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ নয় তা আর মানুষকে প্রভাবিত করতে পারছে না। তাই সব রকম ধর্মীয় নীতিবোধ আজ শিথিল, ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন থেকে বিযুক্ত। ফলে যে কোনো শিক্ষিত ও

বুদ্ধিমান লোক এখন দোজখের জল্লাদ থেকে তাঁর এলাকার থানার দারোগাকে বেশি ভয় করে থাকেন।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটা খুব ভালোভাবেই দেখা গেছে যে, ধর্ম বা সিকুলারিজম কোনোটাই মানুষকে বাঁচাতে পারে নি। কাজেই ধর্ম নয়, সিকুলারিজমও নয়, একমাত্র মানবতার উপরই জোর দিতে হবে। ধর্মের কথা বললেই অনিবার্যভাবে অন্য ধর্মের কথা এসে পড়ে। সিকুলারিজমের সঙ্গেও বৈপরীত্যের কল্পনা অবিচ্ছিন্ন। যারা সিকুলার নয় তাদের শত্রু ভাবতে সিকুলারিজম বিশ্বাসীর মোটেও বাধে না। বামপন্থীদের কণ্ঠস্বরও আজ কিছু মাত্র আশাপ্রদ নয়। সম্প্রতি ভারতীয় লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় যে বিতর্ক দেখা গেল তা রীতিমতো আতঙ্কজনক। কাজেই মানুষকে অমানুষিকতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে মানবতাকেই করতে হবে একমাত্র অবলম্বন। কথা আছে : বাঘ বাঘের মাংস খায় না। কথাটা সত্য। বাঘও বাঘের বেলায় নিজেদের সাধারণ ব্যাঘ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন। ব্যাঘ্রত্বে পরস্পর অভিন্ন। অতএব অবধ্য। মানুষকেও সচেতন করে তুলতে হবে সাধারণ মানবতা সম্বন্ধে। এখন ধর্ম আর সিকুলারিজমের উপর জোর দিতে গিয়ে আমরা সাধারণ মানবতাকে শুধু খাটো নয় প্রায় মুছে ফেলেছি আমাদের জীবন থেকে। আমরা নির্ভেজাল মুসলমান বা নির্ভেজাল হিন্দু কি না এ-দাবিই আজ সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ – পাশাপাশি দুই দেশের দুই বৃহত্তর সমাজে আজ এ-দাবিই সবচেয়ে উদগ্র। নির্ভেজাল মানুষ হোক—এ স্বাভাবিক দাবি কোথাও শোনা যায় না; পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র এ-দাবি অনুপস্থিতিতেই বিশিষ্ট।

অন্য মানুষটাও আমার মতোই মানুষ—এ বোধ ও চেতনাকে ব্যাপক ও ব্যবহারিক করে তুলতে না পারলে মানুষের রক্ষা নেই। ধর্ম বা সিকুলারিজম মানবতার স্থান নিতে পারে না। প্রাণপণে দুই বিপরীত ধর্ম পালন করে কোথাও মিল হয়েছে এমন নজির আমার জানা নেই।

দুই ধর্মের দুই ধার্মিকে সত্যকার সখ্যতা বা আন্তরিকতাও বিরল ঘটনা— আত্মীয়তা তো অবিশ্বাস্য। হিন্দু মহাসভা আর জমা'আতে ইসলাম একই মঞ্চে মিলিত হয়ে একই কর্মসূচীতে হাত মেলাবে এ কল্পনার বাইরে। শুভ বুদ্ধিওয়ালা কেউ কেউ যে বলে থাকেন, মুসলমান খাঁটি মুসলমান আর হিন্দু খাঁটি হিন্দু হলেই মিলন সহজ হবে—এ কথা আমার কাছে সোনার পাথরবাটি।

বরং মানুষ যখন এবং যেখানে প্রচলিত মুসলমানিত্ব ও হিন্দুয়ানিকে ছাড়িয়ে গেছে সেখানে মিলন সহজ ও অবাধ হয়েছে—হিন্দু-মুসলমানে যে কয়টা বৈবাহিক সম্পর্ক হয়েছে তাও এ-দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। এটা মানবতার দিকেরই ইঙ্গিত—এ-মনোভাব বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হলে মিলন ও সহযোগিতার দিগন্ত অনেক বেড়ে যাবে। সযত্নে নিজের মুসলমানিত্ব কি হিন্দুয়ানিও রক্ষা করব এবং সঙ্গে সঙ্গে 'মানুষ' হিসেবেও বড় ও মহৎ হব-এ হয় না, যেমন হয় না নিজ নিজ পুকুরে গোসল করে সমুদ্রস্নানের স্বাদ পাওয়া। সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার বহর অনেক বেশি—ধর্মে ধর্মে বিরোধও সবচেয়ে বেশি এ-আনুষ্ঠানিকতায়। অথচ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া ধর্মের বৃহত্তর আদর্শ বা আবেদনও থেকে যায় ওদের কাছে তাই অনুপলব্ধ। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাই কে হিন্দু আর কে মুসলমান এ-বোধটাকে খুব বড করে তোলে। এর ফলে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও হিন্দু মুসলমান সমস্যার মৃত্যু ঘটে নি এবং সবরকম আনুকূল্য সত্ত্বেও কোনো রাষ্ট্রেই একটা সুসংহত জাতীয়তা গড়ে ওঠে নি। বলা বাহুল্য সাধারণ মানুষের কাছে অনুষ্ঠানই ধর্ম। ফলে যে কোনো অজুহাতে এরা যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে বা এদেরে উত্তেজিত করে তোলা হয় তখন ধর্মের নামে মানুষ হত্যায়ও এরা মনের দিক থেকে আর কোনো বাধা পায় না।

একবার এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ধার্মিকে আর সাহিত্যিকে পার্থক্যটা কোথায়?

উত্তরে বলেছিলাম: ধর্মগ্রন্থে যদি নির্দেশ দেওয়া থাকে যে, বিধর্মীকে কতল করলে তোমার জন্য বেহেস্তে সর্বোত্তম কামরাটি খাস রাখা হবে আর দেওয়া হবে তোমাকে সত্তর হাজার হুর (সংখ্যাটা কাল্পনিক নয় এক ওয়াজের মজলিসে শুনেছিলাম), তা হলে ধার্মিকজন সুযোগ পেলে এ-নির্দেশ পালন করতে কিছুমাত্র ইতস্তত করবে না। এখন ইতস্তত করার বা পালন না করতে পারার একমাত্র অন্তরায় পার্থিব আইন—অধিকতর পার্থিব ও প্রত্যক্ষ পুলিশ! কিন্তু সাহিত্যিক এমন নির্দেশ শুধু যে পালন করবেন না তা নয়, বরং অবিশ্বাস্য বলে এমন নির্দেশকে তিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন। মানুষ মেরে বেহেস্তে যাওয়ার কল্পনাই তাঁর কল্পনার বাইরে। স্বয়ং ঈশ্বর নেমে এসেও যদি তাঁকে এমন নির্দেশ দেন, সাহিত্যিক তেমন ঈশ্বরকেও নিজের লেখন কক্ষ থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে দ্বিধা বোধ করবেন না, ঈশ্বর নামধেয় কারো

পক্ষে এমন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব এ-কথাটাই সাহিত্যিকের কাছে অবিশ্বাস্য। কিন্তু ধার্মিক তো সম্ভব অসম্ভবের বিচার করে না। কারণ, ধর্ম আর শাস্ত্রীয় ব্যাপার নিয়ে বিচার করাটাই তার কাছে অধর্ম। তার একমাত্র অবলম্বন অন্ধ বিশ্বাস আর অন্ধ অনুসরণ। একজনের জন্য সত্তর হাজার হুর সম্ভব কি অসম্ভব, সম্ভব হলেও একত্রে অতগুলি হুর দিয়ে সে কি করবে এ সব অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রশ্নও তার মনে উদয় হয় না—হলেও উত্তর সন্ধানে সে নিস্পৃহ অথবা শঙ্কিত। সে উত্তর যতই লজিক্যাল বা যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, তার কাল্পনিক পরিণাম ভেবে সে আরো বেশি ভীত। যে-মানুষ লজিক বা যুক্তির সম্মুখীন হতে ভয় পায়, তার কাছে মননশীলতা বা মুক্তবুদ্ধির চর্চা এক নিষিদ্ধ ব্যাপার। এমন মানুষকে সত্তর হাজারের পরিবর্তে সত্তর লক্ষ বললেও সে বিশ্বাস করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। হয়তো ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে আরো বেশি উৎফুল্ল, আরো বেশি বেপরওয়া ধার্মিক হয়ে উঠবে। যে-মানুষ জীবনে একটা হুর সামলাতেই গলদ্‌ঘর্ম, মৃত্যুর পর সে সত্তর হাজার সামলাবার অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবে—এমনতর অদ্ভুত বিশ্বাসই সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ ও সম্মোহিত করে রাখে। বলাবাহুল্য সংসারে বা সমাজে অর্থাৎ জীবিত লোকে অলৌকিকতার বিন্দুবিসর্গ মূল্যও নেই—এখানে যা কিছু মূল্য তা বাস্তব আর প্রত্যক্ষের। তাই যে-অলৌকিকতার উপর ধর্ম আর তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে মানুষের মন ফিরিয়ে এনে তাকে মানবতার দিকে—যে মানবতা বাস্তব, প্রত্যক্ষ, সামাজিক, ব্যবহারিক ও যুক্তি-নির্ভর সে দিকে—ফেরাতে হবে।

মানবজাতির শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করছে এ-সাধনা আর এর সাফল্যের উপর। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ ইচ্ছামতো নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠান পালন করুক তাতে কারো লাভ লোকসান ঘটে না। কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাকে বড় করে তুললেই ঘটে মুস্কিল; তখন এমন সব সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যার সমাধান এক কথায় বন্য হংস। আজ পাকিস্তান আর হিন্দুস্থানে এ-'বন্যহংস' ধরার প্রতিযোগিতাই চলেছে। স্বাধীনতার পর দেশে ধর্মানুষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি মশার বংশবৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। অথচ দেশে নৈতিকমান সবরকমে পূর্বতন রেকর্ড ভঙ্গ করে অধঃপতনের পাতালপুরীর দিকেই আজ দ্রুতগতি। জীবনবিচ্ছিন্ন ধর্মচর্চার এ এক শোচনীয় পরিণতি।

আমার বিশ্বাস ধর্ম সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। ধর্ম আজ অনেকের জীবনে অন্য পাঁচটা বৈষয়িক বস্তুর সামিল—পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার। অথচ এরা বাস্তব ও পার্থিব যুক্তি-বিচারের কষ্টিপাথরে ধর্মকে যাচাই করতে নারাজ। ধর্ম আর ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শব্দ ও নানা উক্তি বহু ব্যবহারে আজ এমন একটা নির্জীব অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তা মনে আর কোনো আবেদন বা উপলব্ধিরই চমক লাগায় না। চরিত্র ও নীতিবোধের পরিবর্তে তসবি-র জনপ্রিয়তা, মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি বা হরি-সংকীর্তনে কণ্ঠস্বরের প্রতিযোগিতা মোটেও সামাজিক অগ্রগতির দিগদর্শন নয়। বরং এ-যুগে ওটাও একরকম Playing to the gallery—ওতে খেলায় জেতা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন: মন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। আজ মন্ত্রপাঠ বা তস্‌বীহ্‌ তেলাওয়াৎ মননশীলতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এক জড় ব্যাপারে পরিণত। মুখে আরবী বা সংস্কৃত বুলি যতই উচ্চারিত হোক তার অর্থ কি, তাৎপর্য কি, জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটুকু (জীবন মানে শুধু ব্যক্তিগত জীবন নয়, অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে যে জীবন) এ-সব জিজ্ঞাসা যদি মনে কোনো ভাবনার সৃষ্টি না করে, ভেতরটা যদি কোনো নতুন তরঙ্গে সাড়া না দেয় তাহলে তেমন উচ্চারণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হলেও নিষ্ফল শ্রম ছাড়া কিছুই না।

পৃথিবীর এখন বয়স হয়েছে, সভ্যতা সংস্কৃতিরও বয়স কম নয়, লিপিবদ্ধ ধর্মের আয়ুও কয়েক হাজার বছর। প্রাথমিক স্তরে জীবনধারণ বা সভ্যতার জন্য যে সব উপকরণ অত্যাবশ্যক বিবেচিত হতো, আজ তার অনেক কিছু অকেজো বলে পরিত্যক্ত। সভ্যজীবন-যাপনের জন্যে তা আর অপরিহার্য মনে করা হয় না। তেমনি ধর্মেরও প্রাথমিক স্তরের অনেক কিছুই আজ জীবনের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে। ধর্ম-জীবনও যে সামাজিক জীবন— সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই তার যা কিছু মূল্য, এ-বোধ না থাকলে ধর্ম জীবনবিমুখ হয়ে পড়তে বাধ্য। যেমন এখন হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষ মৃত্যুর পর স্বর্গে গেল কি নরকে গেল তা মানবজাতির কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। কিন্তু মৃত্যুর আগে লোকটা সৎ ও সামাজিক ছিল কিনা তা সব মানুষেরই ভাবনার বিষয়। কারণ তার এ-জীবনের সঙ্গে বহু মানুষের সুখ-দুঃখ জড়িত; জড়িত সামাজিক স্বাস্থ্য, শান্তি, নিরাপত্তা ও ভারসাম্য। স্বর্গের বা নরকের জীবন ব্যক্তিগত ও

একক—ঐ দু-জায়গায় কোনো সামাজিক জীবন আছে বা থাকবে তেমন কথা কোনো ধর্মগ্রন্থেই উল্লেখিত হয় নি। কিন্তু এখানকার যে-জীবন তা পুরোপুরি সামাজিক ও সমষ্টিগত। এ-সামাজিক বা সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই তেমন অশরীরী ব্যাপারকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিলে, আদর্শ ও লক্ষ্য করে তুললে, বিভ্রান্তি ঘটাই স্বাভাবিক। জীবনে যারা জীবনকে ভালোবাসে না, ভালোবাসে মৃত্যুকে অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবনকে, বলা বাহুল্য, এ-হুর-পরীবর্জিত, দুধের নদনদীশূন্য পৃথিবী তাদের জন্য খুব উপযুক্ত বাসস্থান নয়। এ জন্যেই বলছি যা পরকালের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ ধর্ম, তার উপর জোর না দিয়ে যা এ-জীবনের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ মানবতার ওপর জোর দেওয়াই উচিত। মানুষের কল্যাণ এ-দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে জড়িত।

ব্যক্তিগতভাবে কিম্বা সামাজিকভাবে ধার্মিক হওয়ার যে আমি বিরুদ্ধে তা নয়। ধর্ম যদি মনুষ্যত্বের পরিপূরক বা নামান্তর না হয় তা হলে ধর্মে আর মনুষ্যত্বে পদে পদে সংঘর্ষ অনিবার্য। আমার বিশ্বাস খাঁটি অর্থে যারা ধার্মিক তারা কখনো নিজের কি অপরের মনুষ্যত্বকে আঘাত হানতে পারে না—পারে না মানবতাকে কিছুমাত্র খাটো করতে। আমার বক্তব্য: নিছক আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের দ্বারা কেউ ধার্মিক হতে পারে না, যেমন হতে পারে না খাঁটি সাহিত্যিক স্রেফ সাহিত্যের পেশাদারী অধ্যাপনা করে। জীবনের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গীটাই আলাদা হওয়া চাই—আর তা হওয়া চাই ব্যক্তির সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িত। ভেতরে ধর্মবোধ না থাকলে আর বহু সাধনায় তাকে অন্তরঙ্গ করে তুলতে না পারলে সত্যিকার ধার্মিক হওয়া অসম্ভব বলেই আমার বিশ্বাস। ধর্মজীবনের ব্যাপ্তি সামাজিক জীবনে ছড়িয়ে না পড়লে তার মূল্যই বা কতটুকু? ব্যক্তিগতভাবে কোনো মানুষের কাছে যদি কোটি টাকাও থাকে তাতে সমাজের কি এসে যায়, যদি তার এক ভগ্নাংশও সমাজদেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারে সহায়তা না করে? সমাজের দিক থেকে এর চেয়ে স্তূপীকৃত মৃত্তিকা-খণ্ডের মূল্য অনেক বেশি। ঘরে বসে কোটিবার তস্‌বিহ্‌ জপা আর কোটি টাকা সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা ব্যবহারিক দিক থেকে একই ব্যাপার—এ-দুয়ের কিছুমাত্র সামাজিক মূল্য নেই। কোটি টাকা যা কোটি পুণ্যও তাই—সামাজিক মূল্যেই এ-দুয়ের মূল্য। আগে একবার বলেছি ব্যক্তিবিশেষ স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে তার আগাম দুশ্চিন্তায় কারো পক্ষে ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর কোনো মানে হয় না।

মন্দিরে মসজিদে গির্জায় কে কি রকম আচরণ করে, সেজদায় গিয়ে কে দীর্ঘতর সময় কাটায় তা মোটেও বড় কথা নয়। কোনো মানুষ বত্রিশ আনা হিন্দু বা চৌষট্টি আনা মুসলমান কি খ্রীষ্টান হলেও পৃথিবীর কোনো লাভ লোকসান ঘটে না। কিন্তু বাইরে অর্থাৎ সমাজে এবং পরিবারে যদি আট আনা মানুষও হয় তাহলেই পৃথিবী বেঁচে যায়। আজ পৃথিবী এমন মানুষের প্রতীক্ষায় যে-মানুষের একমাত্র অভীপ্সা মানুষ হওয়ার—মানুষের মতো আচরণ করার।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর তাবৎ পৃথিবীর মালিক। এ-সব কথা সামাজিক দিক থেকে স্রেফ হাওয়ায় বেলুন ওড়ানো। এর কোনো সামাজিক মূল্য নেই। এতে কোনো সামাজিক তথা মানবীয় সমস্যারই সমাধান হয় না। এ-সব ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের অঙ্গ হতে পারে। কিন্তু কোনো বিশ্বাসই সামাজিক শান্তি বা শৃঙ্খলা আনতে সক্ষম নয়। তার এক বড় প্রমাণ, কোথাও শান্তিভঙ্গের 'আশঙ্কা' দেখা দিলে লোকে পুলিশ ডাকে, আল্লাহ বা ভগবানকে ডাকে না!

ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে আইনের শাসনে শৃঙ্খলাবদ্ধ না করলে তা সহজে পরস্বাপহরণের অজুহাত হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটা গল্প শুনেছিলাম:

এক ব্যক্তি প্রায়ই মসজিদ থেকে কোরাণশরীফ চুরি করত আর চুরি করার সময় এভাবে সাফাই দিত আল্লার কাছে: আল্ আব্দু আবদুল্লাহ্, আল্ বায়তু বায়তুল্লাহ্, আল্ কালামু কালামুল্লাহ্ অর্থাৎ এ-বান্দাও আল্লার বান্দা, এ-ঘরও আল্লার ঘর, এ-কোরাণও আল্লার কালাম অর্থাৎ আল্লার বাণী! অতএব (তার মতে) এতে কোনো অন্যায় বা পাপ নেই। অধিকতর সেয়ানা আর-এক ব্যক্তি এটা টের পেয়ে একদিন লাঠি হাতে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখে শুনে আজ্‌রবো জরবোল্লাহ্ অর্থাৎ মারটাও আল্লার মার বলে চোরটাকে বেদম লাঠিপেটা করে ছাড়লে!

মনে হচ্ছে এ-চোর এবং দণ্ডদাতা উভয়ে আল্লার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। একই বিশ্বাসের লজিক বা যুক্তি দুজন মানুষকে কেমন পরস্পরবিরোধী কার্য-কলাপে অনুপ্রাণিত করেছে তা দেখে রীতিমতো অবাক হতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: আল্লার সার্বভৌমত্বের এমনধারা ধারণা যদি সামাজিক ও নাগরিক জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে, তা হলে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে

দাঁড়াবে? জগৎ-সংসারের উপর আল্লার সার্বভৌমত্ব যদি ভাবলোকে অর্থাৎ থিউরেটিকেলি স্বীকার করা হয় আর ব্যবহারিক জীবনে করা হয় সম্পূর্ণ অস্বীকার, তাহলে পদে পদে আত্মপ্রবঞ্চনা করাই হবে মানুষের নিয়তি। ব্যবহারিক জীবনে স্বীকার করা হলে কি দশা ঘটে তার নজির ওপরে উল্লেখিত চোর ও তার দণ্ডদাতা। মসজিদ ও কোরাণের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে অথবা একটা চোর ও একজন দণ্ডদাতার সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে এ-ধারণা ও বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করলে আমার বিশ্বাস সামাজিক জীবন আর জঙ্গল-জীবনে কোনো পার্থক্যই থাকবে না। গৃহস্থ ও চোর উভয়ে যদি অন্তরের সঙ্গে পার্থিব ব্যাপারেও আল্লার সার্বভৌমত্ব মেনে নেয় আর তা প্রাত্যহিক জীবনে পরীক্ষা করতে শুরু করে, তা হলে অবস্থাটা যা দাঁড়াবে তা কল্পনা করতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন আইন বলে যদি কিছু থাকে তা একই সঙ্গে গৃহস্থ এবং চোর উভয়ে নিজ নিজ স্বার্থানুসারে নিজ নিজ হাতে তুলে নিতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করবে না। যেমন উপরে বর্ণিত চোর ও দণ্ডদাতা করে নি। পার্থিব ব্যাপারে আল্লাহ ও ধর্মকে টেনে আনলে তা এমনি দু-ধারি করাত হয়ে উঠবে।

আমার বক্তব্য: যা অপার্থিব তা অপার্থিব থাকতে দিন—যা পার্থিব তাকে সর্বতোভাবে পার্থিবের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ রাখুন। অপার্থিবের তথা আধ্যাত্মিকের প্রেরণা ও তৃষ্ণা মানুষ যে একেবারে অনুভব করে না বা তার কোনো প্রয়োজন নেই তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাচ্ছি তা ব্যক্তিগত সাধনা ও উপলব্ধির ব্যাপার। তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে টেনে আনায় আমার আপত্তি, টেনে আনলে শুধু সামাজিক জীবন নয় আধ্যাত্মিক জীবনও নাজেহাল হয়। সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ পার্থিব ব্যাপার —যে-মানুষ নিয়ে সমাজ সে-মানুষও আগাগোড়া পার্থিব। কাজেই অপার্থিবের দোহাই দিয়ে এমন সমাজকে শাসন পরিচালন করতে গেলেই তা ব্যর্থ হবেই। এ-ব্যর্থতার নজির আজ সর্বত্র। কেতাবের ইসলাম আর জীবনের ইসলামের মাঝখানে আজ বিরাজ করছে এক প্রশান্ত মহাসাগর। সব ধর্মের বেলায় এ-কথা সত্য।

মানুষের মধ্যে একটা সনাতন মেষ-প্রবৃত্তি আছে। জিজ্ঞাসা ও মনন-শীলতার অভাব ঘটলে মনের সে-মেষ-প্রবৃত্তিটাই একক হয়ে ওঠে। তখন গতানুগতিক আর অন্ধ অনুসরণই চরম মোক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

গত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করেছে ধর্ম মানুষকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি। ধর্মযুদ্ধ কথাটাই একটা স্ববিরোধী উক্তি, ধর্মকে মানবতার উপর স্থান দিতে গিয়েই মানুষ এ-ধরনের বহু স্ববিরোধিতার শিকার হয়েছে। যার ফলে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে অপরিমেয় ধ্বংস নেমে এসেছে। আর এ-ধ্বংসের পেছনে এক বড় ভূমিকা নিয়েছে পরকাল—যে-পরকাল অদৃশ্য, অপ্রমাণ্য ও সম্পূর্ণ অপার্থিব। আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে অপার্থিবকে পার্থিবের এলাকায় টেনে আনলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। আল্লাব সাবভৌমত্বকে জাগতিক ব্যাপারে টেনে আনলে যে-গোলকধাঁধার সৃষ্টি হয় তাতে প্রবেশের পথ পাওয়া গেলেও বের হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান বা বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করে বিশ্ব ও মানবসৃষ্টি সম্বন্ধে যদি ধর্মীয় মতবাদও মেনে নেওয়া যায়, তাহলেও জাগতিক ব্যাপারে আল্লার সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ায় বিপদ অনেক, যেমন অনেক বিপদ সন্তানের উপর পিতা-মাতার সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ায়। তাই কোনো ইসলামী রাষ্ট্রেও শেষোক্ত সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি পায় নি। স্বয়ং ইসলামের নবীও ঐ ধরনের সার্বভৌমত্ব নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তাঁর নবী জীবনের শুরুতে। অথচ আল্লার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের চেয়ে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক অধিকতর বাস্তব।

যে-ধর্ম ইহকালে মানুষকে রক্ষা করতে পারে নি, পারছে না—সে-ধর্ম পরকালে মানুষকে রক্ষা করবে এমন অলৌকিক বিশ্বাসে কেউ যদি স্বাস্তবোধ করেন তাতে আপত্তি করার কোনো কারণ নেই; কিন্তু আমার আপত্তি হচ্ছে অলৌকিককে লৌকিক ব্যাপারে টেনে আনায়। বলাবাহুল্য দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র এসবই লৌকিক ব্যাপার।

আর পরলোকে যদি কোনো 'প্রবেশিকা' পরীক্ষা হয় তা হলে মানুষের জন্যে মনুষ্যত্বের পরীক্ষা না হয়ে ধর্মের তথা ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের পরীক্ষা হবে, তেমন বিশ্বাস মানববুদ্ধির অপমান। ঈশ্বরের অপমান আরো বেশি কারণ তখন তাঁকে খাটো করে টেনে এনে বসানো হয় সুপরিচিত গুরুমহাশয়ের আসনে।

পাকিস্তান হিন্দুস্তানের আয় আর দায় অর্থাৎ Assets and Liabilities ভাগ বাটোয়ারার সময় আল্লাহ নাকি পাকিস্তানের ভাগেই পড়েছেন। তবে তখন তা আয় না দায় ভালো করে বোঝা যায় নি। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে

পাকিস্তানের এ এক মস্ত বড দায়। দোহাই, কথাটি আমার নয়, আমি মরহুম জাষ্টিস কায়ানীর ভাষণ থেকেই চুরি করেছি। প্রমাণ হিসেবে এ প্রসঙ্গে তাঁর শেষ মন্তব্যটাও উদ্ধৃত করছি : "Undoubtedly the Lord God is an asset when the nation is going to ruin, but in the name of the Lord God, the Beneficent, the Merciful, some of us are apt to develop a narrow pseudo-religious outlook, as though the Lord God belonged to us only, and were not the Lord of the Universe, which is the true meaning of Rabbul-Alamin. And that is how He is made a Liability. (Vide : Not the whole truth : page—186)

বলাবাহুল্য এ-বইর ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট, শুধু ভূমিকা নয়—কায়ানীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন তিনি! এ-liability বা দায় আমাদের শাসনতন্ত্রে শুধু নয় সমাজের প্রতি স্তরেও অনুপ্রবেশ করে কি রকম আত্মপ্রবঞ্চনা ও বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠেছে, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি : মাত্র কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির বার্ষিক সভা। ঐ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি চট্টগ্রামের প্রাক্তন কমিশনার মিঃ এন এম. খান আই.সি.এস.। কি কারণে সেবার তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। সভাপতিত্ব করছেন সহ-সভাপতি জনৈক পূর্ব-পাকিস্তানী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সভার কাজ যথারীতি শুরু হয়েছে—কিছুদূর এগিয়েও গেছে। হঠাৎ একজন মুসল্লী-মোত্তকি সদস্য বলে উঠলেন : "স্যার, কোরাণ তেলাওয়াত হয় নি, কোরাণ তেলাওয়াতের পর সভার কাজ শুরু হওয়া উচিত।"

সভাপতি বেকায়দায় পড়ে ইতস্তত করতে লাগলেন। সভার কাজ শুরু হয়ে গেছে, এখন হাঁ করা মানে কেঁচে গণ্ডুষ করা, না করাতো এক রকম অসম্ভব। কায়ানী সাহেব যে-দায়ের কথা বলেছেন সে-দায় রক্ষা না করে উপায় নেই। অগত্যা সভাপতি আমতা আমতা করে বললেন : "আচ্ছা, তেলাওয়াত করুন, আপনিই করুন।" কয়েক মিনিটের জন্য কর্মসূচী মুলতবী রেখে তাই করা হল।

পরের বৎসর সেই একই প্রতিষ্ঠানের একই বার্ষিক সভা—একই স্থানে, উপস্থিত সদস্য-শ্রোতারাও একই, মুসল্লী-মোত্তকি সদস্যরাও সদলবলে হাজির। কিন্তু ঘটনাচক্রে এবার স্থায়ী সভাপতি স্বয়ং এন. এম. খান উপস্থিত—

তিনিই সভাপতিত্ব করছেন। এন. এম. খান দুর্দান্ত অফিসার এ-খবর সবারই জানা। পরিচিতদের সঙ্গে কুশল জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে তিনি সভার কাজ শুরু করে দিলেন—বিনা তেলাওয়াতে, বিনা ভূমিকায়। কেউ টুঁ শব্দটিও করলেন না। সে মুসল্লী-মোত্তকি সদস্যটিও কোরাণ তেলাওয়াতের কথা এবার ভুলে রইলেন বেমালুম! 'নাচ-গানে ভরপুর' বিচিত্রানুষ্ঠানও কোরাণ তেলাওয়াত করে শুরু হতে দেখেছি। অকারণে ধর্মকে কোথায় টেনে আনা হচ্ছে এ-সব তারই দৃষ্টান্ত।

পাকিস্তানের অন্যতম চিন্তাবিদ মিঃ এ.কে. ব্রোহী তাঁর 'Religion and freedom' প্রবন্ধটি শেষ করেছেন রবীন্দ্রনাথের এ-বিখ্যাত উক্তি দিয়ে: "I love God, because He has given me freedom to deny Him." যে-ঈশ্বর বা আল্লাহ গুরুমশায়ের প্রতীক সে-ঈশ্বর থেকে এ-ঈশ্বরের ধারণা ও উপলব্ধি কি অনেক বড় ও মহত্তর নয়? আল্লার এ-মহত্ত্বের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত কম্যুনিস্ট দেশগুলি। ওরা তো ঈশ্বর, আল্লাহ, গড কিছুই মানে না। তবুও আল্লাহ তাদের ক্রমোন্নতি আর সুখ-সমৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করেছেন অথবা ঐ সব দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দেশ থেকে বেশি তেমন কথা এ যাবৎ শোনা যায় নি। যদি বলেন ওরা মজাটা টের পাবে পরকালে গিয়ে তাহলে অবশ্যই নিরুত্তর থাকতে হয়।

সবরকম অলৌকিকতার অস্তিত্ব মানুষের ধারণা ও উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল—ঈশ্বর ও পরকালও। যা কিছু মানুষের ধারণা ও উপলব্ধির বাইরে তা যে শুধু অস্তিত্বহীন তা নয়, মানুষের জীবনে তার কোনো দামও নেই। যে-ঈশ্বর তাঁকে শুদ্ধ না মানবার স্বাধীনতা মানুষকে দিয়েছেন, সে-ঈশ্বরের Conception বা উপলব্ধি মানুষের প্রত্যয় ও আত্মমর্যাদার দিগন্তরেখা যে শুধু অবারিত করে দেয় তা নয়, মানুষকে নবতর চেতনা আর জিজ্ঞাসায়ও করে তোলে উদ্বুদ্ধ। এভাবে নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে এলেই মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের শাসন তথা মানবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে সহজ। ধর্মের ওপর জোর দিতে গেলেই ঈশ্বরের আবির্ভাব অনিবার্য। আর ঈশ্বর মানে সাম্প্রদায়িক ঈশ্বর—পশ্চিমের বেলায় জাতীয় ঈশ্বর। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এক হলেও আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের মতো আল্লাহ, ঈশ্বর এবং গড নিয়েও কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, মিল হবেও না।

মুসলমানের আল্লাহ আর হিন্দুর ঈশ্বর এক নয়, তেমনি হিন্দুর ঈশ্বর

আর খ্রীষ্টানের গডও এক নয়—বুদ্ধ মানুষ হয়েও কোটি কোটি মানুষের আরাধ্য। এ ভাবে যেখানে মূলেই পার্থক্য, সেখানে ব্যাখ্যা আর উপলব্ধিতে তারতম্য ঘটবেই। ফলে আচার-অনুষ্ঠানেও শুধু তারতম্য নয়—বিরোধও অনিবার্য। আর দেখা গেছে অতি সহজে এ-বিরোধ হয়ে ওঠে বারুদ। নীতিহীন, মনুষ্যত্বহীন রাজনীতি এ-বারুদে অগ্নিসংযোগ করতে এক মুহূর্তও ইতস্তত করে না। ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের এটাই তো পটভূমি।

কিন্তু মনুষ্যত্বের ব্যাপারে এ-বিরোধ ও উপলব্ধির দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্য নেই বলে সহজে ওটাকে মানুষের স্থির মিলন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এ করে তোলার দায়িত্ব আমাদের দু-দেশের শুধু নয়, পৃথিবীর তাবৎ বুদ্ধিজীবীদের বলেই আমার বিশ্বাস।

বাঙলাদেশের মনস্বী চিন্তানায়ক জনাব আবুল ফজল ১৯৬৪ সালে 'মানবতন্ত্র' প্রবন্ধটি লেখেন। একদা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের শরিক ও আজীবন দুঃসাহসী বুদ্ধিজীবী শ্রদ্ধেয় আবুল ফজল সাহেব পাক-ভারত উপমহাদেশে যে-ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তারই "পটভূমি ও প্রেক্ষিতে" এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে অনেক পত্রিকাই এ-প্রবন্ধ ছাপার সাহস পায় নি। অবশেষে 'সমকাল'-এ ঐ ১৯৬৪ সালেই 'মানবতন্ত্র' প্রকাশিত হয়।

আমরা এতদিন বাদে এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করছি, কারণ, আবুল ফজল সাহেব একটি চিঠিতে জানিয়েছেন: "রাজনৈতিক পরিবেশ পরিবাতত হয়েছে সত্য কিন্তু জনগণের এমনকি বহু রাজনৈতিক নেতারও মানসিক পরিবর্তন ঘটে নি। আমাদের লেখার এখন প্রধান লক্ষ্য হবে শাসক আর জনগণের মানসিক পরিবর্তন। বুঝতেই পারেন মানসিক পরিবর্তন না ঘটলে এবং তা আন্তরিক না হলে ব্যবহারিক পরিবর্তন কিছুতেই দীর্ঘায়ু হবে না এবং আদৌ তা বাস্তবে কার্যকরী করা সম্ভব হবে কিনা এ বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ভেদ-বিভেদের উর্ধ্বে যে-মানুষ, সে-মানুষটার দিকে স্বচ্ছ চোখে তাকাবার প্রয়োজন ভারত বাংলা দেশ উভয়ের রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।"

আমরা এই বিতর্কমূলক প্রবন্ধটি সম্পর্কে পাঠকদের মতামত আহ্বান করছি।		—সম্পাদক

ছাত্রবিক্ষোভের মনস্তত্ত্ব

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আজ ছাত্রমানসকে সমাজের আবহাওয়া-নির্ণায়ক যন্ত্র বলা চলে। সমাজের কোনো অংশে চাপ বা শূন্যতা সৃষ্ট হলে ছাত্রমানসে তার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকে না। সামান্য কারণেই উদ্বেল হয়ে ওঠে ছাত্রসমাজ। এ যুগের বিদ্যার্থীর মন কেবলমাত্র বিদ্যার্জনেই নিবদ্ধ নয়, দুনিয়ার যাবতীয় ঘটনা ও সংবাদে সে আগ্রহী, সর্ব ব্যাপারে সে উৎসাহী। ছাত্রমানসের বৈচিত্র্যগ্রাহিতা ও অনুসন্ধিৎসা সর্বজনবিদিত। অতিমাত্রায় সমাজ-সচেতন হয়েছে সে সাম্প্রতিককালে, বিক্ষোভ-প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশেষ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে বিশেষ করে ষাটের দশকে।

বিক্ষোভের মনস্তত্ত্ব আলোচনায় ছাত্রমানসের কতকগুলি সামান্য ধর্মের উল্লেখ প্রয়োজন। বয়ঃসন্ধিকালীন দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের জন্য কিশোর ছাত্র স্বভাবত অস্থির ও উল্লসিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যৌবন প্রাপ্তির ফলে নতুন জগতের তোরণপ্রান্তে উপস্থিত, নবারুণ আবাহনে সমুৎসুক। এক জটিল মানসিকতা ও বৈপরীত্যবোধের উন্মেষে কৈশোর-চঞ্চলতা ঈষৎ স্তিমিত। নিজের শক্তি সম্বন্ধে সজাগ, সংগ্রাম-মাধ্যমে অতি-পরীক্ষায় উন্মুখ, আবার অনভিজ্ঞতার দরুণ রণকৌশল নির্ণয়ে দ্বিধান্বিত, কিঞ্চিৎ বিচলিত, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম পরিকল্পনায় অনীহ। নিজেকে সনাক্তীকরণ, নিজের সংজ্ঞানিরূপণ, সমাজে নিজের স্থান অন্বেষণ, ইত্যাদি নানা বিষয়ে তরুণমানস পীড়িত ও চিন্তান্বিত। ছাত্র-তরুণ পরিবার-নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চায়, 'ফ্যামিলি-কালচার' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'পীয়ার-কালচার' অর্থাৎ সমবয়সীদের সমাজে প্রবিষ্ট হতে চায়। সমাজ ও পরিবারে প্রচলিত ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধকে নানাভাবে যাচাই করে দেখার সুযোগ-সুবিধা পায় ছাত্র-তরুণ, যাচাই করে দেখার প্রয়োজনও ঘটে। এই ধরনের নানা কারণে তার মনে চলে ঘাতপ্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব, সংশয়। শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবকে পরিণত হবার পথ সুগম ও মসৃণ নয়। দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবৃত্তিকালীন সংকট বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। সমাজ যখন

সুস্থিত, এই সংকট তখন মৃদু ও অগভীর। গুরু-লঘুবিচার, শ্রেণীসংস্থান, মূল্যবোধ ইত্যাদি সমকালীন সমাজের সব বিধান প্রায় সর্বজনস্বীকৃত এবং তরুণ-মানসের দ্বন্দ্ববিরোধ অনেকাংশে সুপ্ত, বিততি বা টেনসন স্তিমিত। বশ্যতা অনুগামিতা স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রমানসে সঞ্চারিত এবং সমাজে ছাত্র-তরুণের সুখ ও কর্তব্য পূর্বনির্দিষ্ট ও ছাত্রসমাজ কর্তৃক সহজেই গৃহীত। আবার সমাজ যখন অস্থির, ব্যাপক পরিবর্তন যখন সমাচ্ছন্ন, বিভিন্ন সম্প্রদায় বা শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে যখন সমাজজীবন উদ্বেল, ছাত্রমানসের সংকটও তখন তীব্র ও গভীরভাবে অনুভূত। এই সময় গুরুলঘু বিন্যাস পুরনো মূল্যবোধ ও সামাজিক বিধান, বশ্যতা অনুগামিতা ইত্যাদি সাধারণ ধর্ম, প্রশ্নাতীত অবশ্যস্বীকৃত থাকতে পারে না। সামাজিক বিততির ফলে তরুণমানস পীড়িত হয়ে পড়ে। সমাজে পূর্বনির্দিষ্ট স্থান ছাত্র-তরুণকে আর তৃপ্তি দিতে পারে না, তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। বিক্ষোভ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে ছাত্রসমাজ। আবহাওয়ার চাপ বা শূন্যতা ছাত্রমানসেই বোধহয় সর্বপ্রথম অনুভূত হয়ে থাকে। পরিবৃত্তিকালীন সংকট এ-অবস্থায় আর বিরল ব্যতিক্রম থাকে না। অধিকাংশের মধ্যেই আলোড়ন আনয়ন করে। দেশকালের বিশেষ ধর্ম আরোপিত হয়ে এই বিক্ষোভ আলোড়ন বিশেষ মূর্তি ধারণ করে।

আজ আমরা বিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অননুগামিতা, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি নিয়ে ভাবিত ও উৎকণ্ঠিত। ছাত্রবিক্ষোভ সমৃদ্ধ অসমৃদ্ধ, উন্নত উন্নয়নশীল, ইয়োরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, সর্ব দেশেরই বিশেষ সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। রাষ্ট্রনেতা, সমাজবিজ্ঞানী, মনস্তাত্ত্বিক, প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যার উপর আলোকপাত ও সমাধানের পন্থানির্ণয়ের চেষ্টা করে চলেছেন। সর্ববাদীসম্মত কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা ছাত্রবিক্ষোভ, আগেই বলেছি, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণ থেকে উদ্ভূত; তাই কোনো সর্বগ্রাহ্য ফর্মুলা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য। আবার একই দেশে বিভিন্ন ধরনের পরস্পরবিরোধী ভাবধারা ও স্বার্থপ্রণোদিত ব্যাখ্যায় সমস্যা বিভিন্নরূপে প্রতিভাত। তাই সমাধানসূত্রও পরস্পরবিরোধী এবং বিপরীতধর্মী।

রাষ্ট্রের কর্ণধাররা স্বভাবত স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চান, কাজেই ছাত্রবিক্ষোভ (যদি রাষ্ট্রনেতার নির্দেশ বা অনুকূলে পরিচালিত না হয়) তাঁদের মতে নৈরাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর। সমৃদ্ধদেশের অনেক সমাজবিজ্ঞানীর

মতে এই বিক্ষোভ-আন্দোলন টেকনোক্রাট ও মনোপলির নীতিহীন শোষণ-লিপ্সার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। উন্নয়নশীল দেশে মনে করা হয় এই আন্দোলন উন্নয়ন-পরিকল্পনার ব্যর্থতা বা শ্লথতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি-প্রভাবিত। সদ্য-স্বাধীনতালব্ধ দেশগুলির মুক্তি-আন্দোলনে স্বাধীনতাসংগ্রামে ছাত্র-শিক্ষকদেব অনেক ক্ষেত্রেই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে, সেই ঐতিহ্য দু-এক দশকের মধ্যেই বিলুপ্ত হতে পারে না। তাছাড়া, মনে রাখা দরকার, পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয় (যার ধারা অনুসারে উন্নয়নশীল দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে) ও বিদ্যায়তন বহু দিন ধরেই অনেকাংশে স্বয়ংশাসিত ও অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ শাসনমুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের প্রবেশ নিষেধ ছিল প্রায় সর্বত্র। এমন কি জারের রাশিয়াতেও এই ব্যবস্থাই চালু ছিল, তাই মাঝে মাঝে রাষ্ট্র-অননুমোদিত বিপ্লবী গোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে নির্ভয়ে মিলিত হতে পারতেন। সাম্প্রতিক কালে ভেনেজুয়েলার বিপ্লবীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। এই বুর্জোয়া উদারনীতির উদ্ভব হয়েছিল ধনতন্ত্রের প্রথম পর্বে, যখন মনে করা হত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার উপর দেশের উৎপাদন ও উন্নয়ন নির্ভরশীল, এবং আরো মনে করা হত যে আবিষ্ক্রিয়ার পরিবেশ রাষ্ট্রীয় বাধানিষেধের উর্ধ্বে অবস্থিত না থাকলে, সৃজনক্রিয়া ও স্বাধীনচিন্তা ব্যাহত হতে বাধ্য। প্রাশিয়ার শিক্ষাসংস্কারকদেব এই উদার মতবাদ উনিশ শতকের জাপান পর্যন্ত গ্রহণ করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা হবে ঐতিহ্যসম্মত তত্ত্ব-নীতিকথার গলধঃকরণ, আর বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ে শিক্ষা হবে সৃজনমূলক ; এই ছিল সেই সময়কার আদর্শ। এই সব কারণে উচ্চবিদ্যায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল র‍্যাডিক্যাল ও নতুন ভাবধারার আশ্রয়স্থল। উন্নয়নশীল দেশগুলি এই পশ্চিমী আদর্শকে বহুলাংশে মেনে নিয়েছে। কাজেই 'ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাস' নিষিদ্ধ স্বাধীন চিন্তার, বিপ্লবী মতবাদের, বিদ্রোহী মানসিকতার লালন ও চারণভূমি হয়ে উঠেছে। রাজনীতি আমাদের বা অন্যদের শিক্ষায়তনে নতুন অনুপ্রবিষ্ট কোনো দুষ্টকীট বা রোগবাহী জীবাণু—এ ধারণা ভ্রমাত্মক। বিদ্যার্থীদের বিক্ষোভকে আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অজানা কোনো দুষ্ট ব্যাধির সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

উনিশশো পাঁচ সালে কার্জনের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে ছাত্ররা, উনিশশো

একুশে স্কুল-কলেজ ছেড়ে গান্ধীর ডাকে বেরিয়ে এসেছে ছাত্ররা, বেয়াল্লিশের ধ্বংসাত্মক কাজে ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে তারা বয়স্কদের বিশেষ পিছনে থাকে নি। আজ ছাত্রবিক্ষোভে যে বৈশিষ্ট্য ব্যাপকতা ও তীব্রতা দেখা দিয়েছে, সেটা কালধর্ম আরোপিত। কালধর্মে ছাত্র-তরুণের মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে বিক্ষোভের মাত্রা ব্যাপকতা তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের দেশের গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বিলোপ ঘটেছে অনেকদিন আগে। কিন্তু এ যাবৎ, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বীকৃত 'হায়ারার্কি'র ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কিশোর ও তরুণের নির্দিষ্ট স্থান ও কর্তব্য নির্ধারিত ছিল। ব্যতিক্রম ঘটলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষক, মাতাপিতা এবং সমাজের বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ছাত্রবিক্ষোভ প্রধানত বিদেশী শাসক ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছে। অভিভাবক শিক্ষক ও সমাজের অন্যান্য সম্মানীয় ব্যক্তিদের এই সব বিক্ষোভ আন্দোলনে প্রায় সব সময়েই প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষ অনুমোদন থাকত। এই সব বিক্ষোভে গুরুদ্রোহিতার প্রকাশ ছিল সাময়িক, বিচ্ছিন্ন ও প্রায়শ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিক্ষোভের মূলে প্রায়ই থাকত দেশ বা দেশনেতাদের প্রতি অবমাননা-লাঞ্ছনার কোনো ঘটনা অথবা উক্তি। গুরুদ্রোহিতা ও অননুগামিতা আজকের ছাত্রবিক্ষোভের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ ছাত্রমানসে আজ দেখা যাবে তীব্র ঘৃণা ও দুরন্ত ক্রোধ কিম্বা প্রাণহীন নিস্পৃহতা, উদাসীনতা, কর্তব্যবিমুখীনতা। প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাস পোষণ, বোধ হয়, আজকের তরুণ সমাজের এক সামান্য ধর্ম। অভিভাবক শিক্ষককে তারা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখতে অনিচ্ছুক।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন আনার প্রয়াস চলেছে। শহর নগরের জনসংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়ছে। শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ও কারীগরী শিক্ষার, প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা চলেছে। গ্রাম থেকে নগরী অভিমুখী হয়েছে ছাত্র-তরুণের এক বড় অংশ। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষা-সময় অনেকক্ষেত্রেই বিলম্বিত হয়েছে ও উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় বয়ঃপ্রাপ্ত পরিগণিত ও বিবাহিত হয়ে সংসারধর্ম নির্বাহ করত যারা, তাদের অধিকাংশই এখন বিদ্যার্থী। একদিকে তারা অভিভাবক শিক্ষকের উপর নির্ভর করতে চায়,

অনুগত থাকতে চায় ; অন্যদিকে আবার নিজেদের বয়ঃপ্রাপ্ত ও দায়িত্বশীল মনে করে সমাজ-পরিবর্তনে স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণে উৎসুক। এই 'সাইকোলজিকাল উইনিং' (psychological weaning)-এর সময় অনেকখানি বেড়েছে এবং এই ব্যাপারে জড়িত কিশোর-তরুণের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। বলা চলে, বয়ঃসন্ধিকাল দীর্ঘায়ত হয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবৃত্তি-সংকটে জড়িয়ে পড়েছে অনেকে। এই বয়সে সকলেই অল্পবিস্তর আদর্শবাদী হয়ে থাকে। তরুণ মাত্রেই কিছুটা স্পর্শপ্রবণ, ভাবপ্রবণ ও রোমান্টিক। দেশ-বিদেশের খবর, বিশেষ করে অন্যদেশের ছাত্র-আন্দোলনের সংবাদ, তাদের কাছে নানাভাবে এসে পৌছচ্ছে। খবরগুলি সব সময়েই শুধু খবর নয়, বিশেষ ধরনের মতবাদের রঙে রঞ্জিত খবর। 'ইলেকট্রনিক' যুগের দ্রুত ও অভাবনীয় পরিবর্তনের নিত্য নতুন সংবাদে ছাত্রমানস অস্থির চঞ্চল হয়ে আছে। "তরুণ মানস জেট-প্লেনের গতিতে এগিয়ে যেতে চাইছে, আর পার্টি প্রতিষ্ঠান সরকার যেন শম্বুক-গতির পরিকল্পনার আলেখ্য তার চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।" তাই ছাত্রমানসে দেখা দিয়েছে অসহিষ্ণু মনোভাব। এই অবস্থায় তার মনে হচ্ছে, বড়রা ঠিক পথে চলছে না। তাই সে রুষ্ট, তাই সে বড়দের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে কেন তার দেশের অগ্রগতি ঘটবে না—এই তার জিজ্ঞাসা। সব বিক্ষোভের শেষ বিশ্লেষণে বোধহয় এই কথাটাই বেরিয়ে আসবে। যুক্তির থেকে আবেগের আধিক্য হয়তো তাদের বক্তব্যে প্রকাশ পাচ্ছে। তরুণ মানসে আবেগের আধিক্য ও প্রভাব বেশি থাকাই তো স্বাভাবিক।

অভিভাবক ও শিক্ষকদের উপর আস্থা হারানোর আরো কারণ আছে। রাজনৈতিক ছাড়া অন্য যেসব কারণে ছাত্রবিক্ষোভ ঘটছে, তার মধ্যে আছে প্রধানত পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি। এই সব ব্যাপারে পিতামাতা অভিভাবকরা আর তাদের বিশেষ সাহায্য করতে পারছেন না। সমাজের অস্থির অবস্থায় তাঁরা নিজেরাই অস্থিরতা ও মানসিক উদ্বেগে ভুগছেন। অনেকেই আর্থিক আনুষঙ্গিক সমস্যায় জর্জর। ছেলেমেয়েদের পাঠ্যক্রম ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়বস্তু তাঁদের অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য। এক প্রজন্ম আগেকার এনট্রান্স পাশ পিতা ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্রের অধিকাংশ পাঠ্যবিষয়ে তাকে সাহায্য

করতে পারতেন, আজকের দিনে তা সম্ভব নয়। কাজেই আজকের ছাত্র কিশোর আগের দিনের পুত্রের মতো পিতাকে আর নিজের থেকে জ্ঞানী কাজেই শ্রদ্ধার্হ মনে করতে পারছে না। শিক্ষা পরিচালনার ব্যাপারেও শিক্ষক ও অভিভাবকদের কর্তৃত্বও আগের তুলনায় অনেকটা সীমিত। দেশের সামগ্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও শিক্ষাপরিচালনার নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সাহায্যস্রোতের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে। তার প্রতিক্রিয়া শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমনির্ধারণের ক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে। বারবার পরিবর্তনের কথা শোনা যাচ্ছে, কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিতও হচ্ছে। এর ফলে একদিকে ছাত্রমানসেও অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও পড়াশুনার ব্যাপারে আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে; অন্যদিকে গুরুজনদের উপর আস্থা আরো কমছে। মনে রাখা দরকার, ছাত্রসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়তন ও শিক্ষার উপকরণ বাড়ে নি। কাজেই নানা অব্যবস্থা ও বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে। ছাত্ররা শিক্ষকের উপর, শিক্ষার উপর, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনেতা, গুরুজন, অভিভাবকের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। আরুণি-উপমন্যুর উপাখ্যানের চেয়ে বেণ্ডিট ভ্রাতৃদ্বয়ের বাণী তাই তাদের অনেক বেশি আকৃষ্ট করছে। কাসাবিয়াংকার কথা তাদের মনে দাগ কাটছে না। শিক্ষক ও গুরুজনদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের বিযুক্তি ঘটেছে এবং অননুগামিতা বেড়েই চলেছে। বামপন্থায় দীক্ষিত বেশ কিছু ছাত্র-তরুণ দেশীয় নেতাদের নির্দেশ অমান্য করে অতি-বামপন্থী হয়ে বিদেশী নেতাকে গুরুপদে বরণ করেছে। দক্ষিণপন্থীরা নেতা-গুরুদের চেয়ে আরো দক্ষিণে যেতে চাইছে। আর মধ্য-পন্থীরা শুধু পরীক্ষা পাঠ্যক্রম নয়, রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি ব্যাপারেও নেতাদের নিজেদের ইচ্ছামতো পরিচালিত করতে মনস্থ করেছে। জ্যেষ্ঠদের আধিপত্য আর ছাত্র-তরুণ নির্বিচারে মেনে নিতে পারছে না।

দ্বিতীয়যুদ্ধোত্তরকালে পৃথিবীর সর্বত্র তরুণমানসে যে-পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে, আমাদের দেশের তরুণরাও সে-পরিবর্তনের শরিক। এইকালের তরুণদের এটি এক বিশেষ ধর্ম। হার্বার্ট মার্কুস মনে করেন ছাত্ররা morally alienated, নীতির প্রশ্নে তারা সমাজ প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের আমলা-তান্ত্রিক অধিকর্তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা বর্তমান সমাজের সব কিছুকে, শিক্ষাব্যবস্থাসমেত সব কিছুকে, প্রত্যাখ্যান করতে চায়। একজন ফরাসী

সমাজতাত্ত্বিক বলেন জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আগের দিনের মূলধনের মতো দামী। কাজেই আগের দিনের শ্রমিক-অসন্তোষের সঙ্গে আজকের দিনের ছাত্র-অসন্তোষ তুলনীয়। ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক মজুর-মালিক সম্পর্ক। মার্ক্সের মতো ইনিও ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে একই পর্যায়ে ফেলেছেন এবং যন্ত্রতন্ত্রকে অতি-গুরুত্ব দিয়েছেন। এঁরা কৌশলে তাঁদের তত্ত্বে সমাজতন্ত্রবিরোধিতা প্রচার করতে চেয়েছেন। মনে রাখা দরকার ছাত্ররা শ্রমিকের মতো উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে না, উৎপাদনের কাছাকাছি যে-সব ছাত্র আছে তাদের মধ্যে বরং অসন্তোষ কম। ছাত্রদের মনোভাব অনেকটা মরশুমি ফুলের মতো। ঋতুর মতোই পরিবেশের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ওদের মনের রঙে রঙিন হয়ে ফুলের মতো ফুটে ওঠে। আবার একজন সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন ছাত্ররা সুবিধাভোগী বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তর্গত, 'এলিট গ্রুপ'। এদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিপথে চালিত করা। এ-তত্ত্বের যাথার্থ্য নির্ণীত হয় নি। দেখা গেছে, ছাত্র-স্বার্থ ও শ্রমিকস্বার্থ কোনো কোনো সময় এক হয়ে গেছে, শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে ছাত্ররা অনেক সময় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ছাত্রদের বুর্জোয়া বা শ্রমিক কোনো শ্রেণী পর্যায়ভুক্তই করা চলে না।

কালধর্ম ছাত্রবিক্ষোভকে ব্যাপক ও তীব্র করেছে, ছাত্রমানসিকতায় রূপান্তর ঘটেছে। এই সত্যকে অস্বীকার করা চলে না। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশেও বুদ্ধিবৃত্তিক ও উচ্চশিক্ষাভিত্তিক শ্রমের চাহিদা বেড়েছে। টেকনিশিয়ানরা আজ উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, মার্কেটিং-এর সঙ্গে জড়িত, বুদ্ধিজীবীরা আজ সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা না-রাখার ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। কাজেই ছাত্ররা আজ উৎপাদন-ব্যবস্থায় অপরিহার্য, রাষ্ট্রের কাছে সমাজের কাছে আগের তুলনায় অনেক বেশি মূল্যমণ্ডিত। উচ্চশিক্ষা শুধু উৎপাদনের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। উৎপাদন-সম্পর্ক বজায় রাখা ও পরিবর্তিত করার সঙ্গেও সম্পর্কিত। বিপ্লব সংঘটিত করা বা প্রতিহত করার ব্যাপারে ছাত্রদের ভূমিকার গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। ছাত্রদের সংখ্যা যেমন বাড়ছে চেতনাও তেমনি বাড়ছে। সমাজের দ্বন্দ্ববিরোধ ও নিজেদের গুরুত্ব সম্পর্কে তারা ক্রমশ সজাগ হচ্ছে। এদের মধ্যে যারা র‍্যাডিক্যাল, তারা পুরনো পরিচালনাধীন বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরনো উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সম্পর্ক বজায় রাখার একটা যন্ত্র-প্রতিষ্ঠান মনে করছে। কর্তৃপক্ষ চাইছেন, ছাত্রদের জ্ঞান বাড়ুক, বিদ্যা বাড়ুক, কিন্তু চিন্তা করার ক্ষমতা

যেন না বাড়ে। আর ছাত্ররা চাইছে, তাদের 'রবোট' করে রাখার এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে হবে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের আয়ত্তে আনতে হবে, না পারলে ভেঙে ফেলতে হবে।

বিক্ষোভের মনস্তত্ত্ব অনুধাবনে সমকালীন নানা বিরোধী ভাবধারার অনুপ্রবেশ সম্পর্কেও আমাদের অবহিত থাকা দরকার। সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসন যতদিন প্রভাবশালী ছিল—আনুগত্য, অনুগামিতা ইত্যাদি ধর্মাচরণ করে তরুণমন সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরোধিতা পরধর্ম ভয়াবহ বলে এড়িয়ে যেতে পারত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধিকার-চেতনা ও গণতন্ত্রের ধারণা তাদের মনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি—যথা পরমত সহিষ্ণুতা, আত্মসচেতনতা, আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি। বুর্জোয়া 'sense of independence' এবং ফিউড্যাল 'sense of dependency' একই সঙ্গে বসবাস করছে অনেক ছাত্রমানসে—বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা গ্রামীন পরিবেশ থেকে সদ্য শহরে এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে। এর ফলে নানারকম বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে, বিক্ষোভ হয়তো এই কারণেই বিপথগামী হচ্ছে। সব কিছু ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা, পুরনো সব কিছুকে ধ্বংস করার প্রবৃত্তির মধ্যে আমি দেখতে পাই সামন্তধর্ম 'sense of dependency'কে জোর করে অস্বীকারের, হীনম্মন্যতা বিলোপের, এক ব্যর্থ করুণ হাস্যকর প্রচেষ্টা। অন্যদিকে ছাত্রমানসে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ধারণা ও সাম্যবাদের চেতনা। তরুণমন ইউটোপিয়া কমিউনিজমের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবে, এটাই স্বাভাবিক। আশু ও সর্বাত্মক পরিবর্তন চাওয়া তারুণ্যধর্ম। সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার এটা তারা বুঝতে পারছে। উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক চেতনা লাভের জন্য সময় ও শ্রম ব্যয়ে তারা কিন্তু রাজী নয়। যে যুগে পরীক্ষা পাশের সহজ উপায় হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে 'short cut' 'guide' ইত্যাদি পড়লেই চলে, সে যুগে কে পড়তে চায় সাম্যবাদী সাধনার জন্য কঠিনবোধ্য বিপুলায়তন মার্কস-এঙ্গেলসের ক্লাসিক? পার্টি লিটারেচারে সহজতম উপায় নির্ধারিত করার দাবি তারা অনায়াসে করতে পারে এবং কিছু কৌশলী পার্টিনেতা অনায়াসে তাদের এই দুর্বলতার ও অসহিষ্ণুতার সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়েও আসতে পারেন। যন্ত্রে একটি মুদ্রা ফেলে দিলে যদি তৈরি গরম এক পাত্র কফি পাওয়া যায়, কে আর পারকোলেটর, দুধ, কফি, চিনির ঝামেলা পোয়াতে চায়?

সহজে দ্রুত সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকদের চিনে নিয়ে খতম করতে পারলেই যদি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে কেন মিথ্যা শাস্ত্রচর্চা ও ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার কৃচ্ছ্রতা? আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি ও লালফিতার জটিল গ্রন্থিতে গণতন্ত্র আটকে পড়েছে, কলুষিত হচ্ছে, এটা সর্বজনবিদিত সত্য। এরই জের টেনে সব রকমের 'এসটাবলিশমেণ্ট'-বিরোধিতা এবং সমাজতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে হেয় করা চলে। অভিভাবনপ্রবণ ছাত্র-তরুণকে সহজেই 'স্কেপগোট' দেখিয়ে উত্তেজিত করা যায়, তার ফলে সৃষ্ট হতে পারে ছাত্রবিক্ষোভ অতিবাম প্রবণতা ও ধ্বংসকামিতা। এর জন্য শুধু ছাত্রদের দায়ী করা চলে না। বয়স্কদের জ্যেষ্ঠদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

ছাত্র-তরুণ আজ তার শক্তি সম্বন্ধে সজাগ। তার বিশেষ সুবিধাগুলোও তার অজানা নয়। দায়দায়িত্ব তার খুবই কম, কাজেই আপসরফার প্রয়োজন নেই। তারা জানে, রাষ্ট্রনেতারা খুব বেশি ব্যতিব্যস্ত না হলে পুলিশি জুলুম চালাতে চায় না ছাত্রদের উপর। এর ফলে ছাত্রমনে, বিশেষ করে কিছু কিছু নেতৃস্থানীয়র মনে, নিজেদের জাহির করার ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে। রাজনৈতিক দলের কিছু সুবিধাসন্ধানী নেতার মতো তাদের একাংশও ক্ষমতালিপ্সু হয়ে উঠেছে। অন্যের ক্রিয়াকর্মের উপর আধিপত্য চালানোর ইচ্ছা থেকে সকলে না হোক কিছু লোক রাজনীতিতে লিপ্ত হয়ে থাকেন। ছাত্র-তরুণের মনে নাকি অন্যের উপর আধিপত্য করা, অন্যের চিন্তাকে প্রভাবিত করা এবং অন্যের প্রক্ষোভকে অভিভাবিত করার ইচ্ছা থাকে। বর্তমানে সেই ইচ্ছাগুলো কালধর্মে আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। ছাত্র-তরুণ একটু বেশিমাত্রায় আত্মপ্রচারে উন্মুখ হয়েছে। আত্মপ্রচারে বাধা পেলে আক্রমণমুখী হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। এক ধরনের ছাত্র, যাদের মস্তিষ্কে উত্তেজনার ভাব বেশি, নিস্তজনাক্ষমতা কম, তারা এই কারণেই বোধহয় অত্যধিক কোপণস্বভাব ও মারমুখী।

পশ্চিমবঙ্গের এবং কলকাতার ছাত্রবিক্ষোভের মনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গে গত তিরিশ বছরের সামাজিক ইতিহাস উল্লেখ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ ক্ষত এই কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ বহন করছে। দূর প্রাচ্যে নিয়োজিত মিত্রসেনাদের উদর ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির রসদ সরবরাহ করতে গিয়ে সমাজব্যবস্থায় ফাটল ধরে। কালোবাজারী টাকার খেলায় সেই ফাটল প্রসারিত হতে থাকে। নীতিবোধ, মূল্যবোধে ভাঙন ধরে। নিম্নমধ্যবিত্তের মধ্যেও যথেচ্ছাচারের স্পৃহা ও

বোহেমিয়ান ভাব সংক্রামিত হয়। তার আগেই সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক শাসন শিথিল হয়েছিল, যৌথ পরিবারের নিয়মশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছিল। এল পঞ্চাশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও স্বাধীনতা এবং ছিন্নমূল উদ্বাস্তু প্রবাহ। নিরাপত্তার অভাবে পীড়িত হয়ে উদ্বিগ্ন অশান্ত অস্থির হয়ে উঠল দেশের সাধারণ মানুষ। ঐতিহ্যিক থেকে আধুনিক শিল্পসমাজে উত্তরণের চেষ্টা তরুণ-তরুণীর একাংশকে উৎসাহী সংগ্রামী বামপন্থী করে তুলল। যৌথ-পরিবারের উষ্ণতার অভাব মেটাতে তারা বামপন্থী পার্টির ছত্রতলে মিলিত হয়ে সম্মিলিত আন্দোলনের ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে নিরাপত্তার অভাব ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা দূর করতে চাইল। যে-পার্টি যত উচ্চকণ্ঠে নতুন সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিলো, সেই পার্টি তত বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বামপন্থী আন্দোলন ও বিক্ষোভের ভয়ে রাষ্ট্র-পরিচালকদের মধ্যে দেশের গঠন মূলক কাজের চেয়ে আত্মরক্ষামূলক পার্টিরক্ষামূলক কাজের দিকে বেশি ঝোঁক দেখা গেল। রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে দুর্নীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মধ্যে অসামাজিক অপরাধপ্রবণতা খুব বেশি (দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায়) বাড়ল না। প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে ছাত্র-তরুণ নিজেদের প্রকাশ করতে চাইল, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল, সমাজে নিজেদের স্থান খুঁজতে লাগল। চলল রাজ্যব্যাপী এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। শাসক-পার্টি এযাবৎ শুধু নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি রেখে জোড়াতালি দিয়ে আত্মরক্ষামূলক শাসন চালিয়েছেন, গঠনের দিকে খুব কম নজর দিয়েছেন। আর বিরোধী পার্টিগুলি প্রতিবাদবিক্ষোভের মাধ্যমে আক্রমণ চালিয়েছেন। ছাত্রতরুণের চোখের সামনে নতুন পৃথিবীর ছবি। ন্যায়ের পৃথিবী, সমানাধিকারের পৃথিবী। দিকদিগন্তে নব সূর্যোদয়। উৎসাহ উদ্দীপনায় তারা ফেটে পড়ছে। পৃথিবীতে দুটি মাত্র শিবির। একদিকে ন্যায়ের ও সাম্যের,অন্যদিকে অন্যায় ও অসাম্যের। তাদের মনে তখন এক চিন্তা, কণ্ঠে এক গান, প্রাণে এক আশা। ঐ শিবিরকে ভাঙতে পারলেই স্বপ্নরাজ্য গড়ে উঠবে। বোধহয় আপনা থেকেই গড়ে উঠবে! কাজেই, যে কোনো মূল্যে ভাঙতে হবে। আর ঐ শিবিরের পরিচালকদের একটি মাত্র পরিকল্পনা—যে কোনো ভাবে টিকে থাকতে হবে। ষাটের দশকের প্রথম দিকেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রূপান্তর ঘটে। ভাঙন দেখা দিল কমিউনিস্ট শিবিরে। এ দেশের

তরুণমানসে সেই আঘাত অনুভূত হয় এবং বামপন্থীদের বিভেদ বিচ্ছিন্নতা ছাত্র-তরুণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মনে রাখা দরকার ষাট দশকের কিশোর তরুণের অনেকে বিভক্ত রক্তাক্ত মন্বন্তরপীড়িত অভাবঅনশনক্লিষ্ট শহরতলীতে জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মিছিল দেখেছে জন্মাবধি। তারা শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতি স্বজনপোষণের গল্প শুনছে জ্ঞান হওয়া অবধি। তারা এতদিন অন্যশিবিরস্থিত সকলকে শত্রু বলে জেনেছে; এখন শুনল নিজের শিবিরেও শত্রু আছে, আরো ভয়ংকর শত্রু—বিপ্লবকে যারা শোধনবাদ দিয়ে প্রতিহত করতে চায়। অথবা শুনল, অতিবামহঠকারিতার শিশুরোগে আক্রান্ত হয়েছে অনেক বন্ধু। তাদের বিভ্রান্তি চরমে পৌঁছুল। দলের মধ্যে উপদল গড়ে উঠতে লাগল। দল ভেঙে নতুন দল তৈরি হল, তার মধ্যেও দলাদলি দেখা দিলো। প্রথমে "সোশ্যাল ও ফ্যামিলি কালচার" পার্টি কালচারে পরিণত হয়েছিল; এখন পার্টিকালচার "পীয়ার কালচার"-এর রূপ নিলো। অব্যবস্থিত অপরিণত ছাত্রমানসে ভাঙার ডাক, আঘাত করার ডাক, বিশেষ হৃদয়গ্রাহী মনে হল। অনেকেই এই ডাকে সাড়া দিলো, ছাত্রবিক্ষোভ তীব্র ব্যাপক ও ধ্বংসকামী হয়ে উঠল।

কেনেথ কেনিস্টন (The Uncommitted 1965) হার্ভার্ডের ছাত্রদের মধ্যে সমাজবিচ্ছিন্নতার প্রসার দেখেছেন, ফার্ডিনাণ্ড জোয়াইগ (The Student in the age of Anxiety 1963) অক্সফোর্ড ও ম্যাঞ্চেস্টারের ছাত্রদের মধ্যে বালপ্রৌঢ়ির লক্ষণ দেখেছেন। আমাদের ছাত্রবিক্ষোভের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে ধ্বংসকামিতা ও গুরুদ্রোহিতার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। এ-সবের পেছনে কি কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত নেই?

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি গত কুড়ি বছরে আমাদের অধিকাংশ প্রচলিত ধ্যানধারণার মূলোচ্ছেদ করেছে। স্থানকালের ধারণা পালটেছে, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব এনেছে। আণবিক জীববিজ্ঞানের বৈপ্লবিক আবিষ্ক্রিয়া: যথা—ডি. এন. এ, আর. এন. এ. সম্পর্কিত নতুন জ্ঞান, ল্যাবরেটরিতে প্রাণকোষ তৈরির সম্ভাবনা, ইত্যাদি ভ্রূণের পরিবর্তন-সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে। মহাশূন্যে ও সমুদ্রতলে অভিযান জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও খাদ্যাভাব সমস্যার সমাধানের উপায় আবিষ্কার করতে পারবে, অনেকে মনে করছেন। আমরা বয়স্করা আজ ধ্বংসায়ুধ বাড়িয়ে চলেছি, উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকাশসমুদ্রকে কলুষিত করছি. যে পরিমাণে উর্বর জমির প্রাণরস

নিঙড়ে নিচ্ছি, সেই পরিমাণ নতুন অনুর্বর জমিকে প্রাণ দিতে পারছি না, নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সকলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর মীমাংসার আন্তরিক চেষ্টা করছি না। ছাত্র-তরুণের বিক্ষোভ কি এই ইঙ্গিত বহন করছে যে আমরা নতুন পৃথিবীর নতুন সমস্যা সমাধানে অক্ষম? বহুমাত্রিক জগতের জটিল বহুমাত্রিক প্রশ্নের উত্তর আমাদের, জ্যেষ্ঠদের, জানা প্রচলিত পথে পাওয়া যাবে না। ছাত্র-তরুণ কি সমাজরথের রশ্মি ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, ওদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার ওদের হাতে তুলে দিয়ে, আমাদের সসম্মানে বাণপ্রস্থে যাবার নির্দেশ জানাচ্ছে? আগামী দিনের ছবি হয়তো আমাদের দূরকল্পনারও বাইরে।

ছাত্রবিক্ষোভ আজ বিশেষ সমস্যা। কলকাতার পাভলভ ইনসটিটিউটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও 'মানবমন' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে যে-বিতর্কের সূত্রপাত করলেন আমরা আশা করি 'পরিচয়'-এর পাঠক অনেকেই তা'তে যোগ দেবেন। —সম্পাদক

অপরাধীবুলি

অমলেন্দু বসু

বাঙলায় ভাষাতত্ত্বকুশল আলোচনা যে কতটা অগ্রসর তার প্রোজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যাবে ডক্টর ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের এই দুখানা বইয়ে। ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তা ও গবেষণা লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্যেষ্ঠদের সঙ্গেই ক্ষান্ত হয় নি, নবীন পণ্ডিতেরাও এগিয়ে আসছেন, তাঁরা নতুন দিক্‌চক্রের সন্ধানী, তাঁরাও একক অধ্যবসায়ে বহু কর্মীর সম্মিলিত দায়িত্ব সম্পাদন করতে সমর্থ, এ সবের নিদর্শন এই বই দুখানাতে দেখতে পেয়ে যে কোনো বাঙলা ভাষা-অনুরাগী আনন্দলাভ করবেন। আমার বিচারে (সন্দেহ নেই আরো অনেকের বিচার অনুরূপ হবে) ভক্তিপ্রসাদের বই দুখানাতে ভাষাচিন্তার একটি দুর্লভ অথচ প্রচুর সম্ভাবনাময় দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বাঙলা পাঠকের কাছে।

ভক্তিপ্রসাদের আলোচ্য বিষয় অপরাধ-জগতের ভাষা। অর্থাৎ পশ্চিম বাঙলার ভদ্রসমাজের আলোকচক্রের বাইরে ('বাইরে' শব্দটি আমি এখানে নেহাৎ রূপকচ্ছলেই প্রয়োগ করেছি) অন্ধকার-জগতের অধিবাসী যে ক্রিমিন্যাল ক্লাস, অপরাধপ্রবণ অথবা অপরাধে জড়িত নরনারী বালবৃদ্ধের যে সমাজ, তাঁরা নিজ পরিবেশে যে বুলি ব্যবহার করে, তারই কিছু মনোজ্ঞ আলোচনা হয়েছে দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে, প্রথমটিতে কোষাকারে সংগৃহীত ও সজ্জিত হয়েছে এই বুলির শব্দসম্পদ। আমি যতদূর জানি, Criminals' slang নিয়ে ভারতের কোনো ভাষাতেই নিয়মনিষ্ঠ আলোচনা হয় নি (আদৌ কোনো আলোচনা যদি হয়েও থাকে), বস্তুত পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাতেও খুবই কম হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় অবশ্য মূল্যবান অধ্যয়ন হয়েছে, কিন্তু সেখানেও ভাষাশাস্ত্রীয় অন্যবিধ আলোচনার তুলনায় স্ল্যাং সংক্রান্ত আলোচনা কম, তাছাড়া ইংরেজি, ফরাসী জার্মান ভাষায় ইদানীং Underworld বা পাতাল-

---

১. অপরাধ-জগতের শব্দকোষ : পশ্চিম বাঙলা। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭১। পাঁচ টাকা

২. অপরাধ-জগতের ভাষা। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭১। পাঁচ টাকা

পুরীর ভাষা নিয়ে যে ঔৎসুক্য দেখা যাচ্ছে তার অনেকটারই পিছনে মূলত সোশিওলজিক্যাল, সমাজশাস্ত্রীয় অনুসন্ধিৎসা। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ভক্তিপ্রসাদের আলোচনায় ইতস্তত এই সমাজশাস্ত্রীয় চেতনা লক্ষ্য করেছি। ভক্তিপ্রসাদ যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তার ভাষাশাস্ত্রীয় মূল্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আরো দু-ধরনের মূল্য—সমাজশাস্ত্রীয় মূল্য, সৃজনী সাহিত্যের সম্ভাবনা। এই দ্বিতীয় মূল্য নিয়ে ভক্তিপ্রসাদ আপাতত আলোচনা করেন নি কিন্তু অনতিদূর ভবিষ্যতে তিনি স্বয়ং অথবা অন্য কেউ করবেন এমন আশা করি। ইংরেজি পাতালপুরীর ভাষা নিয়ে এরিক্ পার্‌ট্রিজ্ যে মহার্ঘ আলোচনা করেছেন তার মূলে ছিল আলোচকের শেক্‌স্‌পিয়র-প্রীতি। শেক্‌স্‌পিয়রের নাটকে (বস্তুত এলিজাবেথীয় নাটকের বহু স্থলেই) অজস্র স্ল্যাং পাওয়া যায়, ইতর বুলির প্রয়োগে নাটকের ধমনী দ্রুত বেগান্বিত হয়েছে বহুবার, অতএব এই ইতর বুলির প্রকৃতির ও উৎসের সন্ধান করেছেন আধুনিক ভাষাশাস্ত্রী। আমাদের সাহিত্যেও ইতর বুলির সৃজনী প্রয়োগ হয়েছে। আমার ধারণায় এ হেন প্রয়োগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় যুবনাশ্ব-প্রণীত (মণীশ ঘটক) 'পটলডাঙার পাঁচালী'তে, ইদানীং আবদুল জব্বার তাঁর 'বাঙলার চালচিত্র' গ্রন্থে ইতর বুলির সুন্দর ব্যবহার করেছেন।

অপরাধ-জগতের ভাষা বলতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা বোঝায় না, এ-ভাষা পশ্চিম বাঙলায় ব্যবহৃত, বাঙলা ভাষারই অন্তর্গত একটি উপভাষা বা বুলি। যে কোনো সমৃদ্ধিশালী ভাষাতেই স্ট্যানডার্ড ভাষা এবং ডায়ালেকট এই দু-ধরনের ভাষাই চিত্রা বিদ্যমান, স্থানীয় উপভাষা (যেমন দখনে, বীরভূমী, চট্টগ্রামী, বরিশালী ইত্যাদি উপভাষা) এবং ভব্যতা-সচেতন বহুজন-ব্যবহৃত ভাষা। এছাড়া, প্রত্যেক ভাষায় অনেক পেশাগত বুলি প্রচলিত, যে বুলিকে আধুনিক লিঙ্গুইসটিকস শাস্ত্রে বলা হয় 'রেজিস্টার,' এককালে বলা হত 'আর্গট'। ডাক্তারী বুলি, দোকানদারী বুলি, আইন-কারবারীর বুলি ইত্যাদি নানারকম বৃত্তিসংক্রান্ত বুলি প্রত্যেক ভাষাসমাজেই পরিব্যাপ্ত, এই শ্রেণীর বুলির এক অংশে ছাত্রবুলি পাওয়া যায় যে-বুলি ছাত্রগণ নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করেন, অন্যত্র করেন না। এই পেশাগত বুলির এক অংশে পাওয়া যায় অপরাধীবুলি যা নিয়ে ভক্তিপ্রসাদ গবেষণা করেছেন। অপরাধীবুলি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করতে হয়েছে তাঁকে field work দ্বারা, অর্থাৎ অপরাধীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের কথাবার্তা থেকে তাদের বুলির বিশিষ্ট লক্ষণাদি

জানতে হয়েছে। অপরাধীদের পাওয়া গেছে জেলখানায় এবং জেলখানায় গিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার' সুযোগ পেতে হয়েছে পুলিশের আনুকূল্যে। এই ফিলড ওয়র্ক অতীব দুরূহ। পুলিশ বিভাগ তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন বটে কিন্তু (সঙ্গত কারণেই) অপরাধীদের নামধাম প্রকাশের অনুমতি দেন নি। অনুমতি পাবার পরে অনেক অপরাধী হয় তাঁকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করেছেন অথবা স্বাভাবিক গোপন-পরায়ণতার জন্য সাহায্য করেন নি। কখনো কখনো অনুসন্ধানকালে খুন জখমের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

এই অপরাধীবুলির রূপও বিচিত্র। অপরাধীদের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে, প্রত্যেক শ্রেণীর বুলিতে শ্রেণীপেশাভিত্তিক বিশিষ্টতা আছে। অর্থাৎ পকেট-মার, জালিয়াত, জুয়াড়ী, চোলাইমদের ব্যাপারী, প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর কিছু না কিছু বিশিষ্ট শব্দভাণ্ডার ও প্রয়োগপ্রকৃতি লক্ষ্যসাধ্য। ভক্তিপ্রসাদ শুধু শব্দসংগ্রহ করেন নি, শব্দগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন, তাদের ভাষাগত উৎপত্তি, ব্যাকরণগত চরিত্র, তাদের ধ্বনিবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। পেশাগত শব্দভাণ্ডারের যে অজস্র উদাহরণ ভক্তিপ্রসাদের বই-দুটিতে পাওয়া যায় তা থেকে অল্প কয়টির উল্লেখ করছি। পকেটমারের বুলি : ছপ্‌পর (মানে, বাধা), সেটে জাওআ (মানে, যে লোকের পকেট মারা হবে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো। জুয়াড়ীর বুলি : পাগ্‌ড়ি (দশ), বিস্‌সের (আশী টাকা) ; গববাবাজেব বুলি : সুর্‌বাজ (যে লোক বাইরে থেকে অন্যদের চলা-ফেরা নজরে রাখে), ঢুকু (দলের যে শীর্ণদেহ লোক গায়ে তেল মেখে দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢোকে)। কতকগুলি শব্দ আছে সেগুলি বিভিন্ন পেশায় ব্যবহৃত হয় কিন্তু তাদের অভিধা বিভিন্ন, যেমন সোড্‌লা (মস্তানদের বুলিতে অস্ত্র, পকেটমারের বুলিতে মোটা টাকা), কানি (চোরের বুলিতে জামাকাপড়, মস্তানের বুলিতে বিবাহ), সওদা (পকেটমারের বুলিতে নোটের তাড়া, তোলন-কারীর বুলিতে মাল বা বাক্স, কোটনা-কুটনীর বুলিতে তরুণী, বেশ্যার বুলিতে খদ্দের)। ভক্তিপ্রসাদের গবেষণায় আরো নির্ণীত হয়েছে যে অপরাধীজগতের শব্দকোষে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। যেমন বর্ধমানের অপরাধীবুলিতে আল্‌গা (বিদেশী, নবাগত), গোএন্‌দা (চোর) শব্দগুলির অর্থ ঐ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ; দখ্‌নে অঞ্চলের অপরাধীর ভাষায় উসি মানে চশ্‌মা, হাওড়া রেলইয়ার্ডের বুলিতে আট্‌কাবাজ মানে কয়লাচোর, ত্রিপুরাবাসী অপরাধীর বুলিতে খেমটুকেল্‌ মানে লোক।

এই দু-চারিটি উদাহরণ থেকে কিছু ধারণা পাওয়া যাবে ভক্তিপ্রসাদের সংগ্রহ কত বিচিত্র, তাঁর শ্রেণীবিভাগ কত সূক্ষ্ম। এই স্থলে একটি ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তা পরিষ্কার হওয়া দরকার। অপরাধীবুলির শব্দ যদি সাধারণ বাঙলা ভাষার শব্দ থেকে এতই পৃথক—ভক্তিপ্রসাদের শব্দকোষে প্রায় তিন হাজার শব্দ বিধৃত হয়েছে—তাহলে এই শব্দসমষ্টিকে বাঙলা ভাষার অংশ বলা যাবে কি? এই বুলিতে যখন বলা হয়—বিলা ছলাস্ না—তখন সাধারণ বাঙলা ভাষী কিছুই বুঝলেন না, বক্তা যেন বাঙলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলেছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে স্মরণ রাখতে হবে ভাষাশাস্ত্রের একটি মূল সূত্র। সূত্রটি এই যে শুধু শব্দ দিয়ে ভাষা হয় না, শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের ক্রম (syntax, structure) দ্বারা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে অভিধার সেতুবন্ধ নির্মিত হয়, কমিউনিকেশন বা সংযোগ স্থাপিত হয়। ভাষাপ্রয়োগে শব্দ যত জরুরি, শব্দের গাঁথুনিও ততই। কথাটি বিশদ করার জন্য সুনীতিবাবুর দেওয়া কয়েকটি শব্দযোজনার উদ্ধার করছি :

চলিত ভাষা— "একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটটি বাপকে ব'ললে,'বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে অংশ আমি পাব, তা আমাকে দিন।' "

চট্টগ্রামের ভাষা— "ঔগ্‌গোয়া মাইনষ্যের দুয়া পোয়া আছিল্। তারার মৈদ্ধে ছোড়ুয়া তার ব'রে কইল,'বা-জি,আঁওনর্ সম্পত্তির মৈদ্ধে যেই অংশ আঁই পাইয়ম্, হেইইন্ আঁরে দেত্তক্।' "

কোচবিহারের ভাষা—"একজনা মান্‌সির দুই-কোনা বেটা আছিল্। তার মদ্ধে ছোটজন উয়ার বাপেক্ কইল, 'বা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুই পাইম্, তাক্ মোক্ দেন।' "

চলিত ভাষায় কথা বলেন এমন কোনো অশিক্ষিত বা অনতিশিক্ষিত লোকের কাছে উপরে-উদ্ধৃত চট্টগ্রামের ভাষা ও কোচবিহারের ভাষা দুর্বোধ্য হবে এবং উচ্চারিত ধ্বনি সম্ভবত অবোধ্যই হবে যদিও তিনটি স্তবকেই একই কথা বলা হয়েছে। তিনটি স্তবকের শব্দাবলী প্রায় সর্বত্র একই মূল জাত বটে কিন্তু বর্তমানে তাদের রূপ ও বিশেষত ধ্বনি পৃথক। তবে কি এগুলি পৃথক ভাষা? —তা নয়, কেননা একটু অভিনিবেশ সহকারে নজর করলে দেখা যাবে যে বাক্‌রীতি, বাক্যের গাঁথুনি তিন স্তবকেই এক রকম। এই বাক্‌রীতির সমতা তিনটি স্তবকের যোগসূত্র, এই সমতা হচ্ছে বাঙলা বাক্‌রীতির পদ্ধতি, অতএব

কোনো উচ্চারণ বাঙলা ভাষার অন্তর্বর্তী কি না সে কথার বিচার হবে ঐ উচ্চারণগুলি (শব্দের প্রভেদ সত্ত্বেও) বাঙলা বাক্‌রীতির অনুসারী কি না তারই মাপকাঠিতে।

এই মাপকাঠির প্রয়োগে অপরাধীবুলি বাঙলা ভাষার অন্তর্বর্তী। তিনটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

১. (সাধারণ ভাষা) চোর গোপনে মাল চুরি করছে।
(অপরাধীবুলি) কোদ্ চাপাএ মাল চামাচ্‌ছে।
২. (সাধারণ ভাষা) বেইমান দলকে ঠকাল পরে খুন হল।
(অপরাধীভাষা) চোট পার্টিকে চোড়ে গ্যালো, পরে খালাস হলো।
৩. (সাধারণ ভাষা) চোরাইমালখদ্দেরের কাছে চোরাইমাল জমা রাখো।
(অপরাধীভাষা) নিলুর কাছে সওদা বানাও।

এই দৃষ্টান্তগুলিতে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে যদিও সাধারণ ভাষার উক্তিতে এবং অপরাধীভাষার উক্তিতে শব্দের পার্থক্য প্রচুর তথাপি শব্দশৃঙ্খলা, শব্দের গাঁথুনি, অর্থাৎ বাক্‌রীতি প্রায় হুবহু এক, সর্বত্র একই বাঙলা বাক্‌রীতিসম্মত। তাহলে কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে যে ভক্তিপ্রসাদ অপরাধবুলির যে শব্দরাজি চয়ন করেছেন সেগুলি বাঙলা ভাষারই অন্তর্গত।

অপরাধীগণ কেন তাহলে সাধারণ চলিত শব্দ প্রয়োগ করেন না, কেন তাঁরা শব্দের প্রয়োগে এক সন্ধ্যাভাষা সৃষ্টি করেছেন ?

ভক্তিপ্রসাদ এই প্রশ্ন তুলেছিলেন অপরাধীদের কাছে। সাত রকম উত্তর পেয়েছেন : (১) কথাবার্তা গোপন রাখার উদ্দেশ্য ; (২) ধরা পড়ার ভয় ; (৩) লঘু বুলি চটকদার এবং সহজে বোঝানো যায় ; (৪) ব্যবহারে মজা লাগে ; (৫) ভাষা থেকে স্ল্যাং বাদ পড়লে কথা বলা কঠিন ; (৬) ব্যবহারের কারণ জানা নেই ; (৭) মেলামেশার ফলে ব্যবহার। উত্তরগুলি দুটি প্রধান কারণের অন্তর্ভুক্ত : (১) অপরাধকর্মে গোপনতার আবশ্যক, অতএব ভাষাও হবে গোপনতাপূর্ণ ; (২) এই ভাষার ব্যবহারে মজা পাওয়া যায়।

এই কারণের সঙ্গে সামাজিক সমস্যা অন্তরঙ্গভাবে জড়িত। ভক্তিপ্রসাদ সে বিষয়ে অবহিত আছেন, তাঁর 'অপরাধ-জগতের ভাষা' বইখানার ইতস্তত সামাজিক সমস্যার উল্লেখ আছে। অবশ্য অতীব প্রশস্ত হিসাবে ভাষা সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা (যে-ভাষা নির্ভরে সাহিত্যসৃষ্টি হয় সেই সাহিত্যের আলোচনাও) মানবিক প্রয়োজন ও আচরণ সংক্রান্ত আলোচনার অংশ মাত্র,

কেন না ভাষা তো সমাজজীবনেরই অংশ। সেই প্রশস্ত পরিপ্রেক্ষিত ছেড়ে দিয়েও সংকীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে, অপরাধকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গোপন বুলির পেশাগত সন্ধ্যাভাষার আলোচনায় স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে জাগে, লোকে কেন অপরাধে প্রবৃত্ত হয়? ভক্তিপ্রসাদ এই প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত থাকতে পারতেন, তাঁর ভাষাশাস্ত্রীয় মৌলিক গবেষণাই একখানা গ্রন্থের পক্ষে যথেষ্ট। অপরাধীদের সঙ্গে কিছু মেলামেশার ফলে তাঁর সহৃদয়তা তাঁকে সমব্যথার দিকে নিয়ে গেছে, এই সমাজসমস্যা সম্বন্ধে তাঁর প্রায় সব কয়টি উক্তিই আমার কাছে সেন্টিমেন্টাল মনে হয়েছে। বস্তুত শাস্তিযোগ্য অপরাধ কাকে বলে, শাস্তির পরিমাপ ও চরিত্র কি, অপরাধ কেন অনুষ্ঠিত হয়, অপরাধের দায়িত্ব কি কেবল অপরাধীর না সামাজিক পরিবেশেরও দায়িত্ব বর্তমান, কেন বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থায় বিশেষ ধরনের অপরাধ উদ্বেজিত হয়, শাস্তির পরে অপরাধীকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে কি ভাবে প্রবৃত্ত করা যায়, অপরাধের কি সব সময় ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না অপরাধ এমন একটা স্বকীয় শক্তি যার সঙ্গে সমাজ-পরিবেশের সম্পর্কসূত্র অতীব দুর্বল, অপরাধ কি ক্যানসারের মতো অনুত্তরণীয় কোনো চারিত্রিক শক্তি?—আমাদের বঙ্গীয় সমাজে ইদানীং কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর অপরাধ বেড়ে উঠেছে, কতকগুলি অপরাধ সমাজের তথাকথিত উঁচু শ্রেণীতেও এবং সেই শ্রেণীতেই পরিব্যাপ্ত। ১৯৭১ সালে ইংরেজি ভাষায় অন্তত পাঁচ-ছয়টি গভীর চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-প্রসূত গ্রন্থ বেরিয়েছে ক্রাইম নিয়ে, তাছাড়া পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই, বিশেষত আমেরিকায়, জুভেনাইল ডেলিনকুয়েন্সি, নাবালকের অপরাধপ্রবণতা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। এই বিশাল ক্রিমিনলজি শাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা অপরাধ-জগতের ভাষা নিয়ে তথ্যপূর্ণ গভীর আলোচনা আগামীতে হবে, ভক্তিপ্রসাদ স্বয়ং করবেন অথবা অন্য কেউ করবেন, এমন আশা পোষণ করছি। এক বিষয়ে ভক্তিপ্রসাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ছাত্রবুলি বিষয়ে। ছাত্রসমাজের বুলি অবশ্য দীর্ঘকালীন। অক্সফোর্ডে যখন ছাত্ররা Tut, Prep., Digs ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করে তখন কেউ অবাক হয় না, কিন্তু আমাদের বাঙলাদেশে যখন অপরাধীর বুলির ছোঁওয়া লাগে ছাত্রসমাজে ('অপরাধ-জগতের ভাষা,' ৪৮ পৃঃ) আর সেই বুলি অচিরেই মস্তানী বুলিতে পরিণত হয়, তখন ভাষাতাত্ত্বিকের দায়িত্ব সমাজশাস্ত্রীর দায়িত্বের সমধর্মী হয়ে যায়। আমার আশা, ডক্টর ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক বাঙলায় যে নূতন চিন্তার সূচনা করেছেন তার নব নব রূপ তাঁর ও অন্যান্য কর্মীর গবেষণায় দেখতে পাব।

নিঃসঙ্গ নিরাশ্রিত

সুচরিত চৌধুরী

ভাঙা সাঁকোর এক পাশে বসে ছেলেটা কাঁদছিল। হাতে ছিল রঙীন কাপড়ের পুঁটলি, তাতে মায়ের রাঙাশাড়ি বাপের কামিজ, মুড়ি বেচে সঞ্চয় করা পয়সা ভরা টিনের কৌটো। খালের জলে তার ছায়া স্থির। স্রোতে রক্ত মেশানো ছিল মানুষের। তারা যদি কথা কইতে জানত, তবে জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠত—আমরা ওই গ্রামের তাজা রক্তে স্নান করে সমুদ্রে ফিরে যাচ্ছি। বলতে না পারলেও তাদের নিঃশব্দ গতিতে শোকের বেদনা ছিল। দূরের গ্রামগুলি কিছুক্ষণ আগে জ্বলতে জ্বলতে কালো হয়ে গিয়েছে, গতকালও সবুজ ছিল। ধূ ধূ বিলের বাতাস গরম, যেন একটি সীমাহীন থাবা মানুষ মাটি গাছ ঘাসকে সেঁকে তোলার নিষ্ঠুর ফন্দি পেতেছে।

ছেলেটা ভাবছিল, এখন তার কেউ নেই, যারা ছিল মরে গিয়েছে গুলী খেয়ে। বাপের লাশ এখনো পড়ে আছে ডোবার পাশে, মাকে তুলে নেওয়া হয়েছে মিলিটারি ট্রাকে। ঘরও জ্বলে গেছে। এখন সে যাবে কোথায়?

একটা কুকুর খালের ওপার থেকে সাঁতার কেটে এপারে উঠে এসে গা ঝাড়া দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিলের ওপর ছুটতে ছুটতে দূর গাছপালায় মিশে গেল। কুকুরটার মতো খালে নামতে যাবে অমনি সশব্দে ফেটে পড়ল একটি ভারী গলা।

—এই পোয়া, কণ্ডে যাবি?

কালো দীর্ঘ বিরাটদেহী এক বুড়োর ছায়া জেগে উঠল খালের জলে। পুঁটলিটাকে বুকে আড়াল করে নিয়ে ছেলেটা গুটি গুটি হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। কঁকিয়ে উঠল সেদিনের মতো, যেদিন তার মাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল হানাদার সৈন্যরা। পুঁটলিটাকে আরো জোরে চেপে ধরে সে চেঁচিয়ে উঠল—ন দিয়ম্, আঁই ন দিয়ম্।

দেবে না, তার শেষ ধন কারো হাতে সে তুলে দেবে না।

খক খক কেশে উঠল বুড়ো। এক দলা কফ বেরিয়ে এল ঠোঁটে, খালের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—কণ্ডে যাবি?

পেছনে শ্যামরিক্ত মাঠ, মাথায় সূর্যের আক্রোশছটা, গালে জান্তব চর্মরেখা — বুড়োকে কোনো পৌরাণিক দানবের মতোই দেখাল।

এককালে আচরণ ছিল দানবের মতোই, বিচরণ ছিল গ্রাম-গ্রামান্তের ঘরে ঘরে। রাতের সাক্ষী তারা, তারার সাক্ষী আকাশ, আকাশের সাক্ষী শিশির-সিক্ত মাটি—তার ভারী পায়ের শব্দ শুনে বলতে পারত বুধপুরার রোকন্ চলেছে নিশি অভিযানে! লুঠ হবে, সিন্দুক ভাঙা হবে. গা থেকে অলঙ্কার ছিনিয়ে নেওয়া হবে, দরকার হলে কেউ রুখে দাঁড়ালে লাঠি দিয়ে মাথা দু-ফাঁক করে দেওয়া হবে। সেই আদিম হিংস্র রোকন্‌কে এককালে চিনত সবাই, সরু আল্ পর্যন্ত ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠত তার নাম শুনে।

আজ বটগাছের মতো বুড়ো এইখানে দাঁড়িয়ে, এই ভাঙা সাঁকো খালের পাড়ে ছেলেটাকে দেখে গর্জে উঠল—কণ্ডে যাবি ?

কে তার সামনে এসে বুক চিতিয়ে জবাব দেবে তুমি কে জিজ্ঞেস করার ? কতো সাম্পানকে, কতো পালকিকে এই সাঁকোর পাশে হাঁক মেরে দাঁড় করিয়েছে। মন নরম হলে ছেড়ে দিয়েছে, মন গরম হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রেখেছে। তার বিরুদ্ধে নালিশ কে শুনবে ? থানার দারোগা পর্যন্ত তাকে ধমক দিতে সাহস করে না। একবার এক বিলাতফেরৎ বাঙাল সাহেবের কোট-পাতলুন খুলে রেখে দিয়েছিল। অপরাধ কি ? কিছুই না। মেজাজ দেখিয়ে তিনি শুধু বলেছিলেন—আমি অমুক সাহেবের ছেলে অমুক সাহেবের জামাই। জানো, তোমাকে আমি বছরের পর বছর জেল খাটাতে পারি ?

ব্যস। নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল রোকন্।

তারপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাম্পানে, মাঝি দাঁড় ফেলে লাফিয়ে উঠেছিল পাড়ে। রোকন্ আর কিছুই করে নি, বাঙাল সাহেবের কোট-পাতলুন খুলে নিয়ে সাম্পানটাকে ঠেলে দিয়েছিল স্রোতের দিকে। অনাবৃত দেহে সাম্পান নিয়ে সাহেব ভেসে গিয়েছিলেন।

এমনি শত শত খেয়ালখুশী ঘটনা রোকনের জীবনে ঘটে গিয়েছে। তার এই মেজাজের জন্য সে ধনদৌলত লুঠ করে ধনী বা দৌলতদার হতে পারল না। রাতের নেশায় যারা তার একদিন সঙ্গীসাগরেদ ছিল তারা কেউ আজ বিত্তবান, কেউ কেউ গ্রামের হোমরাচোমরা। হাটে বিলে পথে ঘাটে দেখা

হলে তারা বলে—ওস্তাদ তুই ন হৈলি দরেয়ার মাছ, ন খালর মাছ! কিছু ন কইর্‌লি।

কিছুই করেনি রোকন্। টাকা লুটে এনে তারপর দিন উড়িয়ে দিয়েছে ডাব্বা খেলায়, মদ গিলেছে হাঁড়ি হাঁড়ি। মেয়েলোক নিয়ে তামাসা করে নি, কোনো বেশ্যার খোলাবুকে গিয়ে কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। যেদিন শরীরে মেয়েশরীরের লোভ জেগেছে সেদিন একটি মাত্র মেয়েলোক নিয়ে রাত কাটিয়েছে, যে মেয়েলোক একদিন চোখ ইশারায় বন্দর এলাকার গ্রামাঞ্চল থেকে পালিয়ে এসেছিল। সাতদিন সাতরাত কক্সবাজারে ডাকাতি করে ফিরে এসে যখন রোকন্ দাঁড়িয়েছিল ঘরের উঠোনে, তখন কোনো মেয়েলোক দাওয়ার খুঁটি ধরে 'হায় আল্লা! এত্তো টেঁয়া-পৈছা কত্তে পাইলা?' বলে ললিত-ভঙ্গীতে এসে দাঁড়ায় নি। কলেরায় সমস্ত পাড়া উজাড় হয়ে গিয়েছিল, মাটি চাপা দেবার লোকও ছিল না। শকুন শিয়ালে ভাগাভাগি করে শরীরের যেটুকু অংশ অবশিষ্ট রেখেছিল তা চরের বালিতে পায়ের দাগ মুছে যাবার মতো মাটিতে মিশে গিয়েছিল।

মায়া কি মমতা কি বোঝে না রোকন্। অমন কলজে ফাটানো মেয়েলোকের বীভৎস মরণে একদণ্ড বসে অশ্রুপাত করে নি সে। থলিভরা টাকা অলঙ্কারগুলি নিয়ে সেদিনই ডাব্বা খেলায় মেতে গিয়েছিল। রোকনের মতে, মেয়েরা হল গভীর জঙ্গলের এক একটি সোনালী হরিণ। কখন কার থাবায় লুটিয়ে পড়ে কেউ বলতে পারে না।

রাতের সঙ্গীদের সঙ্গে রোকনের বিরোধ ছিল অনেক। তারা লুট করতে গিয়ে ধর্ষণ করত, হত্যা করত, নির্যাতন করত। রোকন্ কিছুই করত না, শুধু লুটের ভাগ নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে উধাও হয়ে যেত, ফুরিয়ে গেলে আবার সে আড্ডায় হাজির হত।

অদ্ভুত মনোভঙ্গী তার। যার হাতে এই বিদ্যার হাতেখড়ি তার ঘরই সে জ্বালিয়ে দিয়েছিল শেষরাতের ফিকে অন্ধকারে। সেই জমিদার নিত্যবাবুকে মনে পড়লে তার থুথু ছিটোতে ইচ্ছে করে। দেখতে বাঘের মতো হলে কি হবে, ভেতরে আস্ত একটি লেজ গুটনো কুত্তা। রোকন্ তখন তাগড়া যোয়ান, নির্জন গাছের ছায়ায় একলা পেয়ে নিত্যবাবু দরদ দেখিয়ে বলেছিলেন—এমন মজবুত শরীর নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে কেন ঘুরে মরছিস! লাকড়ি বেচে ক পয়সা পাবি? রোজগারের পথ দেখিয়ে দেবো, আসিস কাল আমার বাড়িতে।

মূলধন ছাড়াই প্রশস্ত রোজগারের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন নিত্যবাবু। পাশের গ্রামের জমিদার কৃষ্ণ পালের দো-মহলা ঘর জালিয়ে দিয়ে এসে রোকন্ এক গাদা নোট বকশিস পেয়েছিল নিত্যবাবুর কাছ থেকে। সেদিন তার বয়স ছিল প্রথম কুঁড়ি উঁকি দেওয়া নারকেল গাছের মতো, বাতাসে ঝাঁকুনি লাগলেও শির ছিল উন্নত। ঘর জ্বালানো দিয়ে হাতেখড়ি, দল বেঁধে লুট-তরাজ দিয়ে শুরু। নিত্যবাবু ছিলেন নেপথ্য খুঁটি—ধরা পড়লে থানা থেকে জামিন নেওয়া, মামলা চললে জরিমানা দিয়ে খালাস করে দেওয়া। মদের নেশাটাও শিখেছিল নিত্যবাবুর কাছে, দু-তিনদিন শহরের ঘোড়ার গাড়ির সামনের সিটে বসে তাঁর সঙ্গে রোকন্ চৌদ্দ নম্বর গলিতেও গিয়েছিল। মদ গিলেছিল, কিন্তু কোনো বেশ্যাকে সিনায় লাগায় নি। বেশ্যা তার ভালো লাগে না, কেমন যেন ঘাটে বাঁধা পাথর খণ্ডের মতো—পা রেখে নৌকোয় ওঠা যায়, বুকে বেঁধে নদীতে সাঁতার কাটা যায় না।

নিত্যবাবু তার চোখে ঘোর লাগিয়ে দিয়েছিল ঠিক, কিন্তু একদিন সেই ঘোর কেটে গিয়ে জ্বলে উঠেছিল প্রতিহিংসার আগুন। খাজনার জন্য কয়েক-ঘর চাষী উৎখাত হয়ে গিয়েছিল সাঁইন্দার অঞ্চলে। সবাই অভিশাপ দিয়ে-ছিল রোকন্কে। আর, সেদিন গভীর রাতে হিক্কা তুলে চোখ উল্টে মারা গিয়েছিল তার ফুটফুটে ছেলে সদরুদ্দিন। পরদিন বউয়ের কাতর নয়ন দৃষ্টি পর্যন্ত তাকে উপহাস করেছিল।

এক চুমুকে মদের গেলাশ শেষ করে রোকন্ নিত্যবাবুর মদালস দৃষ্টির দিকে দৃষ্টি মিলিয়ে বলেছিল—বও, এই কাম ছাড়ি দিয়ম্।

বিকট হাসিতে ফেটে পড়ে নিত্যবাবু বলে উঠেছিলেন—ছেড়ে দিলে উপোস করে মরবি হারামজাদা। এই পথ ছাড়া তোর আর কোনো পথ নাইরে রোকন্। এ পথেই জীবন, এ পথেই মৃত্যু, সরে দাঁড়ালে অপমৃত্যু।

বউটা কলেরায় মারা যাবার পর রোকন্ আর লুটতরাজ করবে না বলে নিত্যবাবুকে জানিয়ে দিয়েছিল। কিছুদিন পর হাট থেকে ফেরার পথে গা আঁধার রাতে পেছন থেকে কার লাঠি এসে পড়েছিল তার মাথায়। নিত্যবাবুর সেই ইঙ্গিত সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।

তবে অপমৃত্যু ঘটে নি। রক্তপাত হয়েছিল প্রচুর, মরে নি, কেননা তার প্রাণ ছিল আগুন জল বাতাসের চেয়ে শক্তিশালী। আহত রোকন্কে দেখতে এসে নিত্যবাবু চুপি চুপি বলেছিলেন—তোকে আগেই বলেছিলুম এই পথ

গোলকধাঁধা, যে বেরোতে যাবে তার মরণ ধাঁধার মতো আঁকাবাঁকা। সরতে গেলে কি সরা যায়? যারা তোর সাঙাৎ-ভাই তারাই যে পর মুহূর্তে দুষমন হয়ে দাঁড়াবে!

এই বলে তার ফুফাতো ভাই মিন্নাত আলীর নামটা ফিসফিস করে উল্লেখ করেছিলেন। পলকে রোকনের চোখের তারায় হাটফেরৎ অন্ধকার পথটা ফুটে উঠেছিল।

মিন্নাত আলী চাটাই বিছিয়ে শুতে যাবে, অমান শব্দ হল কাশির।

—হিবা কন্?

জবাব এলো—আঁই!

এই আঁইকে চেনে সবাই। ভীত কম্পিত মিন্নাত আলী কুঁকড়ে বলে উঠেছিল—খোদার কছম্, আঁই মাইর্‌তাম্ ন চাইলাম্, নিত্য বও পাঁচশ টেঁয়ার লোভ দেখাইল্ বলি লাডি লই গেইলাম্। টেঁয়াও ন পাইলাম্, তুইও ন মরিলি।

নিত্যবাবুর নাম শুনে রোকন্ থ বনে গিয়েছিল। তাকে মারতে পাঁচশ টাকার লোভ দেখিয়েছিল মিন্নাত আলীকে। এ যে গোলকধাঁধা। এই গোলকধাঁধার অবতার নিত্যবাবু নিজেই। সেই রাত্রেই নিত্যবাবুর সখের বাগানবাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। তারপর, পুরো দুই বছর রোকন্‌কে গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় নি।

এই দুই বছরে গ্রাম থেকে গ্রামে ছাউনি পড়েছিল ইংরেজ সৈন্যদের। সন্ত্রাসবাদীদের ধবার ছলনায় গ্রামীন জনবাসীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করা হচ্ছিল। সেই সুযোগে নিত্যবাবুদের মতো সুবিধাবাদী লোকেরা বৃটিশ সরকারের সুনজরে পড়বার জন্য দু-চারজন বিদ্রোহীকে ধরিয়ে দিচ্ছিলেন। নিত্যবাবু তার আপন ভাগনেকে তুলে দিয়েছিলেন ইংরেজ সুবেদারের হাতে। এর জন্য লাভ করেছিলেন রায়সাহেব উপাধি। রাত্রে স্ত্রীর বাহুলগ্না হয়ে ঘুমোতে গিয়ে পিঠে ছোরা বিঁধে চিরকালের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

সন্ত্রাস বিদ্রোহ থেমে যেতে রোকন্‌কে আবার দেখা গিয়েছিল বুধপুরা হাটে। নিত্যবাবুর অপঘাত মৃত্যু রহস্য তখন হাটে ঘাটে আলোচিত হত। কেউ কেউ সন্দেহ করত রোকন্‌কে। শুনে মৃদুহাসির টোল খেলে যেত তার গালে। বলত—এ পথ গোলকধাঁধা, সরে গেলে তার মরণও ধাঁধার মতো আঁকাবাঁকা।

এরপর রোকনের জীবন একক নিঃসঙ্গ, চরে ঠেকা ছুলুপের মতো। বউ

নেই, ছেলে নেই। দলের লোকজন এসে ডাকলে সাড়া দেয় না। নেহাৎ জোর করে ধরে নিয়ে গেলে সিন্দুক ভাঙে, এটা ওটা নাড়ে, কিন্তু লাঠালাঠিতে এগোয় না। সাঙাতরা বলে—ওস্তাদ, তুই কমজোর হই গেইয়ছ্।

হাসে রোকন্। এ কাজে যাদের লোভ কমে যায় তারাই তো কমজোর। এই দুই বছরের ফেরারী জীবনে ভিখারীর বেশে সে মানুষের শক্তি ও সাহসের পরিচয় পেয়েছে। আগে জানত শরীরের শক্তি দিয়ে দুনিয়া জয় করা যায়। কিন্তু পাহাড়তলী জালালাবাদে লড়াই করা কচি কচি জোয়ানদের সাহস দেখে তার চোখে তাগ্ লেগে গিয়েছিল। তাদের সাহসের পেছনে নিশ্চয় কোনো বিরাট শক্তি ছিল যার জন্যে গুলী খেয়েও তারা পিছিয়ে যায় নি। কি সেই শক্তি? অনেক ভেবেছে রোকন্, কূলকিনারা পায় নি।

কিছুদিন ঘোরাফেরা করেছিল বাউল-ফকিরদের আস্তানায়, শ্মশান-সন্ন্যাসীর আসরে। গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়েছিল, কূল তবুও পায় নি। একদিন কালার-পুলের ধূলিধূসরিত সড়ক ধরে হাঁটছিল, পেছন থেকে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে তার নাম উচ্চারিত হতে শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

মাথায় টুকরি, খালি গা, পরনে ছেঁড়া লুঙ্গী—এক আধবয়সী লোক খোঁচা খোঁচা দাড়ির ফাঁকে একগাল হেসে বলল—রোকন্‌ভাই, সেলাম।

সম্বোধনেই রোকন্ হতবাক। হাঁটতে হাঁটতে যে সব কথা বলাবলি হল তাতে মনে হয় লোকটা যেন তার বহুদিনের চেনা! বুধপুরা হাটের কাছাকাছি এসেই রোকন্ জিজ্ঞেস করলে—তুঁই কণ্ডে যাইবা?

লোকটা ইতস্তত ভাবে জবাব দেয়—বাঁশখালি।

—বাঁশখালি তো বহুৎদূর। চলো মিয়া আঁয়ার ঘরৎ চলো। রাইত্ কাডাই ফজরৎ চলি যাইবা।

কি ভেবে লোকটা রোকনের দিকে অনেকখন চেয়ে রইল। রোকন্ বলল—ডর নাই, আঁই দুষমন ন।

দুজন চিনল দুজনকে। ঘরে এসে উনোনে হাঁড়ি চেপে ভাত রাঁধল, খেলো, চাটাই পেতে দুজনে শুয়ে পড়ল। মধ্যরাতে আচমকা শব্দ হল ভারী ভারী বুটজুতোর, সঙ্গে টর্চের জ্বলা নেভা আলো। ডাক—রোকন্, এই রোকনুদ্দিন।

ওই ডাক রোকনের চেনা। নির্ভয়ে জবাব দিলো সে—আছি, আছি। হেই কাজ ছাড়ি দি দার্গা সাব।

দারোগা সাহেব সরস কণ্ঠে কললেন—ঝাঁপ খুলে দে, আমরা এমনি

বেড়াতে এলাম।

ঝাঁপ খুলতেই দেখা গেল দাওয়ায় একদল গুর্খা সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সবগুলি টর্চ একসঙ্গে জ্বলে উঠল রোকনের মুখে। দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—চাটাইতে শুয়ে আছে ওটা তোর বউ নাকি?

অবাক চোখে রোকন্ পেছন ফিরে দেখল—চাটাইতে শোয়া শাড়িপরা একটি অবগুণ্ঠিত শরীর টর্চের আলোয় একবার জ্বলছে একবার নিভছে।

বলল—হ।

—মাথায় টুকরি, পরনে ছেঁড়া লুঙ্গী, খালি গা, খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা কোনো লোককে এদিকে আসতে দেখেছিলি?

বলল—না।

ওরা চলে গেল শব্দ আর আলোর ধ্বনি জাগিয়ে।

শাড়িপরা লোকটা দাওয়ায় এসে রোকনের কাঁধে হাত রেখে বলল—ধন্যবাদ রোকন্‌ভাই। তোমার এই উপকার আমি জীবনে ভুলব না।

রোকন্ প্রতি-জবাব দিলো—তুঁই মিয়া যেয়ন্‌তেয়ন্ মানুষ ন অ। আইলা মরদ হই, হই গেলা মাইয়া পোয়া!

ভোররাতে যাবার সময় লোকটা যা বলে গিয়েছিল তা রোকনের গলায় আজ পর্যন্ত কবচ হয়ে ঝুলে আছে। বলেছিল—তুমি আমাকে আশ্রয় দাও নি, আশ্রয় দিয়েছ স্বাধীনতাকে। ইংরেজরা আমাদের দেশের মানুষকে চেনে না, তাই বুটজুতোর তলায় সবাইকে দাবিয়ে রাখতে চায়। তারা এদেশের দশটি লোককে হত্যা করলে আমরা পারি আর না পারি তাদের একটি লোককে হত্যা করব। ইশ্বর আমাদের পক্ষে থাকবেন, কেননা আমরা হত্যা করি অত্যাচারীকে, তারা হত্যা করে অত্যাচারিতকে। রোকন্‌ভাই, সেলাম। যদি পারো পাহাড়তলীর কর্নেল সাহেবকে হত্যা করো। সে আমাদের আঠারোজন বিদ্রোহীকে মেরে ফেলেছে। একজন গিয়ে যদি তাকে হত্যা করতে না পারে তবে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বৃথা।

তিনদিন পর কর্নেল সাহেবের বাংলোয় উন্মত্ত ছোরা হাতে ধরা পড়েছিল রোকন্।

আর্দালি দারোয়ান বয় বাবুর্চি পর্যন্ত তাকে শক্ত বাঁধনে ধরে রাখতে পারছিল না। একটানা চেঁচাচ্ছিল রোকন্—ঔগ্‌গ্যা কালা আদ্‌মী মারা গেলে ঔগ্‌গ্যা শাদা আদ্‌মী খতম্।

বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল রোকনের।

সাতচল্লিশে দুটো দেশ ভাগ করে দিয়ে ইংরেজ যখন পাততাড়ি গুটিয়ে নিজের দেশে চলে গিয়েছিল তখন রোকন্ আন্দামান থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এল গ্রামে।

বার্ধক্যের ভারে তার শরীর তখন ঝাঁঝরা। দলের লোকজনরা পরামর্শ দিত—ওস্তাদ আবার তোর কাম শুরু কর্। এবার মওকা ভালা, দাঙ্গা লাগিলে লালে লাল।

থুথু ছিটিয়ে বলত সে—হে শুন্ কুত্তার কাম।

গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গার ত্রাস জাগিয়ে মিন্নাত আলী অনেক সংখ্যালঘুর জায়গা জমি দখল করে নিয়ে ধনী বনে গিয়েছিল। সে মাঝে মাঝে রোকন্‌কে ফুসলাত, টেঁয়া লাগিলে লইও ভাইজান।

টাকা! টাকা দিয়ে কি করবে সে? বউ নেই, ছেলে নেই, মায়া নেই বাঁধন নেই—টাকা দিয়ে কি করবে সে? হাঁ লাগত, যদি সদরুদ্দিন বেঁচে থাকত, লাগত যদি বউটা নাকের নথ দুলিয়ে বলত—তুঁই আঁয়ার লগে ন মাতিবা।

একদিন কি মনে করে ফাঁকা ভিটের ওপর ঘর বাঁধতে বসে গেল রোকন্। গাছের খুঁটি, বাঁশ ও ছন যোগাড় করে এনে দিনরাত টুকটাক করে কাজ করে যেতে লাগল। এক কানি জমি ছিল পৈতৃক। এর ওর কাছ থেকে লাঙ্গল গরু ধার করে এনে চাষ করল। মাটির গন্ধে ধানের গন্ধে বৃষ্টির ছন্দে মেতে গেল রোকন্। মাঝে মাঝে একটি নারীর মুখ উঁকি দিত মনে, আবার কি মনে করে মনে মনেই সেই নারীকে গলা টিপে মেরে ফেলত। কি হবে ওই সোনালী হরিণে?

এমনি করে গাছের বয়স বাড়ে, খালের পাড় ভাঙে, বন্ধ্যা মাটি ফসল-সম্ভবা হয়।

লুটতরাজে ডাকাতদলের আড্ডায় এখন রোকনের নাম বিস্মৃত। জোয়ান ডাকাতরা এখন রোমহর্ষক নায়ক। তবে কখনো কখনো তার নাম উচ্চারিত হয় যখন কোনো জমিতে ধান লুট করার দাঙ্গা হয়। যখন কোনো জোয়ান ডাকাতের মাথা লাঠির আঘাতে দুফাঁক হয়ে যায় তখন বলাবলি হয়—এই অব্যর্থ ঘা রোকনের লাঠি ছাড়া আর কারো নয়। থানার দারোগা পর্যন্ত ডায়েরিতে লিখে রাখেন—এই বৃদ্ধ এককালে দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল, সম্প্রতি

চাষীদের পক্ষ নিয়ে লাঠালাঠি করে। বেআইনী কাজকর্মে নির্লিপ্ত থাকলেও কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতির সময় সন্দেহজনক ব্যক্তি।

এই ডায়েরির জন্য কখনো কখনো পুলিশ এসে তার খোঁজখবর নেয়। রোকন্‌ তখন হাসে। মনে মনে বলে—চাষ করি, ধান কাটি, কাজ করে খাই। তাতেও যদি অপরাধ হয় তবে আগুন অন্যদিকে জ্বলে উঠবে।

আগুন জ্বালার এই মনোবাসনা তার দেখা দিত যখন কোনো অন্যায় অবিচার দেখত। মিন্নাত আলী এসে বলত—ভাইজান এই কামে কেয়া নামিলা? লাভ তো নাই, খালি লোকসান, দুষমনও বাড়ি যাইবো।

বাড়ুক। দুষমন কি জানে রোকন্‌। দুর্বলরাই দুষমন। এই কয় বছরে মাটির সঙ্গে মাথামাখি করতে গিয়ে সে জানতে পেরেছে মাটিকে যারা ভালোবাসে না তারাই দেশের দুষমন।

সেবার জিরি অঞ্চলে দাঙ্গা লেগে গিয়েছিল। কয়েক ঘর চাষী কোনো এক বাস্তুত্যাগী হিন্দু জমিদারের জমিতে চাষ করত। জমি থেকে ধান তুলতে গেলে চেয়ারম্যান ইউসুফ সদাগরের ভাড়া করা গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চাষীদের ওপর। কাস্তে আর লাঠিতে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল ধান ও মাটি। শত্রু-সম্পত্তির অজুহাতে ইউসুফ সদাগর জমির মালিকানা দাবি করে জমির সমস্ত ধান গভীর রাতে তাঁর গোলায় তুলতে চেয়েছিলেন। চাষীদের সঙ্গে লেগেছিল সংঘর্ষ। রোকনের বৃদ্ধ শরীরে জেগে উঠেছিল বিশ বছর আগের সেই দুর্ধর্ষ মানুষটি। গুণ্ডাদের মধ্যে একজন জমিতেই মারা গিয়েছিল।

দারোগা রোকন্‌কেই গ্রেপ্তার করেছিলেন। শৃঙ্খলিত হাত ঊর্ধ্বে তুলে রোকন্‌ গর্জে উঠেছিল—তারা চাষ করিলো, ধান কা তুলি লইব অন্যজনে?

সেদিন তার প্রশ্নের উত্তর কারো কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। বিচারক রায় দিয়েছিলেন—বারো বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

জেলে যাবার পথে পথে থুথু ছিটিয়ে রোকন্‌ বলেছিল—বিচার হইবো একদিন, আইজ্‌ না হইলে কাইল্‌।

একাত্তরের মার্চ মাসের শেষ দিকে জেলখানার ফটক খুলে দেওয়া হয়েছিল। হানাদার পশ্চিমা সৈন্যরা তখন বাঙলাদেশের গ্রাম-শহরে নির্যাতন চালাচ্ছিল। উল্লসিত কয়েদীদের সঙ্গে বেরিয়ে এল রোকন্‌। শহরে লুটতরাজ

চলছে, ঘরবাড়ি জ্বলছে, পালাচ্ছে মানুষ আলো থেকে অন্ধকারে।

গ্রামে এসে রোকন্ ভিটের দাওয়ায় বসে শুধু ঝিমায়। সব বদলে গেছে, আকাশ বাতাস মাটি পর্যন্ত। ঘরে ঘরে আতঙ্ক। শহর শেষ করে এবার হানাদার সৈন্যরা গ্রামে এসে ঢুকবে। যে দিন দুটি বোমারু বিমান পটিয়ায় বোমা ফেলল সেদিন গ্রামবাসীদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ লুট করার পক্ষে, অন্য ভাগ জান মাল আত্মরক্ষার পক্ষে। রোকন্ শুধু ঝিমায় আর মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ে—বিচার হইবো একদিন, আইজ্ ন হইলে কাইল্।

বিরাট একটি ঘটনার জন্য গ্রামবাসীরা অপেক্ষা করে বসেছিল। অবশেষে ঘটনাটি ঘটল, অর্থাৎ কয়েক ট্রাক পশ্চিমা সৈন্য পটিয়া ক্যাম্প থেকে ভোরে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে মহিরা, কাশিয়াইশ, পরৈখোরার ঘরবাড়ি জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। জ্বলন্ত দুপুরে গরু ছাগল নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল গ্রামবাসীদের মধ্যে। কচি কচি মেয়েদের করুণ চিৎকারে ভেঙে পড়ল আকাশ।

রোকন্ ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎ তার শরীরের মধ্যে সেই তাগড়া মানুষটি জেগে উঠল। এক লাফে ছুটে গেল সড়কে—যেদিকে মিলিটারি জিপ-ট্রাকগুলি চলে গেছে দক্ষিণের গ্রামগ্রামান্তে। সেগুলি হাজার হাজার নারী শিশু বৃদ্ধ হত্যা করে বীরদর্পে এই সড়ক দিয়ে আবার ফিরে যাবে পটিয়ায়। রোকন্ এই মুহূর্তে কিছুই করতে পারে না। পারে কাঠের পুলটা ভেঙে দিতে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুলের সব তক্তাগুলি সে আলগা করে দিলো। সব না হোক, অন্তত একটি গাড়িকে পড়তেই হবে। সেই গাড়িতে যারা থাকবে তাদের সবাই না মরলেও একটিকে মরতেই হবে।

রোকন্ আবার গর্জে উঠল—এই পোলা কণ্ডে যাবি ?

ছেলেটা গুটি গুটি হয়ে শুয়ে পড়েছে ঘাসের ওপর ভয়ে ও ক্লান্তিতে। তার অচেতন দেহ কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে রোকন্ নেমে পড়ল খালে।

আর কিছুক্ষণ পর হানাদার সৈন্যরা ফিরবে দক্ষিণাঞ্চল থেকে। পুলটা পেরোতে গিয়ে প্রথম গাড়িটা নির্ঘাত হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। তারপর শুরু হবে সেই অঞ্চলে নির্যাতন। সমস্ত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। জ্বালাক, সেই

গ্রামের শিশু থেকে প্রত্যেকটি বৃদ্ধ পর্যন্ত লুট করার জন্যে বেরিয়ে গেছে গ্রামে গ্রামে। লুটের মাল নিয়ে ফিরে এসে দেখবে তাদের ঘরগুলি ছাই হয়ে পড়ে আছে ভিটের ওপর। ইউসুফ সদাগর ও মিন্নাত আলীর ঘরও বাদ যাবে না।

তার আগে রোকন্ পালিয়ে যাবে অন্য গ্রামে। এবার আর একা নয়, সঙ্গে একটি বাপ হারানো মা হারানো ঘর হারানো ছেলে। তারই মতো নিঃসঙ্গ। মাটি যার জননী, শক্তি যার পিতা, সত্য যার বন্ধু। সে তো আবহমান বাঙালি. নিরাশ্রিত নির্যাতিত বিদ্রোহী সন্তান।

সাক্ষী

গুণময় মান্না

পোশাকী নাম আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সবাই ওকে ডাকে বুড়ো বলে। বয়েস বোধহয় এগারো-বারো হবে, কিন্তু অপুষ্টির জন্যে আরো ছোট দেখায়। চোখের গড়ন বড় বড়, কিন্তু ঘোলাটে, ক্বচিৎ সে চোখে বিস্ময়ের চমক লাগে। তার কারণ, সবাইকে আর সব কিছুকে ও এত পরিচিত বলে মনে করে। সিঁথির মোড় থেকে একটু দূরে এই জায়গাটায় ও প্রসেসন দেখেছে, বি.টি. রোডের ওপর যানস্রোতের মাঝখানে এ্যাকসিডেণ্ট দেখেছে, কত বাঙলাবন্ধ্ দেখেছে, ছুরি মারা দেখেছে, বোমা ছুঁড়তে দেখেছে। রাস্তার ধুলো, খোলা কাঁচা নর্দমার বর্ষায় রাস্তা ও ঘরের মধ্যে অনধিকার অগ্রগতি যেমন, তেমনি এই এপ্রিলের প্রথম দিকে ঐ যে টিনের পাতের ওপর কাগজ সেঁটে হাতের লেখা অক্ষরে 'রাধা কেবিন' সাইন বোর্ড ঝুলানো চায়ের দোকান, তার পাশেই ঝাঁকড়া লাল-হলদে ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া গাছটাও ওর চৈতন্যকে এড়িয়ে যায় না। বুড়ো সব কিছুই দেখতে চায়, জানতে চায়।

ছেলেটা বেওয়ারিশ, কিন্তু কথাটার বিশেষার্থ আছে। চা-দোকানটার মালিক গজেন মণ্ডল, কিংবা এই রকম আরো কেউ কেউ জানে যে, ওইখানটায় গলির মধ্যে একটা পুরনো টালির ঘরের ছেলে ও, ওর বাবা বড়-বাজারের এক গদিতে খাতা লেখে, কিন্তু কথাটা স্মৃতির তলায় চাপা পড়ে থাকে। স্বয়ম্ভু হয়ে বিরাজ করে ছেলেটা নিজেই, কেননা সর্বদা এই তল্লাটের সব জায়গাতেই তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ও সব কিছুই করে, সবার সব কিছুতেই নাক গলায়। কিন্তু লিকলিকে চেহারার ওপর মস্ত মাথা আর বিবর্ণ মুখের ওপর বড় বড় চোখে এমন বোকা-বোকা তাকায় যে সকলে তা সরলতা বলেই মনে করে। বিরক্ত হতে গিয়েও লোকে আর বিরক্ত হয় না। যেমন, খুব ভোরে গজেন মণ্ডলের দোকানে এসে ও হাজির। বলে, 'গজাকা, তোমার আঁচটা আমি দিয়ে দিই, পল্টা তো আসেনি দেখেছি'...তারপর আঁচ দিতে গিয়ে ঘুঁটে কেরাসিন নিয়ে কাজ করতে লেগে যায়। কিছুক্ষণ পরে গজেন দেখে আঁচ নিবে গেছে, আর বুড়ো প্রাণপণে কখনো ফুঁ দিচ্ছে আর কখনো পাখা

চালাচ্ছে। গজেন গর্জন করতে বুড়ো কাঁচুমাচু মুখে উঠে দাঁড়ায়, মুখে-চোখে কয়লার কালি লেগেছে, ছাই পড়েছে, চোখ দুটো সেই রকম বোকা-বোকা। হাতের চড় তুলেও গজেনের আর মারা হয় না।

ওকে আবার স্কুলে যেতেও দেখা যায়। বড়-ছোট বই খাতা বগল থেকে পড়ে যাবার উপক্রম. শার্টের বোতাম খোলা, জীর্ণ হাওয়াই চটি পা পেরিয়ে রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছে, বুড়ো এগোচ্ছে চারদিকে তাকাতে তাকাতে। বাড়ির জন্যে ও বাজারও করে, ফুটপাত আর রাস্তা জুড়ে বাজারটার সব জায়গায় দর করে, কেনে কেনে না, তারপর কতক্ষণ পরে ওকে ফিরতে দেখা যায়, চটের থলের কোণ দিয়ে পুঁই-ডগা উঁকি মারছে। খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে আসে, মুদির দোকানটায় ওঠে, কিছু কেনে কিনা বোঝা যায় না।

রামভজন ঠেলাওয়ালা মোড় দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে গিয়ে থামল, গজেন মণ্ডলের দোকানে চা কিনে খেল এক ভাঁড়। ফিরে দেখে বুড়ো তার ঠেলাটা কায়দা করবার চেষ্টা করছে আর কতকটা এগিয়েও নিয়ে গেছে। তাও রাস্তার মাঝামাঝি ও মুখটা গিয়ে পৌছেছে, আর একটু হলেই কলিশন হত, স্টেটবাসটা চোখা বাঁক নিয়ে পেরিয়ে গেল। 'এ লেড়কা, এ হারামিকা বাচ্চা' বলতে বলতে রামভজন এল ছুটে, কিন্তু বুড়ো ছাড়বে না, সে ঠেলা চালাবে। রামভজন রগচটা মানুষ, এই বখামিতে তুলল একটা হাতুড়ির মতো চড়—মজা এই যে যেমন রামভজন বুঝল না তেমনি বুড়োও বুঝল না এই ঘা-টা যথাস্থানে পড়লে তার ফল কি হবে—বুড়ো কুতকুতে চোখে তাকিয়ে রইল। বুঝল পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে নিখুঁত শার্ট-ট্রাউজার পরা চশমা চোখে এক মাতব্বর, 'আহা-হা, খতম হো যায়গা। আমাদের রাষ্ট্রের ভাবী নাগরিক···এরাই তো দেশ চালাবে···'

'মারেগা নহী তো কেয়া···উসকো গাড়িপর চড়ানেকে···' বলতে বলতে রামভজন চড় নামিয়ে বুড়োকে দু-বগলে ধরে ইঁদুরের মতো তুলে ঠেলার ওপর ছুঁড়ে দিলে আর ওকে সুদ্ধ ঠেলে নিয়ে চলতে লাগল। রক্ত চোখে রামভজন ওর দিকে তাকিয়ে রইল আর বুড়ো হাঁটু মুড়ে বসে দুহাত শূন্যে ছুঁড়ে মাইকে হাজারবার শোনা গান হাঁকতে লাগল, 'চলেছি একা কোন্ অজানায়···'

বুড়োর সব চেয়ে আগ্রহ তল্লাসী, গ্রেপ্তার, বোমা, পাইপ গান এই সব নিয়ে। পুলিশ ভ্যান যদি পাড়ায় এল—আর হামেশাই আসছে সেই সব—তাহলে পাড়ার ছেলে-ছোঁড়ার দল যেন বাঘের পিছনে ফেউ লেগে গেল। বুড়ো

সবার আগে। সেদিন শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল বুড়োর, বাইরে অস্বাভাবিক গোলমাল। তিড়িক করে লাফ দিয়ে বুড়ো ছুটল বাইরে। ঠিক ওদের গলিটায় কেউ নেই, তবু মনে হল সব বাড়িতেই লোকজন জেগেছে, কিন্তু কোনো বাড়িতেই আলো জ্বালে নি। পরক্ষণেই বুঝতে পারল, গোলমালটা আসছে পিছনের পাড়া থেকে। তখন লাফ দিয়ে ছুটল সেই দিকেই।

ফিরে এল যখন তখন সকাল হয়ে এসেছে। ওদের গলিতে ঢুকতেই ওর দোস্ত রুণু (তখন অনেকেই বেরিয়েছে বাইরে) ওকে খবর দেবার জন্য বলে উঠল, 'জানিস, পুলিশ রেড হয়ে গেল, সুজয়দাকে ধরে নিয়ে গেছে। পিটিয়েছে খুব···'।

তাচ্ছিল্যে বুড়োর মুখখানা বেঁকে উঠল, 'কি বলছিস, আমি সেখেন থেকেই আসছি না···' লিকলিকে হাত ছুঁড়ে ভঙ্গি করল একটা, 'পায় নি, ভেগেছে, কোথা দিয়ে যে গেল···'তারপর এগোতে গিয়ে বললে, 'আমি একটাও দেখতে পাই না···'

'কি রে···'

'যাব্ বাবা, তুমি শোনো নি, পুলিশ এ্যারেস্ট করতে এলেই সুজয়দারা বোমা ছুঁড়ে, গুলি মেরে বাছাধনদের ফাটিয়ে দেয়···জান নিয়ে নেয়···'

এইবার রুণুব পালা, সে ওকে থামিয়ে মুখ ভেংচে বলে,, 'বুদ্ধু, তুমি বুঝি এই জানো? পুলিশই আগে মারে, তারপর যুদ্ধ হয়···'

'হ্যাঁ, যুদ্ধ হয়, সে আমি জানি ··' কাঁচুমাচু মুখে বুড়ো বলে, 'কিন্তু···'বুড়োর আপশোষ ও একটা যুদ্ধও দেখতে পায় না। পুলিশের সঙ্গে ছেলেদের যুদ্ধ, এপাড়ায় ওপাড়ায় কতই না সে শুনছে। ছুটে যায় সে, দিনে-রাত্রে যখনই শুনুক না কেন, কিন্তু গিয়ে দেখে কোথাও কিছু নেই। যা হবার নাকি সব ঘটে গেছে। হয় পুলিশ ঘেরাও করে আছে, ফাইট নেই; নয় তো ছেলে-ছোঁড়ারা গরম গরম জটলা করছে, পুলিশ নেই। বোমা ফাটছে, পাইপগান থেকে গুলি বেরোচ্ছে, তারপর রিভলবার, রাইফেল···না একটা ফাইটও সে দেখতে পায় নি।

২

সেদিন রুণু বুড়ো আরো ছেলেরা 'রাধা কেবিন'-এর সামনে জটলা করছিল। কখনো ওরা জড়াজড়ি করছে, কখনো একজন আর একজনকে তেড়ে

নিয়ে যাচ্ছে কিছু দূর পর্যন্ত। ছেলেগুলো যেন পাঁকাল মাছ। বি.টি. রোডের ট্রাফিক-স্রোত কেটে বেরিয়ে গিয়ে ওরা পালাতেও পারে, তাড়া করতেও পারে। কখনো কখনো ওরা চা-দোকানটার পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছটায় ওঠে, আর-একজন তাড়া করলে ওদিকের ডাল থেকে ঝুলে নেমে পড়ে। এক-আধটা ডালও ভাঙে, আর কতকগুলো ফুল ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে।

এই সন্ধ্যার মুখটা শহরের সব জনস্রোত আর যানস্রোতের মাঝখানেও কেমন আর একটা রঙ এসে পড়ে। কোনো একটা নতুন পরিবর্তনের ভূমিকার মতো। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।

ছেলেগুলোর বোঝার কথা নয়, কিন্তু হঠাৎ ওদের ছোটাছুটিতে বাধা পড়ল—পুলিশ! একটা কালো ভ্যান মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর তার থেকে কয়েকজন রাইফেলধারী সিপাহীর সঙ্গে নেমেছে এক অফিসার। বাঙালি, বয়েস চল্লিশ পেরিয়েছে, শরীরে মেদ হয়েছে কিঞ্চিৎ। যথাসম্ভব স্মার্ট ভঙ্গিতে চায়ের দোকানটার সামনে এগিয়ে গেল।

গজেন মণ্ডলের দোকানে সব সময়েই খদ্দের থাকে, সন্ধ্যার দিকটায় বেশ জমজমাট। সব বয়সের লোকজনই আছে, তার মধ্যে ছোকরাদের সংখ্যা বেশি। অফিসার এগিয়ে গিয়ে সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। সঙ্গে একজন ছিল ধুতি-শার্ট পরা লম্বা-পানা লোক। তার চোখ একটা মুখের উপর স্থির হল। সেই অবস্থায় অফিসারের কানের দিকে একটু হেলে কিছু বললে।

অফিসার রিভলবারের খাপের ওপর হাত চেপে এক পা এগিয়ে গেল। অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে সেই ছোকরাটিকে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার নাম অভীক বসুরায়?'

'হ্যাঁ,…' কুড়ি-একুশ বছরের একটি ছোকরা উঠে দাঁড়াল, হাতে আদ্দেক খাওয়া চায়ের ভাঁড়।

'তেইশ নম্বর পণ্ডিত পাড়ায় বাড়ি?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?…'

এদিকে বুড়ো, রুণু এবং তার সঙ্গীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বুড়ো ফিসফিস করে বললে, 'একটা ফাইট হতে পারে…'

রুণু ওর কথায় কান না দিয়ে বললে, 'অভীক বসুরায়…চিনিস? পণ্ডিত পাড়াটা কোথা রে?'

যে-ছোকরাটিকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, সেই অভীক বসুরায় এতগুলো

চোখের সামনে কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। সবার চোখ (আর ভিড় ক্রমেই বাড়ছিল) ওর দিকে—পুলিশ ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সে জন্যে তো বটেই—তাছাড়া চেহারাটা তাকিয়ে দেখবার মতো। বাচ্চা শাল গাছের মতো—লম্বা, দোহারা চেহারা, ফর্সা রঙ, অদ্ভুত লাবণ্য। মুখখানির দিকে তাকালেই মন টেনে নেয়, টানা ভুরু, কালো উজ্জ্বল চোখ, ছোট করে ছাঁটা গোঁফ, কথা বললেই পাতলা ঠোঁট আর শাদা দাঁত স্পষ্ট হয়। সাধারণ ট্রাউজার আর হাওয়াই শার্ট কিন্তু মানিয়েছে আশ্চর্য রকম।

অফিসার বললে, 'আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে···'

'থানায়? কেন···'

'আপনি অনেকগুলো কেন জিজ্ঞেস করছেন, আমি তার কি জানি। আমি শুধু হুকুম তামিল করতে পারি····'

হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল অভীকের মুখখানা, হাতের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে বললে, 'তার মানে, কেন-কী তার ঠিক নেই, আর খামকা আপনি বলবেন আর আমাকে থানায় যেতে হবে···'

অফিসার মাথার হ্যাটটা একটু নামিয়ে দিলেন। এখন সন্ধ্যা হয়ে আলো জ্বলে উঠেছিল, সেই আলোয় আড়াল পড়ল। কেবল মুখে ফুটে উঠল একটু হাসি।

'আচ্ছা অভীকবাবু, আপনি চাকরি করেন?'

অভীকের মুখের ওপর সব আলোটা পড়েছে, মুখখানা আরক্ত, বললে, 'না, আমি চাকরি করি না, সুরেন্দ্রনাথ নাইট সেকশনে পড়ি, কমার্সে'...

'জানি। আজ কলেজে যান নি কেন?'

'কেন সেটা কি আপনাকে বলতে হবে?'

হাসল অফিসার, 'দেখলেন তো, সব কেন-র উত্তর সবার পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়—আপনারও না, আমারও না। এখন চলুন···'

অফিসার ফিরে দেখল, তার নিজের লোকদের দিকে, আর কতটা ভিড় বাড়ল সেটার দিকেও। ওর নিজেদের লোক কী বুঝল কে জানে, হঠাৎ দুজন সিপাহী ওর কাছ ঘেঁষে এল। একটা লাফ দিল অভীক, পালাবার জন্য নয়, কেননা এল অফিসারের সামনেই। বললে, 'খবর্দার, আমার গায়ে হাত দিতে বারণ করুন। দরকার হলে আমি নিজেই যাব, কিন্তু আপনি বলুন, কি জন্যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'সিম্পলি ফর ইণ্টারোগেশন···নাথিং এল্‌স্‌···ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার···'

'কি বিষয়ে ?'

অফিসার একটু ভাবল। তারপর যেন গোপন কথা ফাঁস করছে এমনি অন্তরঙ্গতার স্বরে বললে, 'কাল রাত্রে পণ্ডিত পাড়ার নর্থে একটা মার্ডার হয়েছে আপনি জানেন ?'

'জানি, সবাই জানে। আজ কাগজে বেরিয়েছে···'

'সেই বিষয়েই···'

ঝটকা মেরে থামাল অভীক, 'ননসেন্স, আমাকে মার্ডারের সঙ্গে জড়িত করতে চান ?'

মুচকি হাসল অফিসার, বোধ হয় অভীকের উত্তেজনা দেখে, 'বলেছি তো, আপনার যা বলার আমার অফিসারকেই বলবেন। আমি কিন্তু আর দেরি করতে পারব না। আপনি যদি না যান, তাহলে আমার লোকেরা আপনাকে জোর করেই ভ্যানে তুলবে···'

অভীকের সুন্দর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল, আগুন ছুটল চোখে। অসহায় আক্রোশে চারদিকে একবার তাকাল ও, তারপর কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'আচ্ছা বেশ, যাচ্ছি আমি···'

বলে ভ্যানটার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর হালকা পায়ে লাফিয়ে উঠে গেল ভেতরে। অফিসার ঢুকল সামনের দিকে, সিপাহীরা অভীকের পিছনে, পিছন দিকে। গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

জনতার মধ্যে এতক্ষণে কথা ফুটল। একজন বললে, 'আছে কিছু গোলমাল, তা না হলে নিয়ে যাবে কেন ?'

আর একজন বললে, 'তা বলবেন না। আজকাল কিসে কি হয়, আপনি-আমি বুঝব কি করে ?'

৩

ক্ষণু বললে, 'ওই ও—অভীক কি রকম রেগেছে দেখেছিস ?'

বুড়ো বললে, 'চল···'

ক্ষণু বললে, 'কোথায় ?'

'কি হয় দেখি চল না, অভীকদা (এর আগে চেনা ছিল না) নিশ্চয়ই বোম মারবে। ওর ডান দিকের পকেটটা কী রকম উঁচু হয়ে ছিল দেখলি···' বলে

ও কারুর অপেক্ষা না করে ভ্যানটার পিছু ছুটল। তখন সেটা চলতে আরম্ভ করেছে। ও যে ছুটন্ত ভ্যানের সঙ্গে পাল্লা দেবে এরকম ইচ্ছে ওর ছিল না, কিন্তু ওর ধারণা ছিল, এখনই অভীক বোমা মেরে পুলিশের হাত থেকে পালাবে। এই রকম কথাই সবাই বলে। একটু ছুটে গেলেই তো দেখা যাবে।

সামনেই ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ভ্যানটা। বুড়ো পাশে এসে পড়ল। সিপাহীদের পিঠগুলো ছাড়া পাশের থেকে ভেতরে আর কিছু দেখতে পেলে না ও। ভ্যানটার গায়ে ও একবার হাত রাখল। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, একটা খাঁজের মতো আছে নিচের দিকে, সচ্ছন্দে পা রেখে দাঁড়ানো যায়। বিচ্ছু ছেলে তৎক্ষণাৎ সেটাতে পা দিয়ে উঠে পড়ল, জানালার শিকের জাল ছোট্ট আঙুলগুলো দিয়ে জড়িয়ে ধরল। মাথাটা নিচু করে রাখল, যাতে ওকে দেখতে না পায়। একজনের পিঠের আড়াল পড়েছিল বলে ওদিক থেকেও ওকে দেখতে পেল না।

ওদিকে অভীক ভেতরে ঢুকে দেখলে, ভ্যানের দুপাশের বেঞ্চিতে আরো কয়েকজন বসে রয়েছে। সাধারণ পোশাক পরা, বোঝা গেল না তারা পুলিশের লোক, নাকি তারই মতো ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার পিছনে যে সিপাহীগুলো ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে তারা বসে পড়ল, ওকে বসতে দিলে না।

ও একজনকে বললে, 'একটু সরে বসুন···'

'কেঁও, কাঁহা হঠনা···বলে ও আর একটু ভালো করে বসল।

মাথায় রক্ত চলকে উঠল অভীকের, 'ভদ্রতা জানেন না, আমি কি দাঁড়িয়ে থাকব না কি (আসলে ও দাঁড়াতেও পারছিল না, নিচু ছাদের জন্য কুঁজো হয়ে ছিল)···' বলে ও সিপাহীটির একটা হাঁটু পাশে ঠেলে দিয়ে বসতে চাইলে।

'কেয়া···' সিপাহীটি ধাক্কা দিয়ে ওকে মেঝেতে বসিয়ে দিলে, 'ওঁহা বৈঠো···'

একটু ঝুঁকে পড়েছিল সিপাহীটি, অভীক ঠাস করে ওর গালে একটা চড় বসাল।

তারপর বেশ একটা খেলা শুরু হয়ে গেল। পা দিয়ে হাত দিয়ে ওকে ঠেলে ঠেলে এদিক থেকে ওদিক থেকে মেঝের ওপর ফেলতে লাগল, আর 'লেজ চেপে ধরা বিড়ালের আঁচড়ানো কামড়ানোর মতো অভীক সেটা প্রতিরোধ করতে লাগল।

ইতিমধ্যে সামনের আসন থেকে অফিসার সব লক্ষ্য করছিল, বোধ হয় উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। ফাঁক গলিয়ে রিভলবারটা আস্তে আস্তে কোণের সাদা পোশাক পরা লোকটির হাতে চালান করে দিলে।

অভীক আর একবার মেঝেতে পড়তেই রিভলবারের শব্দ হল একটা, কিন্তু বি.টি. রোডের অনন্ত গর্জনের মধ্যে বাইরে থেকে তা শোনা গেল না। ভ্যানটা বেশ স্পীডে চলছিল।

'মাগো···' চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। সে সব দেখেছিল। কিন্তু ওর ছোট্ট হাতের আঙুলগুলো অবশ হয়ে গিয়েছিল, খুলে গেল হাতটা। তারপর কি হল ও জানতে পারল না।

পুলিশী-সূত্র উদ্ধৃত করে তার পরদিন কাগজে খবর বেরোল, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যখন অভীক বসুরায় ও কয়েকজন ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন মধ্যপথে তারা একযোগে ভ্যানের দরজা ভেঙে পালাবার চেষ্টা করে। সিপাহীরা বাধা দিলে অভীক ছুরি বের করে তাদের আক্রমণ করে। তখন আত্মরক্ষার্থে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। অভীক বসুরায়ের মৃত্যু হয়। দুই জন সিপাহীকে পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বুড়োও হাসপাতালে ছিল। ভ্যান থেকে পড়ে গিয়ে ওর গুরুতর চোট লেগেছিল। চব্বিশ ঘন্টার পর তার জ্ঞান ফিরে আসে। পরের দিন তার বন্ধুরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তাদের মধ্যে রুণুও ছিল। রুণু ওকে খবরের কাগজের কথা বললে। জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়েছিল রে···'

'না-না, কিছু হয় নি···' বলে ও উত্তেজনায় উঠে বসতে গেল, কিন্তু মাথা ঘুরে আবার অচৈতন্য হয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখতে লাগল ও। রুণুরা, অনেক ছেলে, ওদের স্কুলের আর পাড়ার এবং আরো অনেক ছেলে 'রাধা কেবিন'-এর সামনে জড়ো হয়েছে আর তাদের দিকে লক্ষ্য করে ও বলছে, 'আমি সাক্ষী আছি···কিছু হয়নি···কোনো ফাইট হয় নি···'

কয়েকটি হাঁস ও একটি সাপ

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

এমন কিছু ভয় পাওয়ার কারণ ঘটে নি, তবু যে কেন ঘরের ভিতর থেকে হাঁসগুলো অমন চেঁচিয়ে উঠল কে জানে! পরিমল অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল। মনে পড়ল পরশু বাদ দিয়ে তরশুর কথা। বিকেলে আকাশ কালো হয়ে মেঘ জমল। যাকে বলা যায় কাল বৈশাখীর করাল মেঘ। তারপর ঝড়, শিল পড়ার আগে আকাশ-চেরা বাজ, যেন ধারাল কোনো ভোজালি চালিয়ে আকাশ ফেড়ে দিচ্ছে কেউ সড়াৎ সড়াৎ করে। তাতেও তেমন ঘাবড়ে যাওয়ার ব্যাপার ছিল না, পা গুটিয়ে খাটের ওপর বসে মিঠুকে নিয়ে রাম-রাবণের গপ্পো বলেই কাটিয়ে দেওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু হাত পঞ্চাশেক দূরে নারকেল গাছটার মাথায় যখন বাজ পড়ে ফাৎ ফাৎ করে জ্বলে উঠল, তখন কে বাপু মহান বীর-পুরুষ আছো যে ঘাবড়ে যাবে না। আরে ব্বাস, শব্দ কী! শব্দের ধাক্কায় জানালা কপাট ঝনঝন করে নড়ে উঠল। খসে যে পড়ল না এই ওর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।

কিন্তু আজ বিকেলটা গেছে ঝকঝকে পরিষ্কার। সন্ধ্যায় হীরের কুচি তারা ফুটেছে আকাশে। চাঁদ এখনো ওঠে নি, উঠবে নটায় কি দশটায়। ততক্ষণ কেবল গামলা উপুড় করা যা একটু অন্ধকার। দাওয়ায় বেতের চেয়ারে বসে আলসেমি করছিল পরিমল। একবার সিগারেট ধরাল। কাঠিটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পুরোটাকে জ্বালাবার চেষ্টা করল। আঙুলের ডগায় ছেঁকা খাওয়ায় নিজের অক্ষমতাটুকু স্বীকার করে নিয়ে হাসল। দূরে হাটখোলার দিকে বিধু ঠাকুরের মন্দিরে কাঁসর বাজছে। সন্ধ্যারতি হচ্ছে। এতদূর থেকে বেশ শোনাচ্ছে কিন্তু শব্দটা।

সামনে এখন অন্ধকারের মধ্যে পুকুরের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। পুকুর পাড়ে নতুন লাগানো আমের কলম দুটো লিকলিক করে দুলছে। পুকুরের অপর পারে কয়াল সাহেবের বাঁশ বন। জোনাকি জ্বলছে। কাঁসর বাজা থেমে গেলে ঝিঁঝির শব্দ স্পষ্ট শোনা যাবে।

পরিমল বাঁ দিকে একবার রান্নাঘরের দিকে তাকাল। ওখানে এখনো

কাঠের আগুনে খুন্তি নাড়ছে দীপা। ঝাঁঝাল পাঁচ ফোড়নের গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। ছবির বই নিয়ে মিঠু মায়ের পাশে বসে বায়নাক্কা ধরেছে। বড্ড ঘ্যান ঘ্যান করতে পারে মেয়েটা।

পরিমল বার কয়েক মেয়েটাকে কাছে ডেকেছিল, আসে নি। সারাটা দিন হাঁস মুরগির তদারক করতেই কেটে গেছে ওর। এখন একটু যে ক্লান্তি না লাগছিল এমন নয়। রহমত মিঞা এসেছিল বিকেলে। এখনো আড়াইশ ডিমের দাম পাওনা আছে ওর কাছে। লোকটা শেষ পর্যন্ত ফক্কা দেখাবে কিনা জানা নেই। অথচ কথার জাদু দিয়েই আরো পঞ্চাশটা ডিম ও নিয়ে গেল। এমনিই হয়, কথা বেচতে পারলে দুনিয়ার মালিক হওয়া যায়।

বেশ কিছুটা আলস্যতেই পেয়ে বসেছিল ওকে। এমন সময় সামনে হাত দশেক দূরে হাঁসের ঘরে হঠাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটল। মদ্দাটার গলা ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে, ওটা একা চেঁচালে বোঝা যেত না। কিন্তু মাদি চারটেও যেন উলটি-পালটি খাচ্ছে। বড্ড জ্বালায় ওগুলো! ভয় না পেলে অমন করে চেঁচিয়ে ওঠার কারণ নেই। কিন্তু কি এমন কাণ্ড ঘটল যে ভয় পাবে ওরা, বুঝতে পারে না পরিমল। আজ তো আর আকাশে বিদ্যুতের ফলা সাপের মতো জিব বোলাচ্ছে না। দিব্যি বসন্তকালের মতো আমেজ ঘুরছে বাতাসে, তবে!

পরিমল আরো কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে হাঁসগুলোর অসুবিধার কথা বুঝবার চেষ্টা করল। তবে কি ওদের দরজাখানা ঢিল হয়ে খুলে গেল। অসম্ভব নয়, এতবড় একটা পোলট্রির সব আনাচ কানাচ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব সময় নজর রাখা সম্ভব নয়। খুলেও যেতে পারে দরজা। পরিমল অগত্যা উঠে দাঁড়ায়। শোবার ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। ইচ্ছে করলে হ্যারিকেনটা নিয়েই একবার দেখে আসতে পারত। কিন্তু কেমন যেন হ্যারিকেনের কথা মাথায় এল না। এই চার বিঘে জমির প্রতিটি আনাচ কানাচ ওর মুখস্ত। ফলে পা টিপে টিপে ও এগিয়ে হাঁসের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

নাহ্, দরজা তো বেশ বন্ধ। তবে কি নিজেদের মধ্যে জায়গা বোঝাপড়া নিয়ে এই উত্তেজনা। কেমন যেন কৌতুক বোধ করে পরিমল। অবশেষে শাসনের ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে বলে ওঠে, আর কত আমাকে জ্বালাবি বাবা। থাম না। রাতেও তোদের পেছন পেছন থাকতে হবে বলছিস! আহ্।

থামে না। অবশেষে উবু হয়ে ঘরের সামনে বসে পড়তে হয়। দরজাটাকে একটু ফাঁক করে নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে একটা হাত ও এগিয়ে দিয়ে হাঁসের

গায়ে বুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। আহ্, থাম না বাপু। কি এমন হয়েছে শুনি, কেবল ঝগড়া আর ঝগড়া।

ফুলের নরম পাঁপড়ির মতো পালকের স্পর্শ পায় পরিমল। মদ্দাটার গায়েই হাত পড়েছে বোধ হয়। ধবধবে বেল ফুলের মতো সাদা রঙের হাঁস। টুকটুকে গোলাপী রঙের ঠোঁট। স্পষ্ট যেন দেখতে পায় পরিমল। কেবল দেখাই নয় আপন সন্তানের মতোই সারা গায়ে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি যেন দোল খেতে থাকে। নিজের সন্তানের মতো মনে হয় হাঁসগুলিকে। মনে হয় এই পোলট্রির প্রতিটি প্রাণীই ওর আত্মীয় আপনজন। ওপাশে জালের খাঁচায় যে শ-দেড়েক রোড আইল্যাণ্ড এখন ঘুমুচ্ছে—ওরাও, কিংবা বাজেপোড়া ঐ নারকেল গাছটা, কিংবা এই যে ভেজা ভেজা ঘাসের গন্ধ, গোয়ালের ভিতর অলস দেহে দাঁড়িয়ে থাকা ভাগলপুরী যে গাইগুলো রয়েছে ওগুলোও, সবাই ওর আপনজন, বুকের এক একটা পাঁজরা। এদের সকলকে নিয়েই ওর সংসার। এই বাতাস, এই অন্ধকার, এই জোনাকি পোকার আলো-নেভা আলো-জ্বলা, কিংবা পুকুরের জলের গভীরে যে নতুন পোনা মাছের বাচ্চা ছাড়া হয়েছে এদের প্রত্যেকের সাথে কোনো না কোনো ভাবে একটা সম্পর্ক রয়ে গেছে।

কেমন যেন রমরম করে বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে। আশ্চর্য এরকম তো কখনো মনে হয় নি আমার। হাত সরাতে পারে না পরিমল। ডিমের ওপর বসতে দেওয়া মুরগির মতো গর্বে অন্ধ হয়ে যায়।

পালকের ভিতর আঙুল ডুবিয়ে আদর করতে থাকে ও। ইচ্ছে হয় দুটো চারটে সুখ-দুখের কথা নিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করে। কিন্তু ঠিক এ সময়ই আলপিনের মতো আঙুলের ডগায় কিছু একটা যেন ফুটে গিয়ে ওকে সজাগ করে তোলে।

উহ্! কি রে বাবা! ভাঙা পালকের চাঁচ কি! বুঝতে পারে না। হাতখানা টেনে বাইরে নিয়ে আসে পরিমল। অন্ধকারে ভালো করে বুঝতে পারে না। উঠে দাঁড়ায়। হাঁসের ঘরের দরজাটা আবার আঁটো করে এঁটে দিয়ে টলতে টলতে দাওয়ার দিকে এগিয়ে আসে।

দুই

হয়তো একটু আচ্ছন্নতা ঘিরে ধরেছিল পরিমলকে। যেন আরাম কেদারায় গা এলিয়ে বসে স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটা ছবি দেখে উঠল ও। দেখল, ঝমঝম করে

বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে পৃথিবী। লকলক করে দুলছে ধানবন। পুকুর থেকে ছাপিয়ে কৈ-খলসে পথ ডিঙিয়ে নেমে যাচ্ছে ধানবনের কাদায়। মাথায় গামছা জড়ানো অথচ সাপসপ ভিজে দুর্লভ দুটো একটা মানুষ চুরি করে এসে দেখে যাচ্ছে নিজের জমির অবস্থা। বাজেপোড়া নারকেল গাছটার মাথায় একটা কাক এসে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেছিল, ঝড়ো বাতাস এসে তাকে এক ঝটকায় উড়িয়ে নিয়ে গেল দক্ষিণে।

ঘর গুছোলি কাজ সারতে এমন কিছু দেরি হয় নি আজ দীপার। কাচের প্লেটে ডিমভাজা আর খিচুড়ি।

'আহ্! সর গলানো ঘি ছিল না দীপা ?'

'দিচ্ছি বাপু, দিচ্ছি।'

'মিঠু, তোমার সেই মিশনারি স্কুলের ছড়াটা বলো না। কি যেন, রিঙগো, রিঙগো...'

'খিচুড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে না বুঝি!'

চামচে তুলে সইয়ে সইয়ে জিভে দিচ্ছিল পরিমল। আহ্।

'আহ্ না ছাই। এরকমটি যেন খাও নি কোনোদিন!'

'সত্যি বলছি দীপা, খাই নি। খেলেও তা এ মুহূর্তে আর মনে নেই। ঐ দেখ টিকটিকি ডাকল। ঠিক ঠিক ঠিক।'

বৃষ্টির ছাঁট টিনের চালে যেন তেঁতুল বিচি ছুঁড়ে দেওয়ার শব্দ তুলছে। বাতাসে ভর দিয়ে একটা ভোমরা কালো দৈত্য যেন ছুটোছুটি করছে এপাশে ওপাশে। গল্পে কত কিছু-না হয়, এক রাজপুত্র ছিল, এক মন্ত্রীপুত্র ছিল, এক কোটাল পুত্রও ছিল। কিন্তু মজা কি জানো দীপা, এখানে রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র বা কোটাল পুত্র কেউ নেই। এখানে কেবল আমরা তিন জন। তুমি আমি আর মিঠু। আমাদের এই পোলট্রির ভালো-মন্দ আমাদের তিনজনকেই সইতে হবে। শহর থেকে সরে এসে এখানে স্বাধীনভাবে, বলো না দীপা ভালো লাগে না তোমার ?

'ছাই। বড্ড একঘেয়ে। তাও যদি কথা বলার লোক থাকত!'

'ওটা আমাকে শোনাতে হয় বলে শোনাচ্ছ।'

'আহ্, জুড়িয়ে যাচ্ছে না বুঝি খিচুড়ি। খাও না।'

'তোমার সেই আঁশফল রঙের শাড়িটা কোথায়, ওটা তুমি একদিনও পরলে না দীপা। আজ না হয়—'

'এত শাড়ি থাকতে ওটাই তোমার ভালো লাগে। কি যে তোমার টেস্ট।'

'আচ্ছা একটা নোলক পরতে পারো না। নোলক পরলে এত সরল মনে হয় মেয়েদের।'

'তাই বুঝি!'

গর্ভিনী পৃথিবী বৃষ্টিতে আরো সতেজ হচ্ছে। ঝলকে ঝলকে বিদ্যুতের আলো ছুটে বেড়াচ্ছে মাঠময়। গর্জন নেই, কেবল আলো। বাজেপোড়া নারকেল গাছটা হঠাৎ আলোয় যেন যমদূত। তবু কেমন ভয় পায় না পরিমল। সব মিলিয়ে এই যেন বেশ। সব মিলিয়ে কেমন যেন ভালোবাসার নদী হয়ে কুল কুল করে ওর রক্তের মধ্যে বইতে থাকে।

তিন

ডুবুরি যেন জলের অতল থেকে আবার ভাসতে ভাসতে উঠে আসে। ধীরে ধীরে স্বপ্নের রেশটা কেটে যায় পরিমলের।

'কি হল, সেই কখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাও না?'

পরিমল তাকিয়ে দেখে দীপা। 'বাতাসটা কেমন যেন ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।' হাসে।

'খাবে এসো।'

দীপার হাতে হ্যারিকেন। পেছনের বেড়ায় ভাঙা একটা ছায়া দেখতে পায় পরিমল। উঠতে উঠতে বলে, 'অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখে উঠলাম। জানো, তোমাকে আমি সেই আঁশফল রঙের শাড়িখানা পরতে বলছি আর তুমি তাতে মুখ বাঁকিয়ে এমন একটা ভাব করলে যেন খুব অন্যায় করে ফেলেছি আমি।'

দীপা বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

'বিশ্বাস হল না বুঝি!' হাসে পরিমল।

দীপা হ্যারিকেনটা সরিয়ে রেখে খাবার নিয়ে বসে। বেড়ার ওপাশে ছায়াটা কেমন হাত পা নাড়ছে। পরিমল হ্যারিকেনটার দিকে তাকায়। মরচে পড়া আলোয় কেমন যেন খোদাই করা মূর্তির মতো মনে হচ্ছে দীপাকে।

'এই, একটু কাছে এসো না। আসবে?'

দীপা কেমন স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে। 'কি হয়েছে তোমার বলো তো?'

'কিছু না, এসো না।'

পরিমলই এগিয়ে যায়। দীপার চুলের ভাঁজে হাত ছোঁয়াবার জন্য এগিয়ে দেয় হাতখানা। আর ঠিক এসময়ই কেমন যেন শক্ত হয়ে জমে যায় দীপা। 'ও কি! কি হয়েছে হাতে?'

হাতখানা মুঠোর মধ্যে তুলে নেয় দীপা। আঙুলের ডগাটা কেমন যেন জামফলের মতো ফুলে উঠেছে।

সত্যিই ফুলে উঠেছে জামফলের মতো কালচে হয়ে। হাতখানা টেনে নেয় পরিমল। বুকের ভিতর শিরশির করে কেঁপে উঠল। মনে পড়ে হাঁসের ঘরের ঘটনা। কিন্তু এমনভাবে ফুলে উঠল কেন! তবে কি কোনো পোকা-মাকড়ের বিষ ঢুকেছে আঙুলে! অথচ এতক্ষণ এই আঙুলটাকে নিয়ে ও বিন্দুমাত্র ভাবে নি। জ্বালা জ্বালা অনুভূতিটা কেমন যেন গা সইয়ে নিয়েছিল ও। তবে কি বিষধর কোনো···

'কি হয়েছে গো আঙুলে?' দীপার চোখে মুখে কেমন এক আতঙ্ক!

'কিছু না।' সহজ ভঙ্গিতে হাতখানা সরিয়ে নেয় পরিমল। মনে হয় এখনি যেন সমস্ত স্বপ্ন ওর ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। দীপা আর মিঠুকে নিয়ে ওর এই স্বপ্নের পৃথিবী, সবটুকু তছনছ হয়ে মিলিয়ে যাবে।

'দেখি, আঙুলটা দেখি! খারাপ কিছু কামড়ায় নি তো? দীপা আরো ঝুঁকে এসে পরিমলের আঙুল কটি তুলে নেবার চেষ্টা করে।

পরিমল উঠে দাঁড়ায়। 'আলোটা আনো তো!'

সত্যি সত্যি কি বিষধর কোনো সাপ লুকিয়ে ছিল হাঁসের ঘরে। অসম্ভব নয়, বর্ষাকালে মাঝে মাঝে সাপ বেরুতে দেখাটা অস্বাভাবিক নয়। আঙুলটাকে নেড়েচেড়ে আলোর সামনে লক্ষ্য করে পরিমল। বুঝতে পারে না। কিন্তু গা হাত পা এমন ঝিমঝিম করছে কেন! তবে কি!

অথচ আতঙ্কের ভাবটা পুরোপুরি চুরি করে লুকিয়ে রাখতে চায় পরিমল। 'আলোটা দাও, আমি এখুনি আসছি।'

আলো হাতে দৈত্যের মতো দাওয়ায় নামে ও। পা দুটো এমন আড়ষ্ট লাগছে কেন! ঝিমঝিম করে কিছু একটা যেন ছুটোছুটি করতে শুরু করেছে রক্তের ভিতরে। অথচ এতক্ষণ ও নিশ্চিন্তেই ছিল। আঙুলের ক্ষতটাকে দীপা যদি আবিষ্কার না করত, কিছুই হত না। দেহের গ্রন্থিগুলো এমন জমে কঠিন হয়ে আসছে কেন!

মাতালের মতো টলতে টলতে ও হাঁসের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। ডাইনে বাঁয়ে ছায়া দুলতে থাকে ওর। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করে হাঁসগুলোর আর কোনো অস্থিরতার শব্দ ও শুনতে পায় কি-না। না, নিথর হয়ে আছে সবাই। আকাশে বিজবিজ করছে নক্ষত্র। হঠাৎ একবার এপাশে ওপাশে ছুটোছুটি করে আবার স্থির হয়ে গেল। কখন যেন একটা জোনাকি উড়তে উড়তে ওর চুলের ভাঁজে স্থির হয়ে বসে পড়ল। লক্ষ্য করল না পরিমল।

হাঁসের ঘরের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। শ্বাসযন্ত্রটা প্রচণ্ড বেগে একবার নড়ে উঠল। জিভ বার করে বাতাসে একটু জুড়িয়ে নিতে যা সময়, বসে পড়ল পরিমল।

'কি হয়েছে তোমার? বলবে তো?'

দীপার গলার স্বর শুনতে পেল না পরিমল। ধীরে ধীরে হাঁসের ঘরের দরজাটাকে ও খুলে ফেলার চেষ্টা করল।

চার

লকলকে সতেজ একটা লতা। চমকে ওঠে, সাপ। হাঁসগুলো ছুটে বেরিয়ে পড়েছে, সাপ। তবে কি এই সাপটাই আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছিল তখন।

এক হাতে লণ্ঠন পরিমলের। হাতখানা তিরতির করে কাঁপছে। পেছনে পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে দীপা। চিৎকার করে কি যে সব বলতে চাইছে বুঝতে পারে না পরিমল। দেহের ভিতর এখন শীতল বরফের স্রোত। তিরতির করে ক্ষত-আঙুলটা কাঁপছে পরিমলের। দাঁতের পাটি আপনি আপনি বুজে শক্ত হয়ে আসছে, শয়তান।

'কি এমন ক্ষতি করেছিলাম তোর? কি করেছিলাম যে—'

পৃথিবীর সমস্ত বাতাস যেন কমে আসছে, ফুরিয়ে আসছে। পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে আসছে। অথচ এই দুঃসময়েও নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করে পরিমল।

ক্ষত-হাতটাকে আবার ধীরে ধীরে এগিয়ে দেয়। লণ্ঠনের আলোয় কেমন যেন স্থির একটা পদ্মডাঁটার মতো দাঁড়িয়ে আছে সাপটা। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে পরিমল। ধূসর একটা শিরতোলা পদ্মডাঁটা, সাপ। নড়ে না। স্থির।

হাতটাকে এগিয়ে এনে দোলাতে থাকে ও। এইখানে, হ্যাঁ এইখানে।

সাপুড়ে যেন সাপ নাচানো খেলা খেলছে। দীপা নড়তে পারছে না।

পরিমলকে এখনি ওর ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া উচিত, পারছে না। সাপ খেলাচ্ছে পরিমল। সারা দেহে বিষ ছড়িয়ে রেখে সাপ খেলাচ্ছে। যেন সাপুড়ে হয়ে গেছে ও।

হ্যাঁ, দুলছে সাপটা। একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে। একবার এগিয়ে আসতে আসতে কেমন যেন আবার গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। সাপ খেলাচ্ছে পরিমল। সতেজ ধূসর রঙের একটা বিষধর জীব খেলছে, আহ্ শয়তান, এই খানে, হ্যাঁ এইখানে।

সহসা প্রচণ্ড বেগে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সাপটা। হাতের উপরে বিষদাঁতের ছুঁচ ফুটিয়ে দেবার অনুভূতি। হ্যাঁ অবিকল সেই আগের মতো। আহ্—

হাত টেনে নেয় পরিমল।

ধীরে ধীরে সময় বয়ে যায় কিছুক্ষণ। এক হাতে লণ্ঠন পরিমলের, এখনো দুলছে। লণ্ঠনের আলোয় সাপটা কেমন ধীরে ধীরে গুটিয়ে আসছে নিজের ভিতরে। পরিমল নিষ্পলক চোখে লক্ষ্য করছিল, পদ্মডাঁটাটা কেমন নিস্তেজ হয়ে আসছিল। কেমন মোহাচ্ছন্ন। যেন ভীষণ ঘুমে পেয়েছিল ওকে। গুটিয়ে অল্প একটু পরিসরে কেমন যেন জড়িয়ে যাচ্ছিল। কেমন যেন বরফ শীতল রক্তস্রোত ওকে অবশ করে ফেলেছিল।

অথচ নিজেকে এখন সহজ মনে হচ্ছিল পরিমলের। বন্ধ দরজা যেন খুলে গেল। হু হু করা বাতাস। চাঁদ ওঠবার সময় হয়ে গেছে। আকাশের একটা প্রান্ত কেমন ফরসা। নক্ষত্রগুলো ঝকঝক করছে পরিষ্কার। জোনাকিগুলো ফুলঝুরির মতো খেলছে। বিধু ঠাকুরের মন্দিরে কাঁসর বাজা থেমে গেছে অনেকক্ষণ। এখন ঝিঁঝির শব্দ। বাজেপোড়া নারকেল গাছটা এখন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে।

দেহের প্রতিটি অণুপরমাণু যেন সচল হয়ে উঠছে পরিমলের। হ্যাঁ, সহজ ভাবে ও তাকাতে পারছে এখন, সহজভাবে দেহটাকে দোলাতে পারছে। আহ্, বুক ভরে আবার শ্বাস টানতে পারছে পরিমল।

'চলো। ঘরে চলো দীপা।'

দীপা নিরুত্তর।

'কি হল দাঁড়িয়ে রইলে কেন, চলো। নিজের বিষেই নিজে খতম হয়ে গেছে ও। ঘরে চলো।'

দীপা হাঁসের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল, কিন্নে পোকার মতো জড়িয়ে স্থির হয়ে গেছে সাপটা। দাঁত ভরা ওর এত বিষ, অথচ—

যামিনী রায়

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

অখণ্ড বাঙলার যুগশিল্পী যামিনী রায়ের দেহান্ত হল, পরিণত বয়সেই। কিছু কম ষাট বছর ধরে বাঙলায় তাঁর চিত্রাঙ্কন-প্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠিত, কিছু কম চল্লিশ বছর ধরে বিশ্বে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। আজকের আয়োজিত শোকসভাতে মাননীয়া সভাপতি মহোদয়া কর্তৃক তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করা আমার অসাধ্য। কিন্তু শিল্পকলা সম্বন্ধে এমন জ্ঞান বা যোগ্যতা আমার নেই যে তাঁর শিল্পকলার বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করতে পারি। তবে যে সময়ে যামিনী রায়ের চিত্রাঙ্কন বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ হয় সে সময়ে আমার সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সংসর্গ লাভ করে তাঁর স্নেহভাজন হয়েছিলাম—সে সময়ের প্রসঙ্গে আমি কিছু আজ উল্লেখ করব এই ভরসায় যে তিনি যে সিদ্ধি ও অনুপম খ্যাতি লাভ করেছিলেন, আমার বিবরণ তাতে কিছু আলোকপাত করবে।

অগণিত লোক তাঁর সংসর্গ স্নেহ ও বন্ধুত্ব লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তিনি ছিলেন সার্বজনীন যামিনীদা, আমার তো বটেই। বিনয়নম্র অতি স্নেহ-প্রবণ শান্ত মধুর নিরহঙ্কার প্রকৃতির ফলে সকল লোককে তিনি আপনজন করে নিতেন। ছ-সাত বছরের কনিষ্ঠ হলেও আমাকে ডাকতেন মেজদা বলে, আমার জেষ্ঠ্য পশুপতিবাবুকে ডাকতেন বড়দা বলে। স্বীয় পরিবারবর্গের প্রতিও তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। কেউ কখনও তাঁকে বিচলিত, পরিতপ্ত, বিক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হতে দেখেন নি। যে কেউ তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন তাঁকেই তিনি হৃদয় ও দরদ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন।

তিনি ছিলেন বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামের এক সম্পন্ন গৃহস্থের সন্তান, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় অস্বচ্ছল ভদ্রস্থ বাঙালির কৃচ্ছ্রজীবন অবলম্বন করেছিলেন—কেন না মুষ্টিমেয় ছাড়া সকল বাঙালির অবস্থা তো তাই। কজন বাঙালি বিত্তবান? যে সময়ের কথা আমি জানাচ্ছি সে সময়ে যামিনীদা সপরিবারে থাকতেন কলকাতার উত্তরপ্রান্তে, বাগবাজারে। তখনও তাঁর খ্যাতি জমে ওঠে নি, আয় সামান্য। কিন্তু পরবর্তী জীবনে যখন নিয়তির কৃপায় তিনি স্বচ্ছলতা লাভ করে দক্ষিণ কলকাতায় ডিহি-শ্রীরামপুর লেনে স্বগৃহে উঠে এলেন

তখনও জীবনযাত্রার মান অপরিবর্তিত রইল। ঘরে টেলিফোন সংযোগ করলেন না, নিজের বা পরিবারের ব্যবহারের জন্য মোটর গাড়ি কিনলেন না। বাড়ির নিচের তলা বানালেন ছবি-প্রদর্শনের উপযোগী করে। আগন্তুক অতিথির বসার জন্য ব্যবস্থা করলেন আম কাঠের তক্তার তৈরি প্যাকিংবাক্স —সাদা রঙ করা। নিজের বসার জন্য মাদুর, তাতে বসেই ছবি আঁকতেন আর পরিশ্রমকাতর হলে মাদুরে শুয়েই করতেন বিশ্রাম, উপাধান কাঠের চৌকি। তাঁর শিল্পশৈলীর সঙ্গে তাঁর জীবনধারার অপূর্ব এক সঙ্গতি সাধন করেছিলেন তিনি।

যামিনী রায়ের সঙ্গে আমাদের সংসর্গ লাভ হয় ১৯১১-১২ অব্দে। আমরা থাকতাম বাগবাজারে হরলাল মিত্র স্ট্রীটে। অখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি, বছরটাক হল ঢুকেছি। দাদা পশুপতিবাবু পড়েন ক্যাম্পবেল মেডিকাল স্কুলে, অধুনা স্যার নীলরতন সরকার কলেজ। দাদার ও আমার বন্ধুদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে এক চাক গড়ে ওঠে। সেই চাকে জুটতেন সত্যেন বোস (ন্যাশানাল প্রফেসার) আমার হিন্দু স্কুলের বন্ধু, শোভাবাজার রাজ-বাড়ির হারীতকৃষ্ণ দেব, ধূর্জটিপ্রসাদ (পরে লখনউয়ের প্রফেসার), নীরেন্দ্রনাথ রায় (পরে বঙ্গবাসী কলেজের প্রফেসার), হরিপদ মাইতি (পরে সায়েন্স অধ্যাপক), হরিশচন্দ্র সিংহ, হরিপ্রসাদ সান্যাল (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের), কান্তি সেন (পরে বার্ড কোম্পানির), রজনীকান্ত পালিত (পরে পোস্ট-মাস্টার জেনারেল), প্রমথনাথ মিত্র, ভূপালভূষণ ভট্টাচার্য—ও আরও অনেকে। শেষের দিকে যোগ দেন হিরণকুমার সান্যাল ও কবি বিষ্ণু দে। সেই ১৯১১র শেষ দিকে বা ১৯১২র গোড়ায় বড়দা (পশুপতিবাবু) যামিনী রায়কে আবিষ্কার করলেন আমাদের বাড়ির সন্নিকটে এক গলিতে। অতি সহজভাবেই বিনা আড়ম্বরে যামিনী রায় আমাদের কিশোর দলে ভিড়ে গেলেন, দু-এক দিনের ভেতরেই তিনি হয়ে উঠলেন সকলের যামিনীদা। আমাদের সকলের চেয়ে ৭-৮ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু কোনো বাধা আড়ষ্টতা রইল না। তাঁর শিশু-তুল্য সরল স্বভাব বয়সের পার্থক্য নিকিয়ে মুছে নিয়েছিল।

আমাদের মধুচক্রে বা আড্ডায় বড়দা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে মাতোয়ারা করে দিতেন সকলকে। একটার পর একটা গান চলত। শেষ হতে চাইত না। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত স্বরলিপি থেকে। পরে কবিগুরুর স্নেহ-করুণা লাভ করে তিনি জোড়াসাঁকোয়

যাতায়াত করে কিছু গান স্বয়ং কবির কাছ থেকে, কিছু দীনু ঠাকুরের কাছ থেকে শিখে আসেন। হারীতকৃষ্ণ গাইতেন 'মায়ার খেলা' 'ভানুসিংহের পদাবলী'র গান, 'গীতাঞ্জলী'র গান—"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে"—অপ্সরনিন্দিত কণ্ঠে। কান্তি সেন গাইতেন কবির সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টির (সুরের) গান—"তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।" বড়দা সখ করে একটা কটেজ পিয়ানো কিনে এনেছিলেন সাহেব পাড়া থেকে। হারমোনিয়াম ছেড়ে সেইটে বাজিয়েই গান করতেন সবাই। ধূর্জটিপ্রসাদও বাদ যেতেন না। এসরাজ বাজনায় হাত পাকিয়ে সত্যেন এই সময়ে ঋষভের পর্দায় নতুন সমাবেশ সংযোগ করে নতুন সুর অর্থাৎ রাগিণী উদ্ভাবন করলেন। সে সুরের জন্য গান রচনা করলেন বড়দা।

গান যেমন আমাদের চাকের ছিল বড় আকর্ষণ, তেমনি আমাদের চক্র বসলে তাতে এমন কোনো বিষয়বস্তু ছিল না সকলে মিলে যার না একটা জগাখিচুড়ি তৈরি করতাম আমরা। হরিপদ মাইতি ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র। রবীন বাঁড়ুয্যে ছিলেন স্কটিশের টমরি সাহেব আর স্টীফেন সাহেবের ছাত্র; নীরেন্দ্র ছিলেন মনমোহন ঘোষ ও প্রফুল্ল ঘোষের ছাত্র; সত্যেন, আমি ছিলাম আচার্য জগদীশ বোস, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও কালিস সাহেব আর ডি. এন. মল্লিকের ছাত্র। যামিনী রায় ছিলেন গভর্নমেণ্ট আর্টস্কুলের প্রিন্সিপ্যাল পার্সি ব্রাউন ও সুবিখ্যাত হ্যাভেল সাহেবের প্রাক্তন ছাত্র। আর বড়দা ছিলেন আদি ও নির্ভেজাল রবীন্দ্রানুরাগী। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা থেকে শুরু করে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, শেলী, ব্রাউনিং রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র, রুশো, ক্রপোটকিন, নিহিলিজম, ম্যাটসিনি,গ্যারিবল্ডি, 'বর্তমান রণনীতি'; কাঁকুড়গাছির বোমার কারখানা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, নর্টন—চিত্তরঞ্জনের বোমার মামলা পরিচালনা, শ্রীঅরবিন্দের মুক্তি, জগদীশ বোসের গাছের সাড়া, অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা, কুমারস্বামীর ইণ্ডিয়ান আর্টের ব্যাখ্যা, খেয়াল টপ্পা-ঠুংরি···ভূভারতের এমন কোনো বিষয় ছিল না যা নিয়ে না আমরা ঘণ্ট পাকাতুম। যামিনীদা অতি নিবিষ্ট চিত্তে এই সব তর্ক আলোচনা শুনে যেতেন, কিছু বলতেন না। কিন্তু আর্টের কথা উঠলে অত্যন্ত নম্রভাবে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর স্বকীয় মত ব্যাখ্যা করতেন। একটু অস্পষ্ট, একটু বাষ্পীয় লাগত তাঁর কথা। কিন্তু আমাদের কী-বা জ্ঞান ছিল আর্টের কী-বা অভিজ্ঞতা! হরিপদ মাইতি ও আমি একটু জিদের সঙ্গে তর্ক

করতাম যামিনী রায়ের সঙ্গে, কিন্তু অতল সমুদ্রের মতো তিনি থাকতেন অবিচলিত—কখনও বিরক্তির চিহ্ন মাত্র দেখি নি তাঁর মুখে। তিনি ছিলেন প্রকৃত দরদী, কাউকে রূঢ় কথা বলতে বা কটু সমালোচনা করতে কেউ দেখে নি। রাত হয়ে যেত, মা যোগাতেন চা খাবার।

একদিন সত্যেন প্রস্তাব করলেন—একটা হাতে লেখা পত্রিকা বার করতে হবে! তার নামকরণ করলেন 'মনীষা'। বার হল সেই মাসিক পত্রিকা সত্যেনের সম্পাদনায়।

অনেকবার ভেবেছি এই সব তর্ক আলোচনার কি কোনো প্রভাব পড়েছিল যামিনীদার চিত্রাঙ্কনের ওপর? না কখনো না। কিন্তু এই সব নবীন কলেজে পড়া অস্থির ছোকরার দল যে তাবৎ সব কিছু জিনিসকে বাজিয়ে দেখছে, কিছুই শুধু বই পড়ে বা মাস্টারদের পড়ানো থেকে গিলছে না, সম্ভবত তাতে যামিনী রায়ের অন্তরে আর্ট সম্বন্ধে যে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ও স্বাধীন উপলব্ধির আর নতুন পথসন্ধানের আকুতি সঞ্জাত হয়েছিল—তা পুষ্ট হয়েছিল, বল লাভ করেছিল।

এই সময়ে যামিনীদা তাঁর ছবি আঁকবার সাজসরঞ্জাম, তুলি রঙ ইজেল ক্যানভাস তুলে নিয়ে এলেন আমাদের বাড়িতে। সেখানে হল তাঁর বিকল্প স্টুডিও। সারা দিন সেখানে বসেই ছবি আঁকতেন। এই সুযোগে তাঁর ছবি আঁকার ধরনধারণ, আঙ্গিক কৌশল প্রভৃতি জেনে নেবার সুবিধা হল বড়দার ও আমার।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের অনুকম্পায় যামিনীদা এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের এক তেল-রঙের ছবি আঁকবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নিযুক্ত হন। সাহেবের আঁকা তেল-রঙের এক ছবি নকল করার কাজ। বিলাতী অঙ্কন-পদ্ধতি যামিনী রায় অতি প্রকৃষ্ট ভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন বলেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাছে সুপারিশ করেছিলেন। বিলাতী কেতায় চিত্রপটে তুলি দিয়ে তেল-রঙের প্রলেপ লাগিয়ে আলোছায়ার অভিঘাত, আয়তন সংস্থাপন, রঙের বৈপরীত্যে প্রাণসঞ্চার প্রভৃতির প্রয়োগকৌশলে তিনি অসামান্য দক্ষতা লাভ করেছিলেন। সে সময়ে তিনি একটি তেল-রঙের ছবি এঁকেছিলেন যাকে বলা যেতে পারে তাঁর আঁকা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি, **masterpiece**। ছবিটি এক মুসলমান চাষীর নামাজ পড়ার ছবি। মাঠে লাঙল চালানোর শেষে সূর্যাস্তের সময় হাল-বলদ দাঁড় করিয়ে রেখে পাশেই

বসে গেছে চাষী নামাজ পড়তে। ভুল বশত ছবিটি ছাপানো হয় 'প্রবাসী'তে জে. পি. (যামিনীপ্রসাদ) গাঙ্গুলীর আঁকা পরিচয়ে।

বড়দার আগ্রহে যামিনীদা আমাদের মা-র একটি প্রমাণ সাইজের তেল-রঙের ছবি আঁকতে সম্মত হলেন। লাল পাড় গরদের শাড়ি পরে ফুল-বিল্বপত্রের থালা হাতে চলেছেন পুজো দিতে। মাকে দাঁড়াতে হবে এই ভাবে একদফা ৮-১০ দিন, আর একদফা ৩-৪ দিন। আঁকা হবে সরাসরি জীবন্ত মূর্তি থেকে। যথা সময়ে সে ছবি শেষ হল ও আমাদের দোতলার বড ঘরের দেয়ালে টাঙানো হল।

বলা যেতে পারে চাষীর নামাজ পড়ার ছবিটি যামিনী রায়ের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির মোড় নেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। রাজা-মহারাজার নয়, জাঁকজমকের নয়, সুন্দরীশ্রেষ্ঠার নয় বা অন্য কোনো উত্তেজক বিষয়ের নয়, মহানুভব কোনো ব্যক্তির বা ভীষণ বস্তুর নয়—সামান্য দরিদ্র গ্রামীণ চাষীর ও হাল-বলদের ছবি, বাঙালির সামান্য জীবনের আলেখ্য। তেল-রঙের ছবি যামিনী রায় আরও যা এঁকেছেন তার মধ্যে আছে কবিগুরুর সঙ্গে মহাত্মাজীর মুখোমুখি বাক্যালাপের ছবি, এঁকে দিয়েছিলেন বড়দাকে। তার নকল এঁকে দিয়েছেন আরও দু-চার জনকে। স্যর যদুনাথ সরকারের পিতা রায়বাহাদুর রাজকুমার সরকারের ও স্যর যদুনাথেরও তেল-রঙের ছবি এঁকেছেন। আরও বেশ কিছু এঁকেছিলেন—সে সবের উল্লেখ বাহুল্য হবে।

আমাদের বাড়িতে বসে ও নিজের বাসায় যে সব ছবি যামিনীদা আঁকতে লাগলেন তা তেল-রঙের বদলে ক্রমে বেশি বেশি জল-রঙের হতে লাগল। সেই সঙ্গে বিলাতী পদ্ধতিতে আঁকাও পরিহৃত হল। তাঁর জীবনের উপলব্ধি তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল দেশজ ঐতিহ্যের আবেদনে। এই সময়ে তাঁকে বলতে শুনতাম যে দেশী গাছ যেমন দেশের মাটির রস আর দেশের আকাশের আলো-হাওয়া না পেলে মরে যেতে থাকে তেমনি আর্টও দেশের ঐতিহ্য বজায় না রাখলে বিনষ্ট হয়। বিলাতী পদ্ধতির, বিলাতী আর্টের নকল করলে কী হবে, সে দেশের মাটিতে ও সে দেশের ঐতিহ্যে তিনি মানুষ হন নি। নকল করে তিনি সিদ্ধকাম হবেন না; এদেশের বা ওদেশের সমঝদারদের সুখ্যাতি অর্জন করতে পারবেন না। বাঙলার ঐতিহ্যসম্মত পটুয়াদের অঙ্কন-পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করলেন, মনোমতো ভাবে গড়েপিটে নিয়ে। প্রাচীন অজন্তা চিত্রপদ্ধতি বা মুঘল-রাজপুত-কাংড়া পদ্ধতিও তিনি নিলেন না;

কেননা খাঁটি বাঙলা পদ্ধতি একটা রয়েছে, তারই উত্তর-পথ-যাত্রী হতে ডাক এসেছে তাঁর হৃদয়ে।

চিত্রের বিষয়বস্তুতেও চালচিত্র আঁকা পটুয়াদের বা কালীঘাট পটের শিল্পীদের থেকে পরিবর্তন আনলেন। দেবদেবীর ছবি বা রসিক নাগর-নাগরীর চিত্রের বদলে আঁকলেন সাধারণ বাঙালির, দরিদ্রের, চাষীর, বাঁকুড়া বীরভূম অঞ্চলের সাঁওতালদের চিত্র; দোকানীর, রাখালের, গৃহস্থবধূর, পোড়ো মন্দিরের ছবি। সবই প্রায় তাঁর স্বগ্রাম অঞ্চলের, বাঁকুড়া জেলার, ছাপ পেয়েছে। আমার ঘরের শোভাবর্ধন করে টাঙানো রয়েছে সাঁওতাল যুবতীর ছবি, একটা রাধাচূড়া (গুলমোর) গাছের তলা থেকে লাল ফুল কুড়িয়ে নিয়ে জলের কলসি বসিয়ে রেখে অনাবৃত দেহে তার মাথায় ফুল গুঁজছে। সাঁওতাল যুবতীর মাথায় ফুল গোঁজার অন্য দু-রকম ধাঁচের ছবিও আছে আমার দাদার কাছে। আর এক ছবিতে আছে একটি গ্রাম্য মেয়ে এক ভাঙা মন্দিরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার কোলের ছেলের মাথা টিপে নামিয়ে ঠাকুর প্রণাম করাচ্ছে। আর এক ছবি আছে দাদার কাছে, মোষ চরানো এক রাখাল ছেলে মোষের পিঠে বসে আছে, আনমনে। সবই জল রঙের, সবই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে নেওয়া ছবি। আমাদের দেশে অন্তত আর্টের এ রকম সামান্যীকরণ, যামিনী রায়ের আগে বড় একটা কোনো শিল্পী করেন নি। যাতে জলুস বা ঐশ্বর্য বিকশিত সে অঙ্কনের পথে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ও পথের পথযাত্রীদের থেকে নিজেকে পৃথক করতে পারলেই নিজেকে তিনি পাবেন পুর্ণ করে—এ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। যেমন নিজেকে তিনি পেলেন তেমনি লাভ করলেন নিরঙ্কুশ খ্যাতি। কিন্তু খ্যাতির জন্য তাঁর কোনো লালসা ছিল না।

অঙ্কনপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে যামিনীদার আঁকবার উপকরণও বদলাল। পটুয়াদের মতো খুরিতে ও সরায় রঙ গুলতে লাগলেন। তেঁতুল বীচির খোসা ছাড়িয়ে সিদ্ধ করে তার ক্বাথে রঙ মাড়লেন; দেশী মেটে রঙ। পেউড়ি, হরিতাল, গেরিমাটি, খড়িগুঁড়ো। কাঠ-কয়লা, ভুষো হয়ে দাঁড়াল তাঁর রঙের মশলা। ক্রমে উঠল তাঁর আঁকার পটুয়াদের চেয়েও নিপুণ তুলির টান। যামিনী রায়ের এই নিপুণ অব্যর্থ রেখার টান তাঁর চিত্রের ধ্রুব শক্তি। কিন্তু তাঁর আঁকায় পরিত্যক্ত হল পটুয়াদের চালচিত্রসুলভ মামুলি আচার ও দৌর্বল্য। এর বদলে তিনি তাঁর অঙ্কনে সংবেশিত করলেন ঈষৎ আলোছায়ার

সমাবেশ আর প্রয়োজন মতো ভোলের ইঙ্গিত। বাঙলার প্রাচীন পট আঁকা পদ্ধতিকে অবলম্বন করে তিনি উঠে এলেন এক উর্ধ্বলোকে। সৃষ্টি করলেন আমাদের দেশের চিত্রাঙ্কনের এক নতুন কলেবর, তাতে সম্পাদন করলেন নতুন কান্তি, নতুন প্রাণ।

আমরা বাগবাজারের দল কিন্তু তখন এসব তত্ত্ব ভালো করে বুঝতাম না। তর্ক জুড়ে দিতাম যামিনীদার সঙ্গে, বৃথা তর্ক, বেশি করে হরিপদ মাইতি ও আমি। বলতাম অবনীন্দ্রনাথের, অসিত হালদারের, নন্দলালের ছবিতে, তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতিতে আর যামিনীদার ঐ পটুয়াদের আঁকার নকল করায় কী এমন সার বস্তু বা সৌন্দর্য আছে? তুলনা হয় কি Leighton-এর Bath of Psyche, Goyaর La Maja, Turner-এর সমুদ্রবক্ষে তুফানের ছবির সঙ্গে? বলতাম আমাদের দেশের রবি বর্মার কথা। গাছের দোলায় দোদুল্যমান রবি বর্মার আঁকা যুবতীর ছবি 'মোহিনী' সে সময়ে অনেক মধ্যবিত্তের ঘরে টাঙানো থাকত; 'মোহিনী'র আলুলায়িত কেশ,স্খলিত আঁচলে অর্ধাবৃত বক্ষের ও নগ্ন বাহুর সুষমা থেকে চোখ ফেরানো যেত না। কই আপনাদের ছবিতে বাস্তব রূপ, বাস্তব দেহ, বাস্তব দৃশ্য? যামিনীদা বলতেন—বাস্তব চিত্র কথাটার মানে কি? চোখের লেন্স দিয়ে রেটিনার পর্দায় যা পড়ে তা তো ক্যামেরায় তোলা ফটোর সামিল। কিন্তু মনের মধ্যে যা বিম্বিত হয় সে তো হল আর এক বস্তু। সেই প্রতিবিম্বে কিছু সংযোগ বিয়োগ করে মন যা গড়ে তোলে ও তাতে প্রাণ দান করে, শিল্পীর সেই মনের ছবিই হল আর্ট। কবির সাহিত্যিকের বেলাতেও তাই। তাঁরা যা দেখেন হুবহু তা লেখেন না, সেতো রিপোর্টারের কাজ। নিজের অনুভবের অনুপান দিয়ে কবি-সাহিত্যিক তাঁদের রচনা মেড়ে নেন। যামিনীদা বলতেন, আসলে ইওরোপের আর্ট বহির্মুখী, আর ভারতের আর্ট আবহমান অন্তর্মুখী। যামিনীদার বলার একটা ধরন ছিল, অনেকক্ষণ অনেক ঘুরিয়ে উদাহরণ দিয়ে বলতেন। এক এক সময় খেই হারিয়ে যেত। যামিনীদা বলতেন ইওরোপে আর্টে বাস্তবতার প্রতিক্রিয়ায় উদয় হয়েছে impressionist ও post-impressionist পর্যায়ের। আর্টের ভালো ভালো মাসিক পত্র-পত্রিকাদি এনে তিনি আমাদের দেখাতেন, বোঝাতেন। ক্রমাগত বলতেন আমাদের আর্ট আমাদের দেশের মাটিতে জন্মানো চাই। কিন্তু মুঘল রাজপুত চিত্রাঙ্কন এখন আর চলবে না' ইতিহাস এগিয়ে গেছে। এখন চাই বাঙলার গাছের ডালে মনের

কলমের জোড়। শুধু তাঁর অঙ্কনপ্রথাকে দেশের মাটিছোঁয়া করে গড়েন নি, নিজের জীবনকেও গড়েছিলেন দেশের মাটিছোঁয়া করে। বস্তুত তাঁর জীবন-যাত্রা ও তাঁর আর্ট ছিল বলতে গেলে একরকম অভিন্ন। এ বড় যে সে লোক পারে না, এ বড় কম মনোবল ও সৎসাহসের পরিচয় নয়; আশ্চর্য সংশ্লেষ।

যামিনীদার নতুন কেতায় ছবি আঁকা হু হু করে এগিয়ে চলল। বার বার নতুনতর ধারা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। বাসা বদল করে চলে এলেন আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের 'পত্রিকা' আপিশ সংলগ্ন এক বাড়িতে। হরলাল মিত্র স্ট্রীটে আমাদের বাড়ির চাক ভেঙে গেল ১৯১৫-১৬ তে। সত্যেন চলে গেলেন ঢাকায়, ধূর্জটিপ্রসাদ চলে গেলেন লখনউয়ে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এর কিছুকাল পরে (১৯২৪) হরলাল মিত্র স্ট্রীটের ঐ বাড়িতে এসে পদধূলি দিয়ে পবিত্র করলেন। আমার স্মৃতি যদি আমায় প্রবঞ্চনা না করে থাকে, মনে পড়ে সে কালের রাণু অধিকারী—আজকের শোকসভার সভাপতি—কবিগুরুর সঙ্গে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। দরজায় বসানো হয়েছিল দুটি মঙ্গলকলস, আর দুটি কলা গাছ। উঠানে আমি এঁকে দিয়েছিলাম লাল আবিরের পদচিহ্ন। কবি সদর দরজায় পদার্পণ করলে যামিনীদা কবির গলায় মাল্যদান করলেন; বাড়ির মেয়েরা—মা, দিদিমা,বৌদিদিরা—শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে কবিকে ওপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে পাখার বাতাস দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন।

একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজে পাড়ের মতো সাজিয়ে যামিনীদা এঁকে দিয়েছিলেন কলা গাছ। কবি তাতে কবিতা লিখে দিলেন—

"দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামলো"

এর কিছুকাল পরের কথা, ১৯৩১এর গোড়ার দিক। সুধীন্দ্র (দত্ত) একদিন আমাকে বললেন একটা উচ্চমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা তাঁর অভিলাষ। মামুলি কাগজের মতো নয়, বিলাতী সাহিত্য পত্রের অভিকল্প। আমায় বললেন তাতে পুস্তক-সমালোচনার ভার নিতে। আর আমার বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ রায়কে ডেকে এনে দিতে হবে। তাঁকে বলবেন পত্রিকা পরিচালনার আংশিক ভার নিতে। নীরেন্দ্রকে ডেকে আনলাম। তিনিই পত্রিকার নামকরণ করলেন 'পরিচয়' ও তার আদর্শ রচনা করলেন। ধূর্জটি-প্রসাদ, হিরণকুমার সান্যাল, প্রবোধ বাগচী, ডক্টর পশুপতি ভট্টাচার্য, শ্যামল-কৃষ্ণ ঘোষ, অধ্যাপক সুশোভন সরকার, কবি বিষ্ণু দে ও আরও অনেকে যোগ দিলেন। বেদান্তপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন বোস, সুধীন্দ্র, ধূর্জটিপ্রসাদ,

বীরবল, অন্নদাশঙ্কর রায়। নীরেন্দ্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুশোভন সরকার প্রভৃতির রচনায় অলঙ্কৃত হয়ে 'পরিচয়' প্রকাশিত হল ১৩৩৮ সালের শ্রাবণে। অশোককুমার বেদান্তশাস্ত্রী, পশুপতি ভট্টাচার্য, মণীন্দ্রলাল বসু, আমার ও আর দু-একজনের সমালোচনা স্থান পেয়েছিল এই সংখ্যায়। পরে যোগ দিলেন আধুনিক কবি-সাহিত্যিকরা।

'পরিচয়' প্রকাশের কিছু কাল পরেই সুদীর্ঘকাল বিদেশপ্রবাসী কবি ও নাটক এবং আর্ট সমালোচক শাহেদ সুরহ্‌র্দি স্বদেশে ফিরে এলেন। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় প্যারিসে ১৯২৪ অব্দে। দেশে এসে আমার সঙ্গে দেখা করামাত্র আমি শাহেদকে'পরিচয়'-এর আসরে এনে সুধীন্দ্রও অন্যান্য-দের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সুধীন্দ্র ও শাহেদ পরস্পরের গুণমুগ্ধ হন ও পরস্পরের মধ্যে এক নিগূঢ় বন্ধুত্বের উদয় হয়। সুধীন্দ্র আমার কাছে অনেকবার যামিনীদার কথা শুনেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবে একদিন সুধীন্দ্র ও শাহেদকে এক সঙ্গে যামিনীদার আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের বাসায় নিয়ে যাই। শাহেদ তো ছবি দেখে হতবাক হলেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মত দিলেন আমাদের দেশে যামিনী রায়ের চিত্রাঙ্কনই প্রথম ভারতীয় চিত্রের পুনরুজ্জীবন সাধিত করল। যামিনী রায়ের সঙ্গে তাঁর গভীর সৌহার্দ্য স্থাপিত হল।

আমি যামিনী রায়ের চিত্রাঙ্কনের গোড়ার দিকের কাহিনী বলতে চেয়ে-ছিলাম। আমার বলা শেষ হল। যামিনীদার ছবির সংবাদ ও খ্যাতি চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা. রুশদেশ সর্বত্র তাঁর নাম ও জয় বিঘোষিত হল, দেশবিদেশ থেকে পর্যটকরা এসে তাঁর ছবি দেখে ও কিনে নিয়ে যেতে লাগলেন। আজ তিনি পরলোকে। জানিনে আমাদের দেশবাসীরা, আমাদের জাতীয় সরকার, তাঁর অসংখ্য ছবি যা তাঁর ঘরে এখনও বিদ্যমান ও যা তাঁর বন্ধুবান্ধব ও ক্রেতাদের কাছে আছে সে সব সংগৃহীত ও বাছাই করে কোনো একটি জাতীয় চিত্রশালায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন কিনা।

২রা মে ১৯৭২, একাডেমি অফ ফাইন আর্টস গৃহে লেডী রাণু মুখার্জির সভাপতিত্বে যামিনী রায়ের শোকসভায় পঠিত

ক্রেসিডা-বিষ্ণু দে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

চোরাবালি' আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন, এক ঐতিহ্যপুষ্ট কবি কী ভাবে তাঁর বর্তমানকে সমাধেয় করে তোলেন পুরাতন কাব্য প্রসঙ্গের উজ্জীবন ঘটিয়ে। ক্রেসিডার এলোমেলো কথা কী ভাবে তাৎপর্য পেল তিরিশের বাঙালি কবির ত্রিকালদর্শী কিন্তু উৎক্রান্তি-অভিলাষী চেতনায়—সুধীন্দ্রনাথ সে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাঁর আলোচনায়। সে আলোচনারই আলোকে সাতের দশকের আমি, এক মধ্যবয়সী ব্যক্তি, 'ক্রেসিডা'কে জানতে চেয়েছি নতুন করে। কেন না আমিও তো ভুগছি এক কঠিন দুঃসমাধেয় ভবিতব্যে—যা না-হলেই ভালো ছিল তাই হয়—এরই আঘাতে আমিও অন্য সচেতন সামাজিকের মতোই জর্জর—'ক্রেসিডা'র নায়কের মতোই, ওফেলিয়ার নায়কের মতোই। নতুন করেই ক্রেসিডার নায়কের মতোই আমাকেও (নাকি আমাদেরও) জেনে নিতে হয় এই সত্য :

"আত্মদানের উৎসেই জানি উজ্জীবনের আশা।"

ওফেলিয়ার নায়কের মতো আমাকেও খুঁজে নিতে হয় "প্রস্তুতিঘন ভাষা।" তিরিশ থেকে সত্তর পর্যন্ত পরিকীর্ণ হয়ে আছে এই সন্ধানের আততি।

তখনই বিস্মিত হতে হয়, বিস্তৃত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই কবির নানা বিপরীতের মধ্যে সমগ্রতাসন্ধানী ঐক্যসূত্রনির্ণয়ের প্রয়াসে। তিরিশে এ কাজ ছিল জীবনোপেত কবিতার রূপান্বেষাতেই যত জরুরি, সত্তরেও সেই অমোঘ আকর্ষণ এতটুকুও শিথিল হয় নি। আধুনিক জীবনের যে জটিলতার পাশবদ্ধতা দুর্মোচনীয়, তারই মধ্যবর্তী হয়ে এ-কবিতাও অর্থসঞ্চারিতায় হয়ে ওঠে ক্লান্তি-হীন। 'ক্রেসিডা' তাই সেযুগের প্রায়-যুবক পাঠককে ও এযুগের প্রায়-প্রৌঢ় পাঠককে দুভাবে স্পর্শ করে। প্রথম স্পর্শে বড় হয়ে উঠেছিল "ক্রেসিডা আমার প্রচণ্ড আকুলতা···", দ্বিতীয় স্পর্শে এই প্রত্যাঘাতবাসনা প্রধান হয়ে বেজেছে "তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে দেবে?/ উদ্বায়ু আজো হয় নি আমার মন।" আমার সময় লাগবে সেই অক্ষুব্ধ কর্মোদ্যমে পৌঁছতে, যেখানে পৌঁছে বলতে

পারা যায় "স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি"। এখন সে পাঠকের আকণ্ঠ আবদ্ধ হয়ে আছে এক যুগায়ত আর্তিতে:

"এই তবে ভোরবেলা।
হে ভূমিশায়িনী শিউলি! আর কি
কোনো সান্ত্বনা নেই?"

২

এখনকার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ছিল তখনকার রিপন কলেজ। মফঃস্বল থেকে পড়তে গেছি বিমূঢ় সদ্য-যুবক—কাউকেই চিনি না। নবার্জিত কলকাতার বন্ধু রিপন কলেজের দোতালার ঘোরানো সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে একতরফা চিনিয়ে দিচ্ছে বাঙলাদেশের অগ্রণী বুদ্ধিজীবীদের, খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের। "ঐ উনি বুদ্ধদেব বসু, একটু আগে যিনি এলেন উনি প্রমথনাথ বিশী।" স্যারদের বসবার ঘরের পর্দা সরে গেল, নিখুঁত মাপা পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন, একটু বুঝি ধাক্কা লেগেছিল—ইংরেজিতে বললেন "দুঃখিত," শিখিয়ে দিলেন পরোক্ষে ম্যানার্সের একটা ছোট্ট অংশ—ইনি? "জানিস না" বন্ধু সগর্বে জানাল (যেন গর্বটা ওরই কীর্তিজাত) "এচ. এন. এম.—ঈশান স্কলার—হীরেন মুখার্জি।" আর ইনি কে? ততক্ষণে সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী পরা ঈষদ্দীর্ঘ এক যুবক অধ্যাপক সিঁড়ির মুখে এগিয়ে এসেছেন। অচিন্ত্যকুমার এবং অরুণকুমার সরকারের বর্ণনার পরেও আমার দেখার স্মৃতি আমার কাছে অফুরান। আর্যদের মতো নাক, রুক্ষ অনেক চুল পিছনে ফেরানো, প্রশস্ত সৌম্য ললাট, আর আশ্চর্য খুবই আশ্চর্য তন্ময় এক জোড়া দৃষ্টিবান চোখ। বন্ধু বলেছিল—"বিষ্ণু দে। 'ক্রেসিডা' পড়েছিস?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"সে আবার কে?"

৩

সে দিনই দুপুরে 'চোরাবালি' যোগাড় করলাম। 'কেষ্ট কাফে'তে বড় ভীড় মনে হল। ও ফুটপাথের একটা রেস্তোরাঁয় মনে হল নির্জনতা। চা সেখানে প্রায়-চা, কেক সেখানে 'কেক ছিল'। কী আসে যায়! দু-বন্ধুতে তখন ট্রয়লাস হয়ে গেছি। কিন্তু এ সবের কী মানে—'সোৎপ্রাশ', 'বালালোল', 'অপাপবিদ্ধ মন্নাবির'? নতুন দেখা কলকাতারই মতো সহসা সচকিত হয়ে উঠতে হয়—আমার এতদিনের চেনা রজনীগন্ধা বনে ঝড় ওঠে। কঠিন নিয়ন্ত্রণে ধৃত সেই রক্তের রায়ট সঙ্গত বিষন্নতায় ধূসর হয়ে ওঠে:

"লাল মেঘ ঠেলে নীল মেঘ, নীলে ধোঁয়া মেঘেদের ভীড়
মেঘে-মেঘে আজ কালো কল্কির দিন হল একাকার।
বিদ্যুৎ নেভে ঈশান বিষাণে. বজ্রও দিশাহারা।
এলোমেলো কথা ঝাপটি তবুও ওড়ে কথা ক্রেসিডার।"

আর মাত্রাবৃত্তের যে ছয় মাত্রার দোলাকে এতদিন জানতাম শুধু সুখদ এবং নিভৃত আলাপনে আবেদনশীল, সে যে এমন প্রত্যক্ষ সম্মুখ ভাষণে নাটকীয় তরঙ্গবেগের ঝাপট সৃষ্টিতে সক্ষম, সক্ষম পাথুরে দৃঢ়তা ও বহতা নদীর নমনীয়তাকে সহাবস্থিত করতে—তা কি আগে জানতাম! দীর্ঘ পংক্তিগুলির অসম বিন্যাসে এমন একটা বন্ধুর বিস্তৃতি—যা মনে করিয়ে দেয় অস্তিত্বকে, যা বিকল্প হয়ে ওঠে আবর্তঘন বিশাল জীবনের। মাঝে মাঝে একটি ক্ষুদ্র পংক্তি, বা, একক দীর্ঘ পংক্তি তীরের মতো, কিম্বা দীর্ঘ তরবারির মতোই ঝলসে উঠেছে। বেদনার মতো আঘাত হেনেছে, সে ক্রেসিডা-সম্ভাষণ হয়েছে সফল সামাজিকের স্বভাষণ, কিন্তু এ বিশেষ করে তারই—যে সচেতন, ন্যূন পক্ষে যার আত্মশ্লাঘা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে নি, যে জেনেছে নিয়তিলাঞ্ছিত এই জগতে প্রয়াস এবং পরিণামের সম্পর্ককে, এ স্বভাষণ তারই—

"ক্রেসিডা আমার প্রচণ্ড আকুলতা
জিজীবিষু প্রজাপতির বিভ্রমন।"

'জিজীবিষু' শব্দের প্রয়োগেই প্রজাপতি মুক্তি পেয়েছে পুরাতন কবি-কল্পনার প্রচলিত উৎপ্রেক্ষার বন্ধন থেকে।

৪

'ওফেলিয়া'য় হ্যামলেট, 'ক্রেসিডা'য় ট্রয়লাসের মধ্যস্থতাকে এ-কালের বাঙালি কবি মেনে নেন বৈদগ্ধ্যের প্রেরণায় নয়। শিল্পমনস্ক হয়েই কবি বিষ্ণু দে বিশ্বসংস্কৃতির পথে পথে ঘোরেন। জীবনোপেত কাব্যেরই কারণে তাঁর এই ঘোরাফেরা। সেই প্রেরণাতেই তিনি অনুভব করেছিলেন যে প্রচুর এবং প্রধান পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই নায়কের সমস্যার এক মৌল সাদৃশ্য বর্তমান। পিতৃব্যগত জননীকে দেখে হ্যামলেটের যে প্রতিক্রিয়া, আর, দ্বিচারিণী ক্রেসিডার জন্য ট্রয়লাসের যে অনুভূতি তার মধ্যে অস্তিত্বের যন্ত্রণার মাত্রাগত পার্থক্য থাকলেও গুণগত পার্থক্য কম। তাই এই কবি 'ওফেলিয়া' লেখার পরে 'ক্রেসিডা' লেখেন। আর প্রথম মহাযুদ্ধের পরে অস্তিত্ব যখন ভাবনাজর্জর এবং ভাবনা যখন অস্তিত্বজর্জর, যখন বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর অভিজ্ঞতায়

নানা অপচারের স্মৃতি অনিদ্র হয়ে অশান্ত, সেই কাল পরিবেশেই তো লেখা হয় 'ক্রেসিডা'। সেই প্রহারিত কালের নাগপাশ দীর্ঘ সময়েও খসে না, ঘটে না কোনো বিপ্লবের গরুড় পক্ষের বিধূনন—তাই অনেক পরে আবার লিখতে হয় 'এলসিনোরে'।

অপচারের স্মৃতি অনিদ্র। জলে শিলা ভাসার কথা নয়, কিন্তু রাবণ জানে যে তাই ভাসল ; সংকুল যুদ্ধের প্রাককালে কর্ণের জানার কথা নয় সে কানীন কুন্তীপুত্র—কিন্তু তাই সে জানল। হ্যামলেট-জননীর উচিত ছিল না ক্লডিয়াসকে বিবাহ করা, কিন্তু তাই তিনি করেছেন ; লিয়র-কন্যাদের পক্ষে সঙ্গত ছিল না পিতার বিরুদ্ধাচরণ করা, তথাপি তাই ঘটল ; ক্রেসিডার উচিত ছিল না Diomed-এর প্রতি আসক্ত হওয়া—অথচ অনিবার্য হয়ে উঠল সেটাই। এমনি করেই বুঝি নিগৃহীতের সমস্ত অস্তিত্ব ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেও বাস্তবতা তাকে অধিগত করে প্রচণ্ড প্রবলতায়। ট্রয়লাসের আকুল উদ্বেগ এই দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেই প্রাণ পায়—কিন্তু সে ট্রয়লাস বিষ্ণু দে-র ট্রয়লাস।

চসর যে কাহিনীকে জেনেছিলেন ইটালি ভ্রমণের কালে, মধ্যযুগের সেই প্রায়াবসানে আর কিছু নয়, বোক্কাচিয়োর ফিলোস্ট্রেটো থেকে গৃহীত কাহিনীর রূপান্তর সাধনে চসরের প্রধান অভিপ্রেত ছিল জীবনকে—প্রত্যক্ষ অনুভব-যোগ্য জীবনকে প্রতিফলিত করা তাই চসর তাঁর Troilus and Criseyde রচনায় বোক্কাচিয়োর Il Filostratoকে পদে পদে অনুসরণ করলেও শেষোক্ত কাহিনীর করুণ মূর্ছনাকে চসর প্রায় পরিহার করতে সক্ষম হয়েছেন মানবিক সরসতার অভিযোজনে। প্যাণ্ডোরা Il Filostratoতে ছিল ক্রেসিডার জ্ঞাতিভ্রাতা, চসরের রচনায় তিনি হয়েছেন ক্রেসিডার কাকা। কিন্তু সেই সহজে সন্দিগ্ধ অথচ অনাসক্ত ভূয়োদর্শী ব্যক্তিটির বাস্তবজ্ঞান জীবনের প্রতিই পক্ষপাতী ছিল। অন্যতর প্রাসঙ্গিক সহযোগিতায় চসর এই চরিত্রটির মধ্যস্থতাতেও ঘোষণা করেছেন তাঁর জীবনধর্মী মানবিক অভীপ্সা। চসরের শৈল্পিক তন্ময়তাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বোক্কাচিয়োর কাহিনীতে যে ঘটনাগতির তীব্রতা, তা শিথিল হয়ে গেছে চসরের রচনায়। ক্রেসিডার বিশ্বাসঘাতকতাজনিত কারুণ্য অপেক্ষা সম্মুখবর্তী জীবন চসরের কাছে অনেক মূল্যবান বলে প্রতিভাত হয়েছে—তাই ঘটনাগতির শিথিলতাকে স্বীকার করেও চসর অঙ্গুলিসঙ্কেত করেছেন জীবনের দিকে। তাঁর নায়ক জেনেছিল জীবনের অফুরন্ততাকে।

বিষ্ণু দে-র পক্ষে, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের দেশকালপীড়িত আধুনিক কবির কাছে, জীবনের প্রতি পক্ষপাত ঘোষণা সহজ নয়। সে পথে জিজীবিষায় অটল বন্ধুই বা তখন কোথায় অপরাজেয়? সে যুবা নিশ্চিতভাবেই নিঃসঙ্গ। তাই বিষ্ণু দে-র ক্রেসিডার নায়ক বলে :

"ভ্রান্তি আমায় নিয়ে যায় যদি বৈতরণীর পার,
ভবিষ্যহীন আঁধার ক্লান্তি কাকে দেবো উপহার?
তপ্ত মরুর জনহীনতায় কোথায় সে প্যাণ্ডার?"

হেনরিসনের মধ্যে চসরের কবি-করুণা অবিদ্যমান ছিল একথা এ-শতাব্দীর কবি ভাবেন নি। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ভিখারিণী ক্রেসিডাকে নিয়ে হেনরিসন তাঁর The Testament of Cressied কবিতায় পাপ-প্রায়শ্চিত্তের যে 'থীম'কে মূর্ত করেন, তার মধ্যে অপরাধিনী ক্রেসিডা সম্বন্ধে হেনরিসনের হৃদয়বেদনাই ফুটে উঠেছে। বিষ্ণু দে হেনরিসনকে অতি সামান্য অংশে ব্যবহার করেছেন :

"বিজয়ী রাজার দানসত্রের শ্রাবণ প্লাবনে ভাসে
পুরজন যত গৃহহীন যত বুভুক্ষু ভিক্ষুক।"

হায়েনার হাসি আসে স্মৃতিপটে—বেহিসাবী ক্রেসিডা সে। এরই অব্যবহিত পূর্বের স্তবকের বিজয়ী ট্রয়লাসের উল্লেখের পটভূমিতে এই উদ্ধৃত স্তবকটি স্মরণ করিয়ে দেয় হেনরিসনের দীর্ঘ কবিতার এই অংশটি :

"Than upon him scho kest up baith hir Eue,
And with ane blenk it come into his thocht,
That he sumtime hir face befoir had sene."

বিষ্ণু দে তাঁর ট্রয়লাসের জন্য এই অংশটির পরোক্ষ প্রেরণা নিলেও, পরিহার করেছেন হেনরিসনের চসরীয় স্তবকের এই শেষ চার চরণ :

"But scho was in sic plye he knew hir nocht,
Yit than hir luik into his mynd it brocht
The sweit visage and amorous blenking
Of fair Cressied sumtime his awin darling."

এবং এ গ্রহণ-বর্জনের ভিতর দিয়েই গড়ে উঠেছে বিষ্ণু দে-র ট্রয়লাস-কল্পনার স্বাতন্ত্র্য। এমন কি শেকসপীয়রীয় ট্রয়লাস-কল্পনার এই প্রারম্ভিক সোপান মেনেনিয়েও :

"Why should I war without the walls of Troy,
That find such cruel battle here within."

বিষ্ণু দে বর্জন করেছেন এই ইঙ্গিত :

"Each Trojan that is master of his heart
Let him to field ; Troilus, alas ! hath none."

তাঁর প্রতিভাদৃষ্টিতে যে নায়ক মূর্ত হয়েছে, বীরধর্ম, হৃদয়ধর্ম—এক কথায়, মানবধর্মের সর্বাঙ্গীন চারিত্রে সে বর্মাবৃত। সেই বর্মে প্রতিহত হয়েই ক্রেসিডার প্রেরিত আঘাত খান খান হয়ে যায়। এবং পূর্ণাঙ্গ লোকায়ত জীবনকে ভালোবেসেই বিষ্ণু দে শেকসপীয়রের বিস্তৃত কল্পনায় দাঁড়িয়ে চসরকে আমন্ত্রণ করেন।

চসর যেমন বোক্কাচিয়োর আবরণ ফেলে দিয়েছেন, হেনরিসন যেমন ফেলে দিয়েছেন চসরের বাতাবরণ, শেকসপীয়র যেমন তার দ্বন্দ্বজর্জর নায়ক-কল্পনায় পূর্ববর্তীদের অতিক্রম করলেন, বিষ্ণু দে তেমনি তাঁর পূর্ব-পথিকদের চরিত্রকল্পনাকে অনুধাবন করেই রচনা করলেন আর-এক ট্রয়লাস। শেকসপীয়রের ট্রয়লাস শেকসপীয়রের হ্যামলেটের মতোই এক অপ্রত্যাশিতের দ্বারা পীড়িত। পীড়িত এক অনাচারের আঘাতে ও সাক্ষ্যে। বিষ্ণু দে-র নায়ক-কল্পনায় ফুটে উঠেছে একালের জটিলতার মাঝে প্রহত নায়কের জীবন-বিস্ময়—জিগীষা নয়, জিজীবিষা যার নামান্তর। এ ক্রেসিডার নায়ক জানে যে বস্তুর আকৃতিতেই তার স্বরূপ জ্ঞান হয় না। এবং এও জানে সমগ্র মিলন এবং চূড়ান্ত বিচ্ছেদ যখন অভিজ্ঞতায় একটি মুহূর্তে চূড়ায়িত—সে বড়ো কঠিন মুহূর্ত। যে স্বপ্ন লোকোত্তর এবং যে সংগ্রাম লোকায়তিক—তার বৈপরীত্যে ও আলিঙ্গনেই জীবনে বিচিত্রের বন্ধুরতা। এ ট্রয়লাস জানে ব্যক্তিগত সব বিমর্ষতাকে মুক্তি দিতে হবে মহাসমরে। কিন্তু শেকসপীয়রের ট্রয়লাস এক অভিজ্ঞতালব্ধ অনাসক্তিকে অধিগত করেছে, সে জানে গ্রীকপক্ষে ও ট্রোজানপক্ষে মূঢ়ত্বের সমাবেশ ঘটেছে সমান ভাবে। বিষ্ণু দে যে ট্রয়লাসকে কল্পনা করেছেন সে এমনভাবে নিজ ভূমিকাকে গৌণ করে ফেলতে চায় না :

"ঊষসী আকাশ ধূসর করেছে মরণের আনাগোনা।
হেলেনের বুকে শবসাধনার বিশ্রাম আর নেই।
আমার হৃদয়-ঘটাকাশে শুধু জীবনের আরাধনা।"

এখানেও সুধীন্দ্রনাথের অনুমানই মান্য—চসরী জিজীবিষাকেই কবি সবিচার স্বীকৃতি দিলেন। শুধু তাই নয়. শেকসপীয়রের 'ট্রয়লাস'-কাহিনীতে কোনো করণীয়ই শেষ পর্যন্ত করা হয়ে ওঠে না, কোনো বিতর্কেরই সমাধান হয় না। ঘটনা পরিহার এবং পরিহৃত পরামর্শসভার অসম্পূর্ণতায় এ কাহিনী পূর্ণ। কাব্যে অসামঞ্জস্য ছিল না. শেকসপীয়রের হাতে এ হয়ে উঠেছে অসামঞ্জস্যেরই কাব্য—যে অসামঞ্জস্য বৈদগ্ধ্যদীপ্ত, অথচ, উদ্দেশ্যহীন বস্তুভারে পীড়িত মানুষকেই বহন করতে হয় সেই জানিত অসামঞ্জস্যের কাব্য।

বৈদগ্ধ্যের কারণেই বিষ্ণু দে-র নায়কও এক দুরূহ চিন্তাভারে ক্লান্ত। তাই 'ক্রেসিডা'র ভাষা 'ওফেলিয়া'র মতো হার্দ্য নয়। 'ক্রেসিডা'র নায়কের ভাষা হৃদয়ের আবেগের ভাষা নয়, দুঃসমাধেয় চিন্তার ভাষা। যা আমাদের বন্দী করে (ঐ ক্ষণায়ু প্রেম) এবং যা আমাদের মুক্তি দেয় (সংগ্রামময় জীবন) এই দুয়ের মাঝে সংযোগসূত্র কোথায়—বিষ্ণু দে-র 'ক্রেসিডা'র নায়ক তাকেই খুঁজেছে আপন চিন্তার গহনে। সে চিন্তা প্রথাসিদ্ধ ব্যর্থ প্রেমিকের পেলব এবং মসৃণ চিন্তা নয় বলেই আভাঙা সংস্কৃত শব্দ, শ্রোতার অপেক্ষা না রেখেই—স্বগতচিন্তায় শ্রোতার অপেক্ষা কেই বা রাখে—আহৃত হয়েছে। এই শব্দরাজি সেই চিন্তারই চারিত্রের লক্ষণ। কিন্তু এ. সমস্ত জেনেও 'ক্রেসিডা'র নায়ক কেবল নিরুদ্যোগ চিন্তাকেই বা ভূমিকাহীন বৈদগ্ধ্যকেই জীবনের বিকল্প বলে মনে করে নি। এখানেই সে নায়কের যুগোচিত স্বাতন্ত্র্য। এ্যাকিলিসের আত্মন্তরী জিজ্ঞাসার জবাবে জীবনবেত্তা য়ুলিসিসের সেই বিখ্যাত উক্তির ("Time hath, my lord, a wallet at his back/wherein he puts alms for oblivion···") জবাব হয় 'ক্রেসিডা'র নায়কের এই চরম স্বীকারোক্তি :

> "সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র, বিস্মৃতি কীট কাটে।
> প্রাণোপাসনার পূজারী তাই তো তোমার শরণ মাগি।
> প্রাণহন্তারা রলরোলে চলে ট্রয়ের মাঠে ও বাটে।"

৫

এ নায়ক আপন কাললক্ষণ অস্বীকার করে নি। ট্রয়ে রক্ষিত হেলেন তার শ্রেণীরই উত্থানের দিনের অর্জিত সৌন্দর্যস্বপ্ন। কালেরই নিয়মে সেই শ্রেণীর এবং সেই সৌন্দর্যস্বপ্নের শিয়রে আজ ধ্বংস, কিন্তু সেটা ধ্বংসও হতে পারে, ধ্বংসের ছদ্মবেশে মুক্তিও হতে পারে :

"মহাকাল আজ দক্ষিণ কর প্রসারে আমারই দিকে
ভীরু দুর্বল মন !
দৈবের হাতে হাত বেঁধে যাওয়া মহাসিন্ধুর ডাকে !
সর্বসমর্পণ !"

এই "সর্বসমর্পণ"-এর সঙ্কল্পের মূলে রয়েছে ক্রেসিডার ঘটনা—ব্যক্তিগত জগতের নৈতিক শৃংখলার সেই বিপর্যয়ের স্মৃতিতে দুর্বার হয়ে ওঠে এই অনুভূতি—"কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।" এই প্রতিষ্ঠিত কাব্যোক্তি উপস্থাপনার কৌশলে এবং সুদৃঢ় বিষয়ের ভৌম প্রশ্রয়ে নতুন অর্থে দুলে ওঠে। তখনই তার 'স্বপ্ন গোধূলি" "খর রক্তের কোলাহলে" ডুবে যেতে চেয়েছে। আর এই চূড়ান্ত বিপর্যয়ের ক্ষণে তার নিজের কাছেই মেঘ-বিস্ফারিত বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠেছে জীবনার্থ—"আত্মদানের উৎসেই জানি উজ্জীবনের আশা।" এই উজ্জীবনই তার কাম্য।

যে প্রেম শুধু মায়া ছড়ায়, যা শুধুই মুখর তা ভেঙে যাবার কালে বেদনা ছড়ায় ছড়াক। মুখরতার পরিণামী স্তব্ধতায় সান্ত্বনাহীন হয়ে ওঠে ব্যর্থতার বেদনা। সে বেদনায় তিক্ততার অন্ত নেই—কিন্তু স্মৃতিধর প্রেমের শেষ দান তা হলেও ফুরোয় না :

"রজনীগন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে
আজো তো সে ফোটে দেখি—"

ছোট ছোট স্তবকের মধ্যবর্তী শূন্যতায় এই কবিতার নায়কের জীবনের বহু নেপথ্য বৃত্তান্ত অদৃশ্য অথচ ক্রিয়াশীল। উচ্চারিত কথাগুলি সেই ঘটনার দ্বারা লাঞ্ছিত চিন্তার এক এক মুখ—নায়কের দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বের এক এক স্তর। "দুঃস্বপ্নেও প্রেম করেনি এ আশা"—যেমন এই নায়কের ব্যক্তিগত ব্যর্থতার স্মারক, তেমনি সেই ব্যর্থতার ভগ্নস্তূপ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন উজ্জীবনের পালা সূচিত হয়েছে এই অংশে :

"তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে দেবে ?
উদ্বায়ু আজো হয়নি আমার মন।
লোকায়ত মোর স্বেচ্ছাবর্মে লেগে
বর্শা তোমার হয়ে গেল খান খান।"

এখানেই বিষ্ণু দে কালোচিত প্রজ্ঞায় শেকসপীয়রের নির্দেশকে অতিক্রম

করেছেন। তাঁর নায়ক abandoned actions-এর নায়ক নয়। সে স্পষ্টভাবেই সিদ্ধান্তমুখী। কিন্তু একে আমরা চসরীয় জিজীবিষা বলেই চিহ্নিত করতে পারি না। তার সিদ্ধান্তের মধ্যে কাজ করছে এ যুগের পুরুষকার-দৃপ্ত চিন্তা। সে আর দৈবের হাতে সর্ব সমর্পণের কথা বিপর্যস্ত মুহূর্তেও ভাবতে পারে না। বরঞ্চ এ নায়ক এই মুক্তির পরেই স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করে, "প্রাক্তন-পাশ্চাত্য মাগিনা।" কিন্তু "প্রাক্তন-পাশ্চাত্য"-কেও সে যেমন আর চায় না, তেমনি প্রথাবদ্ধ নিশ্চল, অহৃদয় কর্মচর্যাতেও তার আর সায় নেই—"জড় কবন্ধ অন্ধ কর্মে ফুৎকারে করি নর্মাচার।" এর পর বিস্তৃত জীবনকে অঙ্গীকার করা ছাড়া তার আর অন্য কোনো করণীয় থাকতে পারে না। এ নায়কেরও রইল না।

'ওফেলিয়া'র নায়ক চেয়েছিল শাপান্তক কর্মৈষণা। স্তবরত ওফেলিয়ার দিকে তাকিয়ে শেকসপীয়রের নায়ক বলেছিলেন—"The fair Ophelia—Nymph—in thy orisons/Be all my sins remembered." বিষ্ণু দে-র 'ওফেলিয়া'র নায়ক এই শতাব্দীর যন্ত্রণাতেই নিজের ভূমিকাকে আরো তাৎপর্য দেয়:

> "দেবযানী! সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে
> ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বাজে
> শাপমোচনের সুরভি স্বরের পাকে পাকে—এই সাধনা আমার।"

পক্ষান্তরে 'ক্রেসিডা'র নায়ক চেয়েছে জীবনের মধ্যে মুক্তি। সমস্ত শরৎ মাধুরী, বাহুপাশের সকল স্মৃতি থেকে প্রেয়। ওই পুরাতনের তীব্র স্মৃতি তারও পরে আঘাত যে হানতে পারে না তা নয়, তবে তা মুখ্যত তুলনীয় "তরবারি"-র সঙ্গেই। তরবারির মতোই তা দীর্ণ করে বটে, কিন্তু তরবারির মতোই তা ছেদকও বটে। যখনই অতীত মোহ নানা ছলায় আবার জড়িয়ে ধরতে চায় তখনই সেই স্মৃতিও তরবারির মতোই ছেদন করবে সেই নাগপাশ।

এবং এই বিষ্ণু দে-র নায়কেরা—'ওফেলিয়া'র হ্যামলেট, 'ক্রেসিডা'র ট্রয়লাস, 'পদধ্বনি'র অর্জুন, 'এলসিনোর'-এর দিনেমার এবং 'তিনটি কান্না'র লিয়র—সাম্প্রতিক ইতিহাসের যন্ত্রণাময় প্রেক্ষাপটেই কাল-লক্ষণে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এ পুরাতনকে পুনরাহ্বান নয়—ঐ সব কালোত্তর নায়কদের মধ্যস্থতায় কবি আমাদের শুনিয়েছেন মহাকালের সাম্প্রতিক হৃদস্পন্দনকে—তার পদসংকেতের গূঢ়তাকে। এই পাঠকও যেন তাকে চিনতে ভুল না করে।

রামমোহনের আধুনিকতা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

আজ থেকে দুই শতাব্দী আগে যখন রামমোহন বাঙলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন, তখন আমাদের ইতিহাসের এক সংকটময় যুগ। একদিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বাঙলাদেশকে জয় করে তাকে বেঁধে ফেলেছে পরাধীনতার নিষ্ঠুর শৃঙ্খলে। অপরদিকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজে অপ্রতিহত রয়েছে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের রক্ষণশীল রাজত্ব। দেশের মানুষের দুর্দশা ঘোচানোর জন্য প্রয়োজন ছিল এই দুই শৃঙ্খলের বিরুদ্ধেই কঠিন সংগ্রামের, প্রয়োজন ছিল বিশাল উদার চেতনা, প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব ও অসামান্য পুরুষকারের। বাঙলাদেশের ইতিহাসের সেই কঠিন সন্ধিক্ষণে উদিত হয়েছিলেন যুগপুরুষ রামমোহন। তাঁর জন্মের দুই শতাব্দী পূর্ণ হবার সময় আজও রামমোহনের যথার্থ মূল্যায়নের প্রয়োজন এতটুকু কমে নি, কারণ "রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন, সে কাল তেমনই অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত ; আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হোতে পারিনি।"[১]

২

ভারতে বিদেশী ইংরেজের আধিপত্যকে রামমোহন কখনোই পছন্দ করেন নি। শেষ জীবনে ইংলণ্ড থেকে ভারতে তাঁর এক বন্ধুর কাছে লেখা চিঠিতে রামমোহন স্পষ্টই বলছেন :

"কৈশোরেই আমি দেশভ্রমণে বেরলাম এবং ভারতের মধ্যে ও বাইরে অনেক জায়গায় গেলাম। ভারতে ইংরেজ-শাসন সম্বন্ধে আমার মনে একটা গভীর বিতৃষ্ণা জাগ্রত হ'ল ···।"[২]

১৮২৮-এর ২৯এ জুন, কলকাতায় একজন ফরাসী পর্যটককে রামমোহন বলেন, "ভারতবর্ষকে হয়তো এখনও বহু বছর ইংরেজের পরাধীন থাকতে হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারত তার জাতীয় স্বাধীনতাকে অবশ্যই পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।"[৩]

আয়র্ল্যাণ্ডে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের যে অত্যাচার চলছিল, রামমোহন বার বার তাকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন। ১৮২২-এ তাঁর পারসী ভাষায়

প্রকাশিত পত্রিকা 'মিরাৎ উল্ আকবর'-এ তিনি 'আয়র্ল্যাণ্ড—তার দুর্গতি ও অসন্তোষের কারণ' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাতে তিনি লেখেন :

"কি চমৎকার কথাই না লিখে রেখে গেছেন মহাকবি সাদী—

একথা বোল না যে অত্যাচারী মন্ত্রীরা সম্রাটের শুভাকাঙ্ক্ষী ;
তারা যে পরিমাণে জবরদস্তি আদায় করে অর্থ রাজকোষের জন্য,
সেই পরিমাণে কমে যায় শাহনশাহ্‌র জনপ্রিয়তা ;
হে অমাত্যবৃন্দ, রাজকোষের অর্থ ব্যয় করো জনকল্যাণের জন্য ;
তাহলেই পাবে প্রজাবৃন্দের আনুগত্য।"[৪]

ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে রামমোহন উল্লসিত হয়েছিলেন। নেপোলিয়নের পরাজয় ও ভিয়েনা মহাসম্মেলনের পর, ইউরোপে প্রতিক্রিয়া ও স্বৈরাচারের সাময়িক পুনরুত্থান দেখে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন। ১৮২১-এ যখন মেটারনিখের চক্রান্তে নেপ্‌লসে গণতান্ত্রিক বিপ্লব রক্তবন্যায় ডুবে গেল, তখন বন্ধুগৃহে ভোজসভায় যেতে অস্বীকার করে রামমোহন একটি প্রসিদ্ধ চিঠিতে লেখেন :

"ইউরোপ থেকে পাওয়া সর্বশেষ খবরে আমার মন বিষণ্ণ। ইউরোপের দেশগুলিতে স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়ছে, আমার জীবদ্দশায় এমন দিন আবার দেখতে পাব, এ ভরসা আর রাখতে পারছি না। এশিয়ার যে সমস্ত দেশ ইউরোপীয় জাতিদের পদানত হয়েছে, তারা আবার স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবদ্দশায় তা দেখবার আশা আরও কম। তাই জন্য নেপ্‌লসের জনগণের সংগ্রামকে আমি একান্তভাবে আমাদের নিজস্ব সংগ্রাম বলেই মনে করি। স্বাধীনতার শত্রুরা এবং স্বৈরাচারের বন্ধুরা কখনও চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারে নি, পারবেও না।"[৫]

১৮২৩-এর ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ আমেরিকার তিনটি দেশ সশস্ত্র মুক্তি-সংগ্রামের পথে স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ববন্ধন ছিন্ন করে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করল। এই খবর পেয়ে রামমোহন সোল্লাসে কলকাতায় নিজের বাড়িতে এক বিরাট ভোজসভার ব্যবস্থা করলেন। জনৈক বন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করেন যে দক্ষিণ আমেরিকার তিনটি দেশের স্বাধীনতালাভে তাঁর কি আসে যায়। তখন রামমোহন তাঁকে দৃপ্ত জবাব দেন : "ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার যতই পার্থক্য থাক না কেন, পৃথিবীর সব দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামীই আমাদেরও বন্ধু।"[৬]

পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতাসংগ্রামের সমর্থনে রামমোহনের এই ভূমিকা পৃথিবীর প্রগতিবাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্পেনে ১৮২০তে গণবিপ্লব সাময়িক জয়লাভ করলে সেখানকার গণতন্ত্রীরা গণতান্ত্রিক সংবিধানের খসড়া পুস্তিকা ছেপে বইটি উৎসর্গ করেছিলেন রামমোহনকেই—"Abel sabio Brahmin Rammohan Ray।"

১৮৩০-এ ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের সাফল্যে রামমোহন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। জাহাজে ইংলণ্ড যাবার সময় উত্তমাশা অন্তরীপে এক দুর্ঘটনায় রামমোহন পায়ে গুরুতর আঘাত পান। তথাপি সমুদ্রবক্ষে ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণরঞ্জিত নিশান ওড়ানো দুটি ছোট জাহাজ দেখে তিনি জেদ করেন যে ঐ জাহাজে চড়বেনই। এবং আহত পা নিয়ে বহুকষ্টে দড়ির মই বেয়ে ফরাসী জাহাজে উঠে রামমোহন বিপ্লবের পতাকাকে অভিবাদন জানালেন, আলিঙ্গন করলেন ফরাসী নাবিকদের এবং বারবার আনন্দে ধ্বনি দিতে লাগলেন: "ফ্রান্সের জয় হোক।"[৭]

রামমোহন যখন ইংলণ্ডে পৌছলেন, তখন, পার্লামেণ্ট-সংস্কার আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে। পার্লামেণ্টে ভোটাধিকারের দাবিতে শ্রমিকদের এক মিছিল রাজপথে দেখে উত্তেজিত রামমোহন শোভাযাত্রার নেতাদের জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে ওঠেন "সংস্কার-আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক।"[৮] এক ইংরেজ বান্ধবীকে লেখা পত্রে রামমোহন নিজের মতামত ব্যক্ত করে লেখেন: "এ সংগ্রাম শুধু সংস্কার-সমর্থক ও সংস্কার-বিরোধীদের মধ্যে নয়, এ সংগ্রাম হচ্ছে পৃথিবীজোড়া অত্যাচার ও স্বাধীনতার মধ্যেকার সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।"[৯]

১৮৩২-এর ৭ই জুন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট, সংস্কার আইন পাশ করায়, খুশী হয়ে রামমোহন আর এক বন্ধুকে লেখেন:

"অভিজাতদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও আপনারা যে সংস্কার-আইনটি পাশ করেছেন, তাতে আমি খুবই আনন্দিত। সংস্কার-আইনটি পরাজিত হলে, আমি আপনাদের দেশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই ছিন্ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম...।[১০]

৩

ভারতবন্ধু পাদ্রী অ্যাডাম বলেছেন যে রামমোহন ছিলেন স্বাধীনতার একজন নির্ভেজাল সমর্থক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহনের

সংগ্রাম এই সূত্রে বিশেষভাবেই স্মরণীয়। দেশের মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার জন্য ১৮২১-এর ৪ঠা ডিসেম্বর রামমোহন একটি বাঙলা পত্রিকা প্রকাশ করলেন : 'সংবাদ কৌমুদী'। কয়েকমাস পরে তিনি পারসী ভাষায় আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন (এপ্রিল ১৮২২)— 'মিরাৎ উল্ আকবর'। প্রথম সংখ্যার মুখবন্ধেই রামমোহন লিখলেন : "এ পত্রিকা বের করায় আমার একমাত্র উদ্দেশ্য জনসাধারণের অভিজ্ঞতা বাড়ানো ও তাদের সামাজিক উন্নতি সাধন করা। তা ছাড়া আমি চাই যে শাসক-শ্রেণী জানুক যে তাদের প্রজারা কি রকম অবস্থায় আছে, প্রজারাও জানুক যে তাদের শাসকদের আসল উদ্দেশ্য কি—যাতে শাসকরাও ইচ্ছা করলে প্রজাদের ঢের বেশি কল্যাণ করতে পারে এবং প্রজারাও প্রয়োজন বোধে শাসকদের কাছ থেকে অভিযোগের প্রতিবিধান পেতে পারে।"[১১] রামমোহন আরও স্পষ্টভাবে লেখেন যে তাঁর পত্রিকা "ভারতবর্ষে ও আয়ার্লাণ্ডে—উভয় দেশেই ইংরেজ সরকারের নীতির সমালোচনাও করবে।"[১২] ১৮২২ সালে এ ধরনের উক্তি খুবই সাহসের পরিচায়ক।

বাঙলাদেশে এ ধরনের চেতনার বিকাশ ইংরেজ সরকারের আদৌ পছন্দ হল না। ভারতে ইংরেজ সরকারের মুখ্যসচিব বেইলি প্রধানত রামমোহনের পত্রিকাগুলি লক্ষ্য করেই মন্তব্য করলেন : "যে কোনও দেশের মানুষদের কাছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে পরিমাণ মূল্যবানই হোক না কেন, এ দেশের বিশেষ অবস্থায় তা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়।"[১৩]

১৮২২-এর শেষ দিকে অস্থায়ী বড়লাট অ্যাডাম ভারতে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে একটি কুখ্যাত আইন জারী করলেন। ১৮২৩-এর ১৭ই মার্চ তার বিরুদ্ধে লিখিত যৌথ প্রতিবাদ জানিয়ে সাহসের সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে দাঁড়ালেন কলকাতার ৬জন বিশিষ্ট নাগরিক—রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ ও গৌরীচরণ ব্যানার্জি। আবেদন অগ্রাহ্য হলে প্রতিবাদে রামমোহন তাঁর পত্রিকা 'মিরাৎ উল্ আকবর'-এর প্রকাশ বন্ধ করে দেন এবং কাগজের শেষ সংখ্যায় এক স্মরণীয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন : "হৃদয়ের একশত রক্তবিন্দুর মূল্যে যে সম্মান অর্জন করা হয়েছে, হে বন্ধু, সেই সম্মানকে সামান্য সুবিধার লোভে দ্বারবানের কাছে বিক্রি করে দিও না।"[১৪]

রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী কোলেট তাঁর এই কীর্তিটিকে ইংলণ্ডের

মহাকবি মিল্টনের উদাত্ত ঘোষণার সঙ্গে তুলনা করেছেন—১৬৪৪-এ সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ করা আইনের বিরুদ্ধে যে-মিল্টন গর্জে উঠেছিলেন: "সব স্বাধীনতার উপরে আমাকে দাও জানবার, বলবার ও নিজের বিবেক অনুযায়ী মুক্তমনে তর্ক করবার স্বাধীনতা।" ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের সংবাদপত্রগুলি গৌরবময় ভূমিকাই পালন করেছে, আর তাদের প্রথম পথ দেখিয়েছিলেন ১৮২৩-এ, রামমোহন।

৪

রামমোহন ছিলেন মানবধর্মী—সমস্ত রকম সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। মুসলিমদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব এদিক থেকে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে বলতে গিয়ে রামমোহন দ্ব্যর্থহীনভাবে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"যখন মুসলমান শাসকেরা এদেশে রাজত্ব করতেন, তখন এদেশের হিন্দুরা, মুসলমান প্রজাদের সমান রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধাই ভোগ করতেন—সরকারের উচ্চতম কর্মচারীর পদ পেতেন, সেনাপতি পদে নিযুক্ত হতেন, সুবাদার নিযুক্ত হতেন, এমনকি সুলতানের পরামর্শদাতার পদও লাভ করতেন। ধর্মের বা জাতির পার্থক্যের জন্য তাঁদের সঙ্গে কোনোরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হত না। জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাও জাতিধর্মনির্বিশেষে সমাদৃত হতেন। কিন্তু ইংরেজ শাসকদের রাজত্বে এদেশের অধিবাসীরা সমস্ত রাজনৈতিক অধিকারই হারিয়েছে…।"[১৫]

মুসলমান সমাজের প্রতি কোনও তাচ্ছিল্যের মনোভাব ছিল না রাম-মোহনের—ছিল গভীর শ্রদ্ধা। আইনজীবীদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রামমোহন লিখছেন: "হিন্দুদের মধ্যে দক্ষ আইনজীবী খুব কম, বরঞ্চ মুসলিমদের মধ্যে আমি বেশ কয়েকজন সৎ আইনজীবীকে চিনি।"[১৬] অন্যত্র, মুসলমানদের উন্নতির সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন সাফ জবাব দিচ্ছেন: "অন্য যে কোনও সুসভ্য মানুষদের মতই মুসলমানদেরও উন্নতি সাধনের সম্ভাবনা রয়েছে।"[১৭]

দেশের মধ্যে কুসংস্কার ও বীভৎস লোকাচারের বিরুদ্ধে এবং আধুনিক শিক্ষার প্রসারের জন্য রামমোহনের অজস্র প্রচেষ্টা এতই বহুল পরিচিত যে, তা আবার আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। সেই সব ধর্ম ও শিক্ষাসংস্কারের

উদ্যমের পিছনেও ছিল তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম ১৮১৮তে লেখা একটি পত্রে রামমোহন তা স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন :

"গভীর দুঃখের সঙ্গেই আমাকে এ কথা স্বীকার করতে হচ্ছে যে হিন্দুদের বর্তমান ধর্মীয় আচরণ, তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী। তাদের মধ্যে এত সংকীর্ণতা, এত বর্ণভেদপ্রথার বেড়াজাল, যে তাদের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রতই হতে পারছে না। হাজার রকম ধর্মীয় তুচ্ছ আচার-অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকায়, কোনও কঠিন কাজে ব্রতী হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।... অন্তত রাজনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক উন্নতির জন্যও তাদের ধর্মব্যবস্থায় সংস্কার সাধনের আশু প্রয়োজন।"১৮

রামমোহনের মৃত্যুশতবার্ষিকীতে তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মূল্যায়ন করেছিলেন, তাঁর জন্মের দ্বিশতবার্ষিকীতেও আমরা সেই কথার পুনরাবৃত্তি করতে পারি :

"সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে। কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতই আধুনিক।...তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহা-ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দুমুসলমানখৃষ্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।"১৯

পাদটীকা

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারত-পথিক রামমোহন, ডিসেম্বর ১৯৩১
২. রামমোহন রায় : বন্ধুকে পত্র, আগস্ট ১৮৩৩
৩. ভিক্তর জ্যাকমে : ভয়েজ দাঁ ল' ইন্দে, পারী, ১৮৪১
৪. 'মিরাৎ উল্ আকবর' : এপ্রিল ১৮২২
৫. রামমোহন : বাকিংহামকে লেখা পত্র, ১১ই আগস্ট ১৮২১
৬. 'মান্থলি রিপজিটরি অফ থিওলজি অ্যাণ্ড জেনারেল লিটারেচার' : ১৮শ খণ্ড, পৃ : ৫৭৫-৫৭৮
৭. শিবনাথ শাস্ত্রী : হিস্ট্রি অফ দি ব্রাহ্মসমাজ, প্রথম খণ্ড, ১৯১১
৮. ঐ
৯. রামমোহন : শ্রীমতী উডফোর্ডকে লেখা পত্র, এপ্রিল ১৮৩২

১০. রামমোহন : উইলিয়ম র‍্যাথবোনকে লেখা পত্র, এপ্রিল ১৮৩১
১১. 'মিরাৎ উল্ আকবর' : ১৮২১
১২. ঐ
১৩. ভারত সরকারের মুখ্যসচিব বেইলির গোপন বিবৃতি : কলকাতা, ১০ই অক্টোবর ১৮২২
১৪. 'মিরাৎ উল্ আকবর' : ৪ঠা এপ্রিল ১৮২৩
১৫. রামমোহন : অ্যান অ্যাপীল টু কিং ইন কাউন্সিল এগেনস্ট প্রেস রেগুলেশনস, ১৮২১
১৬. রামমোহন : জুডিশিয়াল সীস্টেম ইন ইণ্ডিয়া
১৭. রামমোহন : কণ্ডিশন ইন ইণ্ডিয়া
১৮. রামমোহন : বন্ধুকে পত্র, ১৮১৮
১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারত-পথিক রামমোহন, ১৯৩

হিরণ্ময়েন পাত্রেন

বিষ্ণু দে

আয়না বুঝি অন্যেরই জন্য ?
নিজরূপ নিছক কল্পনা ?
ভবিষ্যত জানি সুখস্বপ্ন,
যা গত তা বিলাসী আল্পনা ?

হিরণ্ময় ! কেন খোলো পাত্র ?
মুখ দেখে কে না বা বিষণ্ণ
সাধ ক'রে হব অহোরাত্র ?
সত্যে যে হৃদয় বিপন্ন।

থাক্, রাখো স্বর্ণময় ঢাকনা।
সুখে দুঃখে দেহেমনে অন্ন
পরমুখাপেক্ষী, বন্ধ্যা স্বপ্ন।
অন্ধের কিবা নীল পাখ্‌না ?

চাপে চ্যাপ্টা

গোলাম কুদ্দুস

চোখ তুলে সুন্দর পৃথিবীটা
দেখব নিশ্চয়,
যদি বুক থেকে পাথরটা
নেমে যায়,
সেই সঙ্গে বাজারদরটাও
একটু নামে

ছেলের গায়ের জ্বরটাও
একটু কমে,
বৌয়ের রক্তহীনতা
চ'লে যায়,
এ-পাড়া থেকে উৎখাত
না হই,
আর মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়াতে পারি
তা হলে চোখ তুলে সুন্দর পৃথিবীটা
দেখব নিশ্চয়।

এখন আমি তাকাই না 'ডাইনে'
চাই না 'বামে'
দেখি না সামনের পথও 'মাঝখানে'।
চাপে চ্যাপ্টা হয়ে মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে হাঁটি।
শুধু চোখ বুজলেই দেখতে পাই
খোকশা-জানিপুরের কালিপূজার বলির মোষটাকে
যাকে চারপায়ে দড়িদড়া বেঁধে
চিৎ ক'রে ফেলে
গলাটা হাড়িকাঠের মধ্যে ডলতে ডলতে
সরু ক'রে ফেলে সম্মান দেখানো হয়েছিল,
আর এক হাত লম্বা জিভ বেরিয়ে পড়ার পর
যার মুখের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল
এক গামলা ঠাণ্ডা জল!
কিন্তু তখন তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা ছিল না
সেই দলিত মহিষাসুরের,
তার দুচোখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল বরং
অনেক অনেক জল।

আমারও চোখের সামনে যারা
তুলে ধরতে চাইছে
শিল্প-সাহিত্যের রস,

তারা কি দেখছে না
আমারও দুচোখ বেয়ে
ফোঁটায় ফোঁটায় বেরিয়ে আসছে
সুন্দরের ধারা !

সে আশ্রয় নেই

রাম বসু

সব কিছুর পরেও আমার আশ্রয় ছিল
ময়ূরকণ্ঠী নদীর ধারে পাহাড়ের জটিল অরণ্যে
চিত্রিত গুহা ছিল মাতৃজঠরের মতো শুশ্রূষার
বড় বড় গাছ বুক ফাঁক করে দিত আর আমি
রূপকথার নায়কের মতো তার ভিতর আশ্রয় নিতাম
সারি সারি পাতা গায় গায়ে ঘেঁষে ঘেঁষে বৃহ হয়ে যেত
পিঙ্গল শিকড় সহস্র বল্লম তুলে আমাকে পাহারা দিত

সব কিছুর পরেও আমার আশ্রয় ছিল
আমার যা কিছু জীবন্ত, ইচ্ছা ও বিশ্বাস, স্বপ্ন ও চেষ্টা
আমার সব উপাদান, যা আমি, আমার আমি-কে নিয়ে যেতাম
পরাজিত বাতাস যেমন তার উৎসে ফিরে যায়
বিপন্ন জলরাশি যেমন তার গুহামুখে ফিরে যায়
ক্লান্ত গেরিলা যেমন তার পশ্চাৎভূমিতে ফিরে যায়
আবার জন্মের স্বাদ ও আহ্লাদ পেতে
আবার আরম্ভের বিস্ময় ও বিশ্বাস পেতে
আমিও ফিরে যেতাম আত্মার কেন্দ্রমুখে
নিজেকে উদ্ধার করতে লোকগাথার প্রোজ্জ্বল আলোয়
আবার ফিরে পেতে হাত, পা, মুখ, মানুষের মুখ

সে আশ্রয় আমার নেই

সমুদ্র নিজের হাতে সব বাতিঘর উপড়ে ফেলেছে
পথনির্দেশের বয়াগুলো পড়ে আছে মড়ার খুলির মতো
বিশ্রুত নায়ক তুলো-ছেঁড়া পুতুলের মতো আস্তাকুঁড়ে
গোবর আর প্রস্রাবে ঘেঁটু-ঠাকুর ইতিহাস কড়ির মুকুট পরছে

সে আশ্রয় আমার নেই

অগোচরে একরাশ ছায়া নেমে আসে
মাথা মুড়ানো মুখ চুন করা ক্রীতদাস কানে কানে বলে :
আমাদেরও বিক্রি করে দিল
লোভের কাছে, ক্ষমতার কাছে, অন্ধতার কাছে, মত্ততার কাছে
বিক্রি করে দিল

আর, ক্ষীণতম শব্দ স্পষ্ট হবার আগেই
লোকশ্রুত বীর এখন ধূর্ত কাপুরুষ
সহসা স্ফূর্তিবাজ মুখ পরে
জয়ধ্বনি দিতে দিতে গেল
অন্ধকারের দিকে

ঈশ্বর, হে কল্পিত নোঙর, নিয়তি অথবা সময়
কচ্ছপের পচা খোল থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস, নাইট্রেট
অথবা মার্কারির ভিতর হে জ্বলন্ত তামা, গ্রহপুঞ্জ
অথবা দুর্জ্ঞেয় দুর্ভেদ্য হে রহস্য, আদিতম
উপকথায় সমৃদ্ধ বয়ান কেন ছিন্নভিন্ন করে দিলে
কেন রগ সমান উঁচু ঢেউ সহসা হয়ে গেল কবন্ধ
তবে আজ কিসে পরিমাপ হবে মানুষের
মহাজগতের এই অলৌকিক কীটের ?

আর্তনাদ, মাগো
আজ আমার নৈঃশব্দ্যও নেই যেখানে মাথা রাখতে পারি

আদিগন্ত জলন্ত গৈরিকে, ধিকিধিকি খরার আগুনে
মরুভূমির ক্রুদ্ধ পাখির মতো নিজের বুকের দিকে তাক
করেছি ঠোঁট

আর্তনাদ, মাগো,
আমাদের প্রাচীন গ্রহটার হৃদয় কে যেন কামড়ে ধরেছে
আমাদের রক্তের ভিতর থেকে ছাড়া -পাওয়া কালো নেকড়ে
সূর্যের টুঁটি ছিঁড়ে আনছে

আর্তনাদ, মাগো
আজ এই অমঙ্গলের দিনে
কোথায় নিরাবরণ স্নান করে পাবো
নবজাতকের চোখের রঙ
বীজ বোনার আতুর গন্ধ
কোথায়
কোথায় ?

বাঙলা একাডেমিতে এসে পড়েছিল শেল
সিদ্ধেশ্বর সেন

বাঙলা একাডেমিতে এসে পড়েছিল শেল
আমরাও ঘুরেফিরে দেখলুম তাকে
মৃত এক ধাতুপিণ্ড লোহা বা নিকেল—
আমাদের সকলের স্বাভাবিক উপহাস্য বটে

ভয়ানক তেজে সেটি ঢুকেছিল মার্চের পঁচিশে
দেয়ালেতে গর্ত ফেঁদে পুঁথিপত্র উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে—
পুঁথিতে কি লেখা ছিল তৈমুরের মধ্যযুগীয়
বর্বর দস্যুর দল আজকের ভীড়ে যাবে মিশে ?

এই সব আমাদের দেখালেন গ্রন্থ-আগারিক
এবং বোঝালেন এক চমৎকার ঘটনা শুনিয়ে :
সে রাতে যা ঘটেছিল—ভয়ানক—তবু তারও প্রহসন খানিক,
না হলে ভাঙবে কেন স্প্রিন্টাবে ফটো যেটি, 'কায়েদে আজম'-এ.

অথচ অক্ষত থাকে রবীন্দ্র-রচনাবলী, লালনের গান,
বৌদ্ধ চর্যা, দোঁহা আর অগ্নিযুগ-চারণের কাজী,
হানাদার শেল, তবু এই সবই পুড়তে গররাজী—
ভাষা ও ধ্বনির তত্ত্ব, শহিদুল্লা সাহেবের অভিধান

বাঙলা একাডেমিতে এসে ঢুকেছিল আহাম্মুক শেল
বর্ধমান হৌসে তার চিহ্ন শুধু উল্টো সাক্ষ্য রটে
বেকুফ জড়ের পিণ্ড, তৈরি কিসে—লোহা না নিকেল
সে যাহোক, আজ তার প্রভু কোন্ নেশাখোর জুয়াড়ীর ঝোঁকে—

আমাদের সকলের স্বাভাবিক উপহাস্য বটে ॥

হীরামন পাখি

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আমার মনের মধ্যে যেন অনেক-কাল আগের এক দালান, চামচিকের
গন্ধ-ছোটানো সমাধি-সৌধের হঠাৎ অন্তঃপুর, যেন কাদের ফিসফাস
কথাবার্তা মাগধী প্রাকৃতে, অপভ্রংশে :

বা যাদের বলাৎকারের বীর্যে এই-তো সেদিনও আমাদের ঘরে-ঘরে বাড়ন্ত
মেয়েদের ধনেখালি এখানে-ওখানে কত-না দুঃস্বপ্নের দ্বীপময়, এখনো নদীর কূল
হয়তো নোংরা, সেই সব কিছু-কিছু দানব ও প্রভু-পিশাচরা অন্ধকারে হুমকি
ছাড়ে,

ইংরেজ-ফরাসি-ওলন্দাজে, বা জাহাজ থামে, নামে অন্ধ নাবিকদল :

পরেই, এই সব ও তার চেলা-চামুণ্ডাদের সমগ্র পারিপার্শ্বিক যেন সার্কাসের বিচিত্র খেলোয়াড়, ক্রমশই আরো বড় লাফ মারতে-মারতে গভীর হতে গভীরতর অন্ধকারে অন্তর্হিত হয়।

অর্থাৎ, আমার এই মনের মুহূর্তে আজ, অজ্ঞাতে-অতর্কিতে, দাগ কাটে পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক দুঃখের ভাপ, এত মানুষের জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলা রাত্রির অলিন্দে—কত-না সুগুনা সুনয়না নারীর আর্তনাদ।

তবু বলো তো এই একই মুহূর্তে, যখন হাত বাড়িয়ে হাত ধরতে চাও, হীরামন পাখি কে ওড়ায় আকাশে—তুমি ?

নেফরেত্তির অলীক শহর

তরুণ সান্যাল

প্রতিদিন পদপাত আমারই একান্ত চেনা রাস্তা এইটুকু
প্রাণধারণের দায়, কেন দায় নিজেরই অজানা, তবু আমি
রহস্য সিরিজে ডিটেকটিভ
এক পা এগোই আর এক পা এগোই
যেন কেউ ঘনভেজা দীর্ঘশ্বাসে চোখ কচলে উঠে বসবে ম্যমি থেকে
এই নেফরেত্তির খোজার শহরে
যে-শহরে মৃতরা জানে না মৃত, জীবিতেরা প্রত্নকাহিনীর মধ্যে বাতিল অতীত
পুত্ররা কোমরে ছুরি পিতাদের খুঁজে বেড়ায় কপিল আশ্রমে
রমণীরা নিজেরাই ভগীরথ জন্ম দিতে পুংকেশর-নিরপেক্ষ রম্য গর্ভাধানে

হঠাৎ কানের কাছে ডেকে ওঠে পাখি
ঘুমের রাজত্বে হাঁটতে, হাঁটতে হাঁটতে, চটকা ভেঙে জেগে নত হয়ে
পথ থেকে তুলে নিই মহেঞ্জোদাড়োর নিউজপ্রিন্টে ভিয়েতনাম
…কত দিন যুদ্ধ চলে, হে কৌন্তেয়, কতকাল নদীগুলি সমানে বহেছে
শিশুর একপাটি জুতো, রমণীর চুম্বনবিদায়ী ওষ্ঠ, একলব্য পুরুষের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, বাহু,
পিতাদের প্রেম তবু হয়ে ওঠে শস্যবীজ মাটির ভেতরে,

মায়েদের জরায়ুতে গর্ভকোষ নড়ে ওঠে, যেখানে দুরন্ত শিশু
　　　বি-৫২ বোমারুর কষায় গন্ধক গন্ধে বাকি জুতো খোঁজে ক্যাসিলেজে

আর আমি নেফরেত্তির খোজার শহরে, পার্থ,
হাওয়াই শার্ট, টাই কলার, পাঞ্জাবির তলা থেকে উঠে আসা
প্রত্ন কঙ্কালের হাঁটা চলা দেখছি এক্স-রে স্ক্রীনে, ফাঁপা হাতগুলি
পার্কে পার্কে ফোয়ারা ও চষা ঘাস, টুসকি চুমো, কুলপি ও ফুটবল ম্যাচ
　　　　　　ঘিরে রাখতে গ্রীল-বালুস্ট্রেড

ঘর থেকে রাস্তা, যেন রহস্য পথিক এক পা
রাস্তা থেকে ঘর, যেন রহস্যপথিক এক পা
হে বীভৎস, হে শ্বেতবাহন, দেখছি নেফরেত্তির অলীক শহর ॥

তিনটি চতুর্দশপদী

অমিতাভ দাশগুপ্ত

লূ লূ শব্দে উলু দিতে ছুটে এল গোক্ষুর-নাগিনী,
দু-কানে দাক্ষীর দুল, রৌদ্রের জিহ্বায় চাটা মুখ,
দুধের বলক দেয়া স্তন দুটি রিরংসায় তুলে
ধরার প্রতীকে নারী বলেছিল : সমর্পণ করো।

আমিও উরস খুলে তাকে দিই নিজস্ব গোপন
মৃত মল্লিকার শব, কাফন-জড়ানো অন্ধকার
অপয়া যৌবন, ব্যর্থতার বই থেকে ছেঁড়া পাতা,
মুক্তা ব'লে ভ্রম হয়, এরকম কয়েকটি অঙ্গার।

শ্মশানের সব ছাই চণ্ডালের কলসে নেভে না
সব অপ্রেমের পরও লেখা হয় চৌর-পঞ্চাশিকা,
মদ্যে অধোমুখ সূর্য নেমে এলে ভস্ম খুঁটে খুঁটে
ভ্রমর-কৌটায় অস্থি নিয়ে ফেরে নষ্ট-চণ্ডালিকা ;

প্রেতের বিকল্প অগ্নি যখন বিন্যাসে থরো থরো,
খরার প্রতীকে নারী বলেছিল : সমর্পণ করো।

২

বল প'ড়ে ফাস্ট হচ্ছে। এসো, টানা ফরোয়ার্ড খেলি।
তেমন কুটিল ঘুরলে বাতাসের বিষাক্ত মোচড়ে
না হয় বিস্তৃত প্যাডে সব ক-টি উইকেট ঢেকে
ব্যাটের হৃদয়ে নেবো বোলারের রক্তিম ছোবল।

রানারের ক্রীজ্ থেকে অনর্থক ছোটাছুটি ক'রে
অকালে ভেঙো না তুমি রক্ত, শ্রম, মেধা-ঢালা খেলা,
আমাদের রান নেয়া, চমৎকার বোঝা-পড়া দেখে
তাবৎ দর্শক যেন ব'লে ওঠে : মডেল-দম্পতি !

সারাবেলা খেলে যাবো। সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের মতন
সর্বাঙ্গে ক্ষতের চিহ্ন দেগে দিক ক্ষুধিত বাম্পার,
কেন্দ্রে কিংবা পরিবেশে স্রোতগ বিস্তারে চিনি খুনী.
গুলির শব্দের প্রতি যেভাবে নিক্ষিপ্ত জাগুয়ার।
হাহাকার, মন্বন্তর অনায়াসে অস্বীকার করি
অকালে খেলার জুটি না ভেঙে অভ্রান্ত যদি থাকো।

৩

তুমি সবই জানো। জানে যুবতীকে যেমন সাবান,
ক অক্ষর থেকে তবু শুরু করি, প্রথম পাঠের
উপক্রমণিকা শেষে মূল গ্রন্থে যেতে বড় বেলা—
রাজ্যের মনীষা নিয়ে না কি অর্বাচীন-ই ভালোবাসো ?

আমি কালো যাদু জানি। প্রত্যাখ্যানে নির্ভয়-হৃদয়
পাপোশের তুল্য পেতে শুধু নম্র, দীনজন পারে
বিখ্যাত মগজ, মেধা থেকে ক্লোরোফিল শুষে নিতে,
আমার অ-বিদ্যা, মানে, পতঙ্গ-ভুকের শিল্প-রীতি।

স্তব্ধ হও, আর বেশি তর্কের জটিলে যেতে গেলে
ঐ রমণীয় মুণ্ড ঘোর ব্রাত্য ধুলোয় লুটোবে,
সহজে নিকটে এসো, জানো কি মৈত্রেয়ী, তুমি জানো
তোমারও গভীরে আছে আম-জাম-পিপুল ছড়ানো
বসত-বাটির ঘ্রাণ ? ভূষণ, অঙ্গদ খুলে খুলে
সন্নত হবে না তবু, যেভাবে জলের কাছে নারী ?

একমাত্র ফ্ল্যাশব্যাক

শিবশম্ভু পাল

আমি জাল দলিলে জ্ঞাতসারে সই করে
অবাধে হাঁটার মতো মাটি আর খোলাবাজারের সরু চাল
ইচ্ছেমতো কেনবার সামর্থ্য অর্জন করেছিলাম।
আমি স্মৃতি, শেষরাত্রির ফুরফুরে হাওয়া, বেলফুলের গন্ধের
যৌথ সংসারকে পথে বসিয়েছিলাম।
গোলমাল বন্ধ করার জন্যে ক্ষমতাসীন শান্তিরক্ষাবাহিনী
সশস্ত্র পাহারা দিচ্ছিল কলকাতা ও হৃদয়ের কতগুলো স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে
তাই রাজভবনের দিকে দুমাইল মৌনমিছিল বেরয়নি
বন্ধ করা হয়নি রেডিও থেকে আধুনিক গান
ঈশ্বরের পৃথিবীতে, মানিকবাবু যেমন লিখেছিলেন, শান্ত স্তব্ধতা।

সেইসব স্বাস্থ্যবান ফিটফাট টাইআঁটা প্রতিশ্রুতি
বলেছিল, সই করো এইখানে।
তাদের কণ্ঠস্বর চাপা, মেটালিক, টেপরেকর্ডে ধরা ভূতের রাজার মতো।
বলেছিল, সই করো, নয়তো লাশ ফেলে দেবো রেললাইনের ওপর।

কিন্তু এখন আমার বুকে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা
এখন আমি স্মৃতি, শেষরাত্রির ফুরফুরে হাওয়া, বেলফুলের সাদা লাশ
ছত্রাখান পড়ে আছে দেখতে পেয়েছি যাতায়াতের রাস্তায়
রামায়ণ মহাভারতের দেশ পর্যন্ত প্রসারিত রেললাইনের ওপর।

দেখে আমার বুক ফেটে যায়, নিদ্রা ছিঁড়ে যায় মাঝরাতে,
কথা বলতে পারছি না।
ক্রমাগত ঘুমের ভেতর থেকে, মাইনের খাম থেকে চোখের সামনে
ছিটকে আসে একটিমাত্র ফ্ল্যাশব্যাক :
আমি জ্ঞাতসারে জাল দলিলে সই দিয়েছিলাম।

চাবি হাতে

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

একদিন এ ঘরে অনেকেই আসত,
আমরা নিজেদের খুবই কাছে ছিলাম
সমস্ত মানুষ আমাদের খুব কাছে ছিল।

টিনের কৌটো উপচে পড়ে
স্তো পর্যন্ত টানা বিড়ির টুকরো,
সতরঞ্চির এদিক ওদিক ঘুমিয়ে পড়ে
তলানিশূন্য ভাঁড়,
হাতে হাতে ঘুরে বেড়াত অনমনীয় পাণ্ডুলিপি,
তারপর মধ্যরাত্রির গম্ভীর পাদপ এবং
তেজারতি স্বপ্নে উপবিষ্ট সিংহাসন তুচ্ছ ক'রে বন্ধুরা ফিরে যেত
রুপালি জলধ্বনির দিকে
জাগ্রত হৃদপিণ্ডগুলির খুব কাছে।

প্রতিপক্ষ ছিল তৃণবৎ, হঠাৎ গুলির শব্দে গজিয়ে উঠত
চোয়ালের হাড়, সমস্ত দরজা খুলে যেত—
কয়েকজন ছুটে যেত শব্দের উৎসে—
কয়েকজন প্রস্তুত থাকত—'প্রস্তুত' শব্দটি
রাত্রির দিগন্তে সরল নিরস্ত্র নিদ্রা ভেঙে গড়িয়ে যেত
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে,

প্রতিটি আঙুল ছিল লাঙলের ফণা,
হৃদয়—খরমধ্যাহ্নে খণ্ডিত তরমুজ।

তারপর দক্ষিণ থেকে হাওয়া এল—ইশারায় ভেসে গেল
মুর্শিদাবাদী আঁচল, এঁটো নোটের বাণ্ডিল, ময়ালচুক্তিপত্র—
আতরের গন্ধে ভ'রে উঠল সন্ধ্যা, টেনে নিলো বন্ধুদের—
রৌদ্রহীন অতল খাদের ভিতরে কৃষ্ণানবমীর চাঁদের মতো
তাদের শ্রেণীচ্যুত হাড়গুলো শুঁকে শুঁকে
অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সময়—তাদের
গাড়ল মাংসস্তূপ ঝুলে রইল পশ্চিমের উচ্ছিষ্ট-বারান্দায়—
মদ্যপ রোমরাজিতে, লোলুপ গম্বুজে, শীততাপনিয়ন্ত্রিত কশাইখানায়।

সমস্ত তৈজস পুড়িয়ে দিয়ে চাবি হাতে দাঁড়িয়ে আছি স্তব্ধ,
অম্লাত অন্তঃসারশূন্য ঘরে।
একে একে সমস্ত জানালা খুলে দেই, এই তো সময়, লৌহবৎ ফিরিয়ে
আনতে হবে
একটি শব্দকে—'প্রস্তুত' কারণ, আবার এই ঘরে হাতে হাতে ঘুরবে
সশস্ত্র পাণ্ডুলিপি, আবার বৈশাখী পূর্ণিমায় ঘুরে যাবে জলচরদের যাত্রাপথ
আগের চেয়ে আরও কর্কশ সতরঞ্চি, অনেক চওড়া আর তৎক্ষণাৎ
ধারালো ঘরের কথা মনে রেখে,
আমি চাবি হাতে অপেক্ষা করি, সতর্ক, কেননা আবার ভেসে আসবে
দক্ষিণের বুক ভেঙে-দেওয়া চুলের গন্ধ, এবং শৃঙ্খলিত সন্ধিপত্র
উঠে আসছে যে প্রখর তরুণ পদধ্বনি, আমি খুবই সতর্ক, তাদের জন্য
অনর্গল প্রতীক্ষা করি।

আমার অসুখ

অনন্ত দাশ

সবাইকে সুখী দেখতে চেয়ে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে আমার অসুখ
বিনিদ্র রাতের স্বপ্নে উড়ে যায় নিশাচর পাখি
যেন কোন প্রলয়ের আগে থমথমে আকাশ, কালো মেঘ—
বিদ্যুতে বকের ডানা নীল হয়ে যায়।

সময়, প্রতীক্ষাতুর ভিখারীর মতো,
উৎসব হনন করে চলে যাচ্ছে সূর্যাস্তের দিকে ;
আমি একবুক দুঃখের ভিতরে
নিরন্ন মাঠের কান্না শুনি
হা-ঘরে জ্যোৎস্নায় দেখি
ঊর্ধ্বমুখ শুয়ে থাকা ফুটপাথে সারিবদ্ধ মানুষের মুখ।

তাই এই হাতের ফাটলে ধরে আছি রুক্ষরাত, নিরাসক্ত দিন
বৃষ্টি-সম্ভাবনা নিয়ে চেয়ে থাকি আকাশের দিকে
সৃষ্টির অদম্য নদী বারংবার ছুঁয়ে যায় চোয়ালের হাড়
তবু যেন আসেনাকো নতুন উৎসার
যা দিয়ে ভরাব মাঠ, উজ্জ্বল আশার স্বপ্নে
ভরে উঠবে মানুষের ছিন্নমুখে হাসি

ক্রমশ উত্তাপ বাড়ে পারদের নলে
আমি তাই অনাবৃষ্টি, অক্ষমতা দূরের আকাশে ছুঁড়ে দিই
মানুষের মুখের ভিতরে নতুন জ্যোতিষ্ক খুঁজি
শোকের ভিতর থেকে শোকোত্তর আরেক প্রতিভা
কিংবা ঐ বত্রিশ গ্যালন জলে ডুবে থাকা চাঁদে
আমার আস্তানা খুঁজে পাই
আগামী রাতের ভোরে এ-মাঠে না-হলে বৃষ্টি
ডেকে আনব ক্রুদ্ধ বজ্রপাত।

খরা বিষয়ক

তরুণ সেন

মুঠোয় আয়ুধ ছিল, এখন কৌটোয় নীল বড়ি
ঘোরে ফেরে। নির্বিষ সাপের ফণা নিয়ে খেলে তল্লাটের বেকার বেদেরা
শ্মশান চাঁড়াল চণ্ড, টেনে নিচ্ছে বায়ুভুক ফুলের স্তবক
পথচারীদের কৃশ হাত থেকে, বেতারে ঘোষিত হ'ল খরা ও মড়ক,

'জল দাও' 'অন্ন দাও' বিধ্বস্ত তাঁবুর কাছে অভ্যস্ত ভিখারী

শোনা গেল কাল নাকি একটি বেদেনী এসে এ পাড়ায় দিয়ে গেছে
দারুণ চটক।

চারিদিকে শ্মশান-বান্ধব। কিছু সৎকার সমিতি। মশানের কাছে
ন্যাড়া গাছে কাক প্রাজ্ঞ, সুরসিক। নীচে ফেরিঅলা, বিক্রি
হচ্ছে ফুল, ধূপ। পিণ্ডের পশরা। দূরে দুয়েকটি শিমুল—
ওষ্ঠে ফিকে দাগ লালার, রক্তের। দূষিত ক্ষতের মতো গোষ্পদে
থকথকে জলধারা···

কাঁদছে কে, নাকি ঐ হলুদ আগুন ঝরা হাওয়ার ক্ষিপ্রতা,
সরমা এখানে ছিল? বলেছিল, সহে না, সহে না ··
এলোচুল, লাল পাড়ে সোনালী রোদের জরি, মাটির কলস,
স্বপ্নে বহুদূর নাকি? সোঁদা ঘ্রাণ, ঘামে ভেজা মাটি, কাঁকরে
পেশীর ক্রোধ, অযুত আয়ুধশালে বুকের হাপর, নির্মম পরুষ হাতে
কেঁপে উঠেছিল কোন প্রান্তরের সটান জঠর, ঘাসে রোমকূপে
শিশির স্বেদের কারুলিপি···ছিল কি···ছিল কি···
ঐ কার হাতে ক্ষীণ একতারা···কবে এসেছিল···কেউ নেই···
কেউ নেই···বেড়ে ওঠে প্রথামতো আদিম ধুতুরা, পাখির সংসারে
একা প্রবীণ চড়ুই, দেখে দেখে অঙ্কুরের কাছে আঁকা প্রহরী
করোটি কাকতাড়ুয়ার অসম্ভব উদাসীন···ঘর বাঁধো
ঘর বাঁধো ব'লে কার নিকনো উঠোন কবে পার হ'ল
মুস্কিল আসান—তার আজানু ভূষণে মিহি সাবেকী বুনোট
কালো সময়ের মতো···ঘুম নেই ঘুম নেই খরটান
মজ্জায়, মেধায় দূর পশ্চিমের দিকে বাজে মেঘের গাজন।

সহজ নয়

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

আগুন জেলে ঘর জ্বালানো
গ্রাম জ্বালানো
খুবই সহজ,

বুলেট ছুঁড়ে বুদ্ধিজীবী ছাত্র মারা
কৃষক বণিক দোকানী আর মজুর মারা
ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মারা
খুবই সহজ।

আগুন এবং বুলেট এবং নাপাম এবং
মাইন এবং ইত্যাদি সব
ঘর জ্বালাবার
মানুষ মারার
কায়দা কানুন
ফন্দি ফিকির
প্রয়োগ বিধি
সূত্রধারী প্রভুর কাছে শিক্ষামাফিক হকাহুয়া
পরম ভাবে।

সহজ বলেই
বাঙলাদেশে মানুষ মরে
সহজ বলেই
বাঙলাদেশে আগুন জ্বলে।
শুধুই কি আর আগুন জ্বলে
মানুষ মরে?

ঘর জ্বালালে ভস্ম থাকে,
　　　　স্মৃতি থাকে,
　　　　ভস্মচাপা বারুদ থাকে ,
ছুঁড়লে বুলেট মানুষ মরে স্বপ্ন থাকে,
　　　　বধ্যভূমির সাক্ষী থাকে
　　　　মৃতের লাশের স্মৃতি থাকে,
　　　　স্বপ্ন থাকে, বাণী থাকে ;

সহজে সেই মানুষ মারার
　　　　ঘর জ্বালাবার
সহজ কাজে মত্ত হলে
বাঙলাদেশে আগুন জ্বলে
　　　　মানুষ মরে
বাঙলাদেশে অবশেষে
অত্যাচারী শত্রু মরে ;

প্রিয়জনের লাশের শপথ
পোড়াঘরের ভিটের শপথ
অস্ত্রহাতে বাঙালিরা বাঙলাদেশে
　　　　শত্রু রোখে ;

বাঙলাদেশের সবুজ পটে
　　　　সূর্য ওঠে,
সহজে নয়,
লক্ষ শহীদ ভাইয়ের গাঢ়
রক্ত-স্নানের দুরন্ত অস্তিমে।

সোনার পাখি

আজীজুল হক

আমরাও ডাকি তার মগজের নিরিবিলি সবুজ নীড়ের
স্বকণ্ঠ পাখিকে,
কী মোহন যাদু তার সোনালী গলায়,
সুকুমার কারুকাজ কথার বুনটে।
এই পোড়া দেশে আর বোশেখের এমন খরায়
জানি কার ডাকে
সবুজ ঘাসের লোভে ছুটে আসে মায়াবী হরিণ ;
জানি কার হাত
শহর বন্দর গ্রামে, অফিসে দোকানে,
পার্কে জেটিতে গাঙে, ফাইলে মোড়কে,
সন্ধ্যার অ্যাভেন্যুয়ে, ঘরের দেয়ালে,
নরকরোটিতে,
রূপসীর পেটিকোটে, স্বদেশে বিদেশে
পাতি পাতি কী যে খোঁজে, কী বা তার কাজ।

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।

অতঃপর পৃথিবীতে মানুষেরা কী করে যে বাঁচে
অন্যথায়।
বাদশাহী চলে গেছে, উজ্জয়িনী কবে পলাতক,
গালিচায় ছারপোকা, ন্যাড়া শিরে আঁটে না মুকুট,
ষাঁড়ের আধিক্য পথে, পায়চারী করে চকিদার
যুঁইবনে, লালচোখ গানের সিপাই ;
জ্যামিতিক তলপেট নাচে
গোলাপী আলোয়, নাচে নর্তকীর মিশরী শরীর ;

পার্কে পাঁঠার দল, গান ছবি কবিতা বোঝে না
গবেট জনতা, অধিকন্তু কেবল চেঁচায় ;
রগচটা যুবকের ঝাঁক
সমবেত ঘুষি মারে তিলোত্তমা আর্টের পাঁজরে।
ক্রমাগত বিপন্ন পাখিরা,
অথচ কোকিল টিয়া আমাদের কতো প্রয়োজন।

স্মৃতি, তুমি নিরুদ্বিগ্ন লঘু পায়ে হাঁটো
খাড়া আছে সীমান্তে পাহারা,
যতো পারো হাসো তুমি স্বাধীন স্বাধীন
কান্নার ভার নেবে সময় স্বদেশ,
মিহি সুরে গান করো, গান করো গুণী,
অন্যথায় ছিঁড়ে যাবে গুণ।

যতক্ষণ রক্ত আছে আমাদের আয়ুর তলায়
ঝরাব তা অবশ্যই পাখিকে বাঁচাতে,
আমাদের পাঁজরের হাড়ের খাঁচায়
নিরাপদ ঘুম দেবো তাকে,
ক্ষুদ-কুড়ো দানা-পানি সব
চুমো খেয়ে ঠোঁটে তুলে দেবো,
আহা পাখি, সোনা পাখি, কোকিলেরা, ময়না টিয়ারা !

পুস্তক-পরিচয়

বিদ্যাসাগর। গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড। এগারো টাকা

এই অল্পদিন আগে আমাদের চোখের সামনে যে নতুন 'বাঙলাদেশ'-এর উত্থান ঘটল, তার প্রধান নির্ভর ছিল মধ্যবিত্তের আন্দোলন। এইটেই এর বৈশিষ্ট্য, আবার এইখানেই এর নিহিত দুর্বলতা। এই দুর্বলতা আছে বলেই এর ভবিষ্যৎ সংগঠন বিষয়ে আমাদের মনে খানিকটা অনিশ্চয়ের বোধ থেকে যায়। নতুন-জেগে-ওঠা মধ্যবিত্ত সমাজ কী ভাবে তার সম্পর্ক তৈরি করবে গোটা দেশের সঙ্গে, দেশের আসন্ন নির্মাণে তার ভূমিকা ঠিক কী ধরনের হবে, কতোটা আত্মসচেতন, এসব কথা আজ নিশ্চয় আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।

এদিক থেকে, 'বাঙলাদেশ'-এর একটা সহজ তুলনা আছে যেন উনিশ শতকের বাঙলায়। দেশভাগের পর পঁচিশ বছর জুড়ে ওখানে গড়ে উঠেছে এক নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যেমন একদিন গড়ে উঠেছিল গত শতাব্দীর বাঙলায়। 'বাঙলাদেশ'-এর সাম্প্রতিক অবস্থা একদিকে যেমন সেই পুরোনো বাঙলারই ঐতিহাসিক পরিণতি, অন্যদিকে কোনো কোনো অর্থে তা যেন সেই বাঙলারই সমান্তরাল তুলনা। তাই, গত শতাব্দীর বাঙালি সংস্কৃতিকে স্পষ্ট-ভাবে বুঝে নেবার বা তার পদক্ষেপের ভুলভ্রান্তিকে মোহহীন ভাবে বিচার করে নেবার কাজটা ওদেশের পক্ষে আজ দ্বিগুণ মূল্যবান।

তবে এই ধরনের বিচার-পুনর্বিচারের সময়ে একটা খুব বড়ো ভয় থেকে যায়। অনেক সময়েই এমন হয় যে আমরা আমাদের সমকালীন আশাভঙ্গ বা ব্যর্থতার পুরো দায়টা চাপিয়ে দিতে চাই পিতৃপুরুষের ওপর, আর এইভাবে হয়তো নিজেদের অনেকটা হালকা আর দায়মুক্ত বোধ করি। ব্যক্তিগত জীবনেও এই অভিযোগপরায়ণতার ব্যাধি এখন যেমন প্রকট, তেমনি সামাজিক জীবনে। এই কারণেই মর্মরমূর্তির মুণ্ডচ্ছেদ আমাদের কাছে বিপ্লবের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়, অথবা পুরোনো মনীষীদের চরিত্রহননটা হয়ে ওঠে আমাদের বুদ্ধি-জীবীদের সময় কাটানো ফ্যাশান। রামমোহন বা বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই অতিমানব ছিলেন না, তাঁদের মানবসুলভ স্খলনের পরিচয়

দেওয়া অথবা তার বিচার করা অবশ্যই পণ্ডিতজনের যোগ্য কাজ। কিন্তু এই বিচারের সময়ে আমরা যেন আমাদের পরিপার্শ্ব বা ইতিহাসের বোধ থেকে ভ্রষ্ট না হই, সেদিকে লক্ষ্য থাকা ভালো।

গোলাম মুরশিদ সংকলিত 'বিদ্যাসাগর' বইটি পড়তে গিয়ে এসব কথা মনে হল। এই সংকলনে এমনি এক পুনর্বিচারের আয়োজন কাজ করছে বলে বোঝা যায়। এর লেখকেরা 'বাঙলাদেশ'-এর বাসিন্দা এবং অনেকেই নিতান্ত তরুণ-বয়স্ক। ফলে আমাদের আগ্রহ আরো বেড়ে যায়, জানতে ইচ্ছে হয় ওদেশের এই তরুণ বুদ্ধিজীবীরা কীভাবে তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কাজে লাগান বিদ্যাসাগরকে, কীভাবে তাঁরা তুলনা খোঁজেন বিদ্যাসাগরের কাজকর্মের সঙ্গে নিজেদের দায়দায়িত্বের, অতীতের সঙ্গে কীভাবে তাঁরা মেলান তাঁদের বর্তমানকে।

প্রবন্ধগুলিতে সে-রকম প্রত্যক্ষ যোগ দেখানোর চেষ্টা অবশ্য সব সময়ে ততো জোরালো নয়। নিজেদের পথ খুঁজবার আয়োজন হিসেবে অতীতকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা স্পষ্ট নয় তেমন। মযহারুল ইসলাম চকিতে একবার উল্লেখ করেন বটে, "আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের দিকে তাকালে তাদের দুর্বল চরিত্রের ছায়া আমাকে সর্বদাই অস্থির করে তোলে" (পৃ ১৮২) আর এরই প্রতিতুলনায় তিনি দেখতে চান "বিদ্যাসাগরের প্রোজ্জ্বল আলোক" (পৃ ১৮৩), কিন্তু এসব কথা প্রায় ক্ষিপ্র মন্তব্যেই অবসিত হয়ে যায়, কোনে পারস্পরিক বিশ্লেষণের ঝুঁকি আর নেন না লেখক। অথবা, দু-চারবার দ্রুত উঠে আসে মুসলিম সমাজের কথা। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক জীবনে মুসলিম পুনর্জাগরণ কেন ঘটল না তেমনভাবে, স্যর সৈয়দ আহমদ বা নবাব আবদুল লতিফের ভূমিকা কীভাবে এই সমাজকে টান দিচ্ছিল পিছন দিকে, আহমদ শরীফ বা আলী আনোয়ার তার কোনো বিস্তারিত বিবরণ দেন না, এসব কাজকর্মের ফলাফল কীভাবে আধুনিক কাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে সেটাও আর বিচার করে দেখেন না তাঁরা।

অর্থাৎ, স্বদেশ আর স্বকালকে সরাসরি হাজির করা হয় নি এসব আলো-চনায়। আমরা কেবল ধরে নিতে পারি যে সেই চেতনা কাজ করছে পশ্চাৎপটে, আত্মবিশ্লেষণের এই পরোক্ষ উৎসাহ থেকেই নিশ্চয় তাঁরা ফিরে তাকাচ্ছেন বিদ্যাসাগরের দিকে। তাই ভূমিকায় যখন পুরোনো জীবনীকারদের বিষয়ে সম্পাদক অভিযোগ করেন যে "যে ইতিহাস ও সমাজচেতনার অধিকারী

হলে চিন্তার আচ্ছন্নতা কাটিয়ে তাঁরা বিদ্যাসাগরকে দেখতে পেতেন তাঁর যথার্থ রূপে, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়—কিন্তু দেশ ও কালের পটভূমিকায় স্বাভাবিক —এই লেখকদের তা আংশিক মাত্র ছিল" তখন আমরা আশা করি যে অন্তত এই সংকলনের লেখকেরা সেই ইতিহাস ও সমাজচেতনার সম্পূর্ণ অধিকারী হবেন, আশা করি যে সেদিক থেকেই বিদ্যাসাগর-চরিত্রকে এখানে পুনর্বিবেচিত দেখতে পাব।

সে আশা একেবারে ব্যর্থ হয় না অবশ্য। সংকলনের অন্তত আটটি প্রবন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোটা পটভূমিকে উপস্থাপন করবার চেষ্টা আছে, আর সেই পটভূমিতে বিদ্যাসাগরের সাফল্যের সীমা নির্ধারণ করবার কল্পনা আছে। সম্পাদক যে বলেন, প্রবন্ধকারদের মধ্যে কখনো-কখনো মতভেদও দেখা যায়, সেটা সুখেরই বিষয়। বদরুদ্দীন উমর যদি বলেন যে "এজন্যেই তাঁর চিন্তার মধ্যে কোনো বৈপ্লবিক সম্ভাবনাও থাকে নি" (পৃ ১৪), গোলাম মুরশিদ তাহলে লিখতে পারেন যে "তাঁর চিন্তা ও কর্ম ছিল রীতিমতো বৈপ্লবিক" (পৃ ২২৭)। অবশ্য এই দুই লেখকের একজনও জানান নি যে বৈপ্লবিক' শব্দে তাঁরা ঠিক] কী বোঝেন। তাই এমন হতেও পারে যে এটা বাস্তবিক কোনো মতভিন্নতা নয়, কথা বলবার ভঙ্গির প্রভেদ মাত্র। বিশেষত ওই একই প্রবন্ধে গোলাম মুরশিদকে বলতে শুনি যে "সংস্কার বিষয়ে তিনি মূলত রামমোহনের পথ বেছে নিয়েছিলেন" (পৃ ২২৬) অথবা "বিদ্যাসাগর সংস্কারের ধীর পন্থার দ্বারা তাঁর বৈপ্লবিক ধ্যানধারণাকে মূর্ত করতে চেয়েছিলেন" (পৃ ২২৭)। একথা বললে হয়তো বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে তাঁর খুব একটা মতভেদ আর থাকে না। বস্তুত, বলবার ভাষায় খানিকটা হেরফের থাকলেও, এই সংকলনের প্রবন্ধগুলিতে লেখকদের সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত প্রায় একই রকম। যেমন:

> "বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি সমাজকে ছাড়িয়ে আর একটু প্রসারিত হয়ে দেশ এবং শাসন ও শোষণের দিকে অগ্রসর হলে তাঁকে অতুলনীয় প্রগতিবাদী বলে আখ্যায়িত করা যেত। দৃষ্টির সেই প্রশস্ততার অভাবে, তিনি শুধু মানবপ্রেমিক ও মানববাদী হয়েই রইলেন, মানুষের মুক্তির সন্ধান দিতে পারলেন না।" (গোলাম মুরশিদ)

> "তিনি কাঁচা কলা পাকাতে চেয়েছেন তাই ব্যর্থতাই বরণ করতে হলো তাঁকে।" (আহমদ শরীফ)

"কালগঙ্গা বিদ্যাসাগরের বিপুল ব্যর্থতাকে পরম শ্রদ্ধায় ভবিষ্যতের ঘাটে বয়ে নিয়ে চলে।" (সনৎকুমার সাহা)

"তাঁরও ক্ষমতা অসীম নয়—স্বাভাবিক দূরপ্রসারী ঘটনাপ্রবাহে তিনি বেগের সঞ্চার করতে পারেন···কিন্তু তাকে রোধ করতে পারেন না···। এখানেই ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা ও তার পরাজয়।" (আলী আনোয়ার)

"কৃষকস্বার্থের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো বক্তব্য উপস্থিত না করলেও তার প্রতি ঔদাসীন্যই তাঁর চিন্তার একটা বিশেষ পরিধি নির্দিষ্ট করে। এবং এই পরিধিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূল্যায়নে সঠিকভাবে বিচার ও বিবেচনা করা প্রগতিশীল চিন্তার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।" (বদরুদ্দীন উমর)

আসলে এঁরা দেখাতে চান যে বিদ্যাসাগর সমকালীন জীবনযাপনের নানা সমস্যা দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন বটে—তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রবল ও স্বাতন্ত্র্যময়—কিন্তু প্রায় কখনোই তিনি পৌঁছতে পারেন নি সংকটের মূল পর্যন্ত, তাঁর হাতে ছিল না কোনো সামাজিক মুক্তির সন্ধান। কথাগুলি যে একেবারে নতুন তা নয়, গত শতকের ক্রিয়াকর্মে এই সীমাবদ্ধতা এবং স্ববিরোধ বেশ-কিছুদিন ধরেই আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছে। কথাগুলি নতুন নয়, নতুন হয়তো এর ঝাঁঝটা। সেটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে এই কারণে যে 'ব্যর্থতা' প্রসঙ্গে আলোচনা এখানে অনেক সময়েই ধীর এবং যুক্তিসংগত নয়, ধারালো কিছু শব্দক্ষেপ মাত্র। বদরুদ্দীন উমরের সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি কেবলই মন্তব্যময়, গোলাম মুরশিদ তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধের একেবারে শেষ কয়েকটি লাইনে হঠাৎ তুলে আনেন ব্যর্থতার কথা, সনৎকুমার সাহার লেখা নানা দিক থেকে ঈষৎ উদ্‌ভ্রান্ত। এই সংকলনের লেখকদের 'ইতিহাস এবং সমাজচেতনা' সম্পর্কেও ভাবিত হয়ে পড়ি আমরা, যখন একদিকে শুনতে পাই এ-রকম উচ্ছ্বাস "যেদিন তিনি আরশোলা গলাধঃকরণ করেছিলেন সেদিনই বোঝা গেল কত বড়ো মানববাদী তিনি, কত গভীর তাঁর মানবিকতা" (আহমদ শরীফ, পৃ ৪) আর অন্যদিকে যখন জানি যে মেট্রোপলিটান স্কুল ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যাসাগর না কি হয়ে উঠেছিলেন "সামাজিক অপকর্মের অন্যতম নায়ক" (সনৎকুমার সাহা, পৃ ৯৮)।

সামাজিক বিকাশের একটা পর্যায়ে মধ্যবিত্তের জাগরণও যে তাৎপর্যময় ছিল, সনৎবাবুরা সাময়িকভাবে সেকথা ভুলে যান মনে হয়। এই ভুল থেকেই আলোচনার ঝোঁকটা পড়ে বারে বারে এইটে দেখানোর দিকে যে বিদ্যাসাগরের

কাজকর্ম কৃষকসমাজের সঙ্গে জড়ানো ছিল না। এই ভুল থেকেই বিধবাবিবাহ নিয়ে এমন মন্তব্য সম্ভব হয় যে বিদ্যাসাগর "ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন, তাঁর জীবনের "সর্বপ্রধান সৎকর্ম" এই কথাটাই যেন মনে করিয়ে দেয়" (পৃ ৯৭)। শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁর "সর্বপ্রধান কীর্তি নিঃসন্দেহে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন" (পৃ ৯৭) অথচ এ কীর্তি তো লেখকের মতে অপকীর্তি! এই বইতেই বহুবার বলা হয়েছে এসব তথ্য যে শিক্ষার কলে তৈরি করা একছাঁচের মানুষগুলি সম্পর্কে কতোখানি বিরক্ত ছিলেন বিদ্যাসাগর, অথবা যে-বিদ্যা আধুনিক জীবনের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য নয় তাকে সরিয়ে দেবার কতোটা আয়োজন করেছিলেন তিনি; এই বইতেই বলা আছে যে কয়েকজন পণ্ডিত তৈরি করাই তাঁর মূল অভিপ্রায় ছিল না, শিক্ষা তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন ব্যাপক সাধারণ্যে, তাই গ্রাম-গ্রামান্তরে ইস্কুল খুলবার জন্য ছুটতে হয় তাঁকে, ভাবতে হয় সহজপাঠ্য বই লিখবার কথা; লেখাপড়া-জানা শহুরে বাবুদের তুলনায় তাঁর অশিক্ষিত সাঁওতালেরা ভালো, এই বিবেচনায় জীবনের শেষ পর্বটা তাদেরই সেবা ও সাহচর্যে কাটানোর কাহিনীও এই লেখকেরা জানেন। কিন্তু মনে হয়, এই তথ্যগুলির সংগত যোগাযোগ করে নেন না তাঁরা। ভাবেন না, কেন মাতৃ-ভাষা নিয়ে এতোটা ভাবতে হয়েছিল বিদ্যাসাগরকে, বলতে হয়েছিল "it is by this means alone that the Condition of *the mass of people* can be ameliorated" (দ্র° করুণাসাগর বিদ্যাসাগর: ইন্দ্রমিত্র, পৃ ৭৪৬)। ভাবেন না, কেন সারস্বত সম্মিলনীর প্রস্তাব শুনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বলেছিলেন তিনি "বড়ো বড়ো হোমরাচোমরা লোকদের ইহার মধ্যে লইও না—তাহা হইলেই সব মাটি হইয়া যাইবে" (দ্র° জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি: বসন্ত-কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ ১৮২)। চারদিকে যে নানা সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছিল তার থেকে অনেকটা দূরে থাকতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, এটা লক্ষ্য করেন লেখকেরা। কিন্তু হয়তো ততোটা ভাবেন না এই অসহযোগের তাৎপর্য। এমন নয় তো যে সেই দূর কালে বসে বিদ্যাসাগরই এক প্রধান ব্যক্তি যিনি টের পাচ্ছিলেন 'ভদ্রলোক'দের গোলমাল? এমন নয় তো যে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন কীভাবে সঙ্ঘ-সমিতিতে দেশের সঙ্গে যোগহীন একটা সম্প্রদায় তৈরি হয়ে উঠছে, দেখা দিচ্ছে একটা কায়েমী স্বার্থের সূচনা? এই সব প্রশ্নের দিক থেকে ভাবলে হয়তো একটা ছকেবাঁধা প্রগতির ধারণা দিয়ে বিচার করতে চাইতাম না তাঁকে, অথবা বলতে হতো না এই ধরনের হেঁয়ালি-

কথা: "কালগঙ্গা বিদ্যাসাগরের বিপুল ব্যর্থতাকে পরম শ্রদ্ধায় ভবিষ্যতের ঘাটে বয়ে নিয়ে চলে।" বিপুল ব্যর্থতাকে এতোটা শ্রদ্ধা করবার কী কারণ আছে তা বোঝা যায় না ভালো, আর ভবিষ্যতের ঘাটে ঘাটে তাকে বয়ে যেতে দিলে নিশ্চয় খুব মুশকিলেই পড়ব আমরা।

এই ধরনের কথার মধ্যে দ্বিধাময় একটা অস্থিরতাই আছে। এ অস্থিরতা আবার কখনো কখনো তথ্যগত বিভ্রমেরও কারণ হয়ে ওঠে। আহমদ শরীফ লিখেছেন, "আঠারশ সত্তর সালের দিকে পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রেও তিনি একক নন, তাছাড়া বিধবাবিবাহ কিংবা বহুবিবাহের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রয়াস তখন ব্যর্থ ও অতীতের দুঃস্বপ্ন মাত্র" (পৃ ৬)। তাহলে আর তাঁর কোন কীর্তি গৌরবময় হয়ে রইল, এই প্রশ্ন তুলছেন লেখক। এই প্রশ্নের কথা যদি আপাতত ছেড়েও দিই, আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে, ১৮৭০ সালের দিকেই কেমনভাবে বিদ্যাসাগরের কাছে সবকিছু 'দুঃস্বপ্নমাত্র' বলে বোধ হল। বহুবিবাহ নিয়ে লেখা বইয়ের খণ্ড দুখানি ছাপাই হয়েছে ১৮৭১ আর ১৮৭৩ সালে। আর, অন্তত ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত এসব সংস্কারকীর্তি নিয়ে বিদ্যাসাগরের কর্মিষ্ঠ উৎসাহের যথেষ্ট প্রমাণ তাঁর চলতি জীবনীগুলির মধ্যেই ছড়ানো আছে। এসব চলতি বই যে তাঁরা ব্যবহার করেন না তা নয়, কখনো কখনো হয়তোবা একটু বেশি মাত্রাতেই করেন। এখানে র‍্যালফ লিণ্টন বা ফ্যানি পার্কস-এর উদ্ধৃতিও ব্যবহার করা হয় বিনয় ঘোষের বই থেকে, অথবা রবীন্দ্রনাথের সেই "বহমান কালগঙ্গা"র উপমাকেও টেনে নেওয়া হয় অনেক দূর, বিনয় ঘোষের মতোই। অথবা অস্থিরতাবশে গোলাম মুরশিদ হঠাৎ যখন এ-রকম প্রশস্তি করে বসেন, "বিদ্যাসাগরের মানবিকতা সমকালীন য়ুরোপীয় দর্শনের তুলনায় পশ্চাৎপদ তো নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রেই প্রাগ্রসর। কেননা তাঁর মানবিকতা বিশুদ্ধ মানবিকতা, সে আদর্শ মোটেই ঈশ্বরনির্ভর নয়" (পৃ ২২৬), তখন একেবারে বিহ্বল বোধ করি আমরা। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে বিদ্যাসাগরের সমকালীন ইয়োরোপীয় দর্শন হল নিতান্তই ঈশ্বরনির্ভর এক মানবিকতা? আবার অন্যদিকে, আলী আনোয়ার দুঃখ করেন যে "তাঁর শিক্ষাদর্শন বিস্তারিত ভাবে তিনি আলোচনা করে যান নি" (পৃ ২৮)। এটা বলা কি ঠিক? সংস্কৃত কলেজ বিষয়ে তাঁর ১৮৫২ সালের নোট, ব্যালান্টাইনের রিপোর্ট বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত মতামত, ময়েটকে লেখা তাঁর চিঠি, গভর্মেণ্টের আণ্ডার-সেক্রেটারিকে জানানো তাঁর মাতৃভাষাবিষয়ক পরিকল্পনা—এসব থেকে তাঁর

শিক্ষাদর্শনের পুরো চেহারাটাই কি আমরা পেয়ে যাই না ?

তবুও, এইসব টানাপোড়েনের মধ্যে, এই সংকলনে আলী আনোয়ারই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সুবিন্যস্ত আলোচনা করেন। তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও ব্যক্তির সীমানা' প্রবন্ধটিকেই বলা যায় এ-বইয়ের লক্ষ্যবিন্দু; অন্য সবাই যেখানে পৌছতে চেয়েছেন, আলী আনোয়ার জানেন সেখানে পৌছে দেবার পথ। স্তরে স্তরে প্রশ্ন তুলে আর তার মীমাংসা করে এগিয়ে যান এই লেখক। সমকালীন বাঙলার ইতিহাস বিচার করে তিনি দেখান যে বিদ্যাসাগর একেবারে মৌলিক চিন্তানায়ক ছিলেন না, জনশিক্ষা নারীশিক্ষা বা বিধবা-বিবাহের ভাবনা তাঁর জন্মের আগে থেকেই জাগছিল দেশে। কিন্তু "গভীরভাবে বোঝার, ভাবার ও দেখার ক্ষমতায়", বাস্তববোধ এবং তৎপরতায়, সাহস এবং আত্মবিশ্বাসে সেই আদর্শগুলিকে তিনি এগিয়ে নিতে পেরেছিলেন অনেকদূর, "এই পথিকৃত্বেই তাঁর গৌরব বা ক্ষমতা" (পৃ ৩৪)। আলী আনোয়ার ঠিকই লক্ষ্য করেন যে বিদ্যাসাগর "সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যক্তিচরিত্রের নির্মাণের দ্বারা আগাগোড়াই নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন" (পৃ ২৮) কিন্তু সেইখানেই তাঁর সীমাবদ্ধতা। হয়তো এইখানেই ছিল বিদ্যাসাগরের কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার যোগ, বিদ্যাসাগরের এই "বস্তুতান্ত্রিক সার্বভৌমত্বের ওপরে ব্যক্তিত্বের জয়"ই (পৃ ৩৪) হয়তো রবীন্দ্রনাথকে পৌছে দিতে পারে সমাজবিষয়ে তাঁর 'আত্মশক্তি'র ধারণায়।

'বিদ্যাসাগর' সংকলনটিতে আরো কয়েকটি প্রবন্ধ আছে তাঁর সাহিত্যচর্চা বিষয়ে। লেখাকটি ভালো, কিন্তু বইটির পরিকল্পনার দিক থেকে এই রচনাগুলি খুব একটা মানাচ্ছে না এখানে। সামাজিক পুনর্বিচারের কাঠামোর উপর সাজিয়ে নিয়ে তাঁর রচনাবলির বিচার করা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু কার্যত তা হয়ে ওঠে নি। দুটি লেখায় (শকুন্তলা ও সীতার বনবাস : মুখলেসুর রহমান। ভ্রান্তিবিলাস : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী) আছে তুলনায় বিচার, শেক্‌সপীয়র বা ভবভূতি-কালিদাস থেকে কোথায় বিদ্যাসাগর ভিন্ন হয়ে যান অনুবাদে, তার বিবরণ। 'একজন বিপন্ন মহাকবি ও তাঁর বন্ধু' প্রবন্ধে মধুসূদন-বিদ্যাসাগর কাহিনীর সম্পূর্ণ বিবরণ সাজান আবু হেনা মোস্তফা কামাল। একটি অল্প-আলোচিত সম্ভাবনাময় প্রসঙ্গ তুলে আনেন গোলাম মুরশিদ, 'বিদ্যাসাগরের

রচনায় রঙ্গব্যঙ্গ'। এই প্রসঙ্গটি যেন বিদ্যাসাগর-চরিত্রের স্বতন্ত্র একটি দিক উদ্ঘাটন করতে পারে। তবে, গোলাম মুরশিদের ব্যবহৃত উদাহরণগুলি সব সময়ে হয়তো নিরাপদ ছিল না। জন্মকাহিনীতে এঁড়ে বাছুরের সঙ্গে নিজের তুলনা, অথবা মধুকর নিয়ে শকুন্তলার ব্যতিব্যস্ত উক্তি, কিংবা বেতালের গল্পে স্বৈরিণী জয়শ্রী বলছে "ঐ হৃদয়চোর ব্যক্তির সহিত সংঘটন করিয়া দাও" : এসব যে রঙ্গব্যঙ্গেরই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, সে-বিষয়ে সকলে হয়তো একমত হবেন না।

আমাদের এখানে বইটি এখন সহজেই পাওয়া যাবে। কেননা, প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই এর একটি নতুন সংস্করণ ছেপেছেন বিদ্যোদয় লাইব্রেরি। এই সংস্করণের ফলে, সম্পাদকের মতো আমরাও মনে করি, "বিদ্যাসাগরকে পূর্ব বাঙলার জনগণ যে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছেন তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের পরিচয় হতে পারবে এবং এই পথে হয়তো পূর্ব ও পশ্চিমের নিকটতর যোগসূত্র রচিত হবে।"

শঙ্খ ঘোষ

বিবিধ প্রসঙ্গ

রামমোহন রায়ের একটি পত্রিকার দেড়শো বছর

রামমোহন-জন্ম-দ্বিশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর একটি পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী'র দেড়শো বছর নিঃশব্দে পূর্ণ হয়েছে। বহুদিন আগে লুপ্ত এই পত্রিকাটির কথা অনেকেই হয়তো বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু একদা বাঙলা সংবাদপত্রের উষালগ্নে 'সম্বাদ কৌমুদী' একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এটি কার্যত ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত প্রথম দেশীয় সংবাদপত্র। এর আগে অবশ্য ১৮১৮ সালের মে মাসে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বঙ্গাল গেজেটি' বেরিয়েছিল। কিন্তু এর আয়ুষ্কাল ছিল স্বল্প।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেরেস্তাদারের কাজ ছেড়ে আসবার পর রামমোহন রায় ১৮১৫ সাল থেকে কলকাতায় পাকাপাকি বসবাস শুরু করেন। তিনি সাময়িক সমস্যাবলী ও দেশের মানুষের স্বার্থ সম্পর্কে পরিপূর্ণ সজাগ ছিলেন। তখন থেকেই তিনি বুঝেছিলেন, দেশবাসীকে বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াকি-বহাল রাখবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম সংবাদপত্র। তাই শুরু হল তাঁর ইস্তাহারযোগে প্রচারকার্য। একই সময় খ্রীষ্টান মিশনারীরা দুটি বাঙলা সাময়িকপত্র 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' এবং একটি ইংরেজী পত্রিকা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রকাশ করলেন। এই পত্রিকাগুলির মিশনারীরা খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতে শুরু করলেন। এছাড়া 'সমাচার দর্পণ'-এর 'প্রেরিতপত্র' স্তম্ভে তাঁরা হিন্দু ধর্মের যুক্তিহীনতা প্রতিপন্ন করার ও কুলীনদের কটাক্ষ করার প্রয়াস চালাতে লাগলেন। তাই একটি বাঙলা সংবাদপত্রের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হল। ঠিক একই কারণে রাজা রামমোহন রায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় কলুটোলানিবাসী তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সংবাদ-সাপ্তাহিক প্রকাশে উদ্যোগী হলেন।

১৮২১ সালের নভেম্বর মাসে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বলিত

একটি প্রচারপত্র (Prospectus) মুদ্রিত হয়। পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে "উৎসাহীদের সাহায্য ও আনুকূল্য" প্রার্থনা করা হয়।

'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রকাশ উপলক্ষে 'Calcutta Journal'-এর ২০ ডিসেম্বর সংখ্যায় (পৃ ৫১৯) 'বিদ্বান হিন্দুর সম্পাদনায় একটি দেশীয় পত্রিকার জন্ম' ('Establishment of a Native Newspaper, edited by a learned Hindoo') শীর্ষক সম্পাদকীয়, পত্রিকাটির প্রসপেক্টাসের একটি কপি ও 'বঙ্গীয় পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন' প্রকাশিত হয়।

২২এ ডিসেম্বর 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদক লিখেছেন—"সম্বাদ কৌমুদী। এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী এক বাঙ্গালি সমাচারপত্র মোং কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পর্যন্ত ছাপা হইয়াছে ইহাতে আমরা অধিক আহ্লাদপ্রাপ্ত হইয়াছি যেহেতুক দর্পণ বল কিম্বা কৌমুদী বল অথবা প্রভাকর বল যাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রানসীমা বিস্তার হয় তাহাতে আমরা তুষ্ট…"

'সম্বাদ কৌমুদী'র ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বঙ্গীয় পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন'-এ স্পষ্ট করে জানানো হয়, ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক আলোচনা, অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী, দেশ-বিদেশের সংবাদ ও জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ—এক কথায় লোকহিত সাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য। পত্রিকার শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হত :

"দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটাস্থিতং
রবি না ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ॥"

প্রথমে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রতি মঙ্গলবারে প্রকাশিত হত। ১৬শ সংখ্যা (১৬ মার্চ ১৮২২) থেকে মঙ্গলবারের বদলে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হত। এই সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে সম্পাদক হলেও কার্যত পত্রিকাটির পরিচালক, উদ্যোক্তা সবই ছিলেন রামমোহন। এর প্রতি সংখ্যাতেই তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হত।

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশের ভিত্তি ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। তাই এই পত্রিকা প্রকাশের শুরুতে ভবানীচরণের মতো গোঁড়া হিন্দু ও রামমোহনের মতো উদারনৈতিক—উভয় অংশই যুক্ত ছিলেন। অচিরেই উদার চিন্তার

সঙ্গে মতান্ধতার সংঘাত শুরু হল। পত্রিকার রচনাদির মধ্যেও এর প্রতিফলন ঘটে। এক সময় মতবিরোধ চরম পরিণতি লাভ করে। ভবানীচরণ সাপ্তাহিকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন। পত্রিকা প্রকাশের "দুই তিন মাস গতে দত্তজের এক সুসন্তান শ্রীযুত হরিহর দত্ত এই কাগজের এক সহকারী হইলেন ইহাতে তাঁহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছা প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার কটাক্ষ করা মত এজন্য তাঁহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি ঐ কাগজ প্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্মহানি এবং হিন্দুসমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী ত্যাগ করিয়া ঐ সালের ফাল্গুনে চন্দ্রিকা নামক কাগজের সৃষ্টি করেন ইহাতে কৌমুদী ও চন্দ্রিকায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল।" ১৩শ সংখ্যা (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২) পর্যন্ত ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রকাশক ছিলেন।

'সম্বাদ কৌমুদী'তে সম্পাদক রূপে ভবানীচরণের নাম প্রকাশিত হওয়ায় ও বহু লেখায় তাঁর নাম থাকায় তিনি পাঠকদের মধ্যে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাই তিনি 'সংবাদ চন্দ্রিকা' প্রকাশ করায় বহু গ্রাহক 'কৌমুদী' ছেড়ে দিল। তাছাড়া সে যুগে বিধবা বিবাহের সপক্ষে মত প্রকাশ করায় গোঁড়া হিন্দুরা অত্যন্ত চটে গিয়েছিল। এক সময় অবস্থা এমন হল যে পত্রিকাটির অস্তিত্ব বজায় রাখা দায় হয়ে উঠল।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর তাঁর সহকারী হরিহর দত্ত পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সক্রিয় সমর্থন সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে 'কৌমুদী'র পথ চলা শুরু হল। ১৮২২ সালের মে মাস পর্যন্ত হরিহর দত্ত পত্রিকাটি চালালেন। কিন্তু দেশীয় পাঠকবর্গের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া না পেয়ে তিনিও অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনিও পত্রিকা ছাড়লেন। তারপর এলেন গোবিন্দচন্দ্র কোঙার। তিনি শাঁখারীটোলায় থাকতেন, সামরিক বোর্ডে করণিকের কাজ করতেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৮২২ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সাপ্তাহিকটি কোনোক্রমে টিকে রইল। ঐ বছর দুর্গাপুজোর ছুটির ঠিক আগে 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রকাশ প্রথম বন্ধ হল।

সবাই ভাবল 'সম্বাদ কৌমুদী'র মৃত্যু হল। একটি উদারনৈতিক পত্রিকার যখন এই অবস্থা তখন খ্রীষ্টান মিশনারীদের 'সমাচার দর্পণ' ও গোঁড়া হিন্দুদের 'সংবাদ চন্দ্রিকা' বাজার গরম করে রেখেছে। এই অবস্থায় 'কৌমুদী'র

পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হল। ১৮২৩ সালের এপ্রিল মাসে এটি আবার নব কলেবরে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। জোড়াসাঁকোর ৮৯ নং ভবন থেকে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ করবার জন্য নতুন আইন মতে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। এবার সম্পাদক হলেন আনন্দচন্দ্র মুখার্জি। প্রকাশক ও মুদ্রকরূপে গোবিন্দচন্দ্র কোঙারের নাম ছাপা হল। ১৮৩০ সালের জানুয়ারি থেকে 'সম্বাদ কৌমুদী' অর্ধ-সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে।

নবপর্যায়ে 'কৌমুদী' প্রকাশিত হবার পর রামমোহন বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পত্রিকাটিতে লেখা শুরু করেন। ভারতীয় স্বার্থ বিরোধী বৃটিশ আইন-কানুনের বিরুদ্ধে তিনি প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। ১৮২৫ সালে East India Jury Bill গৃহীত হল। এই বিলে নির্দেশিত ছিল, শুধুমাত্র খ্রীষ্টানদের সমন্বয়ে 'গ্রাণ্ড জুরি' গঠিত হবে। ভারতীয় বিচারকদের কোনো স্থান এতে ছিল না। রামমোহন এই আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। 'কৌমুদী'র ১৮২৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর সংখ্যায় তিনি জুরি বিলের কঠোর সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিচারকদের সমন্বয়ে সাধারণ বিচারক-মণ্ডলী গঠন করা উচিত।

'সম্বাদ কৌমুদী' সেযুগের তিনটি বাঙলা সংবাদপত্রের তুলনায় নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল ছিল। নতুন যুগের উন্মেষশালী চিন্তার ছাপ ঐ পত্রিকায় বিধৃত ছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জাতীয় অগ্রগতির বিষয়সমূহ 'কৌমুদী'তে স্থান পেত। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ১৯৩৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় 'Raja Rammohan's services to the press' শীর্ষক একটি নিবন্ধ লেখেন। তিনি ঐ নিবন্ধের এক অংশে লিখেছেন :

The Kaumudi's contents embraced·· such items as the following :—An appeal to the Government to establish a native charity school—The advantage of newspapers to natives—The propriety of a subscription of watering Chitpur Road—Ridicule of those wealthy Bengalees who never give any money on charity, but on their death immense sums are lavished—An appeal to the Government to grant more ground for a 'ghat', the Christians having such a space for burrials—An appeal to Govt. to prohibit the export of rice, the chief article of Indian food—A remonstrance against

furious driving by Europeans in the Chitpur Road when idol processions are passing—A suggestion for having 22 instead of 15 years of age fixed as the period of succeding to an inheritance—" এক কথায় ভারতীয় নবজাগৃতির চিহ্ন 'কৌমুদী'র পাতায় পাতায় ছড়ানো ছিল। আর সেযুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক রামমোহন ঐ পত্রিকার মধ্য দিয়ে ঐ সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করে ভারতীয় যুগপ্রগতির মূল সুরটির উদ্বোধন করেছিলেন।

নতুন যুগের বার্তাবহ হওয়া সত্ত্বেও 'সম্বাদ কৌমুদী' কিন্তু পাঠকদের আনুকূল্য লাভ করতে পারে নি। ফলে এটি বিরাট বাধার সম্মুখীন হয়। বারংবার সম্পাদক বদল হতে থাকে। ১৮২৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখের 'বঙ্গদূত' সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত সেকালে প্রচলিত ইংরেজী ও বাঙলা সাময়িকপত্রের তালিকায় কৌমুদী সম্পাদকরূপে হলধর বসুর নাম পাওয়া যায়।

রামমোহনের বিলেত যাত্রার পর পত্রিকার অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে ওঠে। এই সময় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায় কিছুকাল 'সম্বাদ কৌমুদী' পরিচালনা করেছিলেন। ১৮৩২ সালের ২১ জানুয়ারি সংখ্যার 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশ :

"এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কৌমুদী নামে কাগজ করিতেছিলেন ঐ কাগজের গ্রাহক কেবল সতীদ্বেষী কএক মহাশয়েরা আছেন শুনিয়াছি তাহার ব্যয় নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী ১৬ টাকা আর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় হইয়াছে নচেই কৌমুদী এতদিনে কোনস্থানে মিলাইয়া যাইতেন···।"

এরপর আর দু-এক বছর 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর কাগজটি একেবারে উঠে যায়। শেষ কবে কৌমুদী প্রকাশিত হয়েছিল সে-সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য সাহিত্যগবেষকরা এখনো সংগ্রহ করতে পারেন নি। অথচ সমসাময়িক আরো দুটি পত্রিকা—'সমাচার দর্পণ' ও 'সংবাদ চন্দ্রিকা' বহুকাল পর্যন্ত টি কে ছিল।

'সম্বাদ কৌমুদী' ক্ষণজীবী হলেও বাঙলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এর অবদানকে কোনোমতেই ছোট করে দেখা যায় না। তা ছাড়া এই পত্রিকার

মধ্য দিয়েই রামমোহন রায়ের সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল। তাঁর উন্নত মতাদর্শ ও উদারনৈতিক চিন্তাধারায় কৌমুদী পুষ্ট হয়েছিল। এক কথায় তিনি ছিলেন ওই পত্রিকার প্রাণ।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'সম্বাদ কৌমুদী'র কোনো কপি নেই। তিরিশের দশকে গবেষণাকালে সাংবাদিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর কোনো কপি সংগ্রহ করতে পারেন নি। তাই সমসাময়িক পত্রিকা ও কয়েকটি গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রবন্ধটি রচিত। যে যে বই ও পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি :

১　বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২　Modern Review—March, 1931

৩　Amrita Bazar Patrika—Dec. 17, 1935

৪　কণ্ঠরোধ ('নব্যভারত,' বৈশাখ ১৩০৪)

পবিত্রকুমার সরকার

ভারতবর্ষের আটত্রিশ কোটি নিরক্ষরের দাবি

> মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী,
>
> স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও আমি নিরক্ষর। আমি লেখাপড়া শিখতে চাই। আশা করি আমার মত এদেশের আটত্রিশ কোটি নিরক্ষরকে লেখাপড়া শেখার সুযোগ দেবেন।

পশ্চিমবঙ্গের একজন নিরক্ষর মানুষ এই চিঠিখানি লিখেছেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে। তিনি শুধু একা নন। তাঁর মতো লক্ষজন মানুষের টিপসই সম্বলিত এই রকম কয়েক সহস্র চিঠি পাবেন মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী, স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীর প্রাক্কালে।

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির উদ্যোগে এই টিপসই সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে গত ৫ই জুন থেকে। একই সঙ্গে চল্লিশ হাজার শিক্ষিত মানুষের স্বাক্ষর সহ দশ হাজার পোস্টকার্ড যাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে, এই ভয়াবহ সমস্যার নিরসনের দাবি জানিয়ে। তার সঙ্গে থাকবে আঠেরো হাজার সগুসাক্ষর মানুষের আবেদন —গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির পরিচালনায় যাঁরা নিরক্ষরতা মুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে এই বছর, মহা সমারোহে। কিন্তু স্বাধীনতার—এবং গণতন্ত্রের—সমস্ত অর্থকে ব্যর্থ করে দিয়ে

আজও এই উপমহাদেশে আটত্রিশ কোটি মানুষ অশিক্ষার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি এই সমস্যার ভয়াবহতা প্রধানমন্ত্রীকে উপলক্ষ করে জনসাধারণের সামনে আর একবার তুলে ধরতে চাইছেন।

১৯৬৫ সাল থেকে এই সমিতি নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজে নিয়োজিত আছেন। গত সাত বছরে বিভিন্ন ভাবে তাঁরা নিরক্ষরতার সমস্যাটির গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন। শুধু সভা সমাবেশ প্রদর্শনী বা প্রচার-অভিযানই নয়, পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় শত শত সাক্ষরতা কেন্দ্রের মাধ্যমে এঁরা কয়েক সহস্র নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরতা লাভের সুযোগ দিয়েছেন। মাত্র গত বছরেই এই সমিতির পরিচালনায়, এই রাজ্যের পাঁচটি জেলায়, ৬০০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে, ১৮০০০ বয়স্ক মানুষকে কার্যকরী সাক্ষরতা দান করা হয়েছে। চলতি বছরে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এঁরা ১০০০টি সাক্ষরতার কেন্দ্র খুলবার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

সমিতির কাজের পরিধি ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু নিরক্ষরতার সমস্যাটির ব্যাপকতার তুলনায় এ প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকর। সাধারণ মানুষের সচেতন সহযোগিতায় এই অভিযানকে গণআন্দোলনে উত্তীর্ণ করা এখুনি প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি এই আন্দোলনের উপযোগী আবহাওয়া তৈরি করছেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

স্বপ্না দেব

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে আমরা লিখেছিলাম "শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র সত্তরের নিকটবর্তী।" প্রকৃত পক্ষে অমরদাও আগেই সত্তর অতিক্রম করেছেন।

—সম্পাদক

গণশিল্পী পৃথ্বীরাজ স্মরণে

প্রয়াত পৃথ্বীরাজ কাপুর চলচ্চিত্র ও নাট্যজগতে স্বনামধন্য পুরুষ। বাঙলা-দেশের চলচ্চিত্র দর্শকরা বিভিন্ন ছবিতে তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় দেখেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু নাট্যজগতেও যে তাঁর কি অপরিসীম দান সে সম্বন্ধে আজকের তরুণ সমাজের হয়তো সম্যক ধারণা নেই। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে তিনি হিন্দি নাট্যজগতে এক নবযুগের প্রবর্তন করেন। অভিনয়ে, নাট্য-রচনায়, নাট্য-প্রযোজনায় তিনি নতুন ধারা আনেন। তাঁর নাটকগুলোতে ভারতের গণমানস রূপ পায় এবং মানবিক মূল্যবোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি ছিলেন প্রকৃত গণশিল্পী। গণজীবনই ছিল তাঁর নাট্যপ্রেরণার মূল উৎস। তাই বোম্বাই শহরের চৌহদ্দির মধ্যে তিনি তাঁর নাট্যকর্মকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারেন নি, সারা ভারত ঘুরে বেরিয়েছেন তাঁর নাট্যদল নিয়ে। অনাড়ম্বর জীবন—একটি বিশাল নাট্য-পরিবারের জনক। তাঁর নাট্যসাধনা ও জীবনচর্চা মিলে এক হয়ে গিয়েছিল। মানুষের দুর্গতি দেখলে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত—দুর্গতজনের দুঃখমোচনের জন্যে তিনি ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। তাই তাঁকে দেখা যায় বাঙলার পঞ্চাশের মন্বন্তরে, নোয়াখালি ও বিহারের দাঙ্গায়, দেশবিভাগে সর্বস্বান্ত মানুষের জন্য ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিতে। পৃথ্বীরাজ কেবল একজন মহান শিল্পীই ছিলেন না, ছিলেন মহাপ্রাণও।

১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে তিনি কলকাতায় আসেন তাঁর 'পৃথ্বী থিয়েটার্স' নিয়ে। 'পূরবী' সিনেমাঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে তিনি উপস্থিত করেন 'দিওয়ার', 'পাঠান', 'আহুতি', 'কলাকার', 'গাদদার' ও 'শকুন্তলা' নাটক। নাটকগুলো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর সাদর আমন্ত্রণ পেয়েই দেখেছিলাম সেগুলো। কেবল নাটকই দেখি নি, একাধিক দিন দীর্ঘকাল আলোচনার সুযোগ পেয়ে তাঁর নাট্যচিন্তার মৌলত্বও উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। বুঝেছিলাম তাঁর জীবনবোধের সঙ্গে নাট্যবোধের কোনো বিরোধ নেই। তিনি ছিলেন জীবনপ্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। সমস্যাকে এড়িয়ে না চলে সাহসভরে তার সম্মুখীন হওয়াকেই তিনি স্বাগত জানাতেন। পরিবর্তন-শীলতায় তাঁর ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। লক্ষ্যহীন যাত্রা বা পুনরাবর্তনের প্রবক্তা তিনি

ছিলেন না। মিছিলে থেকে তিনি মিছিলের লক্ষ্য জানতেন। তাই লক্ষ্যভেদে তাঁর ভুল হত না। এক কথায় তিনি ছিলেন প্রত্যয়িত নট-নাট্যকার-প্রযোজক।

'পূরবী' সিনেমা হলে তাঁকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন দেয়া হয়। প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত ছিলেন তখন রাজ্য কমিটির সভাপতি। ৯ জানুয়ারির সেই সম্বর্ধনা সভার সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দেন সেটি তখন আমার সম্পাদিত 'নাট্যলোক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই ভাষণ থেকে খানিকটা তুলে দিলেই বোঝা যাবে পৃথ্বীরাজ ও তাঁর থিয়েটার সম্পর্কে কি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন বাঙলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় নাট্যকার। শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেছিলেন :

"...সাধারণ মানুষের যে সৃষ্টির সঙ্গে, যে সভ্যতার সঙ্গে, যে সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ থাকে না, সে সৃষ্টি, সে সভ্যতা, সে সংস্কৃতি প্রাণরসের যোগান না পেয়ে শুকিয়ে যায়, শীর্ণ হয়ে পড়ে। তাই আজ অসাধারণ সভ্যতার ('অসাধারণ' বলতে তিনি বুর্জোয়া সভ্যতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন—লেখক) উত্তরাধিকারীদের মুখেও শোনা যায় মানব অভ্যুদয়ের কথা। শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, প্রগতিশীল রাজনীতিক সকলেই আজ সঞ্জীবনী সুধার সন্ধানে সাধারণ মানুষের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানকে বাঁচিয়ে রাখবার অন্য কোন উপায় দেখতে পাচ্ছেন না। তাদেরকে অনেক মূল্য দিয়ে আজ এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েচে।

"আজ এখানে যারা সমবেত হয়েচি, ভারতীয় অভারতীয়, শ্বেত পীত, কৃষ্ণকায়, প্রাচীর এবং প্রতিচীর সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, আমরা সকলেই মানব-অভ্যুদয়কেই মানুষের পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলে উপলব্ধি করেচি। শ্রীপৃথ্বীরাজ তাঁর নাটকের ভেতর দিয়ে, সহজ অভিনয়ের সাহায্যে এই মানব-অভ্যুদয়ের আদর্শ প্রতিফলিত করেচেন বলেই তাঁকে নব-যুগের মানুষের মর্মবাণীর ধারক ও বাহক জেনে প্রাচী ও প্রতিচীর নাট্যানুরাগী মানবকল্যাণপ্রয়াসী সকলেই তাঁকে পরমাত্মীয় মনে করচি। বিশেষ করে বাংলার নাট্যানুরাগী আমরা এই দেখেই পুলকিত হয়েচি যে, শ্রীপৃথ্বীরাজ তাঁর অতি প্রশংসনীয় নাট্য-প্রয়াসের পরিচয় দিয়ে আমাদের বোঝবার সুযোগ দিয়েচেন যে অন্তত নাট্য-প্রয়াসে ভারতের পশ্চিম আর পুব সমস্তরে উপনীত

হয়েছে; পাঞ্জাবে বোম্বাইয়ে বাংলায় এ বিষয়ে খুব বেশি পার্থক্য নেই। মানুষের সর্ববিধ মুক্তির একই আবেদন ভারতের পূবে ও পশ্চিমে নাটকের ও নাট্যাভিনয়ের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়ে ভারতকে পৃথিবীর সকল মানব-হিতৈষী শান্তিকাম মানুষের সমশ্রেণীতে স্থান দিয়েছে।"

'পৃথ্বী থিয়েটার্স'-এর নাট্যপ্রযোজনা সম্পর্কে 'নাট্যলোক' পত্রিকায় তখন আমি যে আলোচনা করেছিলাম সেটি এখানে তুলে দিলে এ যুগের পাঠকরা তার বৈশিষ্ট্যগুলি খানিকটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। তাই পুরো আলোচনাটিই দেয়া হল :

"কিছুদিন আগে পৃথ্বী থিয়েটার্স কলকাতায় তাঁদের নাটকগুলো দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের নাটকগুলো এখানে যে সমাদর পেয়েছে তা যে-কোনো পেশাদার নাট্য সম্প্রদায়ের নিকট সত্যি ঈর্ষার বস্তু। পৃথ্বী থিয়েটার্স-এর নাটকের বিশদ আলোচনা এখানে করব না; তাঁদের নাট্যরূপায়ণের মধ্যে যে যে বৈশিষ্ট্য দেখেছি এবং যেগুলো শিক্ষণীয় বলে মনে করেছি সেগুলোই সংক্ষেপে আলোচনা করব।

"প্রসঙ্গত 'পাঠান' ও 'আহুতি' দুখানি নাটকের অভিনয়পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যাক। সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় নাটকীয় চরিত্রগুলির স্বাভাবিক বাচনভঙ্গির। পৃথ্বীরাজ তাঁর থিয়েটারে মেলো-ড্রামা বা অস্বাভাবিক অতিঅভিনয়কে একেবারে পরিহার করেছেন। সেজন্যে মানুষগুলিকে মঞ্চ-জগতের ভিন্ন জীব বলে মনে হয় না; প্রতিদিন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে আমরা যাদের সঙ্গে মিশি, যেভাবে কথা বলি, নাটকের চরিত্রগুলি তাদেরই অবিকল প্রতিচ্ছবি হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। ব্যবহারিক জীবন এমন কি মানুষের কুঅভ্যাসগুলিকে পর্যন্ত তিনি অতিসাহসের সহিত মঞ্চে আমদানি করেছেন। পাঠান সর্দার তামাক টানতে টানতে মঞ্চের ওপরই নিষ্ঠীবন ত্যাগ কচ্ছে—বাইরেটা দেখে বড় নোংরা মনে হয়, কিন্তু অন্তরটা তার স্ফটিকের মতোই স্বচ্ছ নির্মল—যে-জন্যে প্রতিবেশী হিন্দু দেওয়ানের পুত্রকে বাঁচাবার জন্যে সে নিজের একমাত্র পুত্রকে 'বলিদান' করতে পারলো। তারপর 'আহুতি' নাটকে অতি আধুনিক সমাজের লোকদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে শিল্পোচিত ভাবে। স্নানাগারে মুনীবপুত্রকে উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করতে দেখে ভৃত্যের চমকে ওঠা, স্ট্রীট ভ্যাণ্ডারের গা-চুলকানো প্রভৃতি ছোটখাট ইংগিত সূক্ষ্ম রস-বোধের পরিচয় দেয়। 'আহুতি'র প্রথম দৃশ্যে মহিলা মজলিসের হাসির তরঙ্গ

বাংলা রঙ্গমঞ্চে কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমাদের দেশে পাঁচ-জনকে মঞ্চে একসঙ্গে হাসতে বললে তাঁরা এমন কাষ্ঠহাসি হাসেন যে, হাসি দেখে চড় মারতে ইচ্ছে হয়। পৃথ্বীগোষ্ঠীর অভিনয় ধারার বড় কথা হলো যে, মঞ্চে কেউ এক মুহূর্তের জন্যেও নিষ্ক্রিয় থাকেন না। কেউ যখন সংলাপ বলবেন তখন সকলেই সক্রিয়, মঞ্চে একই সময়ে বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন ধরণের কাজ কচ্ছে—কেউ হয়তো মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনছে, কেউ হয়তো ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, প্রণয়ী-প্রণয়িনী চোখে ইশারা কচ্ছে। সব কিছুতে মিলে একটা পারিবারিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে। সবাই সর্বদা একই 'মুড' বা একই 'সেন্টিমেণ্ট' নিয়ে মঞ্চে থাকে না; একসঙ্গে বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন 'মুড' ও 'সেন্টিমেণ্ট' নিয়ে অভিনয় কচ্ছে। আবার এমন 'সিচুয়েশন' আসচে যেখানে সবাইর একই 'মুড', একই 'সেন্টিমেণ্ট' একই 'অ্যাকশন' হয়ে যাচ্ছে। 'পাঠান' নাটকে যেখানে দুই বিরোধী পক্ষে সংঘর্ষ বাধে সেখানে নরনারী সবাই একসঙ্গে একই উদ্দেশ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে—পুরুষরা বন্দুক নিয়ে লড়াই কচ্ছে—মেয়েরা ভেতর থেকে তাদের অস্ত্র যোগাচ্ছে, একজন মিনারে উঠে লড়াইয়ের বর্ণনা দিচ্ছে, জনাকতক পাঠান আহতদের ভেতরে নিয়ে আসচে—অপূর্ব সিচুয়েশন—one purpose, Common action, collective emotion, আবহাওয়া, গতি সব কিছু মিলিয়ে এমন চমৎকার দৃশ্য মঞ্চে ইতঃপূর্বে আর কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। আবার এই নাটকেরই শেষ দৃশ্যে একই সেন্টিমেণ্টের মধ্যে বিভিন্ন 'মুড' ও 'ইমোশন'এর ইংগিত পাই। পাঠান সর্দার বন্ধুপুত্রকে বাঁচাবার জন্যে নিজের পুত্রকে প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে যখন 'কোরবানি কোরবানি' বলে ত্যাগের মহিমায় নিজের অন্তরের বেদনাকে চাপা দেবার চেষ্টা করে তখন তারই পাশে অন্যান্য চরিত্র নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবে স্বজনবিয়োগ-বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ে। একদিকে ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আর একদিকে স্বজন হারাবার মর্মান্তিক ক্রন্দন—সব কিছুতে মিলে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে যা অনুভব করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা চলে না। 'আহুতি'র শেষ দৃশ্যেও এক হৃদয়বিদারক অবস্থার মধ্যে আমরা বিভিন্ন চরিত্রের বিলাপ ও ক্রন্দনের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। সবাইকে ছাড়িয়ে যান পৃথ্বীরাজ নিজে—দূরে সানাই বাজছে, পিতা মৃতা কন্যাকে ক্রোড়ে নিয়ে কাঁদছে—সে কান্না বড় মর্মান্তিক—শুষ্ক কণ্ঠস্বর, মুখে হাসি, অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে ভূগর্ভের লাভাস্রাব।

পৃথ্বীরাজের কণ্ঠস্বর যেন মুহূর্তের মধ্যে মঞ্চে, সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে এক মর্মভেদী হাহাকার সৃষ্টি করে। অভিনয় যে মানুষের মনকে কিভাবে বিদ্যুতের মতো স্পর্শ করতে পারে, এই একটি মাত্র দৃশ্য দেখলে তা সহজে উপলব্ধি করা যায়।

"আলোকসম্পাতেও তাঁদের যথেষ্ট নৈপুণ্য লক্ষ্য করেছি। 'পাঠান' এর সূচনায় শেষরাত্রির অন্ধকার, তারপর ক্রমশ ফর্সা হয়ে আসা এবং ঘুলঘুলি দিয়ে উঠোনে রৌদ্ররশ্মি এসে পড়া, বাইরের আলো ও অন্দরের আলোতে পার্থক্য রাখা প্রভৃতি প্রয়োগচাতুর্য অতিশয় প্রশংসনীয়। 'আহুতি' নাটকে দেশবিভাগের পরে সাময়িক আশ্রয় শিবিরের দৃশ্যে একটি তাঁবুর মধ্য দিয়ে যে আলোকসম্পাত করা হয়েছে তা পরিবেশ সৃষ্টিতে চমৎকার সাহায্য করেছে। মঞ্চের সম্মুখভাগে এবং গভীর প্রদেশে আলোর ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ঘটিয়ে এক-দিকে যেমন মায়াজাল সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি 'মুড'কে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করারও প্রয়াস দেখা গেছে। হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে অভিনয়ের 'মুড' নষ্ট করার চেষ্টা কোথাও দেখা যায় নি। আলোর এরূপ soothing effect কমই দেখতে পাওয়া যায়।

"মঞ্চসজ্জায়ও পৃথ্বীরাজ অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একদিকে মঞ্চসজ্জায় যেমন বাহুল্য বর্জন করেছেন তেমনি অপর দিকে তিনি প্রতিটি দৃশ্যের মূল পট-ভূমির প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিয়েছেন। 'পাঠান' নাটক একটি মাত্র পটভূমিতে অভিনীত হয়ে থাকে—কিন্তু সেখানে ছোট্ট মিনারটি নির্মাণ করে কেবল দৃশ্যপটের ব্যঞ্জনাই নয়, অভিনয়ে 'অন্তরীক্ষ' ব্যবহারের সুযোগও গ্রহণ করা হয়েছে। মঞ্চোপরি বিভিন্ন স্তর থেকে সংলাপ ও ধ্বনি বিস্তারে যে সমগ্র মঞ্চ কতখানি মুখর ও সজীব হয়ে ওঠে, পৃথ্বী থিয়েটার্স-এর অভিনয় দেখে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। 'আহুতি' নাটকের শেষ দৃশ্যে উদ্বাস্তু শিবিরের পরি-কল্পনা কত সহজ অথচ কত সুন্দর—সুন্দর বলছি এজন্যে যে তা মানানসই এবং যথেষ্ট ইংগিতপূর্ণ। অথচ সমগ্র সেটিং নির্মাণে ব্যয় বোধ হয় খুব কমই হয়েছে।

"মঞ্চে শিল্পীদের স্থান নির্ণয়েও বাহাদুরি আছে। একই স্তরে বসে সবাই কথা বলে না। অসমতল মঞ্চে কেউ উঁচুতে বসে কেউ একটু নীচুতে বসে যখন কথা বলে তখন তা বড় স্বাভাবিক ও শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। কয়েকখানি খাটিয়া 'পাঠান' নাটকে কতখানি সাহায্য করেছে! বাংলাদেশে কিন্তু flat stage-এ (সমতল মঞ্চে) অভিনয় করা প্রায় একটা রেয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের প্রগতিশীল নাট্যমহল তো এসব দিকে প্রায় দৃকপাতই করেন না। এসব

করতে ব্যয় যে খুব বেশি হয় তা নয়। আসলে এসব নিয়ে ভাবতে হয়—কল্পনা থাকা দরকার।

"তারপর কণ্ঠস্বর যে আবহ সৃষ্টিতে কতখানি সাহায্য করে পৃথ্বীরাজ তাও আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ-প্রস্থান, নেপথ্যে আবহসংগীত সৃষ্টিতে যন্ত্র ও কণ্ঠস্বরের সংমিশ্রণ, সর্বোপরি 'আহুতি' নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে শ্মশানপ্রায় আশ্রয় শিবিরে উদাত্ত কণ্ঠে যে গান তা দর্শকদের সত্যি অভিভূত করে ফেলে। 'গানের জন্যেই গান' না গাইয়ে যে-গান নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে তেমন গানই পৃথ্বী থিয়েটার্স-এ গাওয়ানো হয়।

"পৃথ্বী থিয়েটার্স-এর আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় এর শৃংখলা। সমস্ত মঞ্চটি যেন ঘড়ির কাঁটার মতো কাজ করে। থিয়েটারে শৃংখলা একটি বড় জিনিস। তারপর পৃথ্বী থিয়েটার্স-এর শিল্পীরা স্মারকের ওপর নির্ভর করে অভিনয় করেন না। সেজন্যেই অভিনয়ে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে মনঃসংযোগ করতে পারেন।

"সর্বশেষে আমাদের একটি অতিপ্রয়োজনীয় কথা ভেবে দেখবার আছে। পৃথ্বী থিয়েটার্স-এর 'পাঠান,' 'আহুতি', 'দিওয়ার' প্রভৃতি যে নাটকগুলো সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েচে সেগুলোর মুখ্য আবেদন মস্তিষ্কের কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে। আবার হৃদয়স্পর্শী হয়েও যে সেগুলো মস্তিষ্ককে সাড়া না দেয় এমন নয়। সুতরাং আজ আমরা যারা গণনাট্যের কথা ভাবছি বা বলচি তাদের বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার যে, আমরা নাটকগুলো কিভাবে পরিবেশন করবো? সাধারণ লোকের কাছে উপস্থিত করতে হলে কিন্তু হৃদয়াবেগপ্রধান নাটকই উপস্থিত করলে আমরা সাড়া পাবো বেশি—বুদ্ধির বেশি কসরৎ থাকলে তার গণ-আবেদন অনেকখানি কমে যাবে।

"পৃথ্বী থিয়েটার্স-এর নাটকগুলিতে স্থানে স্থানে অবশ্য স্থূলত্ব আছে, বাকবাহুল্যও আছে। রবীন্দ্রনাথের, শরৎচন্দ্রের দেশের লেখকরা হয়তো অনায়াসেই সে-দোষ থেকে মুক্ত হয়ে নাটক রচনা করতে পারবেন—কিন্তু পৃথ্বী থিয়েটার্স-এর মূল সত্যটিকে বোধ হয় স্বীকার করে নিতেই হবে যে, গণচেতনা আনয়ন করাই যদি আমাদের শিল্পের মূল লক্ষ্য হয় তবে আমাদের শিল্পের মুখ্য আবেদন হবে হৃদয়ের কাছে। মস্তিষ্কের কাছে যেটুকু আবেদন করা দরকার তা করতে হবে গৌণ ভাবে।" [নাট্যলোক : ফাল্গুন, ১৩৫৮]

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি ডে-লেউইস

সেসিল ডে-লেউইস (১৯০৪-১৯৭২) শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের রাজকবি হয়েছিলেন। টেনিসন যখন রাজকবির পদ নিয়েছিলেন তখন ব্রাউনিং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, মাত্র একমুঠো রূপোর জন্য তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন। ডে-লেউইসের বেলায় আমরা কী বলব? তাঁর বিশ্বাসে চিড় ধরেছিল? কিংবা তিনি দলত্যাগ করেছিলেন বুঝেশুনেই, কিছু প্রাপ্তির আশায়? এক সময় তিনি ছিলেন একজন পাক্কা কমিউনিস্ট। দুনিয়ার সর্বহারাদের বন্ধু, সাম্রাজ্যবাদের শত্রু। তাঁর কবিতার সেই উজ্জ্বল দিনগুলির কথা মনে করেই ডে-লেউইসের মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত না হয়ে পারি না।

ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ের গোড়ার যুগে ইংলণ্ডের যে-কজন কবি-সাহিত্যিক তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন স্পষ্টভাষায়, ডে-লেউইস ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর সমকালীন অন্যান্য সমধর্মী কবি ছিলেন স্পেণ্ডার ও অডেন। এঁরা দুজনেই পরে দলছুট হয়েছিলেন। জার্মানিতে তখন নাৎসীদের খুব বোল-বোলাও। ইতালিতে মুসোলিনীর কালোকুর্তা ফাসিস্ত ও স্পেনে ফ্রাঙ্কোর ফ্যালাঞ্জিস্টরা ছিল তাদের সমগোত্রীয়। নাৎসী ও ফাসিস্তরা ফ্রাঙ্কোকে দিয়ে স্পেনে তাদের ক্ষমতা পরখ করেছিল ১৯৩৭ সালে গৃহযুদ্ধের সময়। সেই সময়ে স্পেনে গণতান্ত্রিক মানুষের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন দুনিয়ার প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকরা। কমিউনিস্টরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। সেই যুদ্ধে আমরা হারিয়েছিলাম ক্রিস্টোফার কডওয়েল, জন কনফোর্ড, লরকা ও রালফ ফকসের মতো আশ্চর্য প্রতিভাবান শিল্পী, কবি ও নাট্যকারদের। তাঁদের এই সংগ্রামে দূর থেকে সমর্থন জানিয়েছিলেন ডে-লেউইস তাঁর কবিতায়, যদিও আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে যোগ দেন নি তিনি। ডে-লেউইসের কবিতার স্মরণীয় কাল গেছে সেই ত্রিশের এবং চল্লিশের দশকেই। যদিও কমিউনিস্ট-বিরোধী সমালোচকরা বলবেন, সে ছিল প্রচারধর্মী কবিতার যুগ। ডে-লেউইস শুধু রোমান্টিক ভাবালুতায় কমিউনিস্ট দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন নি। তিনি বাস্তবিকই ছিলেন মানুষের শোষণের প্রতিবাদী। তাঁর বিশ্বাসে কোনো খাদ ছিল না।

ডে-লেউইসের কবিতার ভাষা সহজ, বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। ভাষা ব্যবহারে কুশলী এই কবি সে কারণেই আধুনিক কবিতা-পাঠকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ইস্কুলের মাস্টার।

অধ্যাপনাকে তিনি ভালোবেসেই গ্রহণ করেছিলেন। এই সাধারণ জীবনযাত্রা স্বেচ্ছায় বরণ করে কবি সাধারণ মানুষের কাছাকাছিই থাকতে চেয়েছিলেন। জীবনের অপচয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী লেউইস লিখেছিলেন, "শহরের ফুলগুলো সব যাচ্ছে পচে" এই ফুল হচ্ছে তাজা টাটকা যুবক-যুবতী যাদের উজ্জ্বল হাসিতে ও ভালোবাসায় শহরের গলিগুলো সন্ধ্যেয় ভরা থাকত। এখন তারা কোথায়? ফ্ল্যাণ্ডার্সের মাঠে তারা হারিয়ে গেছে।

Cursed be the promise that takes our men from us—এই হল ডে-লেউইসের কবিতার ভাষা। সত্তরের দশকে দুনিয়ার সর্বত্র শোষণ আর সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও প্রতিবাদ উচ্চারিত, ত্রিশের-চল্লিশের দশকে তারই রূপ দিয়ে গেছেন ডে-লেউইস। ডে-লেউইসের অনেক কবিতাই আমাদের চিরকাল প্রিয় থাকবে। আমরা বারবার তা পড়ব।

তাছাড়া কবিতা বিষয়ে তাঁর চমৎকার বিশ্লেষণধর্মী বইগুলোও এক সময়ে আমাদের খুবই সাহায্য করেছে কবিতার শরীরের সৌন্দর্য বিচারে। কবি হলেও তাঁর গদ্য রচনা ছিল খুবই চমৎকার। জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টিই তাঁর রচনাকে দিয়েছিল সহজ সৌন্দর্য। শিল্পী ডে-লেউইসের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

কৃষ্ণ ধর

ভেরা নভিকভা

বিদেশে যে অল্পকয়েকজন মানুষ আজীবন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেছেন ভেরা নভিকভা তাঁদের অন্যতমা। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যুসংবাদে অনেকেই আত্মীয়বিয়োগের বেদনা অনুভব করেছেন। শোক প্রকাশের জন্য লিখতে বসে আনুষ্ঠানিক কথাগুলো লিখতে ভালো লাগছে না, কারণ লেনিন-গ্রাদকন্যা ভেরা নভিকভা অনেক দূরের মানুষ হলেও কলকাতায় অনেকের কাছেই খুব কাছের মানুষ ছিলেন। কলকাতায় তিনি মাত্র তিন বার এসেছিলেন। এর মধ্যে প্রথমবার বোধহয় মাস ছয়েক ছিলেন; পরের দুবারে সপ্তাহখানেক মাত্র অথবা কিছু বেশি। বাঙলা তিনি মোটামুটি ভালোই বলতেন, লিখতেনও। বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল অত্যন্ত নিবিড়। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, বাঙলা তিনি শিখেছিলেন লেনিনগ্রাদেই।

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবেই তিনি প্রথমবার এসেছিলেন কলকাতায়। অর্থাৎ কলকাতায় এসে তিনি বাঙলা শেখেন নি। নিঃসন্দেহে কাজটা খুবই দুরূহ ছিল।

অনেকেই জানেন লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে (যা কিনা আগে পরিচিত ছিল সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় নামে) সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ভাষা-চর্চার একটা প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষার চর্চা শুরু হয়েছে বিপ্লব-পরবর্তীকালে। শোনা যায়, স্বয়ং লেনিন ছিলেন এই ব্যাপারে আগ্রহী। 'দাউদ আলী দত্ত' সর্বপ্রথম বাঙলা শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন লেনিনগ্রাদে। দত্ত মশায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দুজন পরবর্তীকালে বাঙলা চর্চায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন—ভেরা নভিকভা এবং ইয়েভ্‌গেনিয়া বীকভা। উভয়েই লেনিনগ্রাদ-কন্যা; প্রথমার কর্মস্থল ছিল লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় আর দ্বিতীয়জন এখনো কর্মরত আছেন মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার মহাকেন্দ্র 'এশিয়ার জনগণের ইনস্টিট্যুট'-এ। নভিকভা ছিলেন সাহিত্যের ছাত্রী আর বীকভার গবেষণার বিষয় হল বাঙলা ভাষাতত্ত্ব।

সাহিত্যের ছাত্রী নভিকভার ডক্টরেটের জন্য লেখা থিসিসের বিষয় ছিল বঙ্কিমসাহিত্য। নভিকভা বঙ্কিমসাহিত্যের প্রতি এত গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন কেন? তাঁর মুখে এ প্রশ্নের উত্তর শুনি নি। তবে এ সম্বন্ধে একটা অনুমান খাড়া করা যেতে পারে। রুশ ভারততত্ত্ববিৎ মিনায়েভ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় এসেছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। মিনায়েভের লেখা নভিকভাকে পরবর্তীকালে বঙ্কিমসাহিত্যের প্রতি উৎসাহিত করে থাকতে পারে। বিষয়টা অনুসন্ধানযোগ্য বলে মনে করি।

ভেরা নভিকভার মহৎ কীর্তি হল রবীন্দ্রসাহিত্যের রুশ অনুবাদের সম্পাদনা। তিনি স্বয়ং বহু গ্রন্থ মূল বাঙলা থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। 'নৌকাডুবি' 'গোরা' 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাস, 'গল্পগুচ্ছ'র বহু গল্প, 'রাশিয়ার চিঠি' এবং বহুসংখ্যক সুপরিচিত কবিতার রুশ অনুবাদ একসময় কলকাতাতেও কিনতে পাওয়া যেত। এই অনুবাদ হয়তো সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়, কিন্তু এগুলিতে যে ধৈর্য এবং নিষ্ঠার পরিচয় রয়েছে তা সচরাচর দুর্লভ। এই প্রসঙ্গে এও স্মরণীয় যে প্রধানত ভেরা নভিকভার চেষ্টাতেই রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার অনুবাদকর্মে হাত লাগিয়েছিলেন বোরিস

পান্তেরনাক, আন্না আখমাতোভার মতো জগৎবিখ্যাত কবিরা। এই ঘটনাটিও বিস্তারিত অনুসন্ধানযোগ্য।

তিনি যখন প্রথম কলকাতায় আসেন তখন আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র ছিলুম। বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। তিনিই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে নভিকভার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। নভিকভা ক্লাসঘরে গিয়ে আমাদের সঙ্গে বসে অধ্যাপক মশায়দের বক্তৃতা নিয়মিত শুনতেন এবং নোট নিতেন। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কোনো আত্মাভিমান দেখি নি, যদিও তিনি নিজেই তখন অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

'পরিচয়' পত্রিকার তিনি একজন মনোযোগী পাঠিকা ছিলেন। 'পরিচয়'-এ তিনি লিখেওছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহাকেন্দ্রের পত্রিকার একাধিক সংখ্যায় 'পরিচয়' পত্রিকা, প্রগতিলেখক আন্দোলন, বাঙলা সাহিত্যের সমাজসচেতন লেখকদের সম্বন্ধে তাঁর নিপুণ বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি পড়লে বোঝা যায় যে 'পরিচয়' লেখকগোষ্ঠীর তিনি কত কাছাকাছি ছিলেন। মনে আছে ১৯৫৬ সালের এক বিকেলে তাঁকে আমি 'পরিচয়' পত্রিকার অফিসে নিয়ে গিয়েছিলুম। ছোট ঘরখানা তখন লোকে ভর্তি। কবি গোলাম কুদ্দুস তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের এই ছোট ঘরখানা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে? নভিকভা উত্তর দিয়েছিলেন—মনে হচ্ছে ছোট ঘরখানায় কতবড় সব লেখক আসা-যাওয়া করেন।

ভেরা নভিকভা দ্বিতীয়বার কলকাতায় এসেছিলেন ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে। তখন পার্কসার্কাস ময়দানের রবীন্দ্রমেলায় তাঁকে হয়তো অনেকেই দেখে থাকবেন। গাঢ় নীল রংয়ের সিল্কের পোশাক পরিহিতা বড়-সড়ো চেহারার এই কৃশ মহিলাটির মুখে বাঙলা কথা শুনে অনেকে অবাকও হয়েছিলেন সেদিন। কিন্তু জীবনের অন্তত চল্লিশটি বছর যিনি বাঙলা সাহিত্যের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁর কাছে বাঙলা বলাটা কি আর এমন কঠিন। বরং অনেক বেশি কঠিন ছিল বাঙালি সমাজ এবং সংস্কৃতির নানা খুঁটিনাটি বিষয়গুলির সম্যক অনুধাবন, যা বাদ দিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাষান্তর প্রায় অসম্ভব। সেই অসম্ভব কাজও তিনি সম্ভব করেছিলেন। এই কথা মনে করতে ভালো লাগছে যে দেরি হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ তাঁর কাজের স্বীকৃতি তাঁর জীবনকালেই দিতে সক্ষম

হয়েছিলেন। গত বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রদত্ত রবীন্দ্র-পুরস্কার নিতে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। তার কয়েকমাস পরেই মৃত্যু তাঁর বাঙলা সাহিত্য চর্চায় চিরতরে ছেদ টেনে দিল। বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে রুশ সাহিত্যের সেতুবন্ধনের জন্য তিনি অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অনিমেষ পাল

এমিল বার্নস

ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সুবিখ্যাত চিন্তাবিদ, মার্কসীয় তত্ত্বের প্রচারক ও লেখক এমিল বার্নস-এর মৃত্যুসংবাদ 'পরিচয়'-এর পাঠকরা গত সংখ্যাতেই পেয়েছেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে ইংলণ্ডে এসে বহু কষ্ট করে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি পান এবং কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। ব্রিটেনে তখনও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে নি বটে, তবে তার প্রস্তুতি চলছে।

তখন শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল ব্রিটিশ লেবার পার্টি এবং তার নেতৃত্বের সংস্কারবাদী পলিসি ও পন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে একটি ছোট অংশ স্বভাবতই একটু বেশি জঙ্গী মনোভাবের আশ্রয় নিয়ে সংকীর্ণতাবাদের দিকে ঝুঁকত। লেনিন 'বামপন্থী কমিউনিজম—শিশুসুলভ রোগ' বইতে এই অতিবামপন্থী মনোভাবের বিরুদ্ধে এক বিশেষ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন একটু পরে, ১৯২০ সালে।

যাই হোক, যাঁরা ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন করতে উদ্যোগী হলেন, তাঁরা ব্রিটিশ লেবার পার্টির সংস্কারবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নানা রকমের বামপন্থী ঝোঁককে মার্কসবাদের পন্থায় আনতে সচেষ্ট হলেন।

এই বামপন্থী সংগঠনদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল ব্রিটিশ সোশ্যালিস্ট পার্টি, যেটা ব্রিটিশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের সমাজতান্ত্রিক মনোভাবকে বয়ে নিয়ে আসছিল। তাছাড়া ছিল সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টি, শ্রমিকদের সোশ্যালিস্ট ফেডারেশন দক্ষিণ ওয়েলস সোশ্যালিস্ট সোসাইটি, এবং ইন-ডিপেনডেণ্ট লেবার পার্টি।

এই শেষোক্ত ইনডিপেনডেণ্ট লেবার পার্টির মধ্যে ছিলেন এমিল বার্নস,

রজনী পাম দত্ত, আমাদের দেশের সাপুরজী সাকলৎওয়ালা, যিনি কয়েক বছর পরে বিলাতের পার্লামেন্টের প্রথম কমিউনিস্ট সভ্য হিসাবে নির্বাচিত হন। কমরেড বার্নস এঁদের এবং হ্যারি পলিট প্রভৃতির সঙ্গে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভ্য ছিলেন।

কমরেড এমিল বার্নসের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রথম পরিচয় তাঁর লেখার মাধ্যমে। ত্রিশ দশকে যখন ভারতের বহু জেলে ও আন্দামানের বন্দীশালায় মার্কসবাদের জোর পড়াশুনা চলছে, তখন বার্নসের সম্পাদিত 'হ্যাণ্ডবুক অফ মার্কসিজম' মার্কসবাদ অধ্যয়নে বিশেষ উপকারে লাগে। ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারি, ১৯৩৯ সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস পূর্বে, গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের যে ছোট্ট মার্কসবাদী পাঠচক্র খানিকটা গুপ্তভাবে সহপাঠী শ্যামল চক্রবর্তীর (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক) বাড়িতে বসত, তাতে এই বইটিই আমরা প্রধানত পাঠ করতুম। বইটি পেয়েছিলুম, আমরা ডিটেনশান ক্যাম্পের জনৈক সদ্যমুক্ত বন্দীর কাছ থেকে, উপরের লাল মলাটটি ছিঁড়ে একটি সাধারণ বাঁধাইয়ে বইটিকে লুকাবার চেষ্টা তাতে ছিল।

এর কিছু পরেই আমাদের ঐ ক্ষুদ্র পাঠচক্রের হাতে আসে কমরেড এমিল বার্নসের 'হোয়াট ইজ মার্কসিজম' (মার্কসবাদ কী?) ; তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে, দমননীতিও বেড়েছে। এখন বইটির ইংরাজী ও বাঙলা তর্জমায় কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে থাকলেও তখন অবশ্য বইটি বে-আইনী ছিল এবং আমাদের পাঠচক্র বইটিকে কয়েক দফা পুরো টাইপ করে সহপাঠী ছাত্রদের মধ্যে পড়বার জন্য বিলি করে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কমরেড এমিল বার্নসের এই বই দুখানি আমাদের মতো বহু ছাত্রকে মার্কসবাদে আকৃষ্ট করতে সাহায্য করেছে।

উত্তরজীবনে, ১৯৪৭-এর পরে, বিলাতে কমরেড বার্নসের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ অনেকবার হয়েছিল। মানুষটি ছিলেন ধীরস্থির, উত্তেজনার লেশমাত্র তাঁর কথাবার্তা বা আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পেত না। কিন্তু প্রথম আলাপেই বুঝেছিলুম, 'মার্কসবাদ কী' পুস্তকের মতোই তাঁর সাধারণ রাজনৈতিক কথাবার্তাতেও যুক্তির তীক্ষ্ণতা ও সারল্য—দুইই একেবারে তীরের ফলার মতো লক্ষ্যভেদ করত। আর এজন্যই ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে যে কয়েকজন শিক্ষক আমাদের নিয়মিত ক্লাস

নিতেন, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন বোধহয় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। কোনো প্রশ্নেই তাঁকে বিরক্ত হতে দেখি নি, মুখে সামান্য একটু হাসি লেগেই আছে। তাঁর প্রশ্নোত্তরের ক্ষুরধার যুক্তিতে প্রশ্নকর্তা অনায়াসে একটু অপ্রস্তুত হতে পারতেন। কিন্তু তাঁর জবাব দেবার পদ্ধতিটা এতো সরল ও সাধারণ মনে হতো যে প্রশ্নকর্তাকে কখনও বিব্রত হতে দেখি নি।

যতদূর জানি, তাঁর সন্তানাদি ছিল না। তাঁর আজীবনের সাথী, পত্নী এলিনর বার্ন্‌স ও ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিকে আমাদের সশ্রদ্ধ সমবেদনা জানাই, সঙ্গে সঙ্গে এমিল বার্নসের 'হ্যাণ্ডবুক অফ মার্কসিজম'-এর একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হবার ইচ্ছা জানিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের সংগ্রামী সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য নিবেদন করি।

ডেনিস নাওয়েলস (ডি. এন.) প্রিট

ভারাক্রান্ত মনে এমিল বার্নসের মৃত্যুসংবাদ জানাবার কালে খবর এসেছে বিখ্যাত আইনবিদ ডি. এন. প্রিটও গত ২৪এ মে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৮৪ বছর এবং এই সুদীর্ঘ জীবন ছিল শুধু কর্মবহুল নয়, নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে নিয়োজিত। ত্রিশ দশকে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে খোদ সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডে তিনি ছিলেন আমাদের বড়ো কৌসুলী, তেমনি আবার পঞ্চাশ দশকে স্বাধীনতার পরে, ভারতের বুর্জোয়া সরকার যখন তেলেঙ্গানার কৃষক-সংগ্রামকে দমন করে আট জনকে ফাঁসী দেবার রায় দেয়, তখন তিনি কৃষকদের পক্ষে হায়দ্রাবাদে এসে বিচারালয়ে তাদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মুকুব করতে বাধ্য করেন। এর পরও কয়েকবার তিনি ভারতে এসেছিলেন নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে, শেষবার কেরলের প্রথম কমিউনিস্ট গভর্নমেণ্টের পক্ষে, কেন্দ্রীয় নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে।

ডি. এন. প্রিটের পরিবার ছিল রক্ষণশীল; বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল চিরাচরিত রক্ষণশীল প্রথায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পর মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। অচিরেই আইনে পশার জমে ওঠে; এবারে তাঁর সামনে পথ খোলা—প্রথমে প্রভূত অর্থোপার্জন, তারপরে প্রয়োজন মতো পলিটিকসে ঢুকে (এক রকমের ব্যবসা বলা যেতে পারে) বিলাতের পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হয়ে গতানুগতিক

প্রথায় মন্ত্রিত্ব লাভ। কিন্তু তা হল না। তিনি পড়াশুনার মাধ্যমে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন, এবং ত্রিশ দশক থেকে বিলাতের শ্রমিক আন্দোলনের কেবলমাত্র আইনী পরামর্শদাতা নয়, ক্রমশ কমিউনিস্ট আন্দোলনের খুব নিকটে এসে পড়লেন।

১৯৩৩ এ জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ বা হিটলারের নাৎসীবাদ কায়েম হয়ে কমিউনিস্ট নিধনযজ্ঞ শুরু করেছে। হিটলার তার ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের প্রস্তুতি হিসাবে জার্মানির পার্লামেণ্ট 'রাইখস্ট্যাগ'-এ আগুন দিয়ে কমিউনিস্টদের ঘাড়ে সে দোষ চাপিয়ে তখনকার বার্লিনে বসবাসকারী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা জর্জি ডিমিট্রভকে গ্রেপ্তার করে লাইপজিগ বিচারালয়ে তথাকথিত মামলা শুরু করেছে। ডিমিট্রভের জেরায় নাৎসী বিচারালয় ত্রস্ত; তারা শেষ অবধি তাঁকে মুক্ত করতে বাধ্য হল (নাৎসী দমননীতি তখনও জার্মানিতে ভালো করে কায়েম হতে পারে নি)। এদিকে লণ্ডনে লাইপজিগ বিচারালয়ের পাণ্টা বিচারসভা বসালেন ডি. এন. প্রিট। এবং সেখানে রাইখস্ট্যাগে অগ্নি-সংযোগের সমস্ত মামলা ও শুনানী তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি ডিমিট্রভকে নির্দোষ ঘোষণা করলেন। ডিমিট্রভ ও প্রিটকে কেন্দ্র করে সেদিন বিশ্ব-জনমত একদিকে নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, অন্যদিকে বিশেষ করে খোদ ব্রিটেনে যখন রক্ষণশীল দলের নাৎসী তোষণের নীতি তাদের কমিউনিস্ট নিধনযজ্ঞে উৎসাহিত করে তুলছিল, একদা রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান প্রিটেরও রাজনৈতিক মতামত এবং ভাগ্য সেই সময়ই নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছিল।

প্রিট হয়ে দাঁড়ালেন ব্রিটেনের সংস্কারপন্থী লেবার পার্টির পক্ষেও বেশি বামপন্থী, প্রায়-কমিউনিস্ট। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতেই ফিনল্যাণ্ড-সোভিয়েত যুদ্ধে তিনি সোভিয়েতকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালে ব্রিটিশ লেবার পার্টি থেকে তখনকার মতো হলেন বহিষ্কৃত। আবার ১৯৪৫-এর সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টির টিকিটে পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হলেও অল্প দিনের মধ্যেই পুনরায় বহিষ্কৃত হলেন, কারণ লেবার পার্টির গভর্নমেণ্ট তখন মালয়ে, পরে আফ্রিকাতে, বর্বর ঔপনিবেশিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই সময়ে ১৯৫০-এর শেষে প্রিট ভারতে এলেন তেলেঙ্গানা কৃষকদের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা আদেশের বিরুদ্ধে হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টে, আপীলে। গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, সেদিন তেলেঙ্গানা কৃষকদের পক্ষে ব্রিটেনে এবং আন্তর্জাতিক যুব-

আন্দোলনেও বেশ বড়ো সমর্থন গড়ে তোলার পেছনে বিলাতে ও ইউরোপে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র আন্দোলনের কিছু অবদান আছে, এবং প্রিটকে ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা প্রধানত ঐ ছাত্র আন্দোলনের মারফতই সম্ভব হয়েছিল।

নিপীড়িত জনগণের নেতাদের পক্ষে (যেমন জোমো কেনিয়াটা) এই সময়ে প্রিট আফ্রিকা মহাদেশে গিয়েও দীর্ঘ সংগ্রাম চালান। মার্কিন মুলুকে ঠাণ্ডাযুদ্ধের শিকার রোজেনবার্গ দম্পতির প্রাণদণ্ডাজ্ঞা আন্দোলনের বিরুদ্ধেও প্রিটের সংগ্রাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মনে পড়ে, রোজেনবার্গ-দম্পতিকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে খুন (আমেরিকাতে ফাঁসি হয় না) করার পরের দিন হাইড পার্কে প্রিটের অগ্নিগর্ভ ভাষণ। কিন্তু বক্তৃতার শেষে অতো বড়ো সংযমী চরিত্রও কান্নায় ভেঙে পড়ল।

জীবনের শেষ কটা বছর প্রত্যক্ষ রাজনীতিগত ও আইনগত সংগ্রাম থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয়ে প্রিট' কয়েকটি বই লিখে গেছেন—তাঁর জীবনের চিত্তাকর্ষক স্মৃতিচারণ, যাতে বিলাতের ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশ থেকে পঞ্চাশ দশকের একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যাবে। এবং পরে লিখেছেন ব্রিটেনের আইন ও সমাজের বিবর্তনের মার্কসীয় ব্যাখ্যা।

আমরা তাঁর অমর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

দিলীপ বসু

ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন

ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন ভারতে এসেছিলেন ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে। এর আগে বিলেতে তিনি ছিলেন 'টেগোর সোসাইটি'র একজন উদ্যোক্তা; ভারতবর্ষ ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট কৌতূহল। ভারতে এসে তিনি ভারতশিল্পের একজন অনুরাগী হয়ে পড়েন; বিশেষ করে বাঙলার মন্দির সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ জন্মে। ফলত তিনি এদেশের অবহেলা ও অনাদরে রক্ষিত বাঙলার পোড়া-মাটির অলংকারযুক্ত মন্দিরগুলি সম্পর্কে দুঃখপ্রকাশ করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে এদেশের সংস্কৃতি-অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। অতুলনীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ বাঙলার এই পোড়ামাটির ফলক-সজ্জিত মন্দিরগুলি

কীভাবে অবহেলায় ও অযত্নে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে, বা এই সব মন্দিরগাত্রের অলংকরণ খুলে নিয়ে মন্দিরসজ্জায় বিকৃতি ঘটানো হয়েছে, অথবা মন্দির সংস্কারের নামে মন্দিরের যথার্থ অলংকরণ সজ্জা নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে—এই সব নিয়েই ডেভিডের চিন্তাভাবনা শুরু হয়, আর তারই সঙ্গে চলতে থাকে তাঁর মন্দির গবেষণা। প্রায় দশ বছর ধরে তিনি উভয় বাঙলার গ্রাম-গ্রামান্তরে তন্ন তন্ন করে ঘুরে বেড়িয়েছেন মন্দিরের সন্ধানে এবং মন্দির-গাত্রের আগাছা ধ্বংস করার জন্যে আগাছা-ধ্বংসী ওষুধ 'ট্রি-কিলার' সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছেন মন্দির বাঁচানোর জন্যে। এক-একটি মন্দিরের আলোকচিত্র নিয়েছেন বহু সংখ্যায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে—কেননা এসব মন্দিরের আয়ুষ্কাল যে কোনো একদিন শেষ হয়ে যেতে পারে; তখন আজকের তোলা এই আলোক-চিত্রসম্ভারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কোনো বিশেষ স্থাপত্য বা ভাস্কর্য-বৈশিষ্ট্য হয়তো পরবর্তীকালের গবেষকদের কাজে লাগবে। বাঙলার মন্দির-মসজিদের ছবি তোলায় কৃপণতা ছিল না তাঁর, ছিল 'ফটোগ্রাফিক ডকুমেণ্টেশান' করার একান্ত ইচ্ছে। এরই সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মন্দিরগুলি সম্পর্কেও বিশেষভাবে গবেষণা চালিয়ে যান, যথাযথ আলোকচিত্রও গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতের মন্দির-শিল্প সম্পর্কেই তাঁর 'ফটোগ্রাফিক ডকুমেণ্টেশান' ও তৎসহ যথাযথ তথ্যসংগ্রহ করার অপ্রতিহত চেষ্টা শুরু হয়।

তবে বাঙলার পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত মন্দিরের দিকেই ডেভিডের ঝোঁক ছিল বেশি। আর এ নিয়ে তিনি প্রবন্ধও লিখেছেন অনেক—মন্দিরের স্থাপত্য, বিবর্তন এবং মন্দিরসজ্জা ও অলংকরণ বিন্যাস সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধই তাঁর এই গবেষণা কর্মের প্রমাণ। এ ছাড়া জনগণনা দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত 'ডিস্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক'-এ হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি প্রভৃতি জেলার মন্দির সম্পর্কে তাঁর লিখিত বিস্তারিত বিবরণই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ডেভিডের এই কর্মপ্রচেষ্টার কথা। বলতে গেলে বাঙলার মন্দির নিয়ে এমন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কাজ ইতিপূর্বে আর কেউই বোধহয় শুরু করেন নি। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা দপ্তর বাঙলার প্রাচীন মন্দির ও পরবর্তীকালের ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের কিছু মন্দির-মসজিদ নিয়ে সমীক্ষা করেছেন, এ ছাড়া উভয় বাঙলার মন্দিরের সঠিক তথ্য অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। সেই বিষয়েই ডেভিড রচনা করে চলেছিলেন বাঙলার মন্দির সম্পর্কে সুবিপুল তথ্যভাণ্ডার। তাঁর এই বিরাট কাজ হয়তো একদিন শেষ হয়ে যেত—আমরা বাঙলা তথা

ভারতের মন্দির সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণার এক পুস্তক হয়তো লাভ করতাম, আমাদের অতীত সংস্কৃতি-গৌরবের পরিচয় পেয়ে হয়তো ধন্য হতাম ; কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। বিগত ১২ই জানুয়ারি (১৯৭২) হঠাৎ মারাত্মক পোলিও রোগের আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হল উডল্যাণ্ড নার্সিং হোমে।

তাঁর কাজ অসমাপ্তই রয়ে গেল। তবু সান্ত্বনা যে বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার মন্দির নিয়ে তাঁর দুখানা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং বাঙলার মন্দির নিয়ে তাঁর লেখা 'লেট মিডিয়াভ্যাল টেম্পলস অব বেঙ্গল' নামে তথ্যপূর্ণ একটি পুস্তক এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশের অপেক্ষায়।

ডেভিডের জন্ম ১৯৩০ সালে, ইংলণ্ডের কভেন্ট্রিতে। স্কুলের বিদ্যাশিক্ষা শেষ করেন ১৯৪৮ সালে তারপর আঠারো মাস ধরে দেশের আইনানুযায়ী মিলিটারি সার্ভিসে কর্মরত থাকেন। ১৯৫৩ সালে কেম্ব্রিজের যেশাস কলেজ থেকে 'ট্রাইপস্' এবং ১৯৫৭ সালে কেম্ব্রিজের স্নাতকোত্তর হন। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল অবধি ফ্রান্সে শিক্ষকতা করেন এবং ১৯৫৭ সালে বিশ্ব-ভারতীতে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তারপর ১৯৬০ সালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষা সাহিত্যের লেকচারার হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৬৪ সালে ঐ বিভাগের রীডার পদে উন্নীত হন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী এই বিদেশী শিক্ষকের বড়ো পরিচয় ছিল ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষা সাহিত্যের একজন বিদগ্ধ সমালোচক হিসেবে। আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলিই তাঁর এই সাহিত্য সচেতনতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। অন্যদিকে ডেভিড ভাষা সাহিত্যের ছাত্র হয়েও মন্দির গবেষণার এই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছিলেন। কোনো ট্রাস্ট, ফাণ্ড বা সরকারী সাহায্য না নিয়েই নিজের স্বোপার্জিত অর্থ দিয়ে তিনি বহু কষ্ট ও দৈন্যের সঙ্গেই এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। শুধু কি বাঙলার মন্দির নিয়ে গবেষণা, তিনি এদেশের অবহেলিত চিত্রকর পটুয়াদের জীবন ও শিল্পকর্ম নিয়েও গবেষণারত ছিলেন। এছাড়াও বাঙলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে থাকা অজানিত প্রাচীন মূর্তি ও ভাস্কর্য সম্পর্কেও তিনি তথ্য সংগ্রহে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাঙলার পট ও পটুয়া এবং ভারতীয় মূর্তিতত্ত্ব সম্পর্কেও দু-একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

কিন্তু এই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, ভারত-পথিক ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন

চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে রইলেন এদেশের মাটিতে—ভবানীপুর সেমেট্রির প্রাঙ্গণে। উত্তরকালের গবেষকদের জন্যে বাঙলা তথা ভারতের মন্দিররাজির যে সংহত সামগ্রিক চিত্র তিনি রেখে যেতে পারতেন, তা আর হয়ে উঠল না। তবে আশার কথা, তাঁর সুবিশাল আলোকচিত্র ও তথ্যসম্ভার তিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে বিলেতের ভিক্টোরিয়া এলবার্ট মিউজিয়মকে দান করে গেছেন। জানিনা, এরপর মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ তাঁর এই সংগৃহীত মালমসলার কি সদ্গতি করবেন।

ডেভিড আমাদের কাছে, বিশেষ করে বাঙালিদের কাছে, অমর হয়ে রইলেন এইসব অবহেলিত গ্রাম বাঙলার মন্দিরের পরিচয় তুলে ধরার আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ হিসেবে।

তারাপদ সাঁতরা

সরোজকুমার রায়চৌধুরী : ১৯০৩-১৯৭২

সরোজকুমার রায়চৌধুরী চলে গেলেন, উনসত্তর বছর বয়সে, ১৯৭২ সালের ২৯ মার্চ। কেউ তাঁকে নিয়ে তেমন হৈ-হুল্লোড় করলেন না, শোকার্ত হলেন না। লেখালেখিও হয়েছে কমই। অথচ, অন্তর থেকে সবাই উপলব্ধি করলেন, বাঙলা সাহিত্যের আরেকটি নক্ষত্র-পতন হল।

এ বড় আশ্চর্য ঘটনা, দুঃখের বিষয়।

অবশ্য সরোজবাবু নিজেও হৈ-হুল্লোড় পছন্দ করতেন না, আত্মপ্রচারে উদাসীন ছিলেন। এবং এই উদাসীনতাই তাঁকে শেষ জীবনে নিঃসঙ্গ, নিরুপায় এবং অভিমানী করে তুলেছিল।

তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনকে বড় সময়ের পরিধিতে বিচার না করলে মানুষকে খাটো করে দেখা হয়। সাহিত্যের যথার্থ মুক্তি, সেই জীবনের সমগ্রতার মধ্যে, আয়ত পরিবেশে। সেজন্যেই দরকার নিহিত কালজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। সময়ের গ্রাহ্যসীমার মধ্যে জীবনের যে-প্রকাশ, তা খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ। কেননা, জীবন বিস্তৃত হয়ে আছে অতীতের অভিজ্ঞতার ভেতর, আগামীকালের সম্ভাবিত স্বপ্নের মধ্যে।

'১৩৫২ সালের সেরা গল্প'-র ভূমিকায় সম্পাদক হিসেবে তিনি লিখেছিলেন

"গল্পলেখকের কাছে সমাজও বড় নয়, অর্থনীতিও বড় নয়। সেগুলি রসসৃষ্টির উপাদান মাত্র। বিচিত্র ঘটনার সংঘাতে অথবা একটা বিশেষ পট-ভূমিকার সামনে মানবমনের যে অপরূপ প্রকাশ, আসলে তাই তাকে আকর্ষণ করে। সেইটেই হচ্ছে গল্পের চিরন্তন আবেদন।···আজকের রাজনীতি কাল হয়ত বাতিল হয়ে যাবে, আজকের অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক আবেষ্টনের কাল হয়ত চিহ্নও থাকবে না, কিন্তু মানুষের কাছে যে আবেদন তা সর্বকালেই এবং সর্বদেশেই সমান প্রবল। সাহিত্যের পরমায়ু তারই মধ্যে নিহিত। রাজনৈতিক মতবাদের তর্কের ঝড়ে, সেকথা যেন আমরা ভুলে না যাই।"

তবুও সময়ের প্রত্যক্ষতায় তিনি ধরা দিয়েছেন কখনো কখনো, স্ব-ভাবকে অস্বীকার করে, সময়ের দাবিকে মান্য করে। এমন কি, যে-রাজনীতিকে তিনি বাতিলযোগ্য মনে করতেন, সেই রাজনৈতিক চেতনায় আচ্ছন্ন হয়েই লিখলেন একটি উপন্যাস—'কৃশাণু'। প্রকৃত সমাজসচেতন শিল্পীর মতোই, সরোজবাবু দেখিয়েছেন, স্বাধীনতার শুদ্ধ আবেগও কিভাবে ক্ষমতার লোভে বিকৃত হয়ে যায়, আদর্শের অপমৃত্যু ঘটে।

এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 'শ্রী' এককালে ঘোষণা করেছিল, স্বামীর চেয়ে ধর্মের চেয়ে দেশ অনেক বড়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর সে তার প্রতিশ্রুতি ভুলেছে, আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের বড় কর্তা, ব্যবসায়ী নৃপেন তার অন্যতম সমর্থক। নৃপেন তাকে মন্ত্রিত্ব দিয়েছে, খদ্দরের মোহ ভুলিয়ে সিল্কের শাড়ি ধরিয়েছে। কিন্তু নিজের ভাই বিপিনকে হাতের মুঠোয় রাখতে পারে নি। কমিউনিস্ট বিপিন বুঝেছে: "যে-প্রতিষ্ঠানে আমার দাদা সভাপতি, দুর্নীতি যে-গবর্নমেণ্টকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, মধুর লোভে ভাগ্যান্বেষীর যেখানে ভিড় জমে গেছে"—সেই সমাজের আমূল পরিবর্তন দরকার।

এই পরিবর্তন চেয়েছেন আরেকজন মানুষ, এ উপন্যাসের আদর্শবাদী কংগ্রেসনেতা ভুজঙ্গবাবু। এককালে তিনি বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। এখনও সে বিশ্বাস হারান নি। এদিক থেকে বিপিন ও ভুজঙ্গবাবু, মতাদর্শের ব্যবধান সত্ত্বেও, সমসত্তাবিশিষ্ট। উভয়েই এই অপশাসনের পতন চান।

আশ্চর্য তাঁর এই দেখার চোখ, এই দৃষ্টিভঙ্গি। নিজের বিশ্বাস এবং আদর্শকে তিনি, সময়ে বিন্যস্ত করে, সঞ্চারিত করেছেন ভুজঙ্গবাবুর মধ্যে, তাঁর জীবন-চেতনায়। ভুজঙ্গবাবু যেমন সামগ্রিকভাবে নৃপেনের মতো অসৎ কংগ্রেসীর

পাল্লায় পড়ে কিছুকাল কাগজের সম্পাদনা করেছেন, সেই অভিজ্ঞতা কি সরোজবাবুরই কম ছিল ?

সরোজবাবুর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি ? এ বিষয়ে নানাজনের নানামত হওয়া সম্ভব। অনেকেই তাঁর ট্রিলজি—'ময়ূরাক্ষী' 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা'র নাম করবেন। কেননা, এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তাঁর ধারণার সর্বাধিক পুষ্টি ও বিকাশ ঘটেছে।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, 'সোমলতা' বেরিয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সময়ে।

সরোজবাবু, এই ত্রয়ী উপন্যাসে, নদীর সমান্তরাল যে-জীবন, যে-জীবনের ধারা, তাকেই বিশদ করেছেন লোকায়ত পটভূমিতে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র সঙ্গে এর তুলনা চলে না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী'র স্রোতোধারাও অন্যরকম। সরোজবাবুর 'ময়ূরাক্ষী' মানুষী অবয়ব পেয়েছে 'বিনোদিনী' নামে। বিনোদিনী তাঁর ট্রিলজির নায়িকা।

'ময়ূরাক্ষী'তে বিনোদিনী চাষী-গৃহস্থের বউ, হারানের স্ত্রী। দিনের বেলা সে পরিশ্রম করে অমানুষিক, স্বামী-সন্তানের প্রতি কর্তব্যপরায়ণা। কিন্তু রাত্রির গভীরতায় সে রহস্যময়ী। একদিকে তার ঘরের উঠোন, অন্যদিকে বৈষ্ণবের আখড়া। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে সে কক্ষচ্যুত হয়েছে 'গৃহ-কপোতী'তে– বাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়েছে।

কিন্তু বিনোদিনী তো থামবার নয়।

সে আবার বাঁক নিয়েছে পরিণামের দিকে। যদিও গৌরহরির স্বপ্নসাধনার অস্পষ্ট স্মৃতি তার বুকে দিগন্তের ডাক শোনায়, তবুও হারানই তার অনেকটা আশ্রয়ের মতো, বাস্তব সত্যের মতো। বিনোদিনী অনুভব করে: "তার দীর্ঘছন্দ বলিষ্ঠ দেহের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালে কত ভরসা জাগে। অমন পুরুষ তো চোখে আজও পড়ল না।"

বিনোদিনীর জীবনের তিনটি স্তরে তিনজন পুরুষ। বাস্তবে হারান, দিগন্তের মতো গৌরহরি, এবং অনাবশ্যক উৎপাতের মতো তারাপদ। প্রথম দুজনের আহ্বানকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। ঘরে বসেও সে গৌরহরির ডাক শুনতে পায়। কিন্তু তারাপদ ?

সে শহুরে এবং কৃষিনির্ভর জীবনের অন্তঃসত্তার সঙ্গে বেমানান, সেজন্যেই বর্জিত। এই জীবনের পরিবর্তন হলে, ময়ূরাক্ষীর তীরে কলকারখানা স্থাপিত

হলে, তারাপদরও হয়তো একটা ভূমিকা নির্দিষ্ট হবে।

কিন্তু সে সময় তো এখনো আসে নি। ময়ূরাক্ষী এখনো আপন স্বভাবেই বয়ে চলেছে।

সরোজ রায়চৌধুরীর জন্ম ১৯০৩ সালের ২১ আগস্ট, গিরিডিতে। মুর্শিদাবাদের মালিহাটি গ্রামে ছিল তাঁর পিতৃপুরুষের বাস। ছেলেবেলার দিনগুলি কাটিয়েছেন ছোটনাগপুর অঞ্চলে। কলেজে পড়ার সময় তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। আন্দোলন যখন থামল, তখন নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে এলেন কলকাতায়। 'জাতীয় বিদ্যালয়' থেকে বি. এ. পাশ করলেন বেশি বয়সে।

এই বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি সুভাষচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। পরে সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। সাংবাদিকতাই তাঁর জীবনের অন্যতম পেশা হয়ে ওঠে। কিছুকাল কাজ করেছেন 'বৈকালী' 'নায়ক' প্রভৃতি কাগজে।

পরে, 'আত্মশক্তি' যখন 'নবশক্তি' নামে বেরোয়, তখন রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের একটা লেখা ছাপার জন্য তিনি কিছুকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৭ সালের 'আত্মশক্তি'তে বেরোয় তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম গল্প 'রমানাথের ডায়েরি'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। এই দীর্ঘজীবনে তিনি যে-সব বই লিখেছেন তার তালিকা মোটামুটি নিম্নোক্তরূপ :

উপন্যাস : বন্ধনী, শৃঙ্খল, আকাশ ও মৃত্তিকা, পান্থনিবাস, বসন্তরজনী, ঘরের ঠিকানা, ময়ূরাক্ষী, গৃহকপোতী, সোমলতা, হংসবলাকা, শতাব্দীর অভিশাপ, কৃষ্ণা, কালো ঘোড়া, মহাকাল, কৃশানু, অনুষ্টুপ ছন্দ, নীলাঞ্জন, সোমসবিতা, তিমির বলয় (২ খণ্ড), মধুমিতা, শুক্লসন্ধ্যা, নাগরী, পূর্বপাড়ার মেয়ে, জীবনের প্রথম প্রেম, উত্তর তোরণ, মকর কেতন, নচিকেতা, নীল আগুন, হংস মিথুন।

গল্পগ্রন্থ : মনের গহনে, দেহ-যমুনা, ক্ষণবসন্ত, শ্মশান ঘাটে, বহ্ন্যুৎসব, ক্ষুধা, রমণীর মন, সন্ধ্যারাগ, বহু নির্বাচন, শ্রেষ্ঠ গল্প, ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।

রম্যরচনা : মধুচক্র।

নাটক : হালদার সাহেব।

কিশোর সাহিত্য : কিশোর গ্রন্থাবলী, গল্প আমার অল্প নয়, রাজার কুমার।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি

কার্তিক লাহিড়ী

যে কোনো শিল্পের আলোচনার মতোই উপন্যাসের আলোচনায়ও সামগ্রিকতা বাঞ্ছনীয়। এ সামগ্রিকতা কেবলমাত্র ঔপন্যাসিকের সাধ ও বক্তব্য নির্ভর নয়, তাঁর অবলম্বিত রূপায়ণ-পদ্ধতি নির্ভরও বটে। বাংলা উপন্যাসের আলোচনা এ যাবৎকাল যতখানি বিষয়-বস্তু সংক্রান্ত ততখানি প্রকরণগত নয়। ডঃ কার্তিক লাহিড়ীর এই গ্রন্থটি তাই বাংলা উপন্যাস-সমালোচনা সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন। সূচনাকাল থেকে প্রত্ন পর্যায়, নব পর্যায় এবং আধুনিক পর্যায়, বাংলা উপন্যাস তার কাঠামো ও প্রকরণে, রূপকল্প ও প্রযুক্তিতে কি ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে তারই বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। 'কাব্য-শরীর' নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই, 'উপন্যাস-শরীর' নিয়ে এ জাতীয় আলোচনা বাংলায় এই প্রথম।

দাম : দশ টাকা

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

পরিচয়
বর্ষ ৪১ । সংখ্যা ১২
আষাঢ় ১৩৭৯

সূচিপত্র

বিয়োগপঞ্জী

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ । হিরণকুমার সান্যাল ১১১৯

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । অমিতাভ দাশগুপ্ত ১১২২

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদ : বিশ্বরঞ্জন দে

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতা বাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

পরিচয়
বর্ষ ৪১। সংখ্যা ১২
আষাঢ় ১৩৭৯

বাঙলাদেশে শিল্পভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ও কুটিরশিল্পের বিলুপ্তি

সরোজকুমার ভৌমিক

বাঙলাদেশে কৃষক-শোষণ ও কৃষিশিল্পভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব—এই প্রসঙ্গের আলোচনায় অপর একটি প্রবন্ধে বলেছিলাম, পঞ্চদশ শতকে ইংল্যাণ্ডেও Capitalist farming অর্থাৎ পুঁজিবাদী কৃষিব্যবস্থা ক্রমশ বিস্তারলাভ করতে দেখা গেছে এবং সেখানেও কৃষকদের ভূমির মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মার্কস এটাকেই "Progressive destruction of peasantry"[১] বলে অভিহিত করেছেন। পুঁজিবাদী কৃষিব্যবস্থার বিস্তার, জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ ও জমির মালিকানার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হবার ফলে সেখানকার গ্রামীণ কুটিরশিল্প ও কৃষিকর্মের মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছেদ ঘটে। ইংল্যাণ্ডের গ্রামীণ কুটিরশিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প ছিল বয়নশিল্প। গ্রামীণ কুটিরশিল্প ও কৃষিকর্মের পারস্পরিক বিচ্ছেদের মধ্য দিয়েই সেখানে গড়ে ওঠে ইনডাসট্রিয়াল ক্যাপিটাল অর্থাৎ শিল্পভিত্তিক আধুনিক পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্র। জেলা ও গ্রামগুলিতে Capitalist farming অর্থাৎ পুঁজিবাদী কৃষিব্যবস্থার উত্তরোত্তর অনুপ্রবেশের ফলে চাষীদের অবস্থা ক্রমশই দরিদ্র থেকে অধিকতর দরিদ্র হতে থাকে। মার্কস লিখেছেন—"Thus hand in hand with the expropriation of the self-supporting peasants, with their separation from their means of production, goes the destruction of rural domestic industry, the process of separation between manufacture and agriculture. And only the destruction of rural domestic industry can give the internal market of a country that extension and

consistence which the capitalist mode of production requires…”[২] অর্থাৎ স্ব-নির্ভর কৃষকদের নিজ নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের ফলে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গেও তাদের বিচ্ছেদ ঘটে ; ফলে গ্রামীণ কুটির-শিল্পের বিলুপ্তি পাশাপাশি চলে। এভাবেই গ্রামীণ কুটিরশিল্পের উৎপাদন ও কৃষিকর্মের পারস্পরিক বিচ্ছেদ ঘটে। এবং কেবল মাত্র গ্রামীণ কুটিরশিল্পের ধ্বংসসাধনই কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকে সেই ব্যাপ্তি ও দৃঢ়তা দিতে পারে যা পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য। আবার একথাও মনে রাখা দরকার যে পুঁজিবাদী উৎপাদন জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রকে আংশিক-ভাবে অধিকার করে এবং চূড়ান্ত ভিত্তি হিসেবে শহরের হস্তচালিত শিল্পকর্ম ও গ্রামীণ কুটিরশিল্পগুলির উপর নির্ভর করে। পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা শহরের হস্তচালিত শিল্পকর্ম ও গ্রামীণ কুটিরশিল্পগুলিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক হিসেবে ধ্বংস করে আবার কোনো কোনো অঞ্চলে সেই শিল্পগুলিকেই অন্যরূপে বাঁচিয়ে রাখে। কারণ ঐ শিল্পগুলিই অন্যরূপে একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত পুঁজিবাদী উৎপাদনকর্মের জন্য অপরিহার্য কাঁচামাল হিসেবে কাজ করে। ফলে গ্রামাঞ্চলে এরূপ একটি নতুন শ্রেণী জন্মলাভ করে যারা পুঁজিবাদী উৎপাদনে শিল্পশ্রমিকের কাজকেই মুখ্য উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করে ; কৃষি-কর্ম তাদের কাছে সাহায্যকারী বা আনুষঙ্গিক বৃত্তি হিসেবে গণ্য হয় ; শুধু তাই নয়, শিল্পশ্রমিক রূপে তারা যা উৎপাদন করে তা উৎপাদনকারী অর্থাৎ শিল্পের মালিকের নিকট নিজেরাই বিক্রয় করে অথবা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যবর্তী কোনো ব্যবসায়ীর মাধ্যমে উৎপাদনকারীর নিকট বিক্রয় করে। পূর্বেই বলেছি, বিগত পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকেই capitalist farming অর্থাৎ পুঁজিবাদী কৃষিব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনে অনুপ্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে এবং তা কৃষকদের ধ্বংস করতে থাকে। ইংল্যাণ্ড এককালে কৃষিভিত্তিক দেশ ছিল। আধুনিক শিল্পই কেবলমাত্র পুঁজিবাদী কৃষিব্যবস্থাকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে পারে ; এর ফলে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিপুল সংখ্যক কৃষক বাস্তু ও বৃত্তিচ্যুত হওয়ায় গ্রামীণ কুটিরশিল্প ও কৃষিকর্মের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে, ফলে সুতো কাটা ও গ্রামীণ বয়নশিল্প নষ্ট হয়ে যায়। এই সুতো কাটা ও গ্রামীণ বয়নশিল্পই ছিল গ্রামীণ কুটিরশিল্পের মূল। এই ভাবেই ইংল্যাণ্ডের অভ্যন্তরীণ বাজার পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার আওতায় আসে।

পূর্বে চাষীরা স্বাধীন ছিল,-তারা ছিল স্ব স্ব কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল। নতুন পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার অনুপ্রবেশের ফলে চাষীরা সুতো কাটার ও কাপড় বোনার বড় বড় কারখানায় অথবা বড় কৃষিখামারে দিনমজুর হিসেবে জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হল। পূর্বে যখন চাষীরা স্বাধীন ছিল তখন প্রতিটি কৃষক পরিবার জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কাঁচা মাল নিজেরা উৎপাদন করত। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আবির্ভাবের ফলে সেই সকল উপকরণ ও কাঁচামাল পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হল; বিত্তবান ও বড় বড় পুঁজিপতি চাষীরা সেই পণ্যসামগ্রীর বিক্রেতা, আর দরিদ্র ভূমিহীন চাষী ও দিনমজুর সেই পণ্যসামগ্রীর ক্রেতা। পশমী সুতো, লিনেন বা মোটা পশমী কাপড়ের উপাদান যা এতদিন সাধারণ চাষী নিজেই নিজেদের চাহিদা অনুসারে উৎপাদন করত, এখন সেগুলি পুঁজিপতিদের উৎপন্ন পণ্যে পরিণত হল এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে এই পণ্যসামগ্রী বিক্রয় হতে লাগল। তখন থেকেই শিল্পভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রের প্রয়োজনে অসংখ্য ছোট ছোট উৎপাদনকারী তৈরি হল। এইভাবেই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির মুনাফা ও বৃহৎ পুঁজিপতি সৃষ্টির পথ তৈরি হল। পুর্বে যে ছোট ছোট চাষী পরিবার নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরাই পুর্বোক্ত পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করত এখন সেই সকল ক্ষুদ্র চাষী ও চাষী পরিবারগুলি একজন বা কয়েকজন পুঁজিপতির উৎপাদন-শিবিরে সমবেত। পুর্বে তারা নিজেদের প্রয়োজনে পৃথকভাবে কৃষিকাজ করত, সুতোও কাটত কাপড়ও বুনত। এখন তারা পুঁজিপতি মালিকের স্বার্থে সমবেতভাবে কাজ করে এবং পুঁজিপতি মালিক ও উৎপাদক তাদের দিয়ে সুতো কাটায়, কাপড় বোনায়। পূর্বে যে টেকো, তাঁত ও বয়নের উপকরণ চাষী ও সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে সারা দেশে ছড়িয়ে ছিল, এখন সেই টেকো তাঁত ও বয়নের উপকরণ পুঁজিপতি মালিকের উৎপাদনাত্মক শ্রমশিবিরে কেন্দ্রীভূত হল; শুধু তাই নয়, যে চাষীরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ঘরে উৎপাদন করত আজ তারাই পুঁজিপতিদের উৎপাদনাত্মক শ্রমশিবিরে শ্রমিক হিসাবে জমায়েত হল। টেকো, তাঁত ও বয়নের উপকরণ যা এতদিন ছিল চাষী তাঁতিদের স্বাধীন জীবনযাত্রার অবলম্বন, আজ সেগুলিই চাষী তাঁতিদের পরিচালকশক্তি ও তাদের শ্রম-শোষণের উপায় ও উপকরণে রূপান্তরিত হল।[৩] এ প্রসঙ্গে মার্কসের উক্তিটি এইরূপ—"And spindles, looms, raw materials are now transformed, from means of independent existence for the

spinners and weavers, into means for commanding them and sucking out of them unpaid labour."

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইংল্যাণ্ডে শিল্পভিত্তিক পুঁজিতন্ত্র চাষী, তাঁতি ও অন্যান্য গ্রামীণ কুটিরশিল্পীদের চাষের জমির মালিকানার অধিকার থেকে এবং বয়নশিল্প ও সুতো কাটা ইত্যাদি স্বাধীন বৃত্তি থেকে বিচ্যুত করে একদিকে কৃষিকর্ম ও গ্রামীণ কুটিরশিল্পের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের সূচনা করে এবং অপর দিকে সাধারণ চাষী, তাঁতি ও সুতোকাটা লোকদের স্ব স্ব স্বাধীন বৃত্তি বিচ্যুত করে নবজাত শিল্প-কৃষি ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্র ও পুঁজিপতিদের উৎপাদনাত্মক শ্রমে দিনমজুরে পরিণত করে তাদের স্বাধীনতাকে হরণ করে এবং শ্রমিক-শোষণের পথ প্রস্তুত করে। এতে ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতি ও উৎপাদনব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। বিগত অষ্টাদশ শতকে বাঙলা-দেশেও ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল কি? অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তথা নবাগত পুঁজিতন্ত্রের এদেশের শাসন-ক্ষমতায় আসীন হওয়ার ফলে বাঙলাদেশের অর্থনীতি ও উৎপাদনব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল কি?

নবাব আলিবর্দী খাঁ-র শাসনকালে তাঁতিদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ছিল। তারা স্বাধীনভাবে উৎপাদনকার্য সম্পন্ন করত। সেক্ষেত্রে বিশেষ কোনোরূপ উৎপীড়ন, বাধানিষেধ ও সীমাবদ্ধতা ছিল না। উৎপন্ন দ্রব্য কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিকট বিক্রয় করারও কোনোরূপ বাধ্য-বাধকতা ছিল না। তাঁতি পরিবার নিজেদের পুঁজি খাটিয়ে নিজেরাই উৎপাদন করত এবং উৎপন্ন দ্রব্য ইচ্ছানুসারে যে কোনো লোকের নিকট বিক্রয় করত। এ প্রসঙ্গে Bolts-এর উক্তিটি প্রামাণ্য।[৪] Verelst-এর লেখা ও তৎকালীন সরকারী চিঠি থেকেও Bolts-এর উক্তির প্রামাণ্যতা স্বীকৃত।[৫]

১৭৫৭ সালের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর কোম্পানির গোমস্তাদের অত্যাচার অদমনীয় হয়ে ওঠে। তাঁতিদের কাছ থেকে বলপূর্বক অর্থ আদায় এবং তাদের উপর অবৈধ ও অযৌক্তিক দাবির ফলে তাঁতিদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। তখন থেকেই উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্যের মান দ্রুত নিম্নাভিমুখী হতে থাকে। এটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। কারণ তাঁতি এবং অন্যান্য কুটির-শিল্পীরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে উৎপাদন করতে বাধ্য হল, এবং সেই উৎপাদনের মূল্য

নিয়মবিরুদ্ধ ও স্বেচ্ছাচারীরূপে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।[৬] একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে গোমস্তারা মধ্যবর্তী লোক বা দালাল হিসেবে নিজেদের ও কোম্পানির স্বার্থে উৎপাদনকারী তাঁতিদের উৎপাদনের উপর নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপ করে ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য স্বেচ্ছাচারীভাবে তাঁতিদের উপর চাপিয়ে দেয়। যে তাঁতিরা পূর্বে স্বাধীনভাবে উৎপাদন করত ও প্রয়োজনীয় মূল্যের বিনিময়ে সেই উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করত, এখন তাদের সেই উৎপাদন কোম্পানি বা কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় নিযুক্ত মধ্যবর্তী লোক বা দালাল কর্তৃক নির্ধারিত ও আরোপিত নিয়মের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ এবং তাঁতির শ্রমজাত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য কোম্পানি বা গোমস্তাদের দ্বারা নির্ধারিত। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁতি শ্রমের স্বাধীনতা এবং শ্রমজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের স্বাধীনতা দুই-ই হারাতে আরম্ভ করেছে। স্বাধীন তাঁতশিল্পী পরাধীন তাঁতশ্রমিকে রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করেছে। তাঁতি, তার শ্রম ও শ্রমজাত দ্রব্য—সব কিছুই, ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ও তাদের পক্ষপুটে আশ্রিত এবং তাদের দ্বারা নিয়োজিত মধ্যবর্তী লোক বা দালালের কর্তৃত্বাধীন হতে আরম্ভ করেছে। এই অবস্থার আবির্ভাব বাঙলাদেশে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রেরই আবির্ভাবের সূচনা করে।

১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রচেষ্টায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে তখন থেকে তাঁতি ও অন্যান্য শিল্পের উৎপাদনকারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তারা বহুলাংশে ব্রিটিশ কোম্পানির কর্তৃত্বাধীনেই থেকে গেল। কোম্পানির নিকট থেকে অগ্রিম টাকা নেওয়া সত্ত্বেও অনেক তাঁতি কোম্পানির চাকুরী পরিত্যাগ করতে চাইল। তখন তাঁতিদের উক্ত চাকুরী ত্যাগ থেকে বিরত করার জন্য Provincial Council of Revenue-কে Board of Trade-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয় নি। অতঃপর আইনের সাহায্যে নির্দেশ দেওয়া হল যে অগ্রিম অর্থ গ্রহণকারী তাঁতিদের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে এবং উৎপাদনজাত দ্রব্যসামগ্রী কোম্পানি বা কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিকট অর্পণ করতেই হবে এবং কোম্পানির প্রতিনিধিদের ক্ষমতা দেওয়া হল তাঁরা যেন পেয়াদা নিয়োগ করে তাঁতিদের সংযত ও দমন করেন। যদিও ১৭৭৩ সালের ১২ই এপ্রিল কোম্পানির সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল—"That all weavers and manufacturers shall, in

future, have full liberty to work for whom they please and shall, on no pretence whatever, be obliged to receive advances against their inclination," কোম্পানির এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁতিদিগকে কোম্পানি বা অন্য কোনো ব্যবসায়ীর নিকট থেকে অগ্রিম টাকা নিতে বাধ্য করা হবে না, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁতিদিগকে অগ্রিম নিতে বাধ্য করা হত।[৮] কোম্পানি বা কোম্পানির গোমস্তা বা কনট্রাকটরদের নিকট থেকে অগ্রিম গ্রহণ করার অর্থই হল উৎপাদন অব্যাহত রাখা ও উৎপন্ন দ্রব্য অগ্রিমদাতার নিকট পূর্বনির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য থাকা। শুধু এই নয়, Contract system অর্থাৎ বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানি, কোম্পানির গোমস্তা বা প্রতিনিধি ও উৎপাদনকারী তাঁতির মধ্যে যে চুক্তির প্রথা চালু ছিল তাতে কোম্পানির নামে গোমস্তা বা প্রতিনিধিরা তাদের চুক্তিমতো কাজ করার জন্য নানারূপ দমন-পীড়ন করত। কোম্পানিও তাঁতিদের উপর দমন-পীড়নে গোমস্তা বা প্রতিনিধিদের উৎসাহ দিত। ফলে তাঁতিদের মধ্যেও কোম্পানিকে ফাঁকি দেবার নানা প্রকার ফন্দী-ফিকিরের প্রবণতা ও অবাধ্যতা দেখা গেল। তাঁতিদের এ ধরনের আচরণ সম্পর্কে John Bebb-এর উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—"Nothing can be done with the weavers without they are paid a price more equal to their labour than they receive at present."[৯] John Bebb-এর এই উক্তি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে তাঁতিরা অর্থাৎ কুটিরশিল্পীরা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার জালে আবদ্ধ হয়েছে, তারা তাদের শ্রমকে পণ্য হিসেবে বিক্রয় করছে কোম্পানির কাছে, কিন্তু সেই শ্রমের যথোপযুক্ত মূল্য থেকে তারা বঞ্চিত। পুঁজিতন্ত্রের কবলে পড়ে শ্রমিক-শিল্পী তার স্বাধীন সত্তাকে হারায়, আপন শ্রমের উপর আপন অধিকার লুপ্ত হয়; যে বৃত্তি পূর্বে ছিল তার স্বাধীন জীবনযাত্রার অবলম্বন এখন সেই বৃত্তিই পুঁজিপতির হাতের হাতিয়ার হয়ে শ্রমিক-শিল্পীর অর্থাৎ তাঁতির শ্রমশোষণের কাজ করছে। এ প্রসঙ্গে মার্কসের উক্তি পূর্বে উল্লেখ করেছি। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকে বাঙলাদেশে বিদেশী বণিক কোম্পানিগুলি দ্বারা যে শিল্পভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে সেই পুঁজিতন্ত্র তাঁতির শ্রম ও শ্রমজাত সৃষ্টির মধ্যে যে নিবিড় একাত্মতা তা হরণ করেছে। অর্থাৎ পূর্বে তাঁতির শ্রম ও শ্রমজাত পণ্যের মাধ্যমে তার সমগ্র

জীবনচেতনার যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে, পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে শ্রম-শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমচেতনা, শ্রম ও শ্রমজাত সামগ্রীর মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই শ্রমচেতনার সঙ্গে শ্রমের ও শ্রমিকের আত্মিক বিচ্ছেদকেই মার্কস বলেছেন alienation। এই বিচ্ছেদের ফলে উৎপন্ন পণ্যের গুণগত মানের অবনতি ঘটেছে। বয়ন ও উৎপন্ন পণ্যের গুণগত মানের অবনতি লক্ষ্য করে কোম্পানি বাঙলাদেশের তাঁতশিল্পীদের বস্ত্র উৎপাদন, অগ্রিম গ্রহণ ও বিক্রয়ের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতাদানের সংকল্প ঘোষণা করেন।[১০] John Bebb-এর উক্তি থেকে প্রমাণিত যে তাঁতি-শ্রমিকেরা বিশেষ কতকগুলি সংগত কারণেই উৎপাদনে ফাঁকি দেওয়া, উৎপন্ন পণ্যের গুণগত মানের প্রতি অবহেলা ইত্যাদি প্রদর্শন করেছে। অতএব তাঁতি-শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার জন্য কোম্পানি ও কোম্পানির প্রতিনিধিদের হাতে আইনগত ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। তাঁতি-শ্রমিকদের বিষয়ে কোম্পানি যে সকল আইনগত বিধিব্যবস্থা প্রয়োগ করেছিলেন সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা আবশ্যক।

বিগত ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২২এ এপ্রিল কোম্পানির Public Department-এর কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছিল—"The purchasers of the said cloths, apparently knowing them to be the property of the company, by the secret and clandestine manner which they take to procure them, or by the notoriety of the weavers being in the company's employ, who offer to dispose of them, on proof of the fact, shall be liable to punishment by the Adaulat ..' 'অর্থাৎ কোম্পানি ব্যতীত অন্য ক্রেতা যদি জেনে শুনে গোপনে কোম্পানি দ্বারা নিযুক্ত তাঁতিদের নিকট থেকে ক্রয় করে এবং তা যদি প্রমাণিত হয় তবে সেই ক্রেতা আদালতে দণ্ডনীয় হবে। কোম্পানির এই আইনগত ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল এই যে কোম্পানি পুঁজিবাদী ব্যবসার পথকে সুগম করার জন্য বদ্ধপরিকর এবং সেক্ষেত্রে কোনো গুপ্ত বা প্রকাশিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোম্পানি সহ্য করবে না। এবং বাজারে ক্রেতা হিসেবে একচেটিয়া অধিকার তার চাই-ই। কোম্পানির এই আইনগত ব্যবস্থাটি প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্রের নিয়মকেই প্রতিফলিত করছে। আবার ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৯এ জুলাই যে, একুশ দফা আইন তৈরি হয় তার নিম্নলিখিত

ধারাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১১ ধারা—"Upon any weaver failing to deliver cloth according to the stated period agreed upon, the Company's Agent shall be at liberty to place peons upon them and keep them under restraint."

১২ ধারা—"If any weaver in the company's service shall be convicted of selling cloth either by himself, any of his family, journeyman or by any agent, to any other merchants or dealers whatever, whilst he is in deficient in his deliveries according to the stated period of his agreement with the company, such offender shall be punished in a regular process on conviction in the judicial Court."

আবার ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ২২এ জুলাই প্রবর্তিত অপর একটি আইনে বলা হয় :

২ ধারা—"If they have not fulfilled their engagements by the period agreed on they shall not work for newer engagements, nor for bazar sales, until those engagements are completed."

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২২ এপ্রিলের কার্যবিবরণীতে দেখা গেছে যে কোম্পানি বাজারের উপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কোম্পানি ব্যতীত অপর কোনো ক্রেতার বাজারে পণ্যক্রয় আদালতে দণ্ডনীয়। আবার পরবর্তী ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ জুলাই তাঁতিদের সম্পর্কে যে একুশ দফা আইন বিধিবদ্ধ হয়—যার কয়েকটি ধারা পূর্বে উল্লেখ করেছি—সেগুলি বিশ্লেষণ করলে সন্দেহাতীত রূপে একথাই প্রমাণিত হয় যে বস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যাপারে তাঁতিদের সমগ্র আচরণ কোম্পানি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের আইনগত প্রচেষ্টা প্রায় সম্পূর্ণ এবং ফলে পূর্বেকার স্বাধীন তাঁতজীবী সম্প্রদায় পরাধীন তাঁতশ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত আইনগত বিধিব্যবস্থার ফলে তাঁত-শ্রমিকদের উৎপন্ন বস্ত্রের ক্রেতা হিসেবে কোম্পানির একাধিপত্য অধিকতর সুদৃঢ় হল। এই আইনগত বিধিনিষেধগুলি উৎপাদনাত্মক শ্রম ও শ্রমজাত উৎপাদনের তিনটি উপাদান, যথা—শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমজাত পণ্যের ক্ষেত্রে শিল্পভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। শিল্পভিত্তিক এই নব্য পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার ফলে তাঁতশ্রমিকরা কতটা পরিমাণে পরাধীন

ও অসহায় হয়ে পড়েছে তা কোম্পানির নিকট তাদের অঙ্গীকারপত্র থেকেই প্রতিফলিত। অঙ্গীকারপত্রটি নিম্নরূপ :"We—weavers of the aurung—fully understanding the contents of the regulations of the 23rd July, 1787 and 30 October, 1789, engage to manufacture on account of the company the several qualities of cloths—the thread of the warf and woof shall be properly twisted and sorted, the 32 folds shall be made well and even throughout and the cloths shall be all of the established dimensions in length and breadth···In cases where any of us possessing more than one loom with journeymen fail in our stipulated deliveries...we will pay according to the Regulations of the 30th October 1789 a penalty of 35 percent on the amount together with repayment of the advances received."[১১]

পূর্বোক্ত বিধিবদ্ধ আইনগুলি রাষ্ট্রশক্তিরই প্রতীক এবং একথাই প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ ব্যতীত বাঙলাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্য চলতে পারে না। কিন্তু কেন? আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক এবং প্রখ্যাত ইতিহাস-গবেষক ও গবেষণা-পরিচালক ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মহোদয় এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তা বস্তুগত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও চিত্তাকর্ষক। তথাপি আমরা এই প্রশ্নের উত্তর অন্যভাবে পেতে চাই। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের ইংল্যাণ্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতি ও রীতিকে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতি ও রীতিতে যখনই রূপান্তরিত করেছে তখনই পুঁজিতন্ত্র উক্ত রূপান্তরের কাজে সুসংবদ্ধ সমাজশক্তি ও রাষ্ট্র-শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে ও সুপরিকল্পিতরূপে ব্যবহার করেছে। পুরনো সমাজদেহে নতুনতর সমাজের বীজ সুপ্ত থাকে, রাষ্ট্রশক্তি ধাত্রীরূপে পুরনো সমাজগর্ভ থেকে নতুন সমাজকে জন্মলাভে সহায়তা করে। এই ধাত্রীরূপী রাষ্ট্রশক্তি অর্থনৈতিক ও সমাজশক্তিরই একটি বিশেষ রূপ মাত্র। কোম্পানির যুগের পূর্বে ছোট বড় বা মাঝারি উৎপাদক হিসেবে প্রত্যেক তাঁতিই ছিল স্বাধীন; অর্থাৎ শ্রমের প্রয়োগ, উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপন্ন পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে উৎপাদনকারী তাঁতিই ছিল সর্বেসর্বা।

তারা প্রত্যেকেই ছিল সামন্ততন্ত্রের অঙ্গ—ধারক ও বাহক। তাদের উৎপাদনপদ্ধতি ও রীতি সামন্ততান্ত্রিক। এই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি ও রীতির প্রয়োজনীয় রূপান্তরের জন্য ধাত্রীরূপী রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য একান্ত অপরিহার্য। ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে যে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ ব্যতীত এ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শোষণপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা আদৌ সম্ভব নয়। বিধিবদ্ধ আইন সেই সুসংগঠিত রাষ্ট্রশক্তি। এ-প্রসঙ্গে মার্কসের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য: "But they all employ the power of the state, the concentrated and organised force of society, to hasten, hothouse fashion, the process of transformation of the feudal mode of production into the capitalist mode, and to shorten the transition. Force is the midwife of every old society pregnant with a new one. It is itself an economic force."[১২] আমরা অবগত আছি ; ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভের পর থেকেই ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ক্রমে ক্রমে বাঙলাদেশে তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে থাকে এবং রাষ্ট্রশক্তি কোম্পানির করতলগত হতে থাকে। পুঁজিবাদী ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাষ্ট্রশক্তির সুপরিকল্পিত প্রয়োগদ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন-শোষণ সর্বোপরি অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করবে এটা অবশ্যম্ভাবী। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৯এ জুলাই তাঁতিদের বিষয়ে যে একুশ দফা আইন বিধিবদ্ধ করা হয় তার প্রথমেই বলা হয়—"It is hereby directed that every weaver be furnished with a ticket specifying the name, place of abode and cooty under which he works, and containing an account of the dates and period of advances made, the value of the cloths or goods he shall from time to time deliver in return." অর্থাৎ প্রত্যেক তাঁতিকে কোম্পানির অধীনে তালিকাভুক্ত হতে হবে। কোম্পানি তাঁতিকে যে টিকেট প্রদান করবে তাতে তার নাম, ঠিকানা, অগ্রিমের পরিমাণ, তারিখ ও সময় এবং তার পরিবর্তে দেয় কাপড় বা অন্যান্য পণ্যদ্রব্য, তার পরিমাণ ও মূল্যের উল্লেখ থাকবে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি উৎপাদনকারী হিসেবে তাঁতিরা সম্পূর্ণ

পরাধীন। কোম্পানি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী। পুর্বেই বলা হয়েছে ক্রেতা হিসেবে বাজারেও কোম্পানির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। কোম্পানি ব্যতীত অপর কোনও ক্রেতা যদি তাঁতির নিকট থেকে কাপড় ক্রয় করে তবে সেক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই দণ্ডনীয়। এ বিষয়ে পুর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে তাঁতিদের পক্ষে কোম্পানির নিকট থেকে অগ্রিম না নিয়ে উৎপাদন অব্যাহত রাখা আদৌ সম্ভব নয়। উৎপাদনের জন্য কোম্পানির নিকট থেকে তাঁতিকে অগ্রিম নিতেই হবে এবং উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য কোম্পানির নিকটই কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে হবে। এই প্রসঙ্গে মার্কসের ধনতান্ত্রিক বিকাশের 'দুই পথ' সক্রান্ত তত্ত্বের কথা এসে পড়ে। ব্রিটেনে ধনতন্ত্রের বিকাশ কিভাবে ঘটেছে সে আলোচনায় মার্কস 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডে বলেছেন—"The transition from feudal mode of production is two fold. The producer becomes merchant and capitalist. This is the really revolutionary way. Or else, the merchant establishes direct sway over production... This system presents everywhere an obstacle to the real capitalist mode of production............without revolutionizing the mode of production, it only worsens the condition of the direct producers, turn them into wageworkers and proletarians under conditions worse than those under the immediate control of capital, and appropriates their surplus labour on the basis of the old mode of production."

ধনতন্ত্র বিকাশের প্রথম পথটির মূল কথা হল প্রাক-ধনতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপগুলির (forms) এবং বণিকী অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের পরিপুর্ণ বিলোপ অথবা চূড়ান্ত বিলুপ্তিসাধন ও শিল্প-পুঁজি দ্বারা মজুরি-শ্রম শোষণের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

মার্কস-নির্দেশিত দ্বিতীয় পথটির মর্মার্থ হল উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণের নানাবিধ রূপ ও পদ্ধতির পারস্পরিক মিশ্রণ। যথা: ১/সামাজিক-রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ও জুলুম প্রয়োগের সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি, ২/profit-on-alienation অর্থাৎ উৎপাদন-প্রক্রিয়া-বহির্ভূত, পণ্য ও অর্থ সঞ্চালন প্রক্রিয়ার

অন্তর্নিহিত বাজার, মূল্য ও ঋণদান ব্যবস্থার নানাবিধ ফন্দীফিকিরের মাধ্যমে বণিকী (mercantile) ও মহাজনী (usurious) শোষণ, ও ৩/উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করার ধনতান্ত্রিক রূপ। এই দ্বিতীয় পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সারবস্তু হল উদ্বৃত্ত শ্রম আহরণের এই ত্রিবিধ রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বার্থসমূহের প্রতিক্রিয়াশীল মিতালি।

১৭৬৫ সালের পরে বাঙলাদেশে কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে যে চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তাতে দেখা যায় যে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কোনোরূপ রূপান্তর ঘটে নি, অর্থাৎ সামন্তযুগীয় উৎপাদন-প্রক্রিয়াই বর্তমান; অথচ উৎপাদন-বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সামাজিক-রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ও জুলুম প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়া-বহির্ভূত পণ্য ও অর্থ সঞ্চালন-প্রক্রিয়ার ভেতরে বাজার, দাম ও ঋণদান বন্দোবস্তের নানাবিধ ফন্দীফিকিরের মাধ্যমে বণিকী (mercantile) ও মহাজনী (usurious) শোষণ ও উদ্বৃত্ত শ্রম ও মূল্য আত্মসাৎ করার ধনতান্ত্রিক প্রচেষ্টা। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অর্থপুঁজি বা money capital-এর মালিক সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামনে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপুঁজিকে নানাভাবে প্রয়োগের বা বিকল্প নানাবিধ কাজে নিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাক-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ককে আংশিকভাবে বজায় রেখে, তার সঙ্গে আপস-রফা করে উপর থেকে এক-চেটিয়া বণিকদের উদ্যোগে শিল্পের বিস্তার এবং সামন্ত-জমিদারদের ধনতান্ত্রিক জমিদারে রূপান্তরের প্রচেষ্টা. মার্কস-নির্দেশিত প্রথম পথের তুলনায় অধিকতর শ্লথগতি, স্বৈরাচারী, প্রতিক্রিয়াশীল। বাঙলাদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই দ্বিতীয় পথে অগ্রসর হয়েছে।

ঢাকা জেলার তিতাবদ্দি অঞ্চলের তাঁতিরা কোম্পানির একচেটিয়-আধিপত্য ও নিজেদের পরাধীন অবস্থাটাকে সহজেই মেনে নিয়েছিল। ১৭৭৬ ও ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁতিরা যে দাম পেয়েছে তা ২০ বা ৩০ বছরের পূর্বেকার দাম অপেক্ষা অনেক কম। অথচ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কাঁচা মালেরই দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তিতাবদ্দির তাঁতিদের শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি পায় নি। কোম্পানি তাঁতিদের উদ্বৃত্ত শ্রমকে আহরণ করছে অথচ যথার্থ মূল্য ব্যতীতই তা করছে। মার্কস একেই বলেছেন 'unpaid labour'। তাঁতিরা এই শোষণকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের মধ্যে যারা তা পারে নি তারা বয়নবৃত্তি পরিত্যাগ করে চাষের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। ফলে কুটির-

শিল্প ও কৃষিকর্মের বিচ্ছেদ ঘটল। বাঙলাদেশে ইনডাসটিয়াল ক্যাপিটাল অর্থাৎ শিল্পভিত্তিক পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাবের ফলেই কুটিরশিল্প ও কৃষিকর্মের পারস্পরিক বিচ্ছেদ ঘটল। পূর্বেই বলেছি ব্রিটেনেও গ্রামীণ কুটির-শিল্প তথা বয়নশিল্প ও কৃষিকর্মের পারস্পরিক বিচ্ছেদের মধ্য দিয়েই শিল্প-ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল।

ঢাকা-তিতাবদ্দির তাঁতজীবীদের মতো শান্তিপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তাঁতজীবীরা সহজে ও বিনা প্রতিরোধে ঐ শাসন-শোষণকে স্বীকার করে নেয় নি। তারা প্রত্যহ বিশেষ বিশেষ স্থানে সমবেত হয়ে নিজ নিজ অভাব ও অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করত কোম্পানির বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ও অসন্তোষ দূর-দূরান্তরের আরঙ্গগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল এবং তাঁতিরা কোম্পানির জন্য উৎপাদন বন্ধ করে দিল। অন্যান্য বিদেশী ব্যবসায়ী যারা কোম্পানি অপেক্ষা অধিক মূল্য দিত তাঁতিরা তাদের কাছেই উৎপন্ন দ্রব্য ও পণ্য বিক্রয় করত। তখন কোম্পানির ঠিকাদাররা কোম্পানিকে পরামর্শ দিল যে বিদেশী ব্যবসায়ীদের কু-অভিসন্ধি বন্ধ করতে হলে তাঁতিদের উৎপাদনকর্ম তদারক করা ছাড়াও পিয়াদা (Peon) নিযুক্ত করা এবং তাঁতিদের বিদ্রোহী নেতাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।[১৩] শান্তিপুরের তাঁতিরা কোম্পানির শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তার জন্যে তাদের মূল্য দিতে হয়েছে। শান্তিপুরের ন-জন নেতৃস্থানীয় তাঁতির উপর নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তাদের মধ্যে ছ-জনকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। অপর তিনজন তাঁতিকে অত্যন্ত মন্দ চরিত্রের লোক হিসেবে অভিযুক্ত করে কারাগারে আটক রাখা হয়। তথাপি আমরা দেখতে পাই তাঁতিরা কোম্পানির অধীনে কাজ করতে উৎসাহী ও ইচ্ছুক; কারণ তারা কোম্পানির আশ্রয়ে আশ্রিত হয়ে দেশীয় সামন্ত জমিদার ও তাদের প্রতিনিধি-দের শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। বলা বাহুল্য নব্য পুঁজিতন্ত্র আপন স্বার্থের প্রয়োজনে শিল্পশ্রমিককে সামন্ততন্ত্রের গ্রাস থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে। তাঁতিরা বুঝতে পারছিল যে তারা কোম্পানির দাসত্বে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে; কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ এমনভাবে ধীরে ধীরে রূপ নিল যে তাঁতিরা জৈবিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে কোম্পানির চাকুরীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর-শীল হয়ে পড়ল।[১৪] পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বাজারেরও ব্যাপ্তি ঘটে।[১৫] এ প্রসঙ্গে মার্কসের উক্তি পূর্বে উল্লেখ

করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের ইংল্যাণ্ডেও শিল্পবিপ্লবের যুগে পুঁজিতন্ত্রের প্রসার ঘটেছে, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাজারেরও ব্যাপ্তি ঘটেছে। শুধু তাই নয়, পুঁজিপতি ব্যবসায়ী বাজারের উপর একচেটিয়া আধিপত্য (monopoly) প্রতিষ্ঠা করেছে। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা অবগত হই যে ১৭৯৩ সালের মধ্যে বাঙলাদেশের শিল্পের বাজারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার শাসনকাল পর্যন্ত তাঁতশিল্পীরা স্বাধীন ছিল; অবশ্য তাদের উপর অত্যাচার কোম্পানির যুগ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কম ছিল। কিন্তু ১৭৯৩ সালে বাঙলাদেশের তাঁতশিল্পীরা উপলব্ধি করতে পারে নি যে কোম্পানির অধীনে চাকুরী, জীবিকার নিরাপত্তা ও আপাত অর্থাগম ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমেই কুটিরশিল্পের শিল্পী হিসেবে তাদের সর্বাত্মক বিলুপ্তি আরম্ভ হয়ে গেছে। বাঙলাদেশের তাঁতশিল্পেরও কুটিরশিল্প হিসেবে বিলুপ্তি ঘটতে আরম্ভ করেছে।[১৬] বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন বন্দোবস্ত ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক যুগ শেষ হতে আরম্ভ করেছে। পুঁজিতান্ত্রিক যুগ আরম্ভ হয়েছে। অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই যুগপরিবর্তনকে সমাজবিপ্লবেরই অঙ্গ বলা যেতে পারে। বাঙলাদেশের প্রাক-ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে যে সমাজবিপ্লব সংঘটিত হল তাতে ইংল্যাণ্ড ও ইংরেজ জাতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বিপ্লবের ফলে বাঙলাদেশের সুদক্ষ তাঁতশিল্পীর বিলোপ ঘটেছে। বাঙলাদেশের প্রাক-পলাশী যুগের সমৃদ্ধি কৃষি থেকে জন্মে নি—সেই সমৃদ্ধি এসেছিল হস্তলিখিত শিল্পকর্ম থেকে। এই হস্তনির্মিত শিল্পকর্মের বিলুপ্তি ঘটায় তাঁতশিল্পীরা কৃষিকাজের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে বিকল্প জীবিকা হিসেবে। ফলে ভূমিসঙ্কট দেখা দিল।

সংকেতসূচী

১. Marx—Capital, Chapt.—XXX, P—268

২. Ibid—Chapt.—XXX, P—268

৩. Ibid—Chapt.—XXX, P—267

৪. Bolts—Consideration, P—193-94

৫. To Court—1769 ; Orme—Fragments, P—411
৬. Bolts—Considerations
৭. Resolutions—12 April, 1773
৮. Dr. N. K. Sinha—Economic History of Bengal, P—150-51
৯. Proceedings, Board of Trade, 15 July, 1783
১০. Resolutions, 12 April, 1773
১১. Proceedings, Board of Trade, 12 June, 1787
১২. Marx—Capital, Chapt. XXXI, P—269-70
১৩. Proceedings, Board of Trade—25 July, 1787
১৪. Ibid—3 Sept, 1790
১৫. Ibid—14 July, 1789
১৬. Abstract of Bengal Investment, 1794

প্রবন্ধটি সম্পর্কে আমরা পাঠকদের মতামত আহ্বান করছি —সম্পাদক

আফ্রিকার সাম্প্রতিক কবিতা

আশিস সান্যাল

এক বা দুই দশক আগে আফ্রিকার কবিতাকে যে অভিধায় চিহ্নিত করা যেত, আজ ঠিক এই মুহূর্তে হয়ত সেই অভিধায় চিহ্নিত করা আর সম্ভব নয়। কেননা, এর মধ্যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের গণমানসে। জাঁ পল সার্ত্র আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে ১৯৪৭ সালে সেনেগালের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট কবি লিওপোল্ড সেদর সেনগরের একটি কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় আফ্রিকার কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন আফ্রিকার কবিতা হল "the true revolutionary at our time" এবং "the voice at a particular historical moment." কিন্তু মনে হয় ১৯৭১-এর পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে একথা এখন আর এত সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করা যায় না। নাইজিরিয়ার বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও সমালোচক লুই নিকোমি সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—"In African literature, as in African politics, the excitement that marked the beginning of the decade is wearing off."

বিষয়টি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক কসমো পিটার্স। গত নভেম্বরে নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি এর কারণ সম্বন্ধে বললেন "স্বাধীনতা লাভের আগে নতুন আফ্রিকা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল কবি লেখকদের, স্বাধীনতা লাভের পর সে ধারণা তারা কোথাও ফলপ্রসূ হতে দেখল না। এক ধরনের ডিস-ইলিউসানমেণ্ট তাদের অনুভবের জগতকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কবিতার আঙ্গিকেও এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।" শ্রীমতী এ্যানে টিকল তাঁর 'African English Literature'-এর সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখেছেন—"Modern African prose is characterised by a limpidy-clear style.... Poetry has the same element of transparency and search towards simple precision—if it can be called that." কিন্তু সত্তরের পটভূমিকায় তারও বিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর কারণ হয়ত এই যে, যখন প্রকাশের বিষয়

জটিল হয়ে উঠেছে তখন অনিবার্য কারণেই তার আঙ্গিকও হয়ে উঠছে জটিলতর। তাই অতি সাম্প্রতিক আফ্রিকার কবিতায় দেখা যায় বহু বিচিত্র আঙ্গিক ও প্রকরণ। কাম্পালা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার এবং বর্তমানে স্বাধীন মালাওউর আমেরিকাস্থ রাষ্ট্রদূত প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক ডেভিড রুবাদিরি সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে সাম্প্রতিক আফ্রিকান কবিতা হল "a varied pattern of insights and views and an enormous of styles." আলোচ্য অনুধাবনার ভিত্তিতে সাম্প্রতিক আফ্রিকার কবিতার বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে।

এক

"হায় ছায়াবৃতা
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানব রূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।"

আয়তনে পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাদেশ এবং প্রাচীনতম ঐতিহ্যকে ধারণ করেও বাইরের পৃথিবীর কাছে কৃষ্ণ মহাদেশ রূপে পরিচিত হয়ে রইল আফ্রিকা। প্রাকৃতিক সম্পদে অপরিসীম সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, গভীর অরণ্য এবং বিস্তৃত মরুভূমি দেশটিকে বহু দেশের চেয়ে জনসংখ্যায় স্বল্পতর করে রেখেছে। এই আফ্রিকার সাম্প্রতিক ইতিহাস ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের ইতিহাস। এই ইতিহাস মোটামুটিভাবে চারশত বৎসরের। তবে সমগ্র আফ্রিকাকে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে বণ্টন করে নেওয়া হয় মাত্র বিগত শতাব্দীতে। সমস্তটাই যে আপোষে ঘটেছে, এমন নয়। তবে ভারতবর্ষে যেমন একটিমাত্র শক্তি প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল, আফ্রিকায় তেমন হয় নি। যাই হোক এইসব ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে বিদায় নিতে হয় ডাচদের। যদিও এখনও দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে এদের ক্ষমতা প্রবল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানিকে আফ্রিকার উপর থেকে সমস্ত দাবি প্রত্যাহার করে নিতে হয়। ইতালি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আফ্রিকান উপনিবেশসমূহের উপর থেকে তার অধিকার প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হলেও তথাকথিত ইতালীয় সোমালি-ল্যাণ্ডের উপর জাতিপুঞ্জের অছিগিরি পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। এইভাবে ১৯৬০ সালের মধ্যে আফ্রিকার ৪৪টি দেশের মধ্যে ২২টি দেশ স্বাধীনতা লাভ

করে। কঙ্গোর স্বাধীনতা লাভের পর আফ্রিকায় বেলজিয়ামের আর কোনো প্রভুত্বই রইল না। অতি সাম্প্রতিককালে আরো কয়েকটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং এ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি কয়েকটি দেশে চলেছে মুক্তিসংগ্রাম। আবার কয়েকটি দেশে ইদানিং রাজনৈতিক কলহ্ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আফ্রিকার এই রাজনৈতিক পটভূমি তার কাব্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকেও করেছে নির্ধারিত। দেখা যাবে সদ্য স্বাধীনতা লাভের পর এইসব দেশের কাব্য আন্দোলনে দেখা গিয়েছিল একটা নতুন পথনির্দেশ। কিন্তু অবস্থা অতিক্রমনের পর এল নিদারুণ হতাশা। রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ইত্যাদি ক্রমশ আফ্রিকার গণজীবনে প্রাধান্য বিস্তার করছে। নাইজিরিয়ার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ক্যাপরিয়ান একউয়েনস্কি-র 'ইসকা' উপন্যাসে সুন্দরভাবে এই দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যাই হোক, লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আফ্রিকার কবি সাহিত্যিকদের পক্ষে তাঁদের সমসাময়িক জীবন ও সমাজকে বর্জন করা অসম্ভব। আর এই কারণেই বোধ করি, জার্মান সমালোচক Jonheinz John আফ্রিকার কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—"In African poetry......the expression is always in the service of the content ; it is never a question of expressing oneself, but of expressing something." তাঁর এই মন্তব্যকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না, যদিও একালের আফ্রিকান কবিদের রচনারীতি ও জীবনভাবনা সম্বন্ধে ধারণা বিচিত্রতর ও অভিনব।

দুই

আফ্রিকার কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আর একটি বিষয়ও প্রসঙ্গত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তা হল আফ্রিকার যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তার ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা। বস্তুত পক্ষে আফ্রিকার নিজস্ব কোনো ভাষায় এখনও পর্যন্ত যথোচিত সাহিত্য রচিত হয় নি। ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে যারা যে অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তাদের ভাষাই সেই সব অঞ্চলের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শিল্প সাহিত্য সেই সব ভাষাতেই হয়েছে রচিত। সমগ্র আফ্রিকার সাহিত্য এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ফরাসী, ইংরেজী, পর্তুগিস ও বেলজিয়ান ভাষাতেই মূলত সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই সমস্ত ভাষা যেন আফ্রিকার নিজস্ব ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। এর প্রধান

কারণ, আফ্রিকার নিজস্ব লিপি ও ভাষায় শিক্ষা প্রসারের আগেই অন্য ভাষাকে তারা আয়ত্ত করে নিয়েছে। ভারতে ইংরেজদের আগমনের পর ইংরেজী ভাষার প্রসার ঘটে একথা সত্য, কিন্তু ভারতীয় ভাষাসমূহের তখন একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস রচিত হয়ে গেছে। আফ্রিকার অবস্থা তেমন নয়। প্রকৃতপক্ষে এই সব ইউরোপীয় ভাষার মাধ্যমেই তারা প্রথম শিক্ষার দুয়ারে উপনীত হয়েছে। তাই এক অর্থে এই ভাষাগুলি বহু ক্ষেত্রে অনেকটা তাদের মাতৃভাষার স্থান অধিকার করেছে। শ্রীমতী এ্যানে ট্রিকা যথার্থ কারণেই তাই বলেছেন—"Perhaps the most complex yet single influence on the English tongue at the present day comes from Africa. This is so important that it is like a blood transfusion." আফ্রিকার ফরাসী পর্তুগিস ভাষা সম্বন্ধেও প্রায় অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যায়।

তিন

আফ্রিকার কাব্য আন্দোলনে ফরাসী ভাষায় রচিত কবিতার স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে এই ভাষার প্রধানত প্রচলন। এই ভাষায় কাব্য আন্দোলনের সূত্রপাত বোধ করি 'নেগ্রিচুড' থেকেই। ফরাসী গায়েনার কবি লিওন ডামাস-এর মধ্যেই প্রথম এই নতুন কাব্য আন্দোলনের উৎস লক্ষ্য করা যায়, পারীতে অবস্থানকালে তিনি সেখানে নির্বাসিত নিগ্রোদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করেন এবং তারই সমর্থনে একটি ঘোষণা রচনা করেন কবিতায়। তার ইংরেজী অনুবাদ হল :

> "My hatred thrived on the margin of culture
> The margin of theories and the margin of idle talk
> With which they stuffed me since birth
> Even though all in me aspired to be Negro
> While they ransack my Africa."

ফরাসী পুলিশ এই ঘোষণাপত্রটি নষ্ট করে ফেলে। এর দু-বছর পর এইমি সিজার নতুন ভাবে এই ঘোষণাপত্রটি রচনা করেন এবং ফরাসীভাষী নিগ্রো কাব্য আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রখ্যাত সমালোচক এনড্রে ব্রিটন তাঁর কবিতাকে স্যুররিয়ালিজমের চরম উৎকর্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে তাঁর কবিতা

স্যুররিয়্যালিজমের যত নিকটতরই হোক না কেন, তাঁর প্রস্থানভূমি মূলত 'নেগ্রিচুড' আন্দোলন।

আফ্রিকার ফরাসীভাষী কবিদের মধ্যে এর পরেই নাম করতে হয় মাদাগাস্কারের কবি জাঁ জোসেফ রাবেয়ারিভেলোর। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাভাবে মাত্র তের বৎসর বয়সে স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রায় সেই বয়স থেকেই তাঁর কাব্যচর্চার শুরু। মাদাগাস্কারের কাব্য আন্দোলনের তিনিই অগ্রদূত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'La coupe de´ Cendes' (১৯২৪), 'Sylves' (১৯২৪), 'Volemes' (১৯২৮), 'Traduit de la Nait' (১৯২৫) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর জীবনের অন্যতম সাধ ছিল পারী নগরে যাওয়ার। কিন্তু নিদারুণ অর্থাভাবে তা সম্ভব হয় নি। দারুণ হতাশায় ১৯৩৭ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর কবিতার নিদর্শন হিসেবে এখানে তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ উল্লেখ করা যাচ্ছে :

"কাল সকালে
যারা সমস্ত রাত ধরে মদ গিলেছে
আর তাসগুলিকে করেছে পাপাসক্ত ;
চাঁদের দিকে মিট মিট করে তাকিয়ে
তারা তো-তো করে বলবে :
"এই ছ-পেন্স কার ?
ওই সবুজ টেবিলটার ওপর গড়াচ্ছে" ?"

[অনুবাদ : আশিস সান্যাল]

রাবেয়ারিভেলোর কবিতার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন মাদাগাস্কারের আরো দুজন ফরাসীভাষী কবি। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় ফ্লাভিয়েন রানাইভো-র। ১৯১৩ সালে মাদাগাস্কারের রাজধানী টানানারিভে তাঁর জন্ম হয়। আট বছরের আগে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার কোনো সুযোগ তিনি পান নি। নানা কাজে গ্রামে গ্রামান্তরে তাঁকে দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়াতে হয়। ফলে বৃহত্তর গণমানসের সঙ্গে তাঁর একটা প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর কাব্যেও এর প্রভাব স্পষ্ট। লোকায়ত সংস্কৃতি ও লোকসঙ্গীতের প্রভাবে তিনি 'hain-teny' নামে এক বিশেষ ধরনের কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। যেমন :

"লাউ খোলাতে রেখেছি জল সখি,
থাকবে ভরা যেমন ভরে রাখি ;
তেমন করে আমায় ভরে রেখো
গীটার তারে, প্রতিটি ঘাটে ঘাটে
শুধুই তুমি, তোমার ভালোবাসা।"

[অনুবাদ : কবিতা সিংহ]

রাবেয়ারিভেলোর দ্বারা প্রভাবিত দ্বিতীয় কবি হলেন জেক্যুই রাবেমননজারা। তাঁর জন্মও টানানারিভে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। শিক্ষাজীবনের পর তিনি একটি সমালোচনার পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর পর তিনি সরকারী কাজে যোগ দেন এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পারীতে আসেন। এখানে অবস্থান-কালে প্রখ্যাত কবি লিওপোল্ড সেদার সেনগোরের সহযোগিতায় 'Presence Africanie' পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি বন্দী হন। পরবর্তী কালে তাঁর দেশ স্বাধীনতা লাভ করলে তিনি মুক্ত হন। বর্তমানে তিনি স্বদেশের অর্থমন্ত্রী। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে—'L´ eventail de´ Reves', 'Confins de la Neut', 'Sur les marches de Soir' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রোমান্টিক গীতিধর্মই তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'নেগ্রিচুড' আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এর পরেই যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন লিওপোল্ড সেদার সেনগোর, বিরাগো ডিয়প ও ডেভিড ডিয়প। লিওপোল্ড সেদার সেনগোর আধুনিক আফ্রিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আফ্রিকার বাইরে তাঁর কবিতার অনুবাদ ও প্রচার যতদূর হয়েছে তেমন আর কোনও ফরাসীভাষী আফ্রিকার কবির হয় নি। সেনেগালের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক বাটিনি জুমিনারকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : "সেনগোর এখন আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি। তাঁর কবিতা অনুবাদ ও প্রচারে সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্রই সহায়ক। অথচ সেনেগালে অনেক উল্লেখযোগ্য কবি আছেন। অনুবাদের অভাবের জন্য বাইরের পৃথিবীর কাছে তাঁরা সম্পূর্ণভাবেই অপরিচিত রয়ে গেছেন।" সেনগোর-এর কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন : "এক সময় সেনগোর সেখানকার জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তখন তাঁর কবিতায় ছিল প্রাণ। কিন্তু বর্তমানে তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার। তাঁর

কবিতা এখন খুবই নিষ্প্রাণ।" সেনগোর-এর জন্ম হয় ১৯৬০ সালে। তিনি হলেন সিরিরি উপজাতীয় শ্রেণীর লোক। তাঁর পিতা ছিলেন ক্যাথলিক। বিশিষ্ট বাদাম ব্যবসায়ী। সেনগোর-এর শিক্ষাজীবন ছিল খুবই কৃতিত্বপূর্ণ। পারীতে অবস্থানকালে সিজারে, দামাস প্রমুখ কবিদের সান্নিধ্য লাভ করেন। রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী হিসেবেও তাঁর প্রতিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। তিনি দীর্ঘদিন ফরাসী জাতীয় পরিষদে সেনেগালের সহ-প্রতিনিধি ছিলেন। এক সময় ফরাসী সরকারের মন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সেনেগাল স্বাধীনতা লাভ করলে তিনি সেখানকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ফরাসী ভাষায় তাঁর অনেক কটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে 'Chante de Omber,' 'Nocturnes' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

সেনগোর-এর প্রস্থানভূমিও সিজারে-র সূচনান্তরের কাছাকাছি। কবিতার আঙ্গিক সম্বন্ধে তাঁর ধারণা—"I still think that the poem is not complete until it is sung, words and music to-gether." তাঁর কবিতার প্রকরণ ও পদ্ধতিতে এই বৈশিষ্ট্যটি খুবই প্রবল। বিষয় হিসেবে তিনি জাগ্রত নিগ্রোর অনুভূতিকেই গ্রহণ করেছেন। মানুষকে ঘৃণ্য অবহেলিত করে রাখার বিরুদ্ধে, শ্বেতাঙ্গ মানুষ কর্তৃক আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর সুতীব্র জেহাদ ঘোষণা করেছে। 'পারীতে তুষারপাত' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

> "কিন্তু আমার হৃদয় সূর্যের আগুনে তুষারের মত গলে গেলে
> এবং আমিও ভুলে গেলাম
> সেই সব সাদা হাতেরা যারা বন্দুকে টোটা পুরে
> তোমার সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছিল।
> সেই সব হাতেরা
> যারা ক্রীতদাসকে মেরেছিল চাবুক
> এবং তোমাকেও,
> সেই সব ধূলোপড়া হাতেরা আমাকে থাপ্পর মেরেছিল,
> সেই সব হাতেরা
> যারা আকাশ স্পর্শ করা বনের
> পদানত আফ্রিকাকে করেছিল নির্মূল।"

[অনুবাদ : শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়]

'টোটেম' কবিতাটির মধ্যেও এই একই অনুভবের প্রসার লক্ষ্য করা যায় :

"অন্তরতম ধমনীশিরায় তাঁকে আমায় ঢাকতে হবে,
সেই পিতৃপুরুষকে যাঁর ঝঞ্ঝাহত ত্বক বজ্রেবিদ্যুতে খচিত
আমার জৈব রক্ষাকর্তা, তাঁকে আমায় ঢাকতে হবে
যাতে কুৎসা নিন্দার বেড়া আমায় ভাঙতে না হয় :
তাতেই আমার বিশ্বস্ত রক্ত যাঁর দাবি নিষ্ঠানুগত্য
আমার নগ্ন গর্বের রক্ষা কবচ
নিজেরই বিরুদ্ধে আর মানব সমাজের কিছু
সৌভাগ্যবান জাতির অবজ্ঞার বিরুদ্ধে।"

[অনুবাদ : বিষ্ণু দে]

কিন্তু আফ্রিকাকে ভালোবাসতে গিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কখনও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে নি। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'লাক্সেমাবার্গ' কবিতায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতীচ্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদানের প্রতি সেখানে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। 'আগমন' কবিতাটির মধ্যেও একটা আন্ত-র্জাতিকতাবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি লিখেছেন :

"সেই একই সূর্যালোক ভ্রান্তিময় শিশির সিঞ্চিত
সেই একই আকাশের গোপন ধৈর্যের অচঞ্চল,
সেই একই আকাশ যা তাদের শঙ্কিত করেছিল
যারা পরিচিত মৃত্যু, তার সাথে।
এবং সহসা মৃত্যু আমাকে সান্নিধ্যে টেনে নিলো।"

[অনুবাদ : আলোক সরকার]

বিরাগো ডিয়প-এর কবিতার প্রস্থানভূমিও অনুরূপ। 'নেগ্রিচুড' কাব্য আন্দোলনের তিনিও একজন পথপ্রদর্শক। তাঁর কবিতার নিদর্শন হিসেবে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাচ্ছে :

"সে এক উলংগ সূর্য—রঞ্জিত ভাস্কর
সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন রক্তরাঙা দেহ ;
ঢেউয়ে ঢেউয়ে লাল রক্ত করে উদগীরণ
রক্তিম সে স্রোতস্বিনী বুকে॥"

[অনুবাদ : দক্ষিণারঞ্জন বসু]

ডেভিড ডিয়প-এর জন্ম ১৯১৭ সালে ফ্রান্সের বোর্দো শহরে। পদানত, অত্যাচারিত আফ্রিকার কণ্ঠস্বর তাঁর কাব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে ডাকারের অদূরে এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। এঁর বাবা সেনেগালের, মা ক্যামেরুনের। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান ফ্রান্সে। শিক্ষা লাভও সেখানে। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'coups de pilan' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডেভিড ডিয়প-এর কবিতায় আবেগ প্রাধান্য বিস্তার করলেও আঙ্গিক-প্রকরণ অত্যন্ত সংযত ও কবিত্বময়। 'শকুন' কবিতার অংশবিশেষ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাচ্ছে :

"হে বিদেশী! তোমাদের কণ্ঠ আজ দাম্ভিক জেনেও
আফ্রিকার ছারখার গ্রামগুলি কি নিঃসঙ্গ জেনেও
অটল দুর্গের মতো বুকের গোপনে আশা রেখেছি বাঁচিয়ে।
এবং জেনেই ওই সোয়াজিল্যাণ্ডের খনি থেকে
য়ুরোপের কল কারখানায়—
আবার বসন্ত আমাদের উচ্ছল গতির নিচে আবার পুনর্জন্ম দেবে।"

[অনুবাদ : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত]

তাঁর সংগ্রামী মনোভাবের আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল 'আফ্রিকা' কবিতাটি। এখানে তার অংশবিশেষ তুলে ধরা যাচ্ছে :

"সেই দিন কোথায়—
একলা বুকে কে যেন পুন্নাশ দিয়ে বলে যায়,
শোনো—ওখানে বিপ্লবের সন্তান,
ওখানে অগ্নিলোকের বাসিন্দা,
বিবর্ণ অরণ্য ফেলে নতুন জন্ম আনে :
সেই তোমার লাল সূর্যাস্তে শেষ পথে—স্বাধীনতা,
সেই আফ্রিকা,
সেই তোমার সুবর্ণপ্রতিম আফ্রিকা।"

[অনুবাদ : শুভ মুখোপাধ্যায়]

একালের তরুণতর ফরাসীভাষী আরো কয়েকজন কবি সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারত। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ায় সে লোভ এখানে সংবরণ করছি। এইসব তরুণতর কবিদের মধ্যে—দেওয়ারে গ্রয়, এ্যানরিয়া নারাহিন্‌জাকা, টমাস রোছাব্রা এর মধ্যেই আফ্রিকার কাব্য আন্দোলনে

নিজস্ব স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। এছাড়া আছেন কঙ্গোর দুজন কবি— প্যাট্রিস লুমুম্বা ও চিকায়া ইউ. টাম. সি। চিকায়ার জন্ম ১৯৩১ সালে, প্যারী ও অঁরলিনসে শিক্ষা লাভ করেন ; এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে চারটি কাব্যগ্রন্থ।

চার

আফ্রিকার ইংরেজীভাষী কবি লেখকরা মূলত পুর্বাঞ্চলের। ফরাসী ভাষায় রচিত সাহিত্যের তুলনায় ইংরেজী ভাষায় রচিত সাহিত্য নতুনতর। আর একটা বিষয় খুবই আশ্চর্যের এই যে, পশ্চিমাঞ্চলের অনেক কটি দেশে ফরাসী ভাষা প্রচলিত থাকলেও সেনেগালেই একমাত্র সাহিত্য বিকশিত ও পল্লবিত হয়েছে। সেনেগাল তাই এতকাল আফ্রিকার কবিতীর্থ বলে পরিচিত ছিল। সেখানেই আফ্রিকার প্রথম কাব্য আন্দোলনের সূত্রপাত। কিন্তু আজ ইংরেজীভাষী নাইজিরিয়া নতুন তীর্থভূমির দুয়ার উন্মোচিত করেছে। পুর্বাঞ্চলের অনেক কটি দেশে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত থাকলেও কাব্য আন্দোলনের দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্ব অর্জন করেছে নাইজিরিয়া। একমাত্র গাব্রিয়েল ওকারা-কে বাদ দিলে এখানকার তরুণ কবিদের অধিকাংশ সুশিক্ষিত এবং ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এঁরা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছে। তাছাড়া জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিক পরিবেশে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ থাকায় এঁদের কাব্যচিন্তায় এনেছে এক ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুর। এঁদের কবিতা পাঠ করলে কেন জানি না ডিলান টমাস, হপকিনস বা এজরা পাউণ্ড-এর কথা মনে পড়ে।

এই কবিদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন ওল সোয়েঙ্কা। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নাইজিরিয়ায় তাঁর জন্ম। প্রথমে ইবাদান সরকারী কলেজে ও পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। স্বদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের পর তিনি যান ইংলণ্ডে এবং সেখানে লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক হন। লণ্ডনে কিছুকাল শিক্ষকতার পর তিনি রয়াল কোর্ট থিয়েটারে যোগদান করেন। সেখানে তাঁর কাব্যনাটক 'এসেন্স অব দি ফরেস্ট' অভিনীত হয় এবং খুবই প্রশংসা অর্জন করে। এই নাটকটি রচনার জন্ত তিনি 'অবজার্ভার' পুরস্কারে সম্মানিত হন। সঙ্গীত এবং অভিনয়েও তিনি বিশেষ পারদর্শী। সম্প্রতি উপন্যাস রচনাতেও তিনি মনোনিবেশ করেছেন। মাত্র তিন মাস

আগে 'ইনটারপ্রিটার্স' নামে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। কবি হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব এই কারণে যে, তিনিই বোধ করি প্রথম আফ্রিকান কবি যিনি আফ্রিকার ঐতিহ্য, সামাজিকতা এবং প্রতিবেশ অত্যন্ত নিপুণ ভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক লিখেছেন : "He is the first African poet to develop an elegant and good humoured style." তাঁর 'The Rain' কবিতাটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ :

"কিন্তু থেমে যায় ঐ বাদলের দামামা
অথচ
বহুদূর থেকে দিগন্ত আড়াল করে অটল হয়ে দাঁড়ায়
ঐ মেঘের পুঞ্জ
পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যে আত্মীয়তা আছে
তারই প্রতীক হয়ে নীচে দেখা যায় স্তম্ভিত পর্বতমালা।"

[অনুবাদ : সুশীল রায়]

জন পিপার ক্লার্ক-ও সোয়েঙ্কা-র সমবয়সী এবং ইবাদান সরকারী কলেজেই শিক্ষালাভ করেন। ঐ কলেজের ছাত্র থাকা কালেই তিনি একটি কবিতা পত্রিকা প্রকাশ করেন। বর্তমানে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সোয়েঙ্কা-র মতো তাঁর কবিতাও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। প্রেম, আনন্দ, বেদনা ইত্যাদি চিরন্তন মানবিক অনুভূতিগুলিই তাঁর কাব্যে মুখর হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতা প্রতীকধর্মী। 'Olokun' কবিতার শেষ স্তবকে তিনি লিখেছেন :

"তাই প্রাচীন প্রাচীরের মতো নেশাগ্রস্ত
তোমার পায়ে ধ্বংসস্তূপ হয়ে আমরা ভেঙে পড়ি
আর সমুদ্রের সুকন্যার মতো
পুরুষদের জন্য সমৃদ্ধ দানসামগ্রী নিয়ে
আমাদের সবাইকে ভিখারী করে তুমি বুকে টেনে নাও।"

[অনুবাদ : কেতকী কুশারী ডাইসন]

এই ধারার আর একজন বিশিষ্ট কবি হলেন গাব্রিয়েল ওকারা। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নাইজিরিয়ার তাঁর জন্ম। শিক্ষালাভ করেন উমুয়াহিয়া সরকারী কলেজে।

বেতারে প্রচারের জন্য বিস্তারধর্মী রচনা নিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। কবিতা ছাড়াও উপন্যাস রচনায় তিনি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন। অতি সম্প্রতি লণ্ডন থেকে তাঁর 'The Voice' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। ওকারা-র কবিতায় একটা রহস্যময় ভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রতীকের ব্যবহারে খুবই সিদ্ধহস্ত। যেমন :

"আর বৃক্ষটির আড়ালে সে ছিল দাঁড়িয়ে
তার পায়ের পাতার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে শিকরগুলি,
তার মাথার ওপর থেকে গজিয়ে উঠেছে পাতার পর পাতা,
নাসারন্ধ্র থেকে নির্গত হচ্ছে ধোঁয়া
অন্ধকার গাঢ়তর করে হাস্যস্ফুরিত খোলা ওষ্ঠাধারে
সৃষ্টি হল গহ্বর।"

[অনুবাদ : সুনীল বসু]

ইংরেজী ভাষাভাষী আফ্রিকার অন্যান্য প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হলেন উগাণ্ডার ডেভিড রুবাদিরি, জন এম. বিতি ; কেনিয়ার জোসেফ কারিউকি ; ঘানার দেই আনং, ফ্রাঙ্ক পার্কস প্রমুখ।

ডেভিড রুবাদিরি আসলে মালাঅউর ব্যক্তি। তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয় উগাণ্ডায়। নিয়াসাল্যাণ্ডের জাতীয় আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই অপরাধে (?) তাঁকে বন্দী করা হয় এবং লণ্ডনে নির্বাসনে পাঠানো হয়। সেখানে কেমব্রিজে কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর উগাণ্ডায় ফিরে আসেন এবং কাম্পালা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার চিঠিপত্রে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং আমার সম্পাদিত 'Bengali Literature' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি মাঝে মাঝে কবিতা পাঠান। উগাণ্ডায় মিলিটারি শাসন প্রবর্তিত হবার পর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 'Afro Asian Writings'-এর বর্তমান সংখ্যায় দেখলাম তিনি মালাঅউর আমেরিকাস্থ রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক লিখেছেন "His poetic works reveal an obvious concern for social and national problems, and an admirable pride in his African heritage." তাঁর কবিতার নিদর্শন হিসেবে 'A Negro Labourer in Liverpool' থেকে কয়েকটি লাইন তুলে ধরা যাচ্ছে :

"This is him
The Negro labourer in Liverpool
That from his motherland
With new hope
Saught for an identity
—grappled
To clutch the fire of manhood
In the land of the free
Will the sun
That greeted his nativity
Again ever shine ?"

জন এম. বিতি কাম্পালা বিশ্ববিদ্যালয়ে রুবাদিরি-র সহকর্মী ছিলেন। তাঁর মধ্যেও রুবাদিরি-র মতোই একটা সংগ্রামী মনোভাব লক্ষ্য করা যায় :

"হে মৃত্যুহারা মানুষ
হে ক্লান্ত
স্থির পাথরের পাশে নিশ্চুপ দাঁড়াও
স্থির থাকো
মৃত্যুকে ডেকো না,
মৃত্যুহারা অশ্রু না শুকোনো পর্যন্ত কাঁদ,
তুমি তোমার মৃত্যুকে মৃত্যু দিয়েছো,
তুমি প্রাজ্ঞ, তুমি মৃত্যুহারা,
তোমার সৌভাগ্যে তুমি আনন্দ করো।"

[অনুবাদ : সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়]

কেনিয়ার কবি জোসেফ কারিউকি-র শিক্ষাজীবনও অতিবাহিত উগাণ্ডায়। কিছুকাল ইংলণ্ডের কিংস কলেজে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। বর্তমানে স্বদেশে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর কবিতাও পূর্বোক্ত কবি দুজনের অনুরূপ। এ ছাড়াও ইদানিং আরো অনেক তরুণ কবির আবির্ভাব হচ্ছে। তাঁরাও বিচিত্র ভাব ও অনুষঙ্গে কাব্য রচনা করে চলেছেন।

পাঁচ

ইংরেজী বা ফরাসী সাহিত্যের তুলনায় পর্তুগিসভাষী রচিত আফ্রিকান কবিতার সংখ্যা স্বল্পতর। কিন্তু কবিতার বিচারে পর্তুগিসভাষী কবিদের অবদানও কম নয়। পর্তুগিসভাষী কবিদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য হলেন এঙ্গোলার মুক্তিযোদ্ধা ও কবি আগসটিনহো নেটো।

আগসটিনহো-র জন্ম হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এঙ্গোলার ইকোলা-এ-বেঙ্গোতে। লিসবন থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক হয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরেই তিনি এঙ্গোলার মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি MPLA-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। এর দুই বছর পরে তাঁকে বন্দী অবস্থায় লিসবনে পাঠানো হয়। কয়েকদিন পরেই তিনি জেলখানা থেকে পালিয়ে স্বদেশে চলে আসেন এবং বর্তমানে অসীম সাহসের সঙ্গে এ্যাঙ্গোলার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছেন। কবিতা রচনায় কৃতিত্বের জন্য তিনি ১৯৭০ সালের আন্তর্জাতিক 'লোটাস' পুরস্কার লাভ করেন।

জ্বলন্ত দেশপ্রেমই আগসটিনহো-র কবিতার মূল সুর। তিনি তাঁর কবিতায় দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :

"I am not the one who waits
but the one who is awaited.
And we are hope,
your children
bound for a faith that can be nourish life...
your sons
searching for life."

তাঁর কবিতায় একটা বলিষ্ঠ আশাবাদের সুর সর্বদাই ধ্বনিত হতে শোনা যায়। বর্তমান অবহেলিত অত্যাচারিত জীবনের অবসান একদিন ঘটবেই এ বিশ্বাস তাঁর কবিতার সর্বত্র অনুরণিত। তিনি বলেছেন :

"তোমার সন্তানরা
ক্ষুধার্ত যারা
তৃষ্ণার্ত যারা
তোমাকে 'মা' ডাকতে যারা লজ্জা পায়

রাস্তা পার হতে যারা ভয় পায়
মানুষকে যারা ভয় পায়
আমরাই
জীবনের আশাকে একদিন ফিরিয়ে আনব।"

[অনুবাদ : শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়]

পর্তুগিসভাষী আর দুজন বিশিষ্ট কবি হলেন এঙ্গোলার আন্তোনিও জাসিনতো এবং কেপ ভার্দের এগুইনালডো ফনসিকা। জাসিনতো-র কবিতার সুর নেটো-র অনুরূপ। এগুইনালডো-র জন্ম ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। পর্তুগিস ভাষায় তাঁর কয়েকটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে। নিগ্রোজীবনের দুঃখময় অনুভব তাঁর কবিতাতেও প্রকাশিত।

ছয়

আফ্রিকার কবিতা, যে ভাষাতেই রচিত হোক না কেন, তার মধ্যে একটা সমধর্মিতা বিদ্যমান। অনুভবের সূক্ষ্মতায়, অভিব্যক্তিতে, বেদনার তীব্রতায়, স্বাধীনতার রক্তক্ষরা সংগ্রামে এবং সবশেষে মোহমুক্তিজনিত হতাশায় সর্বত্রই কবিচিত্ত প্রায় একই ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। অবাঞ্ছিত, অস্বীকৃত মানবতার আকুতিতে সর্বত্রই কবিকণ্ঠ সোচ্চার ; আবার স্বপ্নলাঞ্ছিত মাতৃভূমির স্বাভাবিক বিকাশ না দেখে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশের কবিদের কণ্ঠ ম্লান।

শুধু বিষয়ের দিক থেকে নয়, আঙ্গিক এবং প্রকরণের দিক থেকেও আফ্রিকার কবিতা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। একালের নতুন কবিরা আফ্রিকার কবিতাকে দিয়েছেন নতুন বৈশিষ্ট্য। অবশ্য যে পরিমাণ পত্রপল্লবে সজ্জিত হলে আমরা আরো খুশি হতে পারতাম, এখনও তা হয় নি—তবু তার বিচিত্র প্রকাশ এবং বর্ণবিহ্বলতা সহৃদয়ের মন আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট। কঙ্গোর কিংবদন্তীতে পরিণত রাষ্ট্রনায়ক ও কবি শহীদ প্যাট্রিস লুমুম্বার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাই বলা যায় :

"সকাল হয়েছে বন্ধু, চেয়ে দেখো, আমাদের মুখের দিকে,
চেয়ে দেখো পুরোনো আফ্রিকার বুকের উপর
ভেঙে পড়েছে এক নতুন সকাল।"

[অনুবাদ : সরোজ দত্ত]

এই নতুন সকালের আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনার রূপময় প্রকাশেই আফ্রিকার কাব্য উজ্জ্বল।

অপ্রকাশিত রচনা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

সংকলক : চিত্তরঞ্জন ঘোষ

যুদ্ধ এবং তারপর

একককড়িবাবু তাঁর বাড়ীর আলো থেকে এখনো ঠোঙা সরিয়ে ফেলেন নি। তিনি বলেন, বোমা পড়ার হয়েছে কি? এইবার থেকে ত স্থরু হবে বোমা পড়া!

—মানে?

—মানে, এবার এঁরা ফেলবেন যে!

—এঁরা মানে কারা? মিত্রপক্ষ?

—মিত্রপক্ষই বটে! এঁরা সবারই মিত্র—জাপানীদেরও।

—আমরা কি বলব?

—নিশ্চয়ই মিত্রপক্ষ! এঁদের মিত্রতায় দেশ শুদ্ধ দেশকর্মী নিরাপদে জেলে ব'সে ভাত খাচ্ছেন। পোনর লক্ষ অকর্মা লোক না খেতে পেয়ে আগাছার মত শুকিয়ে গেল, দেশের জঞ্জাল কত কম্‌ল, বলুন ত।

—কিন্তু আমাদের সৈন্যরা এঁদের হয়ে লড়ছে ত?

—মরছে, বলুন। যুদ্ধে কতক লোকের মরতেই হয়। তা যদি আমার ছেলে না ম'রে হরের ছেলেকে মরতে পাঠাতে পারি, মিত্রের কাজ করলাম বৈ কি?

—যা হ'কে, এঁরা এখন কলকাতায় বোমা ফেলতে আসবেন কেন?

—এঁরা বর্মায় বোমা ফেলছেন কেন?

—স্থভাষ বোস সেখানে রয়েছেন বলে।

—বোঝা যাচ্ছে স্থভাষ কলকাতায় আসছেন। তাই, সাত তাড়াতাড়ি আলো খুলে দেবার দরকার হয়েছে, বোমা ফেলবার স্থবিধা হবে ব'লে।

—এঁরাই যে রেঙ্গুন পৌছেছেন শুনছি।

—শুনবেন না কেন? গোয়েরিংও ত গিয়ে ইংলণ্ডে পৌছেছেন। কত-রকম পৌছান আছে খবরের কাগজ পড়ে তা বুঝবেন কি? জানেন ত যুদ্ধের

পয়লা নম্বর শহীদ হ'ল সত্যসংবাদ। খবরের কাগজের মিথ্যার ঝুড়ি খুঁজে খুঁজে সত্য আবিষ্কার করে নিতে হয়। মোট কথা এইটে বোঝা যাচ্ছে, বাংলা ছেড়ে এঁরা চল্লেন। গেলবার জাপান এল-এল হ'লে এঁরা ধান-চাল নিয়ে সরছিলেন, এবার নিচ্ছেন কাপড়চোপড়। এই কাপড় সরানো আর আলো জ্বালা, এইতেই বোঝা যাচ্ছে, এঁরা চল্লেন, কারণ সুভাষ আসছেন।

—জাপান বলুন।

—জাপানের বোধহয় আসতে হবে না। স্বাধীন ভারত বাহিনী এলেই কাজ ফতে কত্তে পারবে। 'এই জন্যেই ত দেরী হয়ে গেল। বর্মাকে স্বাধীন করতে জাপানের কতকটা সময় গেল কিনা।

—এঁরা ত আগেই সরেছিলেন, তবে সময় লাগবার কারণ ?

—কতকগুলি বোকা বর্মী কম্যুনিষ্ট গোলমাল কত্তে লাগল কি না, তাই টোজো বল্লেন, 'বাবা সুভাষ, তুমি দিন কতক আন্দামানে রাজত্ব কর, আমি বর্মার কর্ম সেরেই তোমাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিচ্ছি।' এতদিনে বর্মার কর্ম সারা হয়েছে, এবার সুভাষের রাজধানী কলকাতা।

—বর্মার কর্ম সারাই বটে—একটা পাপেট বসিয়ে—

—এঁরা পাপেট্ই না হয় বসাতেন দেখি। গান্ধি, জিন্না, সাবারকারকে না হয় বাদই দিলাম। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, সপ্রুকে একবার বড়লাট ক'রে বসিয়ে যা খুশী তাই ত ক'ত্তে পাত্তেন। ততটুকু কলিজা এঁদের হ'ল না। হাতে তুলে ছাই দিলেও বুঝতুম যে হাত এল।

—ছাই কেন ? যুদ্ধের পরে স্বাধীনতাই ত দিতে এঁরা প্রতিশ্রুত।

—যুদ্ধ শেষ হ'লে ত ? কোন্ যুদ্ধ ? এক যুদ্ধ ত এঁরা বলছেন শেষ হয়েছে। এখন হবে জাপানী যুদ্ধ। এর পর আবার হবে রুষের সঙ্গে যুদ্ধ। তারপর বাকী রইল আমেরিকার সঙ্গে। তদ্দিনে জার্মানী আবার চাড়া দিয়ে উঠবে; সুতরাং পুনরায় যুদ্ধ, পর পর চল্লই। এর আর শেষ নেই। কাজেই যুদ্ধ শেষ হ'লে আমি আপনাকে লাটসাহেবের···

আমন

আমন ধান বাংলায় নাকি এবার এমন হয়েছে, যেমনটি বহুদিন দেখা যায় নি। কাস্তে ধরার হস্তের অভাব পড়ায়, কিছু কিছু তার মাঠে মারা গেলেও, ঘরে যা উঠেছে তাই নাকি প্রচুর। বাংলায় সবচেয়ে খাকৃতির পেট কলকাতা

সহর আর তার আশপাশ। এর গহ্বর পূর্ণ করবার ভার নিয়েছেন ভারত সরকার খোদ। বাংলা সরকারের ওপর শুধু বরাদ্দমত বিলির ব্যবস্থা। সরবরাহ হবার কথা, সুতরাং, বাংলার বাইরে থেকে। হিসেবে তাহ'লে এবার সারা বাংলার ভূরিভোজনের আয়োজন। কিন্তু শস্যমূল্যের ওঠানামায় সামান্য মতান্তর থাকলেও, ভূরিভোজনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না, গতি যেন খাদ্য-সংযমের দিকে। কতদূর যাবে, গেল বারের মত যমের দুয়ার পর্যন্ত বাংলাকে টেনে নেবে কিনা এখনও বলা যায় না, তবে আশঙ্কা হয়। আমাদের বরাতে হিসেবের সঙ্গে ফল মেলে না। গেল বারে হিসেবে নাকি পাওয়া গিয়েছিল দেশে খাদ্যশস্যের অভাব ছিল না, অথচ খাদ্যাভাবে বাংলায় এত লোক মারা গেল যে আজও তার সঠিক হিসেব পাওয়া গেল না। এবারে তারা আর খেতে আসবে না, জরাসুর ওলাইচণ্ডী মা শীতলার কৃপায় খাইয়েও দিন দিনই কমে আসছে, ঘরে শস্য মজুত, অথচ এবারেও খাদ্যাভাবের আশঙ্কা! কেন?

'শস্যঞ্চগৃহমাগতং' প্রশংসার, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের বেলা নয়। কারণ, এখানে সমস্যা, 'গৃহং, কার গৃহং?' চাষের ধান প্রথমে চাষীর গৃহেই আগত হয়। কিন্তু, ধার শোধ, জমির খাজানা, মাথা (?) পরার খরচার ছিদ্রে তা আবার নির্গত হয়, কখনও বা নিঃশেষে। কাজেই ধান হলেই চাষী খেয়ে বাঁচবে এমন নিশ্চয় ব্যবস্থা নেই, আমাদের মত অ-চাষীরা ত নিত্য অনিশ্চয়তা নিয়েই ঘর করি। ঘুরে ফিরে ধান চাল ওঠে গিয়ে কারবারী মজুতদারদের গোলায়। শস্যের খন্দ এক, কিন্তু খাদ্য সে সম্বৎসরের, প্রত্যহ দু বেলার। সুতরাং মজুত হয়ে শস্য কোথাও না কোথাও থাকবেই। কিন্তু যাঁরা মজুত করবার ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁরা সমাজের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে করেন না, করেন কারবার হিসেবে, অর্থাৎ সস্তার বাজারে কিনে মাগগীর বাজারে বেচে দু' পয়সা ঘরে তোলবার আশায়। এ জন্যে আজ দুরবস্থায় পড়ে, কারবারীদের আমরা গাল দিতে পারি। কিন্তু আবহমান কাল থেকে তাঁদের এই কারবার চলে আসছে বলেই আমাদের অ-চাষীদের পাতে ভাত পড়তে পেরেছে। এ যুদ্ধের বাজারে নানা ব্যবস্থার বিপর্যয়ের সুযোগে, চাল একটু চেপে রেখে, লাভের অঙ্ক কিছু যদি মোটা করে তোলা যায়,এইটে দেখা মজুতদার ব্যাপারীদের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, চিরদিনই তাঁরা এইটেই শুধু দেখে এসেছেন, ক্ষুধার্তের হাঁ দেখে দয়াদ্রব হ'য়ে কোনও কালেই মজুদ চাল বাজারে ছাড়েন নি, নতুন চাল

বাজারে উঠে দর নামাবার সম্ভাবনা দেখে পুরানো মাল বাজারে ছাড়তেন, যাতে না লোকসান খেতে হয়। এরূপ লাভ-লোকসান খতিয়ে খতিয়ে ব্যক্তিগত মূলধন যার যার মনে চলত, তাতে অপচয় যথেষ্ট হ'ত, অথচ মোটামুটি খাওয়া-পরা সমাজের একরকম চলত বলেই লোকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু প্রাণের অপচয়ের স্পষ্ট প্রমাণ গেল বার যেমন বাংলায় দেখা গেল, এমন উদাহরণ বিরল।

কাজ-কারবারে গোলে হরিবোল দিয়ে আর যে চলে না এ শিক্ষা এ থেকে হওয়া উচিত।

বাংলার খাদ্যসমস্যার সমাধান হচ্ছে না। যেই যা বলছেন, ফলে মিলছে না। দাম যে চড়ে রইল, নামবার নামটি নেই।

বাংলায় খাদ্যসমস্যা আগে কোন কালে ছিল না। অন্য হাজার সমস্যা ছিল, যেমন, কন্যাসমস্যা, বন্যাসমস্যা, বোমাসমস্যা, গোণা সমস্যা, তাজিয়া সমস্যা, কাজিয়া সমস্যা, পাট সমস্যা, ঘাট সমস্যা, বাদ্যসমস্যা—কিন্তু খাদ্য সমস্যা ছিল না। দেশে কত খাদ্য জন্মাত, কত আসত, কত চলে যেত, কার পাতে পড়ত, কার পড়ত না—এ সব ব্যাপার নিয়ে কোন মাথা ঘামত বলে জানা নেই। হরি হরি বলে হয়ে যেত, আর আমরা উচ্চৈঃস্বরে গান কত্তাম 'আমার সোনার বাংলা।'

বাংলার খাদ্যসমস্যা পঞ্চম বাহিনীর সৃষ্টি, যুদ্ধায়োজন ব্যাহত করার মতলবে। আগের চার বাহিনীর কারসাজিও কম নেই। মালয়-ব্রহ্মের চাল বন্ধ ত জাপ বেটাদেরই কাণ্ড। তাও বেটারা বাংলায় ঢুকতে ভয় পেয়ে গেল, বোধহয় এই খাদ্যসমস্যার ভয়েই। বাংলায় 'কলা দেখান'-নীতির প্রয়োগে যেমন করে চালচুলো, নৌকাডোঙ্গা, লোকজন সরান হচ্ছিল, খ্যাদারা এলে কি রকম নাস্তানাবুদ হত। কিন্তু 'উল্টা বুঝিলি রাম', কলা দেখাতে গিয়ে এখন সরষে ফুল!

হিসেবে পাওয়া যায় দেশে চাল আছে। চলেই গিয়ে থাক, চালানই না আসুক, চাল আছে। কিন্তু কোথায়? নিশ্চয় পুঁজিদারদের কাছে। চাল বছরে একবার জন্মায়, কিন্তু খেতে হয় বছর ধরে দু'বেলা। কাজেই মজুত হয়ে থাকতেই হবে চালকে কোথাও না কোথাও। এই মজুত কোথাও মোটা লাভের লোভে, কোথাও ভবিষ্যতের ভয়ে। সহজ চাহিদায় মজুত আপনিই আবার নিঃস্বত হত। কারো যেন ভাবনা ছিল না, সব হরি নামে চলত।

এখন সকলে একসঙ্গে ভাবতে সুরু করায় সব চলাচল যে থমকে দাঁড়িয়েছে, তাকে আর সচল করা যাচ্ছে না। কর্ত্তারা যেন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে এটা হাতড়াচ্ছেন ওটা হাতড়াচ্ছেন, কোনটাই জুতসই হচ্ছে না দেখে, আবার ছুঁড়ে ফেলে ফেলে দিচ্ছেন। গোলা লোক আরও গুলিয়ে যাচ্ছে। ওঁরা কিছুই না ক'রে বোধহয় ভাল হ'ত। অন্ততঃ এর চেয়ে বেশী কিছু খারাপ হ'ত না। জাপ বেটারা এলে এ দায় ওদের ঘাড়েই পড়ত, বাঁচা যেত। না এলেও। সমস্যা কিছুদিন বাদে আপনি মীমাংসা হ'য়ে যাবে। সমস্যা এক হিসেবে খাদ্যের নয়। খাদ্য ঠিক পরিমাণই আছে, বেড়েছে খাদক সংখ্যা। এমন অনাহার···

জম্বু-উপাখ্যান

জম্বুর জম্বু নাম কে কবে দিয়েছিল, কারো মনে নেই। বিশাল পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হয়েও জম্বুর জম্বু নাম ঘুচল না।

জম্বুদের বাড়ীর একটা বিশেষত্ব এই যে বাড়ীতে চাকরবাকরের সংখ্যা অসম্ভব রকম অধিক। মুসলমান আরদালি, চাপরাশি, বাবুর্চি; বাঙ্গালী চাকর, ঝি, বামুন; মাদ্রাজী আয়া; হিন্দুস্থানী দরোয়ান, বেয়ারা; শিখ, পাঠান, গুর্খা পাহারাদার; উড়ে মালী; মারাঠী পুজারী; গুজরাটি মিস্ত্রী ইত্যাদি ইত্যাদি। জ্ঞাতিকুটুম্ব যে কিছু কিছু না আছে তা নয়, কিন্তু এই সব ঝি-চাকর-বামুনের দলই বেশী।

অরূপ পাশের গাঁয়ের জমিদার। হাইকোর্টে মামলা হেরে ফতুর হয়ে গিয়েছিল। প্রিভি কাউন্সিলে জিতে আবার লাল হয়ে উঠেছে। মামলা জিতেই সে জম্বুকে সবান্ধবে তার বাড়ী মধ্যাহ্ন ভোজনে নেমন্তন্ন করেছে।

জম্বু নেমন্তন্ন পেয়ে আত্মীয়কুটুমদের ডেকে বল্লে, তারা এই নেমন্তন্ন গ্রহণ করবে কি না। দু'একজন ছাড়া সকলেই গ্রহণ ক'ল্লে। চাকরবাকরদের ব'লে দিলে, 'এই, তোদের নেমন্তন্ন।'

তারা মুখ চাওয়াচায়ি করে ব'ল্লে, 'হুজুর আমাদের ত মত জিজ্ঞেস করলেন না।'

'মনিবের নেমন্তন্নে চাকরদের নেমন্তন্ন অমনিই হয়, ওর আর মত জিজ্ঞাসা কি?'

চাকরবাকররা খুশী হ'তে পাল্ল না। নানা রকম জল্পনাকল্পনা ক'রে মনিবকে সসম্ভ্রমে জানালে, 'আচ্ছা, মত না নিয়েছেন, না নিয়েছেন, আমরা

নেমন্তন্নে যাব, তবে আপনার সঙ্গে যাব না, আলাদা যাব।'

জম্বু মনে মনে জানে এতগুলি চাকরবাকর নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে গেলে অনর্থক গণ্ডগোল হবে; সে আগেই শিখ পাঠান গুর্খা পাহারাদের ব'লে রেখেছে তাদের কাকে কাকে নিয়ে যাবে। তারা বলেছে, 'যো হুকুম হুজুর।' সুতরাং চাকরদের আবদারে সে কর্ণপাতও করলে না।

চাকররা দেখ্‌লে মুস্‌কিল, কি করবে ভেবে কিছু ঠিক কত্তে না পেরে বুড়া গুজরাটি মিস্ত্রীকে ব'ল্লে, 'বাপ্‌ তুমি যা হয় কর, আমাদের বুদ্ধিতে কুলচ্ছে না।'

গুজরাটি মিস্ত্রীর অসাধারণ বুদ্ধির খ্যাতি ভৃত্যমহলে বিশেষ প্রচারিত ছিল। মিস্ত্রী ব'ল্লে, 'আচ্ছা, তোমরা যখন বলছ, ভার আমি নিচ্ছি, কিন্তু আমার কথা মত সকলকে চলতে হবে। সকলে যদি না পার, যে ক'জন পার, তারা চ'ল্লেই হবে।'

মিস্ত্রী তখন একা জম্বুর সঙ্গে দেখা করে বল্লে, 'হুজুর, আপনার যা খুশী করুন, যাকে খুশী নেমন্তন্নে নিয়ে যেতে চান নিন, কেবল এই মামলা-ঘটিত নেমন্তন্নটায় যোগ দেওয়ার অর্থ অনিচ্ছায় মামলার এ পক্ষে কি ও পক্ষে যোগ দেওয়া, এটা অন্যায়। এইটি আমাদের চেঁচিয়ে বলতে দিন।'

জম্বু বল্লে, 'নেহি।'

মিস্ত্রী তখন ঢোঁক গিলে বল্লে, 'এটুকুতেও আপনার আপত্তি? আচ্ছা, নেমন্তন্ন মাত্রেই গুরুভোজন হয়, অপাক মানবদেহের পক্ষে অহিতকারী, এ কথা বলতে পারি ত?'

জম্বু একবার মিস্ত্রীর দুর্বল দেহের দিকে চেয়ে ভাবলে এ দেহের পক্ষে নেমন্তন্ন কেন, ভোজন মাত্রই অহিতকারী। অনেক কষ্টে হাস্য সম্বরণ ক'রে কৃত্রিম রোষের সঙ্গে ব'ল্লে 'ও ভি নেহি।'

মিস্ত্রীর গম্ভীর মুখ দেখে সকলে ভীত হয়ে গেল।

'কি হ'ল বাপু?'

'তোরা কে কে লুকিয়ে লুকিয়ে গাঁজা খাস্‌ না, বাজারের পয়সা চুরি করিস না, ফাঁক পেলেই ঝি মাগীদের সঙ্গে ইয়ারকি দিস না, তার একটা ফর্দ আমায় দে দেখি।'

'কি হবে বাপু?'

'তাদের এক একজন করে, আমি ঠিক করে দেব, তারা ব'লে বেড়াবে—নেমন্তন্ন খেয়ো না, পেট ছেড়ে দেবে।'

'সবাই মিলে এক সঙ্গে বলি না।'

'না রে না। একসঙ্গে গণ্ডগোল ক'ল্লে, হুজুরের নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ায় গড়বড় হ'য়ে যেতে পারে, হয়ত দেরীই হয়ে গেল। ওতে কাজ নেই। আমি যেমন বল্‌ব তেমন তেমন যেতে হবে। নইলে আমি এর মধ্যে নেই।'

'ও বাবা, তুমি থাকবে না কি গো? আচ্ছা তাই হবে। তবে গাঁজা খায় না, একটু-আধটু হাতটান নেই, ঝি-প্রীতি নেই, এমন কি আমাদের মধ্যে বেশী আছে? অত কড়াক্কড়ির কি খুবই দরকার?'

'হুজুর জমিদার, জানিস ত? তাঁর মুখের ওপর তাঁর অনিচ্ছায় সত্যি কথা বলাও অপরাধ। এমন জমিদারী প্যাঁচে ফেল্‌বে যে জেলে যেতে হবেই। ওসব বদ অভ্যাস থাকলে জেলে গিয়ে বেশী কষ্ট হবে না? তাই বদ অভ্যাস যাদের কম তাদেরই আমি যেতে বলি।'

'আচ্ছা, বাপু, সে রকমই হবে। কিন্তু এতে ফল কি হবে? নেমন্তন্ন ত বন্ধ করা হবে না।'

'ভগবান ক'ল্লে এই থেকে পৃথিবীতে নেমন্তন্ন খাওয়া উঠে গিয়ে মানুষের অজীর্ণ রোগ দূর হয়ে যাবে।'

অজীর্ণ রোগের এরূপ সহজ ওষুধ হাতে পেয়ে ভৃত্যমণ্ডলী উল্লসিত হয়ে উঠল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে, 'আর কি কি ফল পাওয়া যেতে পারে?'

'আর কি ফল? ভগবান ক'ল্লে এই জমিদারীই তোদের হাতে চ'লে আসবে।'

সকলে আস্তে আস্তে মিস্ত্রীর জয়ধ্বনি ক'রে উঠল, জমুর কানে না যায়।

কেবল মেদিনীপুরী ঠাকুরটি এক পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, ভগবান ক'ল্লে ত অমনিই সব হ'তে পারে। এত কাণ্ডের কি দরকার? কিন্তু কোনও রূপ উচ্চবাচ্য ক'ত্তে সে সাহস ক'ল্লে না, প্রয়োজনও বোধ ক'ল্লে না। হরি ঝি পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে সকলের সামনেই ডেকে ব'ল্লে, 'কি রে ভাল আছিস ত হরি?'

হরি ভাবলে, 'মুখপোড়া বামুনের হ'ল কি? লুকিয়ে যা কচ্ছিস কর, পাঁচ জনের সামনে ডাকাডাকি কি গো?'

যার ধন তার ধন নয়

কাস্তের কচাকচ্, হাতুড়ির ঘা,
চলছে যে কবে থেকে নাই আলগা।
নগরে নগরে তাই বড় বড় ব্যাঙ্ক্,
আশমানে এরোপ্লেন ডাঙ্গায় ট্যাঙ্ক্।
মজুরি চুরির ফলে পুঁজি যে মজুত,
মজুরি চুরির কল আরো মজবুত।
পেশীরে পেষিয়া কলে যাহা কিছু রস
ভ'রে তোলে অলসের শূন্য কলস।
পিষিয়া মারিতে গেলে উৎস শুকায়,
মজুর এখনো তাই আছে এ ধরায়।
সমুদ্রমন্থনে দেবতাদানব
দুই পক্ষ খেটেছিল যথাসম্ভব।
দানব বঞ্চিত হ'ল, দেবতা অমর,
ধরার এ মন্থন তাহারো ওপর।
যাহারা খাটিয়া মরে তাহারা শুকায়,
যাহারা খাটে না তারা ব'সে ব'সে খায়।
উদর আহার যদি নিজে ধরে রাখে,
হাত-পা জীবনরসে বঞ্চিত থাকে।
যে দশা দেহের হয়, সমাজের তাই,
শীঘ্র প্রতিকার বিনা কোন আশা নাই।
প্রতিকার কার হাতে হাত-পা'র বই ?
যার ধন তার নয়, নেপো মারে দই ?
দুনিয়ার মজদুর তোমাদের ধন
তোমরা কাড়িয়া লও করি প্রাণপণ।
অলসেরা বৃথা রয়, তোমরাই সব,
তোমাদেরি হাতে গড়া বিত্তবৈভব।
মাথার ওপরে যারা ছক্কা-ঘুরায়,
ভুলাইতে ধর্মের বুলি আওড়ায় ;
[illegible]

সভ্যতার ধ্বজা ধরি গগন বিদারে—
হিমালয়-অপচয়, মিথ্যায় ভরা,
সেই সভ্যতার দাম নহে কাণা কড়া।
নির্মম হইয়া তারে ভেঙ্গে কর চূর
গড়িবে দু'দিনে নব সভ্যতার চূড় !
রুষিয়ার মজুরেরা উঠিল রুষিয়া—
পাতালে বাসুকি যেন উঠিল ফুঁসিয়া।
উপরে তাসের ঘর পড়ে দুপদাপ।
নতুন গড়িয়া সেথা উঠে ধাপে ধাপ।
চক্ষুশূল অলসের, তাই দেখ আজ
ধনীরা কাঁপিছে ভয়ে. কর রণসাজ !
তোমাদের হাতে গড়া যত হাতিয়ার
তোমরা লইয়া কাঁধে হও আগুসার।
তোমাদের কানে গায় স্বজাতির বুলি·
তোমাদের চোখে সেঁটে দেয় তারা ঠুলি ;—
তোমাদের হাতে তারা তোমাদের মারে।
কতকাল র'বি ভাই বিষম আঁধারে ?
একের মরায় ক্ষতি কতটুকু বল,
বহুর তাহাতে যদি হয় রে মঙ্গল !
একা তুমি কিছু নও, সকলে ডাগর,
জল-কণা কণা মাত্র, মিলিলে সাগর।

ধাঁধাঁ

আকাশ রাখিলে ভ'রে তারায় তারায়,
আসে যায়
রবি শশী তারি মাঝে মাঝে ;
কখনো আঁকিছ মেঘ কত রঙে রূপে
চিত্রপট যেন.
কভু দেখি দামিনীর ঝলকে ব্যাকুল
গরজনে বরষণে পরিশেষ তার।

আঁকিলে ধরার বুকে নদী গিরি বন
সাগরে করিলে নীল, মরুরে গৈরিক।
গড়িছ ভাঙ্গিছ সদা ভাঙ্গিছ গড়িছ
তৃপ্তি যেন কিছুতে না পাও।
কার পরিতোষ লাগি এ প্রয়াস তব ?
আমারি কি ?
আমি ছাড়া কে দেখিছে জানি না ত আমি।
দেহ দেখি আমারি মতন
প্রাণের প্রমাণ পাই,
কি যে তারা দেখে, জানে তারাই কেবল।
আমি জানি,
আমি শুধু চিনি আমারি জগৎ।
আমারি জগৎ ?
আমারি লাগিয়া শুধু এত আয়োজন ?
কেন ?
ভালবাস বলে ?
তবে কেন দিলে ভয় অন্তরে আমার ?
ছোট বলে ভাবি আপনারে।
জীবনেরে ভাবি কারাগার—
জনম-মরণ দ্বারী আগে পাছে তার ?
শুধু কি বাহির ?
অন্তর খুঁজিলে তারো তল নাহি পাই !
কত অনুভূতি, কত না কাঁপন
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে 'আমি আছি' ব্যেপে
কোথায় যে আদি এর
কোথায় যে শেষ
আভাসে জানিতে নাহি দাও।
জানিবার ব্যাকুলতা দিয়েছ কেবল,
জানাইতে কর কৃপণতা—
এই ব্যথা কেন দাও ?

ভাল নাহি বাস ব'লে ?
তুলিয়া নিতেছ কোলে,
না, কি,
ফেলিয়া দিতেছ দূরে
বুঝিবারে কিছুতে দিলে না।
যুগ যুগ ধরি
ভাবিয়া মরিছে নর—
একমত হ'ল না কখনো।
কভু ভাবে 'পতিত সাগর',
কভু মনে করে
তোমা পানে চলিছে উঠিয়া—
তুমি কি বসিয়া শুধু দেখিবে কৌতুক ?
এই সৃষ্টি,
তারি মাঝে জড়াইলে যদি
জড় কেন একেবারে করিলে না সব ?
জাগালে চেতনা,
তাই পড়িনু ধাঁধায়।
আনন্দের দিলে অনুভূতি,
ব্যথা দিলে সাথে সাথে।
ব্যথা কি তুমিও পাও হে আনন্দময় ?
কিম্বা, আনন্দের মূলে ব্যথা রয়েছে জড়ায়ে ?
একাকী কি তুমি নও,
হ'য়ে আছ দুই ?
তোমাদের বিরহবেদনা
খণ্ডে খণ্ডে ছড়ায়েছে এই বিশ্বময় ?
তোমাদের না হলে মিলন
হবে না ত এ ধাঁধাঁর কভু সমাধান ?
মিলনের বাধা কিসে ?
হায় ! জিজ্ঞাসার ওপর জিজ্ঞাসা যতই না করি,
উত্তর উত্তরোত্তর যায় দূরে সরি।

সত্তার আনন্দ

ভাল লাগা, ভাল নাহি লাগা
দুয়ে মিলে এ জীবন।
কেবল লাগিত যদি ভালো,
মৃত্যু হ'ত অতি ভয়ঙ্কর।
তারি ভয়ে সব ভাল লাগা
ভাল আর লাগিত না।
মৃত্যু যদি না রহিত,
নবীনতা অবকাশ পেত না ফুটিতে ;
অনন্ত জীবন ধরি—
পুরাতন ভাল লাগা
লাগিত না ভাল আর।
যদি কিছুই লাগিত নাহি ভাল,
জীবন হইত অসম্ভব।
জীবনে সুখের পাশে থাকিবেই দুখ।
ওরে মন, বৃথা আপশোষ।
কারে তুই দিবি দোষ ?
দোষ নহে বিধাতার,
তোমারও নহে।
জীবনের রঙ্গ এই
মৃত্যুর ধরিয়া হাত নৃত্য তার চলে শুধু।
এই নৃত্যে ক্লান্ত কিরে তুই ?
চাস কি রে অনন্ত বিশ্রাম ?
সত্তার নির্বাণ ?
মনে হয় তাহা নয়,
সুখ-দুঃখ তরঙ্গের পরে
সত্তার আনন্দতরী
বেয়ে যেতে চাস তুই নিত্যকাল ধরি !

রচনা-পরিচিতি॥ মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের পরিচয় আজ প্রধানত অভিনেতা হিসেবে। কিন্তু তাঁর নানা লেখা সে সময়ের কাগজে ছড়িয়ে আছে। তাঁর নাটকেরও কথা আমরা জানি। কিছু টুকরো লেখা—প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, নাটক, সমালোচনা—অধিকাংশই অসম্পূর্ণ—অপ্রকাশিত আছে। এখানে তাই থেকে কয়েকটি লেখা ছাপা হল। এখানকার কবিতা তিনটি সম্পূর্ণ, গল্প তিনটি লেখাই অসম্পূর্ণ। কবিতাগুলির ও 'আমন'-এর নাম তাঁর দেওয়া। বাকি দুটি লেখার নাম তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি—ও দুটির নাম আমাদের দেওয়া। জম্বু-উপাখ্যানের পাণ্ডুলিপির পেছন দিকে লাল পেনসিলে বেশ স্পষ্ট করে লেখা আছে—মধুকর শর্মা। এই লেখার ক্ষেত্রে তিনি কি ঐ ছদ্মনামটি নিতে চেয়েছিলেন? কৌতূহলী পাঠকের জন্যে মহর্ষির অভ্যেসের কথা জানাই: তিনি মুদির খাতার সাইজের লম্বা স্লিপে সাধারণত লিখতেন, এবং স্লিপগুলি একত্র রাখবার জন্য আল-পিনের বদলে বহু সময়ে বাবলা কাঁটা ব্যবহার করতেন।

এই অপ্রকাশিত লেখাগুলি সযত্নে রক্ষা করেছেন শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র। তাঁর সৌজন্যে এগুলি এখানে ছাপা হল।

—চিত্তরঞ্জন ঘোষ

দুর্ঘটনা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠিক এই মুহূর্তে অঘোরের সঙ্গে দেখা না হয়ে গেলে কী করতে সীতেশ—তা নিজেই জানে না। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সে তার বাড়ির রাস্তায় এসে উদ্দেশ্য-হীনভাবে ঘোরাফেরা করছে—ভেতরে ঢুকতে পারে নি। চৌকাঠ পেরোনো এবং পেরিয়ে ভেতরের অবস্থার সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্য সাহসের প্রয়োজন। এই মুহূর্তে সীতেশ যেন তার অভাব বোধ করছিল।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সীতেশ দেখছিল রোদের তাপে তেতে-ওঠা আকাশ, ঠোঁটের মধ্যে অনুভব করছিল পোড়া সিগারেটের তেতো স্বাদ।

পুড়তে পুড়তে সিগারেটটা এসে ঠেকেছে একেবারে আঙুলের ডগায়। অতএব এখনই ওটাকে না ফেলে দিয়ে উপায় নেই। বাড়িতে ঢোকা এখন তার চলবে না। সুতরাং শুধুমাত্র আকাশ দেখে কতক্ষণ কাটাত সে, যদি না দেখা হয়ে যেত অঘোরের সাথে!

হন হন করে আসতে আসতে হঠাৎ সীতেশের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে যায় অঘোর। ঠিক কী করবে ভেবে না পেয়ে তাকিয়ে থাকে নির্বোধ দৃষ্টিতে।

অঘোরকে দেখে সীতেশের মনে হয়, তার গাল দুটো যেন দারুণ সরু হয়ে গেছে। চোখ থেকে চশমাটা নেমে এসেছে অনেক নীচে। বসে যাওয়া চোখ দুটো লাল, কিন্তু কী এক অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্যে যেন চক্ চক্ করছে।

চোখের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যও কিন্তু কাটিয়ে তুলতে পারে না তার মুখের থমথমে ভাবটিকে। বলার মতো কথা খুঁজে না পেয়ে ভূমিকাতেই একেবারে চরম কথাটি বলে ফেলে সে: 'বৌয়ের অবস্থা খুব খারাপ।' ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ শোনায় তার গলাটা। বিপন্ন চিন্তায় থতমত করে সারা মুখখানা।

অঘোরের প্রতি কেমন যেন দয়া হয় সীতেশের। নতুন একটি প্রাণের জন্ম দিতে গিয়ে কী বিপদেই পড়েছে বেচারী। নিজের শরীরের রক্তে নতুন একটি রক্তপিণ্ড গড়তে গিয়ে মরতে বসেছে তার বৌ। কী কাতর দেখায় তার মুখের অনুভূতিটি।

সুমিতার কথাটা ভেবে যেন হাসি পেয়ে যায় সীতেশের। এই পৃথিবীতে একজনের কষ্ট রক্তমাংসের এই প্রাণটিকে টিকিয়ে রাখার, আর একজনের— নতুন একটি রক্তমাংসের সজীব সত্তাকে এই পৃথিবীতে আনার।

তফাৎ আছে বৈকি! তা হলেও অঘোরকে দেখে সীতেশের ভালো লাগে। সমব্যথী পাওয়ার একটি আনন্দ যেন তার মনটিকে প্রসন্ন করে তোলে। এখন পারস্পরিক সুখদুঃখের কথা আলোচনা করে কিছুটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। অঘোরকে উপদেশ দেওয়া যায় তার বৌয়ের চিকিৎসা সম্বন্ধে। যদিও সে যা বলবে, তার একটিও করার সাধ্য অঘোরের নেই।

তবু সে বলবে। বলতে তার ভালো লাগে। অঘোর অবশ্য সেদিন একটু বিপদে ফেলে দিয়েছিল। তার বৌয়ের প্রেসারটা চেক্ করিয়ে নেবার কথা বলতেই উল্টে সে বলে বসেছিল: 'আপনি বরঞ্চ আপনার ওয়াইফের একটা কার্ডিওগ্রাফ করিয়ে নিন না।'

'করার যখন কিছু নেই, ভেতরের ঝাঁঝরা চেহারাটা স্পষ্ট করে দেখে লাভ কী!' প্রথমটা চমকে গিয়ে পরে ভেবেচিন্তে উত্তরটা দিতে একটু সময় লেগেছিল সীতেশের। আলোচনাটা শুরু হয়েছিল একভাবে। কিন্তু কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশটা অকস্মাৎ এমনই বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল—নিজেরই খারাপ লাগছিল সীতেশের!

অনুভূতির সব রঙ যেন মুছে গেছে অঘোরের মুখ থেকে। শুকনো গালে হাত বোলায় সে।

'বাচ্চাটা বাঁচবে না জানি। কিন্তু বাচ্চার মা যদি…'

মাথার ওপরে আকাশ অগ্নিস্রাবী হয়ে উঠেছে। পায়ের নীচে ঝামা তেতে আগুন। তার মাঝখানে কী প্রচণ্ড রকমের নিষ্ঠুর এবং করুণ শোনায় তার কথাটা।

হতাশার স্তর বেয়ে নামতে নামতে অঘোর আজ এমনই একটি অবস্থায় পৌঁছেছে—টাটকা নতুন একটি প্রাণের আগমনের চাইতে পৃথিবীর পুরনো বাসি হয়ে যাওয়া প্রাণগুলো এখন তার কাছে অনেক বেশি প্রয়োজনীয়।

সীতেশ ভাবে, তার কাছেও কি সুমিতার বেঁচে থাকাটা বেশি দরকার? হয়তো তাই। সুমিতা না থাকলে বাচ্চা দুটোকে মানুষ করবে কে?

সুতরাং অন্তত বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবেও সুমিতাকে বাঁচিয়ে তোলা উচিত সীতেশের। যেমন ভাবছে অঘোর।

'চিকিৎসার কিছু করলেন ?'—ভেবেচিন্তে কথাটা শুধোয় সীতেশ। কোনো কথা না বলে অঘোর এবার হাতের মুঠোটা মেলে ধরে চোখের সামনে আর সীতেশ অবাক হয়ে দেখে, ঘামে ভেজা দলা-পাকানো কতকগুলো নোট তার হাতে।

টাকা! বৌকে মরতে দেবে না অঘোর। এই চড়া রোদের মাঝখানে হনহন করে হেঁটে সে তাই টাকা যোগাড় করে নিয়ে আসছে বৌয়ের চিকিৎসার জন্যে।

সীতেশের মনে হয়, অঘোরের হাতের তালুটা যেন বিরাট প্রশস্ত হয়ে গেছে। আর তার মাঝখানে দলা-পাকানো ঘামে ভেজা নোটগুলো হালকা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে।

'ব্যথা উঠেছে সকাল থেকে। হার্ট খুব উইক। এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাব ভাবছি। তারপর দেখি কি হয়।'—এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে যায় অঘোর। যেন বৌয়ের প্রতি কি কি কর্তব্য সে পালন করছে তারই একটা ফিরিস্তি। আশায় উজ্জ্বল না হলেও কথা শেষে তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে।

অঘোরকে এখন বলা যায় কি—সীতেশ ভাবে—বলা যায় কি—অঘোরের বউ বেঁচে উঠলেও সুমিতা আর বাঁচবে না। কাশির সঙ্গে ঝলকে ঝলকে রক্ত তুলে সে ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে জীবনের সব উপাদান নিঃশেষে ক্ষয় করে। বলা যায় কি—আজ সকালে মা-র মুখ থেকে রক্ত উঠতে দেখে ভয় পেয়ে ছোট মেয়েটা তাকে ঠেলে পাঠিয়েছে ডাক্তার আনতে আর সে খানিকক্ষণ এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে এসে অবশেষে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে মোড়ে দাঁড়িয়ে রোদের তাপে তেতে-ওঠা আকাশ দেখেছে, ঠোঁটের মধ্যে অনুভব করেছে একটা পোড়া সিগারেটের তেতো স্বাদ।

'চলি সীতেশবাবু।' অঘোরের চোখের সেই অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যটা আবার ধক ধক করে ওঠে। ভাগ্য অথবা অদৃষ্টের ওপর ভার চাপিয়ে যতই সে নিশ্চিন্ত হতে চাক—বাড়িতে ফিরে যাবার একটি প্রবল তাগিদ এই মুহূর্তে তার মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কারণ, মানুষকে বাঁচিয়ে তোলবার প্রধান অবলম্বন এখন তার হাতের মুঠোয়।

'দেখি কী হয়' বলে অঘোরের মতো সীতেশ এখন হনহন করে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারবে না। কারণ সুমিতাকে বাঁচাবার সাধ্য তার নেই।

সীতেশ তাই এখন রোগ সম্পর্কে একটি উদাসীন মানুষ। ছোট মেয়েটা বলেছিল: 'মা যে মরে যাচ্ছে বাবা। তুমি এখনও চুপ করে বসে আছ…'

চুপ করে বসে থাকা যেত না যদি সে অঘোরের মতো পেত ঘামে ভেজা দলা-পাকানো কতগুলো নোট! অঘোর চলে গেল। হাতের মুঠোয় জীবন্ত একটা হৃৎপিণ্ডকে আঁকড়ে ধরে সে যেন উড়ে গেল বাতাসে ভেসে!

সীতেশ ভাবে এমন কোনো দুর্ঘটনা কি ঘটতে পারে না, তার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে না কি এমন কোনো হিতাকাঙ্ক্ষীর—সব কথা শুনে যে তার মুঠোর মধ্যে পুরে দেবে দলা-পাকানো কিছু নোট আর সে অমনি উড়ে যাবে বাতাসে ভেসে একটা জীবন্ত হৃৎপিণ্ড হাতে করে?

অঘোরের বউ বেঁচে উঠবে।

কিন্তু সুমিতা আর বাঁচবে না।

সীতেশের জীবনে তার বেঁচে থাকাটা অপরিহার্য হয়ে ওঠা সত্ত্বেও সে মরে যাবে বিনা চিকিৎসায়।

আকাশের রোদ অসহ্য হয়ে উঠেছে। সূর্য এখন ঠিক মাঝ আকাশে। বাড়িতে যেতে তবু যেন পা চলে না সীতেশের।

সুমিতা কি সত্যি মরে গেছে এতক্ষণে!

সীতেশের মনে হয় তার চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন দুলছে। দলা পাকানো নোটগুলোর থেকে উঠে আসা অঘোরের শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত-জল-হওয়া ঘামের গন্ধ যেন তার নাড়ির মধ্যে পাক দিয়ে উঠছে।

অঘোরের সন্তানের মা হতে গিয়ে মরে যাচ্ছে তার বৌ। সুতরাং অঘোরের একটা কৃতজ্ঞতা, একটা কর্তব্য আছে বৈকি! সেই কর্তব্যের চূড়ান্ত স্বাক্ষর সে রাখছে এক আকাশ রোদ মাথায় করে বৌয়ের চিকিৎসার জন্য শেষ মুহূর্তে টাকা ধার করে নিয়ে এসে!

সীতেশ অনুভব করে তার পা দুটো যেন টলছে। নিজের প্রতি ঘৃণা অথবা বিতৃষ্ণার একটা তেতো রস তার পাকস্থলীর মধ্য থেকে পাক খেয়ে খেয়ে যেন তার ঠোঁট পর্যন্ত উঠে আসছে। কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে সীতেশ অগত্যা চলতে শুরু করে।

তারপর মাতালের মতো টলতে টলতে কিছু পরে সীতেশ বাড়ি ফিরতেই

উঠে বসে সুমিতা বলে, 'ওগো শুনছ, কোথায় ছিলে এতক্ষণ! পাশের বাড়ি অঘোরবাবুদের—'

শরীরের রক্তে সারা ঘর ভাসিয়ে এবং সেই সঙ্গে প্রসব করে একটি অপরিণত নিষ্প্রাণ রক্তপিণ্ড অঘোরের বৌ কেমন করে চিরদিনের মতো মুক্তি পেয়েছে সকল পার্থিব যন্ত্রণা থেকে—একসঙ্গে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বুকের মধ্যে আবার টান ধরে সুমিতার। কাশতে শুরু করে সে।

অঘোর সীতেশের বহুদিনের প্রতিবেশী। সুতরাং সীতেশের একবার যাওয়া প্রয়োজন।

জুতোটা পায়ে গলাতে গলাতে প্রথমেই যা মনে হয় সীতেশের তা হল শোকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে অঘোরের কাছ থেকে ধার করা যেতে পারে সেই ঘামে ভেজা দলা-পাকানো নোটগুলো। এই কটা দিনও কি সুমিতা টিঁকিয়ে রাখতে পারবে না নিজেকে?

পরিচয়ের পৃষ্ঠপট

ভবানী সেন

বাংলাদেশে প্রগতি-সাহিত্য এবং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে 'পরিচয়' পত্রিকার সমগ্র ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উনবিংশ শতাব্দীতে 'বঙ্গদর্শন' যে নূতন আদর্শে বাংলার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল এবং সৃষ্টি করেছিল নতুন একটি পথরেখা, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে 'পরিচয়' পত্রিকা তাকেই দিয়েছিল স্পষ্টতর সূচি এবং দৃঢ়তর লক্ষ্য। 'বঙ্গদর্শন' থেকে 'পরিচয়' পর্যন্ত বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাস পরীক্ষা করলে এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাংলার সামাজিক চেতনা যুক্তিবাদ, সামাজিক প্রগতি এবং বিজ্ঞান-শীলতা নিয়ে আরম্ভ করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় যখন পরিণত হয়েছিল ঠিক তখনই 'পরিচয়' তার বর্তমান বিশিষ্ট রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়।

সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন দু-দুটো যুগ পেরিয়ে এসে এখন তার তৃতীয় যুগে পদার্পণ করেছে। প্রথম যুগ হলো—ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নব-জোয়ারের অধ্যায়, ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত। এই নতুন জোয়ারের মধ্যেই 'পবিচয়' পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ, ১৯৩১ সালে। (শ্রাবণ, ১৩৩৮)

দ্বিতীয় যুগে শুরু হয় দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং ভারতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রসারের নব-জোয়ারের অধ্যায়। এই সময় 'পরিচয়' পত্রিকার নতুন পর্যায় আত্মপ্রকাশ করে। (শ্রাবণ, ১৩৫০; জুলাই, ১৯৪৩)

তৃতীয় যুগটি হলো স্বাধীনতা লাভেব পরবর্তীকাল। এই সময়ই দেখা দিয়েছে নতুন পর্যায়ের প্রয়োজন। কাবণ, বাংলার সংস্কৃতি আজ এমন এক চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে তার ঐতিহ্যবিজয়ী যাত্রার দিক্‌নির্ণয় বহু বিবাদের সম্মুখীন।

প্রথম যুগ

বাংলা সংস্কৃতিতে আধুনিক কালের প্রগতি-চিন্তাব প্রথম যুগটি সুস্পষ্টভাবে শুরু হয় ১৯৩৫ সালের কাছাকাছি। তখন সারা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের চাঞ্চল্যকর সাফল্য জনমনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, অভ্যুদয় ঘটছে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ঐক্যের; ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম তখন সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল ভাবধারার স্পর্শে। রবীন্দ্রনাথের কীর্তি এখানেও পুরোধার কীর্তি। বাংলার লেখক-সমাজ তখন সাংস্কৃতিক অভিযানের ভিতর প্রতিক্রিয়া এবং প্রগতি এই দুই ভাবধারার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন এবং কৃষ্টির সঙ্গে সামাজিক প্রগতির যে একটি সুস্পষ্ট সম্বন্ধ আছে তা আর উপেক্ষা করছেন না। "কৃষ্টির জন্য কৃষ্টি" এই প্রাচীন ভাবধারার স্থানে তখন সামাজিক প্রগতির স্বার্থানুগামী কৃষ্টির লক্ষ্য-সাধনা সচেতনভাবে বাংলার সংস্কৃতিবিদদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। মৃত্যুর পূর্বে চিরতরুণ ববীন্দ্রনাথ, নিত্যনতুন যুগধর্মের চারণ কবির মতোই এই নতুন আন্দোলনের অভিষেকে পৌরোহিত্য করে যান।

প্রতিক্রিয়ার শক্তি তখনও সংস্কৃতিরাজ্যে একেবারে অনুপস্থিত ছিল না, কিন্তু নতুন জোয়ারের স্রোতে তা ভেসে ভেসে আসছিল, হঠাৎ এবং নতুন বলেই বোধহয় তখনও সেই কর্দম স্রোতের নিচে জমাট বাঁধার সুযোগ পায়নি।

তখন জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র, অ্যান্টি-ফ্যাসিজম, বিশ্বশান্তি এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা একচ্ছত্র রাজত্বের অধিকারী হয়ে উঠল, দলমত-নির্বিশেষে সমস্ত লেখক এবং শিল্পীই হলেন তার সমগোষ্ঠীভুক্ত। তখন মনে হলো, বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ এক সর্বাঙ্গীন জাতীয় ঐক্যের রূপরেখা বুঝি তৈরি হচ্ছে।

দ্বিতীয় যুগ

কিন্তু ইতিহাসের যাত্রাপথ যে অত সহজ এবং সুগম নয় তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল চতুর্থ দশকে। ফ্যাসিস্ট হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত দেশ আক্রমণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভিতর ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোড়ন এবং বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সংস্কৃতি জগতের আত্মচিন্তার ক্ষেত্রে নিয়ে এলো এক বিষম সংঘাত। এই সংঘাতের ভিতর দিয়েই দানা বেঁধে উঠল প্রগতি সাহিত্য সঙ্ঘ। লেখক এবং শিল্পীরা তখন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন গণ-সংস্কৃতি সৃষ্টির ভাবধারায়, পরীক্ষা চলল নতুন ভাবে নতুন পথে নতুন সৃষ্টির। তৃতীয় দশকের বাহ্য ঐক্য গেল বিলুপ্ত হয়ে, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে তার বিরোধী ভাবধারার ব্যবধান স্পষ্টতর রূপ ধারণ করল। ঐতিহ্যগতি প্রগতি স্রোতের তলায় তখন প্রতিক্রিয়ার কর্দম থিতিয়ে পড়তে আরম্ভ করে, জলে আর কাদায় বাধে ঘাতপ্রতিঘাত।

রবীন্দ্রনাথ এই নবযুগের উদ্বোধন দেখেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, যাবার আগে আশীর্বাদ করে যান প্রগতির শিবিরকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সতর্ক-বাণীও উচ্চারণ করে যান যেন সত্যই যে "মাটির কাছাকাছি" আছে তার অন্তরের বাণী উৎসারিত হয় তরুণ গণ-সংস্কৃতির মধ্যে, সেখানে প্রতারণা যেন কোনোমতে স্থান না পায়।

প্রগতি-সংস্কৃতির স্রষ্টাদের মধ্যেই তখন আত্মচিন্তা এবং আত্মবিরোধ জন্ম-গ্রহণ করে, জীবন্ত ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই।

এমন একটি জটিল প্রশ্ন সেদিন প্রবল হয়ে ওঠে যার সম্পূর্ণ সমাধান আজও হয়নি। সে প্রশ্নটি হলো এই যে সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার সম্বন্ধ কী হবে? যে-কর্মসূচি রাজনৈতিক আন্দোলনেরই একান্ত পরিচায়ক, তাই কি হবে সংস্কৃতির একান্ত পথরেখা? বাংলা সংস্কৃতি তখন তথাকথিত বিশুদ্ধ আর্টের বিমানপোত থেকে নেমে বাস্তব জগতের ভূমি স্পর্শ করেছে। স্বভাবতই তখন গণসংগ্রামের শিবিরস্থ বিভিন্ন রাজনৈতিক

ধারা যেমন নিজ নিজ বক্তব্য হাজির করছে, তেমনি রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে সংস্কৃতির কর্মধারার সম্বন্ধ কী হওয়া উচিত তাও তখন মতভেদের বিষয়-বস্তু হয়ে উঠেছে। তবু মতবাদজনিত এই সংঘাত ও প্রতি-সংঘাতের ভিতর প্রগতি-শিবিরের মধ্যে মোটামুটি একটি মতৈক্য সাধিত হয়েছিল।

ঐক্যের ভিত্তিপ্রস্তর

প্রগতিশীল সংস্কৃতির লক্ষ্য হলো সমাজের প্রগতি। সুতরাং শ্রমসাধ্য সৃষ্টিশীল কর্মে নিযুক্ত সাধারণ মানুষের জীবন ও সংগ্রাম তাতে প্রতিফলিত হবে এবং তা উদ্বুদ্ধ করবে সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনের সহযাত্রীদের। এই ঐক্যের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সেদিন প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, গণনাট্য সঙ্ঘ এবং অন্যান্য বিবিধ প্রতিষ্ঠান নতুন সৃষ্টির কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছিল। সত্য বটে শৈশবসুলভ বাচালতা এবং রাজনৈতিক রণধ্বনির যান্ত্রিক অনুকরণ তার মধ্যে অশান্তি ও অসুস্থতা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু কোনো যুগের কোনো সৃষ্টিশীল ইতিহাসই এই আদিম স্তর অতিক্রম না করে কখনও পরিণত বয়সে পৌছয়নি। প্রতিক্রিয়ার সেবাদাসেরা প্রগতি-আন্দোলনের ঐ সময়কার ত্রুটিগুলিকে সফল-ভাবে ব্যবহার করেছে, প্রগতির শিবিরেও এক ধরণের গোঁড়ামি তার বিপরীত গোঁড়ামিকে রসদ জুগিয়ে প্রতিক্রিয়া শিবিরকে বাড়তে দিয়েছে।

এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি প্রশ্ন তখন সবচেয়ে গুরুতর আকার ধারণ করে। প্রশ্নটি এই যে—মার্কসবাদ এবং মার্কসবাদী সংস্কৃতি বলতে ঠিক কী বোঝায়? সংস্কৃতির এমন কোনো স্বতন্ত্র সত্তা আছে কিনা যা মার্কসবাদ-নিরপেক্ষ? এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দুটো পরস্পরবিরোধী মতবাদ মাথাচাড়া দেয়—একটি হলো কৃষ্টির জন্য কৃষ্টির নিরপেক্ষতা এবং অন্যটি হলো কৃষ্টিতে রাজনৈতিক রণধ্বনির যান্ত্রিক অনুকরণ।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই দুই ধারাই সমভাবে ভ্রান্ত। কারণ, একদিকে কৃষ্টি জীবনদর্শন থেকে নিরক্ষেপ হতে পারে না, সাংস্কৃতিক সৃষ্টি সর্বদাই কোনো-না-কোনো জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি। অন্যদিকে—সংস্কৃতি হলো সামাজিক মানুষের চিন্তার উচ্চতম পর্যায়ের সৃষ্টি; কাজেই তা অনেক সূক্ষ্ম, বিচিত্র এবং পরিমার্জিত। কিন্তু কোথায় এর সঙ্গে যান্ত্রিকতার সীমারেখা এবং কোথায় সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের সঙ্গে তথাকথিত বিশুদ্ধ কৃষ্টির ব্যবধান, তার উপলব্ধি সহজ নয়। তাই এক্ষেত্রে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

তৃতীয় যুগ

এই মতভেদের মীমাংসা হয়নি বলেই স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে প্রগতি-সাহিত্য ও প্রগতি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উদ্যমহীনতা লক্ষ্য করা যায়।

ক্ষমতালাভের পর ভারতের ধনিকশ্রেণী, বিশেষ করে তার চরম প্রতিক্রিয়াশীল অংশ নিজস্ব কায়েমী স্বার্থের সাধনায় বিভোর। তার পৃষ্ঠপোষক শিল্পিগণ মানবতাবাদের ঐতিহ্য বর্জন করে পশ্চিমী ধনিকসভ্যতার অন্ধ অনুকরণে নিযুক্ত। তাঁরাই প্রগতির শিবিরকে ভাঙবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন; তাঁদের মূল রণধ্বনি হলো "কৃষ্টির জন্য কৃষ্টি" এবং "বিশুদ্ধ সংস্কৃতি"। বলা বাহুল্য যে এই তথাকথিত 'বিশুদ্ধ শিল্পের' রণধ্বনি দিয়ে তাঁরা তাঁদের বৈতালিকবৃত্তি চাপা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যেহেতু বাংলার প্রগতিকামী তথা মার্কসবাদীদের মধ্যে কয়েকটি মূল সমস্যারই সমাধান হয়নি, তাই এই নতুন আক্রমণের সম্মুখে তাঁরা একতাবদ্ধভাবে দাঁড়াতে পারলেন না।

তাই আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়েছে প্রগতিশীল সংস্কৃতির সঙ্গে একদিকে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের এবং অন্যদিকে সংস্কৃতির নিজস্ব সত্তার সম্পর্ক নির্ধারণ। সেজন্য স্বাধীনভাবে ভুল করার সাহস নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। রবীন্দ্র-ঐতিহ্য এদিক থেকে আমাদের মূল্যবান সহায়ক।

মানবতাবাদেরই শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ মার্কসবাদ এবং মার্কসবাদ সর্বপ্রকার গোঁড়ামি ও বিজ্ঞানবিরোধী মতান্ধতার পরিপন্থী। মার্কসবাদ হলো সৃষ্টিশীল জীবনদর্শন।

তথাকথিত 'বিশুদ্ধ সংস্কৃতি' যতই বিশুদ্ধ হোক—তা যদি বিজ্ঞান এবং মানবতাবাদের প্রতি নিরপেক্ষ অথবা উপেক্ষাপ্রবণ হয়, তাহলে তা হয় কুসংস্কারেরই নামান্তর। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিই এই উক্তির সাক্ষ্য। সুন্দরের সাধনায় তিনি মানুষের মহত্ত্ব ও জীবনের জয়যাত্রাকেই তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এইখানেই তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের যোগসূত্র। এই সত্যটি মেনে নিলে প্রগতি-সাহিত্যের একটি সাধারণ সীমান্তরেখা খুঁজে পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক যতই থাকুক না কেন, এ বিষয়ে কোনো মতভেদের অবকাশ নেই যে প্রগতিশীল সংস্কৃতির চৌহদ্দি কয়েকটি মূল নীতির মধ্যে অবস্থিত।

প্রগতির সম্মিলিত ফ্রন্ট

এই সীমারেখার মধ্যে রয়েছে উন্নততর মানব-জীবনের সাধনা—যার অর্থ গোঁড়ামি থেকে মুক্ত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ঘনীভূত সারবস্তু; অর্থাৎ মানুষ

কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান—ক্ষুধা-মুক্ত, ব্যাধি-মুক্ত, হিংসা-মুক্ত সমাজের সাধনা।

এই সীমারেখার মধ্যেই অবস্থিত সর্বযুগের সর্বকালের সর্বসাধারণের মহত্তম আকাঙ্ক্ষা—নরহত্যাবর্জিত বিশ্বশান্তি; অর্থাৎ সমগ্র মানব সমাজের পরম কল্যাণময় সুন্দরতম বিকাশ।

এই সীমারেখারই অন্যতম দিগ্বলয় হলো মানবতার জঘন্যতম শত্রু সাম্রাজ্যবাদ তথা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণমানবের মহা-অভ্যুত্থান; অর্থাৎ বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার জয়যাত্রা।

এই সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্রের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিশীল মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত বাস্তবতার প্রতি চিরন্তন আস্থা; অর্থাৎ, 'সত্যমেব জয়তে' এই মহাবাণীতে কেন্দ্রীভূত, তর্কহীন তত্ত্ব। এই তত্ত্বকেই সৃষ্টিশীল রূপ দিয়েছিলেন বঙ্গ-সংস্কৃতির নবযুগ রচনাকারীগণ।

বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রামমোহন রায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন এবং যে ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে বিকশিত করে গেছেন তার মূলমর্ম হলো মানবতাবাদ, স্বদেশপ্রেম এবং আন্তর্জাতিকতা। ইদানিং সীমান্ত-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সেই মহান ঐতিহ্যকেই বিপন্ন করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ স্বদেশপ্রেমকে প্রগতিশীল জাতীয়তার সীমার বাইরে টেনে এনে উগ্র জাতীয়তাবাদকে আভিজাত্য দান করে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির যে অবমাননা ঘটানো হচ্ছে তা উদ্বেগজনক। সীমান্তযুদ্ধে প্রতিবেশী চীনের ভারতবিরোধী সশস্ত্র অভিযান ন্যায়সঙ্গত কারণে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে ছিল পবিত্র স্বদেশপ্রেম। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতাদের আজ্ঞাবহ কতিপয় প্রভাবশালী সংস্কৃতিবিদ সেই পবিত্র স্বদেশপ্রেমকে কলুষিত করছেন গণতন্ত্র বিরোধী যুদ্ধবাজ জঙ্গী সংস্কৃতি সৃষ্টি করে। স্বাদেশিকতার নামে তাঁরা জেহাদ ঘোষণা করেছেন সর্বপ্রকার প্রগতিশীল ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। অন্ধ কমিউনিস্ট-বিরোধিতা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দমনের স্বপক্ষে সংস্কৃতির ওকালতি, শান্তির জন্য মানবিক আবেদনের পরিবর্তে যুদ্ধ-প্ররোচনা ও সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থের জয়ধ্বনি—এই ধ্বনি হলো সেই অশুভ সঙ্কেত যা রবীন্দ্রনাথ-টলস্টয়—রোমাঁ রোঁলার মহান ঐতিহ্যকে পদদলিত করে কিপ্লিং এবং স্পেংলারের ফ্যাসিস্ট মনোবিকারকে বাংলা সংস্কৃতির উপাদান করে তুলেছে। এরই নগ্নরূপ সেদিন

দেখা দিয়েছিল 'অঙ্গার' নাটকের বিরুদ্ধে গুণ্ডাবাজিতে। "স্বাধীন সংস্কৃতির" নামে তা সৃষ্টি করতে চায় কায়েমী স্বার্থের দলীয় নীতির বাধ্যতামূলক বৈতালিকবৃত্তি। আচার্য বিনোবা ভাবে, সত্যজিত রায় কেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রও ওদের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাননি। অনেকেই বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়েছেন।

বিশুদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতির শরীরে কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক কর্মসূচির উর্দি পরায়, এই অভিযোগ তুলে একদা যাঁরা প্রগতি সাহিত্যের মঞ্চ পরিত্যাগ করেন, আফ্রো-এশিয়ান সাহিত্যের আসরেও ঔপনিবেশিকতা বিরোধের কথা তুলতে অস্বীকৃত হন, তাঁরাই এখন ফ্যাসিস্ট কর্মসূচির ডাণ্ডাবেড়ি দিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির পদবন্ধন রচনা করছেন। বড় বড় অক্ষরে লিখে যে-সাইনবোর্ড তাঁরা 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ'-এর দরজায় টাঙিয়েছেন তার ওপর নজর বুলোলেই ধরা পড়ে মানবতার বিরুদ্ধে রজতকাঞ্চনের আহ্বান।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই বঙ্গ সংস্কৃতিতে একটি নতুন ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তার মূলমন্ত্র ছিল ধনতন্ত্র-বিদ্বেষ এবং সমাজতন্ত্র-প্রীতি। রবীন্দ্রনাথ কোনো দেশের বিরুদ্ধেই যে-কোনো প্রকার অন্ধ-বিদ্বেষের বা তার অন্ধ অনুকরণের প্রতি ছিলেন ক্ষমাহীন। কিন্তু আজ স্বাধীন সাহিত্য সমাজের ছায়াতলে সমবেত হয়েছেন এমন অনেক ক্ষমতাপুষ্ট সাহিত্যিক যাঁরা আমেরিকান গোষ্ঠীর অন্ধ স্তাবক এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের অন্ধ-বিদ্বেষী। রবীন্দ্রমানসের পবিত্রতাকে তাঁরা বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দিতে চাইছেন। সভ্যতার সঙ্কটে রবীন্দ্রনাথ যে বিকৃত রুচির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এঁরা তাকেই আবার আভিজাত্যের আসনে বসাবার অপচেষ্টায় নিযুক্ত।

এঁদের এই অবক্ষয়ধর্মী ঝোঁকের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সংস্কৃতির সমবেত জেহাদ টলস্টয়, রোমাঁ রোঁলা এবং রবীন্দ্রনাথের পবিত্র ঐতিহ্যকে রক্ষা করবে এবং তার জন্ম চাই প্রগতির সম্মিলিত ফ্রন্ট। এই সংযুক্ত শিবিরের সীমারেখার মধ্যে মিলিত হোক দলগত নির্বিশেষে প্রগতিশীল জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের পতাকাবাহীগণ। এই সীমারেখার মধ্যেই থাকবে সৃষ্টির স্বাধীনতা, যে-স্বাধীনতা এই সীমারেখার বাইরে গেলেই সর্বপ্রকার বিকৃতিতে বিলুপ্ত হয়, সভ্যতার শীর্ষস্থানে প্রকাশিত হয় বর্বরতা। এবং বর্বরতা হলো সংস্কৃতির ঠিক বিপরীত।

পল্লীর সাংস্কৃতিক নবজীবন

প্রগতিশীল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মতভেদ, বিতর্ক এবং ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ প্রকাশের যে প্রচুর ক্ষেত্র বর্তমান তা অবশ্যই স্বীকার্য। এমনকি একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল প্রয়োগ বলতে কী বোঝায় তা নিয়েও বিতর্কের অবকাশ যথেষ্ট আছে। বিশেষত যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবধারার যখন পরিবর্তন ঘটে তখন মতাদর্শগত বিতর্ক নিশ্চয়ই অপরিহার্য। কিন্তু সংস্কৃতির সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত নির্যাতিত জনগণের সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন যে সাংস্কৃতিক স্রষ্টাদেরই প্রাথমিক দায়িত্ব, অন্তত এ বিষয়ে প্রগতি শিবিরে মতভেদের কোনো অবকাশ নেই। দেশের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করতে হলে জনগণেব মধ্যে বিজ্ঞান ও উন্নত রুচি-সম্পন্ন সাহিত্যের প্রসার একান্তভাবেই আবশ্যক। শিক্ষাই হলো জ্ঞানের বাহন এবং শিক্ষা মানে সর্বপ্রথম নিরক্ষরতার অবসান। সুতরাং শিক্ষার বৈজ্ঞানিক রূপায়ণ এবং নিবক্ষর লোকের মধ্যে অক্ষর পরিচয়ের প্রসারও প্রগতি-শিবিরেরই প্রধান দায়িত্ব। যে-সৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি সম্পন্ন গৃহস্থের মধ্যে, তা জনমনে কোনো আলোড়ন আনতে পারে না; সুতরাং সে-সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে বন্ধ্যা। ইতিহাসের গতিবেগ তার মধ্যে অনুপস্থিত বললেও নেহাৎ অত্যুক্তি করা হয় না। ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা—অর্থাৎ সাংস্কৃতিক জগতের আহৃত সম্পদ অগণিত জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে—তাকে পৌঁছে দিতে হবে বস্তির এবং পল্লীর অচলায়তনগুলির মধ্যে। এই সমস্ত অন্ধকার কোটরে প্রবেশ করলেই দেখা যায় যে যুগে যুগে ইতিহাসের যারা হয় সৃষ্টিকর্তা তাদেরই মনের পিরামিডে প্রাচীনতম যুগের অসংখ্য মৃততত্ত্বের মমি বিরাজিত। যারা কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী তাদের সাংস্কৃতিক প্রচারকবাহিনী বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক রসসৃষ্টির নামে এই মমিগুলিকেই রক্ষা করে। এই সমস্ত অচলায়তনের মধ্যে পঞ্চকের অভাব নেই, কিন্তু মহাপঞ্চকেরাও সক্রিয়। তাই প্রগতি-শিবির থেকেই দাদাঠাকুরদের নামতে হবে অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে আলোক প্রবেশের পথ নির্মাণে। সেখানে বহন করে নিয়ে যেতে হবে সত্যকার ইতিহাস এবং সঠিক বিজ্ঞান। তাতেই তাদের চিন্তাশক্তি সৃষ্টিশীল রূপ ধারণ করবে, সাংস্কৃতিক রুচিরও হবে পরিবর্তন।

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে ইদানীং সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটছে।

পল্লীর নিভৃত কন্দরে কৃষকদের ভেতর থেকে তৈরি হচ্ছে নতুন বুদ্ধিজীবী। তারা শহরেও আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরূপে। পূর্বেকার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাদের সামাজিক ব্যবধান সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে না, যদি-না গণতান্ত্রিক ভাবধারা নিয়ে প্রগতি-শিবিরের স্রষ্টারা অগ্রণী হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিক্রিয়ার পতাকা যাঁরা বহন করেন তাঁরা তাদের কাছে পৌছে দেন যে-তত্ত্ব, যে-রুচি এবং যে-সংবেদন তা ঐ নতুন বুদ্ধিজীবীদের মনে বপন করে ওদেরই সমশ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর বীজ। জনতাও প্রতারিত হয় ওদেরকে বিজ্ঞজন মনে করে। এই সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রগতি-শিবিরের নিষ্ক্রিয়তা যতদিন না বিদূরিত হবে ততদিন তার বন্ধ্যাদশা ঘুচবে না।

পল্লীর নব্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ত প্রগতিশীল মনের অভাব নেই। কিন্তু যে-গুরুমশাইরা প্রগতির প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁরা সংগঠিত, কারণ সরকারী যন্ত্রের যাঁরা চালক তাঁদেরই বৈতালিক ওঁরা। অথচ প্রগতি-শিবিরের যে-উদ্যম একদা সরকারী বাধাকে অনায়াসে অতিক্রম করত আজ তা আত্মতুষ্টিতে নিস্তেজ।' অপরদিকে আতঙ্কিত প্রতিক্রিয়া ক্রমাগতই শক্তিশালী হচ্ছে। তাই নব্য-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে-প্রগতির বীজ বিদ্যমান তার অঙ্কুরোদগম বাধায় বাধায় বদ্ধ হয়ে পড়ে। পল্লীজীবনের প্রাচীন প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে শহুরে কায়েমী স্বার্থের নব্য প্রতিক্রিয়া একত্র হয়ে কী যে অনাসৃষ্টি ঘটাচ্ছে তরুণ শিক্ষিত পল্লীসমাজের মনোজগতে, তা আমরা জানি না। কিন্তু ইতিহাসেই নজীর আছে, ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান শক্তি বিদ্রোহী কৃষক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনের ৫৮ বৎসর পর রাজতন্ত্রেরই পুনর্জন্ম দান করেছিল। যে-কৃষক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান অক্ষশক্তি, সময় সময় সেই আবার হয়ে পড়ে প্রতিবিপ্লবের পদাতিক। সুতরাং আত্মসন্তুষ্টি প্রগতি-শিবিরের প্রধান শত্রু। দুর্নীতি, সমাজ-বিরোধী চরিত্র, প্রগতির বিরুদ্ধে গোঁড়ামির পুনরুজ্জীবন এবং অর্থবিত্তের নিকট প্রতিভার আত্মসমর্পণ যে-ভাবে বুদ্ধিজীবী সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়ছে তা ভয়াবহ। সুতরাং প্রগতি-শিবিরকে অবিলম্বে আত্মসচেতন হতে হবে। তার কাছে আজ জনগণের ন্যূনতম দাবি—জ্ঞানের বিস্তার, যে-জ্ঞান নিজেকে বাঁচতে এবং অপরকে বাঁচাতে শেখায়, যে-জ্ঞান সত্যের দ্বার উন্মুক্ত করে, সমাজের ও প্রকৃতির সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হয় যে-জ্ঞানে, যা সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও দুর্নীতির মহাশত্রু। পল্লীজীবনে আবার দেখা দিক এই যথার্থ জ্ঞানের "তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়"।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবযুগস্রষ্টারা যা করেছিলেন সেদিনকার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের জন্য, বর্তমান প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের অনুরূপ ভূমিকা পালন করতে হবে আধুনিক কৃষক-বুদ্ধিজীবীদের জন্য।

'পরিচয়'-এর ভূমিকা

১৯৪৩ সালে 'পরিচয়'-এর নবপর্যায় শুরু হয়েছিল এমন একটি লক্ষ্য নিয়ে যা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে নবযুগধর্ম সঞ্চারিত করছিল। আজ তার জন্য আর এক নতুন ভূমিকা পালন করবার ডাক এসেছে। তখনও 'পরিচয়' পার্টি-পত্রিকা ছিল না। আজও তা পার্টি-পত্রিকা হবে না। প্রগতির যৌথ স্বার্থে আজ তাকে বরং আরও ব্যাপকতর রূপ নিতে হবে। সেদিনও কমিউনিস্ট কর্মীরা 'পরিচয়'কে সমৃদ্ধিশালী হতে সাহায্য করেছেন প্রগতিশিবিরের দায়িত্ব পালনের জন্য, আজও তাঁদের দায়িত্ব হলো, এই নবপর্যায়ের 'পরিচয়'কে সুপ্রভাবিত করা প্রগতিশীল শিবিরের নবতম ভূমিকার সার্থকতা লাভের জন্য।

একথা ঠিক যে শুধু 'পরিচয়' দ্বারাই সব কাজ হবে না। শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের কর্ম-প্রচেষ্টা দ্বারা নতুন একটি আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে, কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট সর্বপ্রকার সৎ ও সুস্থ চিন্তার লোকদের নিয়ে। এই সমবেত কর্ম-প্রচেষ্টার মুখপত্র 'পরিচয়'। কাজেই কমিউনিস্টদেরই এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিতে হবে। অপর সবাইকে সমান অধিকার দিয়ে সঙ্গে নেবার জন্য সহনশীলও হতে হবে তাঁদের।

প্রগতিশীল সংস্কৃতির আন্দোলন হবে গণসমাজমুখী, কিন্তু হয়তো 'পরিচয়' হঠাৎ এই মুহূর্তেই জনতার বোধ্য ভাষায় সংস্কৃতি পরিবেশন করতে পারবে না। তাতে আপাতত ক্ষতি নেই। যাঁরা সৃষ্টি করবেন সেই আন্দোলন, তাঁদের চিন্তা ও চৈতন্যকে সমৃদ্ধ করবে 'পরিচয়' এবং প্রগতির শিবিরকে করবে ঐক্য-বদ্ধ ও প্রসারিত। স্বভাবতই সত্যসন্ধানের ক্ষেত্র-স্বরূপ 'পরিচয়'-এর নির্দলীয় রূপ প্রগতির শিবিরকে দেবে একটি সামগ্রিক সত্তা। অথচ তার মূল সুরটি হবে প্রগতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব।

তাই প্রগতির একজন একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে নববর্ষে পরিচয়ের নব-পর্যায়কে স্বাগত জানাই।

'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৭০। মে ১৯৬৩

চীনের জেলখানা থেকে পত্রাবলী

হো চি মিন

অনুবাদক : বিষ্ণু দে

ভোর

১

প্রত্যহ ভোরে সূর্য পাঁচিল ছাড়িয়ে
রশ্মি ছড়ায় ফটকের গায়ে, ফটকে কিন্তু তালা।
জেলের মধ্যে বন্দীমহল সদাই আঁধারে মোড়া,
তবুও আমরা জানি তো বাইরে সূর্য অভ্যাগত।

২

জেগেছে যেই অমনি সবাই উকুন শিকার করে।
আটটা নাগাদ ঘন্টি বাজে সকালবেলার খাওয়ার,
চলো সবাই, প্রাণটা ভ'রে যা জোটে তাই খাই।
যা দুর্ভোগ সইছি সবাই, আসবে ঠিক সুদিন॥

দাবা শেখা

১

সময়টা তো কাটাতে হবে, সবাই শিখি দাবা।
হাজার হাজার সওয়ার ছোটে, পদাতিকরা ধায়,
ক্ষিপ্র ঝাঁপ দেয় লড়ায়ে কিংবা হটে খানিক,
খাসা মাথায় ত্বরিত পায়ে আমাদের দিকে সুবিধা।

২

দৃষ্টিকে করো সুদূরপ্রসারী, চিন্তাকে করো সুগভীর।
আক্রমণে যে হতে হবে দুঃসাহসী, বিরামহীন।
যেই দেবে ভুল নির্দেশ, দেখ দুটো রথী হবে ঘা'ল।
ঠিক মুহূর্ত আসুক, বোড়ে-ই করবে তোমাকে বিজয়ী।

৩

দুইটিদিকেই সমান শক্তি বাহিনীর।
বিজয় কিন্তু আসবে একটি দিকেই।
আগাও লড়ায়ে, পিছু হটো এক নির্ভুল রণনীতিতে,
তবে না তোমার সম্মান হবে তুমি সেনাপতি ধন্য।

চীনে উইলকি শাহেবের অভ্যর্থনার সংবাদে

আমরা দুজনে চীনের বন্ধু,
দুজনেই যাই চুংকিং।
অথচ তুমিই পাও মাননীয় অতিথির স্বাগতম্,
আমি তো বন্দী, রয়েছি কারায় পায়ের তলায় ফেলা।
কেন বা আমরা দুজনে এমন বিভিন্ন মান পাই ?
একজন হিম, আরেকজনাকে হৃদয়ের উত্তাপ :
এই তো সারাটা দুনিয়ার চাল স্মৃতির আগের কাল থেকে,
যেমনটি সব জলধারা দেখ সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।

ভোরের আগে যাত্রা

১

মোরগ ডাকল একবার বটে, রাত্রিটা শেষ হয় নি।
চাঁদ ওঠে ধীরে শারদ পাহাড়ে পাহাড়ে,
নক্ষত্রেরা তার সহচর ; কিন্তু পথিক লোকটি
যাকে যেতে হবে দূরের পাড়িতে, সে ইতিমধ্যে রাস্তায় ;
চোখে মুখে লাগে হাওয়ার তুহিন ঝাপ্‌টা।

২

পুর্বদিকের পাণ্ডুর হয় ধূসর,
রাত্রির ছায়াপুঞ্জ খেঁটিয়ে ছড়াচ্ছে উত্তাপ,
সারা দুনিয়ায় আর পথিকের চিত্তে
কবি জেগে ওঠে তপ্ত এবং সজাগ।

কুওতে কারাগার

অদ্ভুত এই কারাগারে হানে যেন গেরস্ত ভাবনা।
কেনো চাল, তেল, নুন, লকড়িও—দাম দাও তবে জুটবে।
প্রতি খুপ্‌রির সামনে রয়েছে খুদে খুদে এক চুল্লি—
সারাদিন ধ'রে ভাতটা ফোটাও, বানাও পাত্‌লা নুন-ঝোল।

একটি দাঁতকে বিদায়

বড়ই কঠিন বড় গর্বিত তুমি হে বন্ধুবর,
রসনার মতো কোমল দীঘল নও।
আমরা দুজনে ভাগ ক'রে ভোগ করেছি তিক্ত মধুর
সব কিছু, আজ তুমি পশ্চিমে, আমি যাই পুবদিকে।

প্রবেশ-দক্ষিণা

লিউচাউ, কোয়েইলিন, তারপরে আবার সেই লিউচাউ।
লাথি খেয়ে খেয়ে যেন ফুটবল এইদিকে ঐদিকে।
নির্দোষ, তবু এ কী টানাটানি সারা কোয়াংসি জুড়ে।*
যাওয়া আর আসা, আসা আর যাওয়া শেষ হবে ভাবি কবে?

———

ভোরবেলায় সূর্য চড়ে পর্বতের শিখর থেকে শিখরে,
গোলাপী সে আভায় মুক্তিস্নান করছে পর্বতের সানু।
শুধুই কারার সামনে আঁধার ছায়াগুলি থেকে যায়,
আর সূর্যের পথে কারাগার মেলে ধরে যত গরাদ।

———

কারাগারে পৌছলেই দিতে হবে মোটা দক্ষিণা—
সাধারণত পঞ্চাশটা ইয়ানের কম নয়।

আর যদিই তোমার টাকাপয়সা নাই থাকে,
তাহলে তোমাকে সদাই ত্যক্ত করবে, দেবে যন্ত্রণাও।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে

মেঘেরা জড়ায় গিরিচূড়াদের, গিরিচূড়া বাঁধে মেঘেদের,
নিচে ঐ নদী আয়নার মতো ঝিকিমিকি করে স্বচ্ছ।
পশ্চিম গিরিমৌলিতে ঘুরি, হৃদয় আমার অস্থির
দক্ষিণাকাশে তাকিয়ে, স্বপ্নে দেখি পুরাতন মিতাদের॥

---

* বহু নিগ্রহের মধ্যে একবার বছর দুই ধ'রে হো চি মিন:চীনের দক্ষিণ দিকে ১৩টি জেলার প্রদেশ কোয়াংসির নানা জায়গায় বন্দী ছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে চৈনিক কারাকর্তাদের জানা ভাষাতেই তাং যুগের রীতিতে কবিতাগুলি লেখেন। —বিষ্ণু দে

এত রক্ত কেন

শিশিরকুমার দাশ

এবার পাখিরা ফিরে যাবে
বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বুঝেছে এবার
সূর্যের নিষ্প্রভ তেজ, গাছের পাতায়
আবার রক্তের আবির্ভাব
এইবার ফিরে যেতে হবে।

পূর্বপুরুষের কোন পাপ, কোন ভ্রাতৃবিরোধের
কোন গুপ্ত লালসার, কোন অন্ধকার দ্বেষ
এতদিন বালির তলায় চাপা ছিল
হঠাৎ হাওয়ায়
সেই সব বালি আজ উড়ে গেছে, প্রত্যক্ষ এখন—
যেমন প্রত্যক্ষ সব পরিত্যক্ত রাজবাড়ি
জঙ্গলে নির্জন শূন্য প্রাচীন মন্দির
দেবতার ভগ্নজানু, সুকুন্তলা সুন্দরীর নয়নে বিকৃতি,
তেমনই সে সব পাপ পাতায় পাতায় স্পষ্ট
এত রক্ত, এত রক্ত কেন
ঝরে গাছে গাছে ?

বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে পাখিরা এবার
বুঝেছে এখন দিন ক্রমশই ছোট
এখন উত্তাপহীন সূর্য হবে ক্রমশ সুদূর
দীর্ঘ হবে ক্লান্ত অন্ধকার
এইবার ফিরে যেতে হবে।

সূর্য স্বর্গ ও স্বদেশ

ফণিভূষণ আচার্য

আমি কোন স্বর্গে যাব কোন সূর্যের করতলে
হাত রেখে আত্মীয়তা জানাব মাটির স্বদেশকে
আমার হৃদয়ে রক্ত ঝরছে
সহিষ্ণুতা অজগর পাথর আমার বুকের ভিতর
অবিভক্ত রক্ত ঝরছে
তুমি কি আমার বুকে আমূল ছুরি
বসিয়ে দিতে পারোনা অকপটে

হলুদ ফুলে ছেয়ে গেছে উপত্যকার অপাপবিদ্ধ বনস্থলী
হাজার মানুষের ভিড়ে আমি তোমার রঙবেরঙের
রাসায়নিক কারচুপি পছন্দ করিনা
আমাকে কি ব্যর্থ প্রেমিকের মতো
তোমার ভাঙা কমণ্ডলু থেকে লবণাক্ত জল
পান করতে হবে
জ্যোৎস্নায় অগ্নিকাণ্ডের পর

সারাদিন আমার বুকের ভিতর ভাইয়ের
বুকের ভিতর নীল তলোয়ার খেলা করে
কাউকে বড় হতে দেখলে চোখের কোণে
রক্ত ছলকে পড়ে
সব সন্ন্যিসিই হাতের তেলোয় বিষাক্ত ঘা নিয়ে
মানুষকে আশীর্বাদ করতে জনস্থলীতে ফিরে আসে
কারণ স্বর্গ তার কেনা
জানিনা আমি কোন স্বর্গে যাব কোন সূর্যের করতলে
হাত রেখে আত্মীয়তা জানাব মাটির স্বদেশকে

ঘুম নেই প্রকল্পের অভিপ্রায়ে

রবীন সুর

যেখানে সূর্যাস্ত নেই কিংবা রাত্রি নক্ষত্রের অমেয় যৌতুকে
হাজার মাইল ব্যাপ্ত জ্যোতির্ময় অসীম আকাশ
তুমি তার কতটুকু ধ্বনির প্রতীকে
আরোপিত ব্যবহার
সমস্ত দুর্জ্ঞেয়তম রহস্যের ঘুমন্ত কোরক
কতিপয় চিত্রকল্প অনুমেয় শব্দের অভিধা
কতটুকু উন্মোচনে পেয়েছে বিকাশ
কে বা জানে কাকে বলে অভিজ্ঞতা
কার নাম বিষয়ের মৌলিক ধারণা
জীবন যৌনতা মৃত্যু উদয়াস্ত অস্তোদয় যার চতুর্দিকে
যে কেবল একা একা নাকি সমবেত
অন্ধকার পার হয়ে কিছুক্ষণ উদয় সূর্যের আমন্ত্রণে
উৎসবের সমাচার
তারপর পুনর্বার অন্ধকার অস্তের পশ্চিমে
প্রত্যহের ঘাম রক্ত নষ্ট ফলশ্রুতি
ধমনীর অভ্যন্তরে লোকায়ত স্বপ্নকে ঘনায়
হয়তো সঠিক কোনো শ্রোতা নেই
কিংবা তার সমগ্র সংলাপ
উত্তরের অপেক্ষা না রেখে
যখন যেদিকে খুশি ক্রমাগত উদ্যোগের নোনা অহংকারে
দিগ্বিদিকে কেউ নেই কিংবা আছে অগোচর কণ্ঠস্বরে
বুকের ভিতর ঘরে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত
জেনে কোনো লাভ নেই কেবল স্বগত
উচ্চারণে অন্তর্গত অনুভব জানিয়ে যাবার
ঘুম নেই প্রকল্পের অভিপ্রায়ে শিল্পান্বিত ভাষার উৎসার।

একটিই মুদ্রাকে পেতে

শুভ বসু

শুনুন, আমরা এই কীর্তিনাশা সময়ের ভঙ্গুর পুলিনে
তবুও প্রচেষ্টাগুলি গেঁথে রাখতে চাই।

যখন এখানে লিখি টেব্‌লল্যামপের নীচে, সেসময়
বিশাল চোয়াল খুলে হাহা হাসে পঞ্চমীর রাত,
আমার আস্পর্ধা দেখে সামান্য কৌতুকে
বেঁকে যায় শিলীভূত সম্রাটের মুখ; মধ্যরাতে
সমস্ত কলকাতা জুড়ে দরদালান, বাড়ি
আমাকে বিদ্রূপ ক'রে ঠাণ্ডা কালো ছায়া মেলে রাখে;
যৌথ তারাদের নীচে, নীহারিকামণ্ডলের নীচে
নিজেকে বিন্দুর মতো মনে হয়—পরম্পরাহীন।

আমি তো তবুও যাই রাস্তায়, মিছিলে—
সমস্ত ফুটপাথ জুড়ে স্পন্দমান অনন্যসঞ্চার;
বিঠোহেবেনে—যাঁর
সুরের মায়ায় তীব্র কালপুরুষ জয়ের বিক্রম; যাই
যামিনী রায়ের কিম্বা রামকিঙ্করের
রঙে বা রেখায় মৃত স্পন্দমান যেখানে জীবন
জয় করে সময়ের পরাক্রান্ত আস্ফালনগুলি; কিম্বা
লেনিনের ঋজুতীক্ষ্ণ উদার ইঙ্গিতে
—সময় যেখানে ঘোড়া, জীবন সওয়ার।

আদিতম অরুণের তমসাঘ্নি দীপ্তি মনে পড়ে,
মনে পড়ে বাইসন শিকার; দাঁতাল হাতির সঙ্গে লড়ায়ের
আগে
নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া, প্রথম মাটিতে

লাঙ্গলের ফাল বিঁধে আমাদের মহান সঙ্গম ;
গ্রীসের পেশল দীপ্তি ; স্বপ্নের মিশর ; সিন্ধু
নদের পুলিন জুড়ে মহেঞ্জোদড়োকে।

তবুও সে থেকে যায়। তাই
সব দীপ্তি ঝ'রে গিয়ে গ্রীসের কঙ্কাল
জেগে থাকে স্তম্ভ ও খিলানে ;
মায়াসভ্যতার সব প্রচেষ্টাগুলির
স্মৃতিগুলি আমাদের সেসব চেষ্টার অসারতা
স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিয়ে যায় ; তার
অহংকৃত ভ্রূকুটির নীচে
আমাদের মানবিক উচ্ছলতাগুলি
গাঢ় অর্থহীনতার প্রবল পাণ্ডুরে প'ড়ে থাকে।

এসব সত্ত্বেও গড়ি গৌরবজনক
আকাশ-বিজয়ী মূর্তি মানুষের ; গড়ি
পর্বতের ভিত খুঁড়ে অশ্বারোহী দুরন্ত মানুষ ;
জীবনের স্বপ্নে সাধে অন্বয়প্রয়াসে
গড়ি যৌথখামারের উদাত্ত কলন সোভিয়েটে, রাখি
চন্দ্রবিজয়ের ধ্বজা।

অর্থাৎ, একা একা নয়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে
একটিই মুদ্রাকে পেতে
আমাদের সচেতন সচেষ্ট প্রয়াস—
যেরকম
এক পর্যায়ের থেকে আর-এক পর্যায়ে
ছৌনর্তকেরা গড়ে বরাভয় মহিষমর্দিনী।

হে পাপী সমুদ্র তোমার ভূমি

কাজল ঘোষ

হে পাপী সমুদ্রের দিকে চলো তুমি,
এইতো সামনেই পথ
সোজা গেছে সমুদ্রের দিকে ;
করজোড়ে সব পাপ
ঢেলে দাও সমুদ্রজোয়ারে—
বলো প্রত্যেক সূর্যের রশ্মি
অতিরিক্ত জীবনের মতো
ধুয়ে দিক তীরের বন্ধন।

হে পাপী সমুদ্রের দিকে চলো তুমি
এইতো সামনেই পথ
সোজা গেছে সমুদ্রের দিকে।
ঈশ্বরের যত ক্ষুধা তোমার
চোখের মণি সব ধরে রাখে,
না হলে তো সেই কবে
সমস্ত পাপের রাশি ভস্ম হয়ে যেত।
তোমার ঐশ্বর্য নিয়ে
আমি কাঁদি গভীর আশ্বাসে ॥

বিরাট অর্জুন গাছের মতো

তৃপ্তি ভট্টাচার্য

ভালোবাসতে বাসতে আমরা তো
ফুরিয়ে যেতে পারি
বিরাট অর্জুন গাছের মতো দীর্ঘদিন
কর্কশ দেহের মধ্যে বেঁচে থেকে কী সুখ ?

ঝড়ের ভিতর কেবল অন্ধকার নিয়ে
আমাদের খুঁজে খুঁজে দেখেছে সময়
আমাদের রক্ত দিয়ে মহিষ ক্ষ্যাপায়
তবুও শব্দের বিভিন্ন অর্থ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের বুকে
বিষণ্ণতা মেপে চাবুক চালায়
নদীকে শুষ্ক দীর্ঘ তাতানো চরের মতো নিঃস্ব লাগে
কারো কারো অন্ধতার সুখ ঘিরে রাখে
জীবনের সংক্ষিপ্ত বয়স

অন্যদিকটা কেউ কী ভুলেও দেখবে না ?
হৃদয়ের চূড়ায় চূড়ায় বসন্তের তুষার গলানো জল
ঝরণা হয়ে নেমে আসতে চায়
হৃদপিণ্ডের দেয়ালে টাঙানো বিস্মিত ছবির মুখ-
সাদা বুকে গোলাপের ছোপ
দীর্ঘদিন অর্জুন গাছের মতো কেউ কি কখনো
আজীবন অরণ্যে দাঁড়াবে ॥

আমরা কেউ

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

দ্যাখ্, আমরা কেউ বিসর্গ হতে চাই নি,
অনুস্বর বা চন্দ্রবিন্দুও নয়,
আমরা প্রত্যেকে অ, আ, ক, খ হব ভেবেছিলাম ।
অপরিহার্য অক্ষর হবার মতন
উদ্দাম প্রাচুর্যও অনেকের ছিল ।
কিন্তু কি আশ্চর্য দ্যাখ্ !
কলকাতার গলিতে দেয়ালে কত বর্ণ ঝ'রে যায়
আমরা আজ বিসর্গ, অনুস্বর অথবা চন্দ্রবিন্দু
আমরা কেউই এখন অপরিহার্য নই…

জর্নাল

কায়সুল হক

১. ঠিকানা

যেন কারা টা-টা শব্দ
উপহার দিয়ে
গ্রীষ্মের ছুটিতে
চ'লে গেল শৈলনিবাসে।

মাঝে মধ্যে ছুটিছাটায়
আমারও
কখনো কোথাও
বেরিয়ে পড়তে সাধ যায়
কিন্তু হায় রেস্তটা কোথায়?

ঘরে ব'সে
চুপ চাপ
তাইতো করছি পাঠ
ভ্রমণকাহিনী।

হা কপাল
যে গেল দূরে
তার ঠিকানাটা
লিখে তো রাখি নি॥

২. মার্চ : ১৯৭১, স্মৃতিচারণা

[মনজুরুল ইসলাম সহমর্মীবু]

কি হয় কি হয়
এই ভাবনায়

সারা রাত
আমারও হয় নি ঘুম।

বিছানাটা ছেড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি
অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ !
আর দেখি, সকাল বেলায়
শহরের গলা টিপে
ঘুরে বেড়াচ্ছে মিলিটারির লরি।

চতুর্দিকে থাক রঙের সমারোহ ;
আর এই খাকি-রঙা রোদ
কড়া পাহারায়
যেন ধ'রে রেখেছে আমাকে।
আমার কেবলি মনে হচ্ছে....

ভয়ার্ত নগরী

লাজোস বিরু

প্রত্যেকটি শব্দ স্টেশনের কাঁচের ছাদে ধাক্কা খেয়ে দ্বিগুণ জোরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। অন্ধকারময় কালিঝুলি মাখা শেডটি তখন দুমদাম দুড়দাড় শব্দে ভরে উঠেছে। একপ্রান্তে, একটা রেস্তোরাঁর বাইরে, অদ্ভুত এক জনসমাবেশ। ওরা সবাই কৃষক, হাঙ্গেরীয় ভাষাতেই কথা বলছে নিজেদের মধ্যে, কিন্তু সবার পরণে 'বক্স্কোর'।[১] প্রায় দুশোজন বিশৃঙ্খল ভাবে বসে বা দাঁড়িয়ে এক বিরাট দঙ্গল পাকিয়ে চীৎকার করছে। প্রত্যেকের হাতে একটি করে গাঁটরি, আর একটি করে বাঁকানো হেঁসো। ওরা কোথাও ফসল তুলতে চলেছে। আমরা দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে লাগলাম। ওদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিল জনৈক রেল কর্মচারী। সে অভিযোগ করার তাগিদে এগিয়ে এল।

"আমি ওদের সামলাতে পারছি না। ওরা ভোর থেকে এখানে রয়েছে আর তখন থেকেই অনবরত মদ গিলছে। এখন ওরা পুরোদস্তুর মাতাল। এক মুহূর্ত আগে ওরা রেস্তোরাঁয় ঢুকতে চেয়েছিল।"

"কোত্থেকে এসেছে ওরা?"

"স্লাভোনিয়া। আর কোথাও 'বক্স্কোর' পরা হাঙ্গেরীয় কৃষক পাবেন না। ফসল তোলার জন্য ওরা টরন্টাল যাচ্ছে।"

'ঝাবাদকা' (এখন সুবোটিকা)-গামী রেলগাড়িটিকে তিন নম্বর রেল লাইনে সরিয়ে আনা হয়েছিল। আমরা ওটায় চড়তে এগিয়ে গেলাম। আমাদের পেছনে রেল কর্মচারীটি যথাসাধ্য তারস্বরে স্লাভোনীয় কৃষকদের উদ্দেশে তখনও চেঁচাচ্ছে।

পেছনে তাকিয়ে দেখি লোকগুলো হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে, নিজেদের মধ্যে গল্প জুড়ে দিয়েছে, হাতে হাতে ঘুরছে ব্রাণ্ডির বোতল, পলকও কেউ চোখের বিশেষ ফেলার ফুরসৎ পাচ্ছে না। আর রেল কর্মচারীটি মরিয়া হয়ে চীৎকার করছে, "ট্রেনে উঠে পড়!" ওরা কেউ নড়ল না। রেল

১ 'বক্স্কোর': এক প্রকার হরিণের চামড়ার জুতো, আগে রুমানীয় কৃষকরা পরতেন।

কর্মচারীটি একটা দলের কাছে এগিয়ে গিয়ে ওদের প্রতি সরাসরি চেঁচাতে লাগল, "ট্রেনটা তোদের এখানে ফেলেই চলে যাবে।"

ওরা ছিল পাঁচজন। পাঁচজনে নড়ে বসল।

"কোথায় যেতে হবে?" প্রশ্ন করল।

"বাইরে, একেবারে বাইরে। আমার সঙ্গে আয়।"

পাঁচজনে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল। জনসমাবেশ চঞ্চল, আন্দোলিত হয়ে নড়ে উঠল। লোকগুলো গাঁটরি আর হেঁসোগুলো তুলে নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রথম পাঁচজনের পদানুসরণ করল। ওদের সামনে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে রেল কর্মচারীটি, অবশিষ্ট সবাই ওর পেছনে কনুই দিয়ে নিজেদের গুঁতো মারতে মারতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে একজন অথবা দুজনের সারিতে। বন্যার মতো এই জনস্রোত আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল, সামনের সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে। একটা খাটো, পেশল যুবক সামরিক বাহিনীতে বেয়নেট ধরার মতো হেঁসোটা হাতে নিয়েছিল। সে তেড়ে এল আমার দিকে।

"এই, রাস্তা ছেড়ে দাঁড়া!"

আমি সরে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ালাম। ও তখন পুরো মাতাল। যুবকটা হো-হো শব্দে অট্টহাস্য করে উঠল, অন্যান্যরাও সেই অট্টহাসির অনুকরণে হেসে উঠল। ভেতরের প্ল্যাটফর্মের দিকে শতাধিক হেঁসো উঁচিয়ে এগিয়ে গেল জনবাহিনী, আর লোকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল।

রেলের জনৈক অফিসার ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। ধাবমান দলটির উদ্দেশে সর্বশক্তি দিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

"দাঁড়া! তোদের দলপতি কই! দাঁড়া! থেমে দাঁড়া!"

কেউ তাঁর দিকে তাকালও না। মনে হল হেঁসো হাতে লোকগুলো ট্রেন অভিমুখে তাদের ক্ষেপা আক্রমণ চালিয়ে নির্বিঘ্নেই কামরা দখল করে নেবে। কিন্তু সবার পেছনে দুলকি চালে এগিয়ে আসছিল দু-তিনটে লোক। রেলের অফিসারটি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"দাঁড়া! তোদের দলপতি কই?"

লোকগুলো ব্যগ্রভাবে এগিয়ে যাওয়া সঙ্গীসাথীদের দিকে তাকিয়ে রইল, আর কোনো জবাব দিতে পারল না। তারা সবাই তখন মাতাল।

"এক পাও এগোতে পারবি না," ক্রোধান্বিত অফিসারটি চীৎকার করে উঠলেন, "যতক্ষণ না আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস।"

লোকগুলোর মধ্যে একজন হাতের হেঁসো তুলে শেষ প্রান্তটা—যেখানে ইস্পাত আর কাঠটা দলবদ্ধ হয়ে মিশে গেছে—রেলের অফিসারের টুপিতে ঢুকিয়ে দিল। ঐ টুপিটাই তার সামনে তখন নিষেধাজ্ঞামূলক সরকারী ক্ষমতার প্রতীক। টুপিটা কুঁকড়ে মাথাটা মট্ করে ফেটে গেল আর রেলের অফিসারটি নিঃশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

দেহটাকে পাশ কাটিয়ে হেঁসো হাতে লোকগুলো আবার ছুটতে লাগল অন্যদের ধরার জন্য। হঠাৎ একজন লম্বা, বাদামী রঙের ভদ্রলোক বিদ্যুৎ গতিতে একটা প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে সেই লোকটার কণ্ঠদেশ ধরলেন যার হেঁসো ভাঙা মাথার খুলিতে তখনও রক্তাক্ত। লম্বা, বাদামী রঙের ভদ্রলোকটির মুখ চীৎকারে চীৎকারে লাল হয়ে উঠল।

"খুনী! তুই ভেবেছিস পালাতে পারবি? পুলিশ! পুলিশ!"

কৃষকটা গোঁয়ার আর বোকার মতো অন্যরা যে পথে দৌড়চ্ছে সে দিকে যাবার জন্য সজোরে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

"আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বাপ।"

"শূয়োর কোথাকার! আমায় তোর ধর্মপিতা বল! আমি একজন অধ্যক্ষ, তোকে উচিত শিক্ষা দেবো!"

যাত্রীরা কামরাগুলো থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন। কৃষকটা ততক্ষণে প্রাণপণে মুক্ত হবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, টেনে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

যে মুহূর্তে শ্বাসরোধকারী হাতটা তার কণ্ঠদেশে আরও চেপে বসে যন্ত্রণা বাড়িয়ে তুলল, ঠিক তখনই সে তার হেঁসো তুলে মারতে উদ্যত হল।

এক লাফে অধ্যক্ষ সরে গিয়েই পকেট থেকে একটা রিভলবার বের করলেন। সেটা দেখামাত্র কৃষকটা পিছিয়ে গিয়ে পেছন ফিরেই তার দলের বাকি সকলের পেছনে চোঁ চাঁ দৌড় দিল। কিন্তু চক্ষের নিমেষে তাকে ধরে ফেললেন অধ্যক্ষটি। কৃষকটা এবার আবার হেঁসোটা তুলে ধরল, ও দিকে রিভলবারও উঠল ত্বরিত গতিতে। ইতোমধ্যে দুজনের পাশে বিরাট ভীড় জমে গেছে। পাঁচজন লোক কৃষকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত থেকে হেঁসোটা ছিনিয়ে নিল। অব্যবহিত পরেই ঘটনাস্থলে এসে পৌছল জনৈক পুলিশ কর্মচারী। অধ্যক্ষ তাঁকে সমগ্র ব্যাপারটা খুলে বললেন।

ধৃত কৃষকটা তখন নিজেকে মাটিতে ফেলে দিয়ে, এলোপাথাড়ি লাথি মেরে,

কামড়ে, ঘুঁসি চালিয়ে, কনুইয়ের গুঁতো মেরে যে হাত দুটো তাকে ধরে রেখেছিল সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সর্বশক্তিতে মেতে উঠেছে।

স্টেশনের অপর প্রান্ত থেকে আস্তে আস্তে তার সঙ্গী সাথীরা ফিরে এল। হতভম্ব অবস্থায় ভীতিবিহবল চোখে তারা তাকিয়ে রইল। সব কিছুই তাদের কাছে তখন দুর্বোধ্য। কিন্তু ধৃত সঙ্গীর চীৎকারের মধ্যে হঠাৎ তারা এমন একটা বাক্য শুনতে পেল যার অর্থ তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে বোধ্য।

"ভদ্দরজাতের লোকগুলো আমায় মেরে ফেলতে চায় গো।"

যারা কামরাগুলোয় চড়ে বসে ছিল সেই সব কৃষকরা দলে দলে জলধারার মতো বেরিয়ে এল। তারা হতচকিত হয়ে নিজেদের দিকে খানিকক্ষণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। আর তারপর, হঠাৎ তারা সব কিছু ধরতে পারল।

"ভদ্দরজাতের লোকেরা আমাদের মেরে ফেলছে।"

বলিষ্ঠ, চওড়া বুকওয়ালা একটা কৃষক সবাইকে একদিকে সরিয়ে বিরাট ভীড়ের মাঝখানে পুলিস কর্মচারীর সামনে এসে দাঁড়াল।

মাটিতে শুয়ে আর্তনাদ করছে তার যে সঙ্গী তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে বলে উঠল, "লোকটাকে ছেড়ে দাও।"

অধ্যক্ষটি তাকে শান্তস্বরে বললেন, "এখান থেকে সরে যা, এ ব্যাপারে তোর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

কৃষকটা এবার দিব্বি দিতে লাগল।

"মশাই, আপনি যতটা মাথা ঘামাচ্ছেন আমাকে ততটাই মাথা ঘামাতে হবে। লোকটাকে ছেড়ে দাও।"

"এখান থেকে সরে যা।"

শিঙায় ফুঁ দেবার মতো করে হাত দুটো মুখের কাছে নিয়ে এসে কৃষকটা চেঁচিয়ে উঠল।

"হেই, ভাই সব। ইদিকে এস দিকিন•••।"

ফসল-কাটা লোকগুলো এবার ভীড় সরাতে লাগল। তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাতের সামনে সবাই ছুটে পালাতে লাগল। এখন ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে রইল পুলিশ কর্মচারী, অধ্যক্ষ এবং ধৃত কৃষককে ধরে রেখেছিল আরও যে দুজন তারা। কিন্তু ততক্ষণে দশজন ফসল-কাটনেওয়ালা চীৎকার শুরু করেছে।

"ওকে ছেড়ে দাও!"

একজন কৃষক অধ্যক্ষকে ধাক্কা মারল। সঙ্গে সঙ্গে তার গালে নেমে এল প্রচণ্ড এক চড়। চড় খাওয়া লোকটা ঘুরে দাঁড়াল, দৃঢ় হাতে হেঁসো তুলে সজোরে মারল অধ্যক্ষের মাথায়। সেই আঘাত সামলাতে না পেরে লম্বা ভদ্রলোক মুখ থুবড়ে পড়লেন রেল লাইনের ওপর। পুলিশটি তার তলোয়ার বের করল। আধ-মিনিট যেতে না যেতে দেখা গেল সে মাটিতে পড়ে আছে, মাথা দিয়ে গলগল করে বেরুচ্ছে রক্ত। আর সবাই এবার পালাল। দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে কৃষকরা সহসা তাদের লক্ষ্য খুঁজে পেল।

"ভদ্দরজাতের লোকেদের মেরে ফেলো!"—এটাই হল তাদের রণধ্বনি।

তাদের মধ্যে কয়েকজন মাটিতে বসে বাঁকানো হেঁসোগুলো সোজা করতে লেগে গেল, সবাইকে বের করে দেবার জন্য অনেকে ট্রেনে উঠে পড়ল আর অধিকাংশ ছুটে গেল 'প্রতীক্ষালয়'গুলি দখল করার তাগিদে। তাদের উদ্দেশ্যটা যে কী তা এক লহমায় নিজেদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। কাজটা মনমতো হওয়ায় তারা এতই দ্রুততার সঙ্গে তা সেরে ফেলতে লাগল যে প্রতিরোধের কথাটা ভাবাই অসম্ভব হয়ে উঠল। ভয়ার্ত যাত্রীরা আর্তস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে পালাতে লাগলেন। বাঁ পাশে দণ্ডায়মান কয়েকজন রেল কর্মী তাদের গতিরোধের চেষ্টা করল। কিন্তু হেঁসোগুলো দুবার আঘাত করা মাত্র দুটো লোক রক্তাক্ত মাথায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল। আর কৃষকরা বীরদর্পে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মদ্যপান, চোখের সামনে দেখা রক্ত স্রোত, তাদের শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা, আর তাদের নিজেদের উন্মাদ জয়ধ্বনি—সবকিছু মিলিয়ে তারা তখন ক্ষ্যাপা ক্রোধান্বিত মাতালে পুরোপুরি পর্যবসিত।

"ভদ্দরজাতের সবকটাকে আমরা মেরে ফেলব!" একজন চীৎকার করে ইঞ্জিন গাড়িতে উঠে পড়ল।

ইঞ্জিনে কয়লা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত লোকটা তাকে নীচে ফেলে দিল।

"বোকা গাধা, আমি কোনো ভদ্দরজাতের লোক নই।"

"তুই তো শহুরে পোশাক পরেছিস। আর এখন তোকে মরতে হবে, কুত্তা!"

আটজন ইঞ্জিনের দিকে একসঙ্গে ছুটে গেল। এক মিনিট পরে দেখা গেল চুল্লিতে কয়লা দেওয়ার লোকটা দেওয়ালের ওপারে রক্তাক্ত মাথা নিয়ে ছিটকে পড়ল

এবার মূল আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হল রেস্তোরাঁর উপর। কাঁচের জানালাগুলো টেবিলগুলির উপর ঝনঝন করে ভেঙে পড়তে লাগল ভারী হেঁসোর আঘাতে। আধ মিনিটের মধ্যে রেস্তোরাঁ, রান্নাঘর আর ভাঁড়ার চলে এল কৃষকদের দখলে।

কামরাচ্যুত যাত্রী ও রেল কর্মচারীদের ঘিরে বিশাল এক জনতা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুলিশের অকর্মণ্যতার প্রতি তীব্র ধিক্কার জানাতে লাগল।

পাঁচ মিনিট পরে এক স্কোয়াড পুলিশ এসে পৌছল। প্রবেশ পথ দিয়ে তারা স্টেশনে ঢুকল। উন্মুক্ত তরবারি হাতে আর রিভলবার প্রস্তুত রেখে তারা প্রকাশ্য প্রবেশকক্ষের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল দ্রুতপদে। লোহার বেড়ার ধারে বসে আটজন কৃষক মহানন্দে মদ গিলছিল। তাদের সামনে রেস্তোরাঁর লুঠের মাল : সুরার বোতল। পুলিশ সামনে আসতেই তারা লাফিয়ে উঠে পড়ল। হেঁসোগুলো সোজা করে দেওয়ালে ভর করে রাখা হয়েছিল। নিমেষের মধ্যে সাঁ করে হেঁসোগুলো হাতে নিয়ে কৃষকরা দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য পুলিশ কমাণ্ডারকে মনে হল দ্বিধাগ্রস্ত। এখানে তরবারি কোনো কাজে লাগবে না। রিভলবার বের করা যাক। কিন্তু আগে সে কথা বলতে চাইলেন।

কৃষকরা তার কথার জবাবও দিল না। আটটা হেঁসো উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক গুলি। তিনজন কৃষক পড়ে গেল মাটিতে, কিন্তু পাঁচটি তীক্ষ্ণ চকচকে হেঁসো হিস হিস আর মড় মড় শব্দে পুলিশ স্কোয়াডকে গিয়ে আঘাত করল। হেঁসোর বাড়ির সামনে নিজেকে রক্ষা করা যায় না, তুমি তাকে এড়াতে পারবে না। হেঁসোর বাড়ি এক আঘাতেই পা ছিঁড়ে ফেলে, নাড়িভুঁড়ি বের করে দেয়, গলা কেটে নেয়। আরও কয়েক ঝাঁক গুলি রিভলবার থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু ততক্ষণে স্কোয়াডের অর্ধেক পুলিশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রক্তের মধ্যে প্রবল যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর অন্যান্যরা রক্তরঞ্জিত অবস্থায় মুক্ত রাস্তা দিয়া ছুটছে।

বাইরে দেখা দিল উন্মাদ আতঙ্ক। মরিয়া হয়ে পালাবার প্রয়াসে লোকেরা পরস্পরকে ঠেলে, ফেলে, পায়ের চাপে দলিত করে এগিয়ে যেতে চাইছে। আর তার আগেই ভয়জনিত ত্বরিতগতিতে পৌছে গেছে খবর।

"কৃষকরা বেরিয়ে আসছে। তারা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে চায়।"

মুহূর্তের জন্য মনে হল হুশো হেঁসোর অপ্রতিরোধ্য, রক্তাক্ত আক্রমণের মুখে

বুদাপেস্ত, অরক্ষিত অবস্থায় ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়ে থাকবে···ভেতরের ওরা বেরিয়ে আসতে চাইলে বাধা দেবার কেউ নেই। কিন্তু রেস্তোরাঁর লুঠের মালের প্রভাবে কৃষকরা ভেতরেই থেকে গেল। আর বাইরে পলাতকদের জায়গায় কৌতূহলবশে যে নতুন ভীড়টা জমে উঠেছিল তা থেকে সহসা শোনা গেল মৃগীরোগাক্রান্তের মতো প্রচণ্ড আওয়াজ।

"সৈন্য। সৈন্য।"

ভীড় বাড়তে লাগল। স্টেশনের আশপাশে ছাপিয়ে বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়ল কেরেপেসি স্ট্রীটে। একটা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এলেন পুলিশ প্রধান। স্টেশনের প্রত্যেক বহির্পথে রিভলবার হাতে পুলিশ স্কোয়াড মোতায়েন করলেন।

"যদি ওদের কাউকে ধারে কাছে দেখো গুলি চালাবে। ওরা ভেতরের জায়গাটা দখল করে রাখলেও ওদের আমরা বাইরে আসতে দেবো না।"

ভেতরে কিন্তু কৃষকরা ইতিমধ্যে নিজেদের এক মণ্ডপ সংগঠন গড়ে তুলেছে। তারা তখন বাইরে আসতেও অনিচ্ছুক। রেস্তোরাঁর বহির্পথে নিজেদের প্রহরা রেখে কয়েকজনকে নীচের ভাঁড়ার ঘরে পাঠিয়েছে। কয়েকটি তরুণ বাকিদের জন্য খাবার নিয়ে এল।

পুলিশ প্রধান স্টেশন মাস্টারকে ডেকে জানতে চাইলেন—স্টেশনে যাতে কোনো ট্রেন না আসে সে ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না। স্টেশন মাস্টারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

"হা ভগবান," স্বগতোক্তি করলেন তিনি, "এক্ষুনি এসে পড়বে কনস্টানটিনোপল এক্সপ্রেস।"

রেললাইন ধরে ছুটবার জন্য এগিয়ে গেলেন স্টেশন মাস্টার। কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ঘটাং ঘট ঘটাং ঘট শব্দে কাঁচের ছাদের নীচে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল হলুদবর্ণ সুন্দর ট্রেনটা। সুতীক্ষ্ণ কলরব করে কৃষকরা তাকে স্বাগত জানাল। ট্রেনের যাত্রীরা বিস্ময় আর আতঙ্কের সঙ্গে রক্তাক্ত হেঁসোধারী লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু সত্যিই অবাক হয়ে থাকার কোনো সময় ছিল না। কৃষকরা কামরাগুলোয় ঝটপট উঠে পড়ল আর আধ মিনিটের মধ্যে লুণ্ঠিত হল কনস্টানটিনোপল এক্সপ্রেস। কিছু যাত্রী গদীর উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রইলেন আর প্রবল প্রহারে জর্জরিত বাকিরা রাস্তার দিকে ছুটলেন।

"কি ভয়ানক ব্যাপার! এমন একটা ঘটনা বুদাপেস্তে ঘটেছে ভাবা যায় না! একটা ইওরোপীয় কলঙ্ক···একটা আন্তর্জাতিক ট্রেন···।"

পলাতক যাত্রারা ভয়ে কাঁপছিলেন। তাঁদের সুনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া হল, এই ভীড়ে তাঁদের কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। পুলিশ প্রধান মানসিক উত্তেজনায় বার বার কেরেপেসি স্ট্রীটের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

"বিউগল ধ্বনি শুনতে পাচ্ছ না?"

জিজ্ঞেস করলেন জনৈক পুলিশ ইনস্পেক্টরকে।

"না।"

অবশেষে বিউগল বাজল। এসে পড়ল ছ কোম্পানি অশ্বারোহী সৈনিক, ঘোড়ার দ্রুত টগবগ আস্তে আস্তে ভীড়ের মধ্যে ধীর পদসঞ্চারে পরিণত হল। তুমুল হর্ষধ্বনিতে ঘাবড়ে গিয়ে ঘোড়াগুলো হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল। সকলের আগে এগিয়ে চলা মেজরটি দিব্যি পাড়লেন। পুলিশ প্রধান তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন।

"আপনার নির্দেশ কী।" মেজর প্রশ্ন করলেন।

"আপনি দয়া করে আপনার লোকদের ঘোড়া থেকে নামিয়ে তাদের বন্দুক ভরে নিয়ে স্টেশনটা মুক্ত করতে বলবেন?"

"আমি দুঃখিত, সেটা করতে পারছি না। কারণ বন্দুক ভরে নেওয়ার কোনো মশলা নেই। আমরা সঙ্গে করে তাজা গোলাগুলি আনি নি।"

"তাহলে আমাদের পদাতিক সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ইতি-মধ্যে আপনি দয়া করে আপনার লোকদের নিয়ে ভীড়টা কেরেপেসি স্ট্রীটের দিকে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা করুন।"

অশ্বারোহীরা ধীরগতিতে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে তাদের গাল পাড়তে পাড়তে পেছনে সরিয়ে দিতে লাগল। মিনিট পনেরো পরে এসে পৌঁছল পদাতিক সৈন্যবাহিনী—জনৈক লেফটেনাণ্ট কর্নেলের নেতৃত্বে তিন কোম্পানি। পুলিশ প্রধান তাদের কি কি চান তা জানিয়ে দিলেন। মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন লেফটেনাণ্ট কর্নেল। তিনদিক থেকে স্টেশনে প্রবেশ করার জন্য তিনটি কোম্পানিকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন তিনি, তাদের বন্দুক ভরতে বলে আদেশের সুরে জানালেন:

"হেঁসো নিয়ে ওদের কাছে আসতে দিও না। বেয়নেটের জন্য কিছু বাকি রেখো না। বুলেট দিয়েই করো।"

তারপর পুলিশ প্রধানের দিকে ফিরে বললেন :

"আশপাশের সমস্ত অঞ্চল থেকে লোকেদের সরিয়ে নিন। আমাদের বুলেট পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলোর দেওয়াল ভেদ করে যেতে পারবে।"

পুলিশ প্রধান ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

"আপনি কি মনে করেন না, লেফটেনান্ট কর্নেল, ওদের আঘাত না করাটাই আরও ভালো কাজ হবে? সন্ধ্যার মধ্যে ওরা পুরো মাতাল অবস্থায় নিঃসাড় হয়ে পড়বে আর তখন আমরা বিনা রক্তপাতেই ওদের নিরস্ত্র করতে পারি।"

"আমার মনে হয় সেটা আরও ভালো হবে। কিন্তু আমার কর্তব্য আদেশ পালন করা।"

"তাহলে আসুন ঐ বেশি হিংসাত্মক পদ্ধতিটা আপাতত বাদ দিই। আমি শুধু আপনাকে তিনটি কোম্পানিকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে বলব—যদি আমার কাজে লাগে। আমরা ওদের অবরোধ করে রাখব। আমাদের দরকার না হলে ওদের জবাই করে কোনো লাভ নেই।"

স্টেশন মাস্টারকেও নির্দেশ দেওয়া হল :

"সকল ট্রেন এসে বাইরে স্টেশনে দাঁড়াবে। আর সেখান থেকেই ছাড়বে। বহির্গমন কক্ষ থেকে বহির্পথটিতে সৈনিকরা পাহারা দেবে।"

আরও তিন কোম্পানি সৈনিক এসে পৌঁছল। তারা সমগ্র স্টেশন ঘিরে ফেলল আর প্রত্যেকটা ফাঁক, প্রতিটি দরজায় বেয়নেটসহ রাইফেল-নল তাক করে রাখল। ভেতরে প্রচণ্ড সোরগোল, কথাবার্তা, চেঁচামেচি, বন্ বন্ শব্দ। কৃষকরা সবকিছু চুরমার করছে। 'বিশ্রামাগার'-এর সকল আসবাব টুকরো টুকরো করে ফেলে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, রেস্তোরাঁর যা কিছু ভাঙার তা ভেঙে ফেলছে। মধ্যাহ্নের দিকে দশ পনেরোজন হেঁসোগুলো উঁচুতে তুলে ধরে একবার বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল। ভদ্দরজাতের লোকেদের তারা মেরে ফেলবে এই রণধ্বনি তুলে স্টেশনের প্রবেশপথ দিয়ে তারা বেরিয়ে এল আর সোজা ছুটে গেল তাদের প্রতি তাক করা বেয়নেটের দিকে, দৃঢ়ভাবে এগিয়ে হেঁসোগুলো উঁচুতে তুলে ধরে। তারপরেই এক সঙ্গে গুলিবর্ষণ হল। ছয়জন পড়ে গেল মাটিতে, বাকিরা কাঁচের ছাদের নীচে আত্মরক্ষায় ছুটে গেল। সেখানেই তারা থমকে দাঁড়িয়ে রইল, এগোল না। ভেতরে শব্দ বাড়তে লাগল, উন্মত্ত গানের আওয়াজও ভেসে এল। বাইরে সৈনিকরা দাঁড়িয়ে রইল,

তাদের পেছনে সমগ্র কেরেপেসি স্ট্রীট ছাপিয়ে গাদাগাদি ভীড়, আর তারও পেছনে মানসিকভাবে উত্তেজিত, অধৈর্য, হতবুদ্ধি, ক্রোধান্বিত বুদাপেস্ত।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ভেতর থেকে দেখা গেল আগুনের লাল আলো। ভেঙে ফেলা আসবাবপত্রের বহ্ন্যুৎসব করছে কৃষকরা। তারপর আবার গান আর থেকে থেকে আরও ঠন ঠন শব্দ। রাত্রি নামল। নেমে এল নিস্তব্ধতা। বুদাপেস্ত বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল মানসিক উত্তেজনার রুদ্ধনিঃশ্বাসে।

মধ্যরাত্রির পর সম্পূর্ণ নৈঃশব্দ্য নামলে শুরু হল পুনর্দখল। সৈনিকদের বেয়নেটের ডগায়, নীরবে, সতর্কতার সঙ্গে অত্যন্ত সযত্নে তৈরি রণনীতি অনুসরণ করে পুলিশবাহিনী ভেতরে প্রবেশ করল। ছাদের বৈদ্যুতিক বাতি-গুলো চুরমার হয়ে গেছে—তাই প্রবেশ পথ, প্ল্যাটফর্ম এবং বিশ্রামাগারগুলো হাত-লণ্ঠনে আলোকিত করা হল। মাঝে মাঝে কোনো বেয়নেট ভয়ে ভয়ে কেঁপে উঠলেও কোনো প্রতিরোধ দেখা দিল না। রক্তাক্ত হেঁসোগুলো মাটিতে শায়িত। আর কাঁচের ছাদের নীচে, বিশ্রামাগারে, ভাঁড়ার ঘরে, দণ্ডায়মান রেলগাড়ির কামরায় মদ্যপ অচৈতন্যতায় পড়ে থাকা কৃষকেরা একে একে তাদের নিজেদের ধ্বংসাবশেষ, আবর্জনা, সুরা, শ্যাম্পেন ও রক্তের ভেতর থেকে জড়ো হতে থাকল।

অনুবাদক : সুমিত চক্রবর্তী

জীবনরসিক ভবানী সেন

প্রমথ ভৌমিক

'পরিচয়' সম্পাদকের আদেশ হয়েছে, ভবানী সেনের জীবনের সাংস্কৃতিক দিকের উল্লেখ করে একটা লেখা দিতে হবে। তাও দিতে হবে অতিদ্রুত। মুস্কিল হল গুছিয়ে কিছু বলা আমার স্বভাবে নেই। তাছাড়া এখন তো আরো বে-সামাল—ভবানীর সহসা প্রয়াণে। তাই একটু এলোমেলো হয়ে যাবে আমার বক্তব্য, সেকথা আগেই পাঠকদের জানিয়ে রাখছি। আর চেয়ে রাখছি ক্ষমা ও প্রশ্রয়।

ভবানী ছিল 'সদ্ভাব শতক'-এর কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের দৌহিত্র। কবি কৃষ্ণচন্দ্র শেষ বয়সে পাগল হয়ে যান। তাঁর নিজ গ্রাম খুলনা জেলার সেনহাটিতে ভৈরবের কূলে তাঁকে প্রায়ই টহল দিয়ে বেড়াতে দেখা যেত। মুখে থাকত ফার্সি কবি হাফেজের বয়েত। এহেন মাতামহের দৌহিত্র যে একটু-আধটু ছিটগ্রস্ত হবে, তাতে আর বিচিত্র কি! তাই তো দেখি কমিউনিজমের ছিটগ্রস্ত বাউণ্ডুলের মতো দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে তার ৬৩ বছরের জীবনটা কেটে গেল। বাল্যকালটা কেটেছে অবশ্য ভৈরবের কূলে। জন্মগ্রাম পয়োগ্রাম কসবা ভৈরবের ধারেই, স্কুলের জীবন মূলঘরে—সেও ভৈরবের তীরে, তারপর দৌলতপুর কলেজের হোস্টেল—তাও ভৈরবের উপর। তারপর এল কলকাতায় পড়তে—গঙ্গাতীরে। আর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল মস্কোভা নদীর তীরে সুদূর মস্কো শহরে। এই হল ভবানী সেনের জীবন-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ততম পরিচয়। কোথায়ও সে ঘর বাঁধতে পারে নি। "কোন দেশে মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর ফিরি খুঁজিয়া"—ভাবটা অনেকটা সেই রকম।

যৌবনের প্রারম্ভে পাঠ্যাবস্থায় ভবানী কমিউনিজম বা মার্কসবাদের মূলমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে। ১৯৩১ সালে ডেটেনিউ হয়ে ৬ থেকে ৭ বছর কাটে বিভিন্ন বন্দীশালায়। সেখানে চলল গভীর অনলস অধ্যয়ন। মার্কসীয় দর্শন, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান অধিগত হল। মার্কসীয় মতবাদের বনিয়াদ্ পাকা-পোক্ত হল। গ্রানাইট পাথরের মতো শক্ত ভিত্তির উপর প্রোথিত হল জীবন-

দর্শন। দৃষ্টির সামনে বিস্তৃততর বিশালতর জীবনের দিগন্ত উন্মোচিত হল।

দেউলী বন্দীশালায় শেষ ৪ বছর আমরা কাছাকাছি ছিলাম। তখন তার অধ্যয়নের বিস্তৃতি লক্ষ্য করেছি। শুধু যে মার্কামারা কমিউনিস্ট পুঁথিই সে পড়ত তা নয়। কমিউনিজমের বিরোধী মতবাদও তাকে যাচাই করে নিতে দেখেছি। দেশীবিদেশী গল্প কবিতা উপন্যাসও সে প্রচুর পড়েছে। অর্থাৎ 'মানুষ' সংক্রান্ত কিছুই তার কাছে বর্জনীয় ছিল না।

কিন্তু এক সময়ে যেমন সমস্ত পথই ধাবিত হত রোমের দিকে—তেমনি সব কিছু পড়ে শেষ সিদ্ধান্ত হত মার্কসবাদই প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সময়েই বোধহয় সে উপলব্ধি করেছিল কমিউনিজম হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ। কমিউনিজম যদি মানুষকে উন্নততর জীবন—যাকে কেউ কেউ 'দিব্যজীবন' বলে বর্ণনা করেছেন—না দেবে তাহলে তো তা একটা শূন্যগর্ভ অসার জীবনদর্শন, তা গ্রহণ করব কেন? মার্কসবাদের কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে সব কিছুই ভবানী যাচাই করে দেখেছে। রবীন্দ্রনাথের পরশ পাথরের ক্ষ্যাপা যেমন পরশ পাথর খুঁজে বেড়াত, অনেকটা তেমনি। কমিউনিজমে কোথাও থামা নেই—এ একটা চির অন্বেষা। একটা একটা করে আবরণ উন্মোচন করে হিরণ্ময় সত্যের মুখ দেখতে হবে। তাই চলেছিল ভবানীর অন্বেষণ। পরশ পাথরের ক্ষ্যাপা যেমন সহসা একদিন দেখল তার হাতের ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি সব স্বর্ণময় হয়ে গেছে, তেমনি ভবানীও দেখতে পেল মার্কসবাদের স্পর্শে তার সবকিছু সুবর্ণময় হয়ে গেছে। নিজেকে, জীবনকে, সে চিনতে পারল। তার সব বন্ধন ঘুচে গেল। আর সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে গেল—ব্রত হল, জীবনের একমাত্র কাজ হল, সবার কাছে এই নবলব্ধ সত্যের প্রচার। এই সত্যকে ভারতবর্ষের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।

জেলের বাইরে এসে সে তখনকার সদ্য প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল—যাকে বলে একেবারে 'হেডলং প্লানজ্' করা। ১৯৩৮-৩৯ সালে সমস্ত রাজবন্দীরা ছাড়া পেয়ে জেলের বাইরে এলে বাঙলাদেশের প্রায় সব জেলাতে ছড়িয়ে পড়ল কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের পরিচালিত গণ-আন্দোলন। জেলের মধ্যে বা বন্দীশালায় ভবানীর কমিউনিজম প্রচারের ফসল বেশ ভালোই ফলল। ভবানী তাই সহজেই হয়ে উঠল কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা।

কিন্তু কোনো দেশে কোনোকালে কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রগতির পথ

কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। ন্যস্ত স্বার্থের লোকেদের বাধাদান তো ছিলই, তাছাড়া সরকারও ছিল খড়্গহস্ত। বছর খানেক যেতে না যেতেই ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল, কমিউনিস্ট নেতাদের সব ধরে ধরে জেলে পোরা হল। অনেকেই চলে গেলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে—যাকে আমাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' যাওয়া বলে। ভবানীও ছিল তাদের অন্যতম।

তারপর ঘটনার গতি দ্রুত তালে এগিয়ে যেতে লাগল। সে ইতিহাস এখানে বর্ণনা করার সুযোগ নেই। ১৯৪১ সালে হিটলারের নাৎসী বাহিনী অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করে সহসা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে বসল। এর ফলে কমিউনিস্টদের মতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চরিত্র গেল বদলে। যে যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যলোভীদের মধ্যে উপনিবেশ দখল ও ভাগাভাগির লড়াই, তা পরিণত হল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধে। দেউলী জেলে আবদ্ধ কমিউনিস্ট ন্দীরা সেই ভাবেই যুদ্ধের মূল্যায়ন করে একটা দীর্ঘ চিঠি বা নিবন্ধ পাঠান। বাইরে যে নেতারা ছিলেন তাঁরাও সেই মতই গ্রহণ করলেন। এমন কি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের যুদ্ধপ্রয়াসেও বাধা দেওয়া বা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নীতি বর্জিত হল। হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হয়ে থাকবে। এই নীতি গ্রহণের ফলে কমিউনিস্টদের সব জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। ১৯৪২ সালে পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল এবং বহুকাল পরে পার্টি খোলাখুলি অফিস করে কাজ আরম্ভ করল।

অন্যদিকে ১৯৪২ সালে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা গ্রহণ করলেন 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব। ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তাব পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস নেতারা অনেকেই গ্রেপ্তার হয়ে যান। সারা ভারত জুড়ে বিষম বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেল। রেলের লাইন ওপড়ানো, টেলিগ্রাফের তার কাটা চলতে লাগল। তার বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার প্রচণ্ড দমননীতি অবলম্বন করে। জঘন্যতম বর্বরতার সঙ্গে যেখানে সেখানে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করে তারা গুলি চালাতে লাগল। সত্য সত্যই একটা প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক সঙ্কট। কমিউনিস্ট পার্টি দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ করল।

কমিউনিস্ট পার্টি তখন খুব ছোট একটি দল। তাদের প্রভাবও ছিল খুব সীমিত। কিন্তু পার্টিকে কংগ্রেস নেতারা "দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, ইংরেজের দালাল'' প্রভৃতি আখ্যায় চিহ্নিত করে কোণঠাসা করে ফেলতে চেষ্টা করতে

লাগলেন। এমনকি মহাত্মা গান্ধীও অনেক নিষ্ঠুর উক্তি করেন। কিন্তু তাতে তাঁরা ব্যর্থ হলেন। কারণ কমিউনিস্টদের মধ্যে অনেক দেশভক্ত ছিল, তাদের দেশপ্রেম কারও থেকে কম ছিল না। তবুও এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ঠাণ্ডা মাথায় 'কাজ' করা ছিল খুবই কঠিন। কমিউনিস্ট অফিসের উপর তখন যেখানে সেখানে কংগ্রেসীদের আক্রমণ চলছিল।

১৯৪৩ সালে বাঙলাদেশের পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হলেন ভবানী সেন। তাঁকে এই সময়ে অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। ইংরেজ সরকারের ডিনায়েল পলিসি বা বঞ্চনা নীতির ফলে সারা বাঙলাদেশ জুড়ে দারুন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কলকাতা বা অন্যান্য শহরগুলি ভরে গেল দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামবাসীদের দ্বারা। "মাগো একটু ফ্যান"—এই করুণ ধ্বনিতে শহরের পথ মুখরিত হতে লাগল। 'অন্নদাতা' কৃষক সেদিন পথে বেরিয়েছিল অন্ন ভিক্ষায়। কমিউনিস্ট কর্মীরা স্বেচ্ছায় তাদের মুখে অন্ন জোগাবার ভার নিল। তাদের দ্বারা জেলায় জেলায় অসংখ্য 'লঙ্গরখানা' খোলা হল। সরকারও কিছু কিছু সাহায্য না করেছেন এমন নয়। কিন্তু কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত লঙ্গরখানা বা অন্নসত্রগুলিই ছিল সুপরিচালিত। তাদের মধ্যে ছিল সেবার মনোভাব। ভবানী সেনই ছিলেন এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রধান প্রেরণা। প্রধানত দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বঙ্গবাসীকে বাঁচাবার জন্য সারা ভারতব্যাপী অর্থসংগ্রহের চেষ্টা চলে। এই সময়েই গঠিত হয় গণনাট্য সংঘ বা ইণ্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন—সংক্ষেপে যাকে বলা হত আই পি টি এ। এরই একটি স্কোয়াড নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পুরণচাঁদ যোশী সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। এই স্কোয়াডে বাঙলাদেশের গায়ক ও শিল্পীরা প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের মূল প্রেরণা-দাতা ছিলেন ভবানী সেন। সেদিন ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংজ্ঞের (যাঁদের সেই পুরাতন আই পি টি এ-র ঐতিহ্যবাহী বলা যায়) এক সভায় সেকথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "চল্লিশের যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভবানীবাবু ছিলেন একজন অগ্রণী উৎসাহদাতা এবং পথপ্রদর্শক।" সেদিনকার আই পি টি এ-র একজন প্রধান নেতা 'নবান্ন' নাটকের লেখক ও অভিনেতা শ্রীবিজন ভট্টাচার্যও এক নাগরিক শোকসভায় এই কথাই স্মরণ করেছেন। বিজনবাবু বলেছেন, "ভবানীবাবু থিয়েটারে অভিনয়ের আঙ্গিক সম্বন্ধে জানতেন না, তিনি

নিজে কোন নাটকও লেখেন নি কিন্তু তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলে আমি নাটকের প্লট পেতাম, পেতাম নূতন নাটক লেখার প্রেরণা।" এই তো সত্যিকারের একজন জননেতার কাজ—সকলকে সব কাজে প্রেরণা যোগানো।

এই সময়কার আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল প্রগতি লেখক সংঘ বা প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন গঠন। এর মধ্যে শুধু কমিউনিস্টরাই ছিলেন না। মতের দিক থেকে প্রগতির পক্ষে ছিলেন যেসব লেখক—তাঁদের সকলকেই এই সংগঠনের মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি নামকরা লেখক অনেকেই এই সংঘে যোগ দেন। এর দু-একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনও হয়। তাতে প্রখ্যাত লেখক মুলকরাজ আনন্দ, খাজা আহম্মদ আব্বাস, সাজ্জাদ জাহির প্রভৃতি অনেকেই যোগ দেন। সর্বভারতীয় সংঘও একটা হয় বটে, কিন্তু বাঙলাদেশেই প্রগতি লেখক সংঘ বেশ ভালো ভাবে জমে ওঠে এবং মোটামুটি একটা আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। ভবানী সেন এই সংঘের সঙ্গে সাংগঠনিক ভাবে যোগ দেন নি বটে কিন্তু তিনিই যে এর মূল প্রেরণা ও উৎসাহদাতা ছিলেন তা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। যে পার্টি সেল এই সংঘে কাজ করত—তারা ভবানী সেনের পরামর্শেই চালিত হত। এই সংঘের প্রভাব বাঙালি লেখকদের মধ্যে এতদূর বেড়ে যায় যে তখন এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে গড়া হয় কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ। যার প্রধান কাজ ছিল কমিউনিস্টদের কুৎসা কীর্তন। অনেকটা আত্মরক্ষার তাগিদেই এই সংগঠনের জন্ম হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর ১৯৪১ সালে গড়ে ওঠে সোভিয়েত-সুহৃদ সমিতি, তৎকালের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রখ্যাত সম্পাদক সত্যেন্দ্র-নাথ মজুমদার হন এই সংঘের প্রথম সভাপতি। এই সমিতি বহু পার্টি-বহির্ভূত মানুষের মিলনস্থানে পরিণত হয়। বিভিন্ন জেলায় এর শাখা গড়ে ওঠে। পরে এই সংগঠন পরিণত হয় ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতিতে। গোড়ার যুগে সোভিয়েত-সুহৃৎ সমিতির অবদান আজকের কমিউনিস্টদের ভোলা উচিত নয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন এই সময় ভবানী অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আত্মগোপন করে ছিলেন। পরে পার্টি আইনসম্মত হলে ভবানী যখন ১৯৪৩ সালে বাঙলাদেশের পার্টি সম্পাদক হন, তখনও এই সংগঠন চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিতেন।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কমিউনিস্টদের যারা কোণঠাসা করে এক-

ঘরে করতে চেয়েছিল, তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেহেতু কমিউনিস্টরা ছিলেন প্রধান চালিকাশক্তি, তাই কমিউনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা ও প্রভাব সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ভবানী সেন একাই যে সব চালাতেন তা নয়। কিন্তু যেহেতু ১৯৪৩-এর পর তিনিই ছিলেন প্রধান নেতা, তাই এইসব সংগঠন পরিচালনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

তারপর সম্ভবত ১৯২৫ সালে পার্টির দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা' প্রকাশ হয়। পরবর্তীকালে ডেকার্স লেনে একটা বড় বাড়ি নিয়ে 'স্বাধীনতা'র প্রেস, পত্রিকা অফিস এবং পার্টি অফিস একত্রে এক জায়গায় আনা হয়। তখন ভবানী ছিলেন পার্টির সম্পাদক। ভবানী পার্টিসংগঠন দেখা ছাড়া প্রত্যক্ষ যোগ রাখতেন কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯৪৬-৪৭-এর তেভাগা আন্দোলনের প্রধান পরিচালক ও সংগ্রামের অন্যতম নায়ক ছিলেন ভবানী সেন।

কিন্তু এখানে পার্টির ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। লিখতে চাই-ছিলাম ভবানী সেন সম্বন্ধে কিছু কথা। কিন্তু যেহেতু চল্লিশের দশক থেকে ৭২ সাল পর্যন্ত বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ভবানী সেনের জীবন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল তাই তার কথা বলতে গেলে পার্টির কথা আসবেই। ভবানী ছিল এমন একজন মানুষ পার্টির বাইরে যার কোনো আলাদা জীবন বা আলাদা অস্তিত্ব ছিল না। পার্টিই ছিল তার সব। তাই বিয়ে করলেও তার পারিবারিক জীবন বলে কিছু গড়ে উঠতে পারে নি। পার্টিই তাকে সম্পূর্ণ ভক্ষণ করে ফেলেছিল। এমনকি স্ত্রীর দিকেও সে খুব বেশি মনোযোগ দিতে পারে নি। সম্ভবত ভবানীর স্ত্রী ইন্দিরার মস্তিষ্ক বিকৃতির এটাও একটা কারণ। শেষ জীবনে দেখেছি তার কোথাও 'ঘর' বলতে কিছু ছিল না। কখনো সে থাকত বারাসতে শ্রীযুক্তা রমা ঘোষের (মাসিমা) আশ্রয়ে, কখনো থাকত চিন্মোহন সেহানবীশের বাসায়, কখনও বা কমরেড ইলা মিত্রের আশ্রয়ে। এখান থেকেই সে দিল্লী হয়ে বিদেশ যাত্রা করে। সেই তার শেষ যাত্রা।

ভবানী সেনের চরিত্রের আরো দু-একটি বিশেষ দিকের উল্লেখ করে আমার এই লেখা শেষ করব। ১৯৪৮-এ পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টিনেতৃত্ব চলে যায় বি টি রণদিভের হাতে। তাঁর সঙ্গে ভবানীও হয় পলিটব্যুরোর সদস্য। রণদিভের উন্মাদ-করা সংগ্রামের আহ্বানই সম্ভবত ভবানীর এ সময়ে প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে। তেলেঙ্গানার ও কাকদ্বীপের কৃষকসংগ্রাম যে-

কোনো সংগ্রামপ্রিয় মানুষকে তীব্রভাবে আকর্ষণ না করে পারে না। অবশ্য অতি অল্পদিনের মধ্যেই এর ভুলের দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জি ঠিকই লিখেছেন, কোনো একটি ব্যাপারে একেবারে শেষপর্যন্ত না দেখে ভবানী ক্ষান্ত হত না।

এই যুগে রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনাম নিয়ে 'মার্কসবাদী' নামে এক পত্রিকায় ভবানীর কতকগুলি লেখা বেরয়। এই লেখায় রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকলেরই মুণ্ডপাত করা হয়। বলা হয় এঁরা যেহেতু ব্রিটিশশাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে সামিল হন নি, অতএব এঁরা প্রতি-ক্রিয়াশীল। অতীব সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে ওঠে এইসব লেখার মধ্যে। অথচ এগুলি ছিল ভবানী সেনের স্বভাববিরুদ্ধ। রণদিভের সংকীর্ণতা-বাদী দৃষ্টিভঙ্গী তখন সাময়িকভাবে ভবানীর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এখানে সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ হয়েছিল—তার সঙ্গে ট্রটস্কীর 'লিটারেচার অ্যাণ্ড রেভোলিউশন' গ্রন্থের বক্তব্য অনেকাংশে মিলে যায়। যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা জানেন লেনিন এই মতের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন—'প্রলেটকাল্ট' বলে কিছু নেই, হিউম্যানকাল্টই কমিউনিস্টদের অনুসরণ করতে হবে।

কিছুকালের মধ্যেই ভবানী তার ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পারে। আণ্ডার গ্রাউণ্ড থেকে বেরোবার পর যতদূর মনে পড়ছে এই সময়ে ভবানী একদিন কবি বিষ্ণু দের সঙ্গে দেখা করে এবং সম্ভবত নিজের ভুল স্বীকার করে। সংকীর্ণতা-বাদের এই যুগে বিষ্ণু দের সঙ্গে তার একবার বিতর্ক হয়। অবশ্যই ছদ্মনামে। এ সম্বন্ধে বোধহয় বিষ্ণু দে কিছু আলোকপাত করতে পারেন।

আমি যে ভবানী সেনকে চিনি, সে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পরম অনুরাগী। কবির বহু কবিতাই তার কণ্ঠস্থ ছিল। রবীন্দ্রসাহিত্য ও উপনিষদে তার অনায়াস বিচরণ ছিল। প্রধান প্রধান উপনিষদগুলি সে খুব ভালো করেই পড়েছিল। বহু আলোচনায় দেখেছি সে উপনিষদ থেকে শ্লোকের উদ্ধৃতি দিত। উপনিষদের অনেক শ্লোকে বস্তুবাদের সমর্থন মেলে—একথা সে অনেক সময় বলত। এ সম্বন্ধে একটা গবেষণা চালাতে তাকে অনুরোধ করলে সে বলে, তার সময় বা সুযোগ কোথায়! পার্টির দৈনন্দিন খুচরা কাজেই তার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। তাই তার পুরো সাংস্কৃতিক অবদান সে রেখে যেতে পারে নি। পার্টির এমনিতরো কাজেই তার জীবন

সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছিল।

বস্তুত "মানুষ সম্বন্ধীয় কিছুই আমার বর্জনীয় নয়"—কার্ল মার্কসের এই প্রসিদ্ধ মটো বা লক্ষ্য ভবানীরও জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এমনকি তাকে আমি টেলিপ্যাথি সম্বন্ধেও পড়তে দেখেছি। সে আমাকে একদিন খবর দেয়—সোভিয়েত পত্রিকা Sputnik-এ টেলিপ্যাথি সম্বন্ধে একটা নিবন্ধ বেরিয়েছে, পড়ে দেখবেন। আমি অবশ্য সেটা সংগ্রহ করতে পারি নি।

ভবানী খণ্ডিত ভাবে, বিচ্ছিন্ন ভাবে কোনো কিছুই দেখত না। দেখত একটা সমগ্রতার (গেস্টাল্ট) দৃষ্টি দিয়ে। মাত্র একবার ঐ রণদিভের যুগে তার এই দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়। কোনো জিনিসের—তা একটা সামাজিক ঘটনা বা কোনো রাজনৈতিক ঘটনা যাই হোক না কেন—তার সৃষ্টি বৃদ্ধি ও ক্ষয় সব মিলিয়ে দেখলেই, সমগ্রতার আলোকে দেখলেই, ঠিক দেখা হয়। এই ভাবেই ভবানী দেখতে অভ্যস্ত ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের দৃশ্যত শান্ত জলরাশির নীচে একটা চঞ্চল প্রবাহ সব সময় বয়ে যাচ্ছে। তেমনি ভবানীর আপাত সৌম্য দৃষ্টির আড়ালে জীবনের সমগ্রতার চঞ্চল স্রোত বয়ে যেত। তাই অনেক সময় তাকে দেখাত উদাসীন অন্যমনস্ক মানুষের মতো। সব সময়েই একটা কিছু চিন্তায় সে মগ্ন হয়ে থাকত। এই যে ভবানী সেন তা একদিনে সৃষ্টি হয় নি। বহু আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে সে এক পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছিল। শেষ যে ভবানীকে দেখেছি—সে গোড়ায় ছিল না। একটা "বিকামিং" বা "হয়ে ওঠা"র পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সে ক্রমেই এগোচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সেই যে আছে, "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী ওগো সুদূর ওগো বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী"—এই সুদূরের পিপাসাও তার মধ্যে দেখেছি। ধীরে ধীরে সে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিল। এমন সময় মৃত্যু এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী মোহন কুমার মঙ্গলম ঠিকই বলেছেন : ভবানীর মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের রাজনীতিকে পরিবর্তিত করে দেবার মতো উপাদান ছিল। কথাটা খুবই খাঁটি। কিন্তু তা পূর্ণ রূপ নেবার আগেই সে প্রস্থান করল। ডিমিট্রভের জন্মভূমিতে সেমিনারে যোগ দিয়ে ফিরে এলে আমরা ইউনাইটেড ফ্রন্টের আরো বলিষ্ঠ আরো সমৃদ্ধতর পরিকল্পনা তার কাছে পেতাম—যার শুরু হয়েছিল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার মধ্যে। অবশ্য তার মৃত্যু আমাদের প্রবল ভাবে আলোড়িত করে গেল। আশা করি তার শূন্যস্থান পূর্ণ করার যোগ্য মানুষ আবার দেখতে পাব।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিষ্ণু দে : তিনি তো আমাদেরই লোক

বিষ্ণু দে-র 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদে প্রগতিবাদী ব্যক্তিমাত্রেই বিস্মিত এবং খুশি। বিস্মিত, কারণ সাধারণত এ জাতীয় পুরস্কারের সঙ্গে যে প্রচুর অর্থের পরিমাণ এবং ফলত প্রচার, তদ্বির ইত্যাদি জড়িত তা মনে রাখলে বিষ্ণু দে-র মতো নিস্পৃহ আত্মসঙ্কুচিত ব্যক্তির কাছে এই পুরস্কার পৌঁছুনো সত্যিই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। খুশি, কারণ আমরা সকলেই অনুভব করেছি, এ পুরস্কার পাওয়ার পক্ষে তাঁর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কে আছে এই দেশে। এমনিতে অবশ্য এ ধরনের পুরস্কারে, বোধহয় সাহিত্যের যে-কোনো পুরস্কারেই, আস্থা রাখা খুব মুশকিল। যে-কোনো ছোট-বড় সাহিত্য-পুরস্কারের ইতিহাসেই সব রকম সম্ভাব্য ব্যাপার ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে : যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কার পেয়েছেন, অযোগ্য ব্যক্তিও পেয়েছেন, আবার সুখের কথা অনেক অযোগ্য ব্যক্তি পান নি এবং হায়, যোগ্য ব্যক্তিও না। সুতরাং যে কেউ পুরস্কার পেলেই আমরা খুশি হই না বা সাধারণভাবে পুরস্কার কোনো বিচারের মাপকাঠি নয় নিশ্চয় কারো কাছে। কিন্তু খুশি হই যোগ্য ব্যক্তি পেলে এবং পুরস্কারটার মর্যাদাও বেড়ে যায় আমাদের চোখে। 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার নিশ্চয়ই নিজেই সম্মানিত হয়েছে বিষ্ণু দে-র মতো রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবিকে পুরস্কৃত করে। এবং এতাবৎকাল পুরস্কৃত ব্যক্তিদের তালিকা দেখলে ভাবতে ইচ্ছে করে, কতোখানি সচেতন এবং কতোখানি আকস্মিক জানি না, একটা মনোভঙ্গি হয়তো কাজ করে থাকতেও পারে নির্বাচনে। অবাঙালি কবিরা যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁরা প্রায় অধিকাংশই 'মহাকাব্য'র রচয়িতা কিংবা তাঁদের কাব্যে রয়েছে মহাকাব্যোচিত আকাঙ্ক্ষা, এ রকম বলা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এর আগে পুরস্কৃত হয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সে বিচারেও আমাদের খুবই সায় ছিল। তখন যাঁরা জীবিত তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর ছাড়া কার উপন্যাসেই বা আমরা পেয়েছি বাঙলাদেশের নাড়ি-ছেঁড়া গ্রামীণ সমাজের একেবারে ভেতরের খবর এবং পুরস্কৃত 'গণদেবতা'য় যেন সেই বাঙলাদেশের আসল মানুষগুলিরই ব্যাপ্ত পরিচয়, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা

ব্যর্থতা সংকীর্ণতা ঔদার্য সংস্কার ব্রতকথা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে মাখামাখি বাস্তবতা। আর বিষ্ণু দে-ই তো আমাদের উপহার দেন পাঁচটি দশকের বাঙলাদেশের আরো উচ্চাকাঙ্ক্ষী আরো জটিল দ্বন্দ্বমুখর বাস্তবের বিন্যাস—আমাদের স্বদেশের ও স্বকালের স্মৃতি সত্তা ও ভবিষ্যতের কথা। রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে কজন বাঙালি লেখক এই মহাকাব্যিক বিস্তারকে স্পর্শ করেছেন, তারাশঙ্কর ও বিষ্ণু দে তাঁদের অন্যতম। আবার বলছি, কতোখানি সচেতনভাবে জানি না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই দুজন লেখককে পুরস্কৃত করে পুরস্কার-কমিটি অসামান্য মূল্যবোধের পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' পর্যন্ত বহুপ্রসূ রচনায় আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা ভাঙাগড়ার তালে তালে বিষ্ণু দে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন বাস্তবের গোটা চেহারা, কবিতার ভাষায়, কবির প্রজ্ঞায়, ধারা-বাহিকতার সজ্ঞানে—বর্তমান উপচে পড়েছে ভবিষ্যতের চিন্তায়, সুখী সমাজের ভবিষ্যৎ-কল্পনায়, প্রেরণা দিয়েছেন তিনি আমাদের সংগ্রামে ও নৈরাশ্যে।

তাই যে-কোনো ক্ষেত্রের সংগ্রামী মানুষেরই নিশ্চয় খুবই সুখী হওয়ার আছে এই পুরস্কারের খবরে এবং সেই সুখের মুহূর্তে তাঁরা স্মরণ করতে পারেন তাঁদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রামে কবির সাহচর্যের কথা। ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যান্দোলনের সময়েই তাঁকে দেখেছি প্রত্যক্ষ ভূমিকায়, ফ্যাসিবিরোধী লেখক সঙ্ঘের অন্যতম সম্পাদক রূপে এবং '২২শে জুন'-এর সেই দীপ্ত কবিতায়। কিংবা 'সন্দ্বীপের চর'-এ কৃষক-আন্দোলনের সেই দিনগুলিতে তীব্র উদ্বেলিত কবিতায়। দাঙ্গা, স্বাধীনতা, অতিবামপন্থার বিপর্যয়, স্বাধীনতা-উত্তর পরিকল্পনার চোরাবালি—'অন্বিষ্ট' থেকে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' পর্যন্ত তাঁর কবিতায় একে একে এসেছে এই সব ঘটনা ও দুর্ঘটনার সঙ্গে আত্মীয়তা, সহযোদ্ধা শরিকের কলম থেকে। আর আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ম্যাকডিয়রমিড কথিত সেই অভ্রান্ত নাবিকের মতো তিনি কম্পাস নিয়ে বসে আছেন সহযাত্রীদের সঙ্গে একই নৌকোয়, কখনো বেচাল হন নি। সাহিত্যে অতিবাম যান্ত্রিকতা ও দক্ষিণপন্থী সাহিত্যবিলাসের মাঝখানে নিজের দ্বান্দ্বিক সমাধানে, কখনো ভুল হয় নি ইতিহাসের অমোঘ শান্তি ও সুখের কথা শোনাতে, সাময়িক বিভ্রান্তিতে তিনি ভরসা হারান নি রাজনীতি-বিষয়ে—এদেশের ওদেশের নানা রাজনৈতিক

দুর্ঘটনায় বরং সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর মার্কসবাদী প্রজ্ঞা, আস্থা বেড়েছে ইতিহাসের ট্রাজিক উল্লাসে। তাই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার তিনি অপরাজিত বন্ধু সেই 'ফ্রেণ্ডস অব দি সোভিয়েত ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই। স্বদেশের ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিভেদের শোকাবহ চেহারা আমাদের অনেককে নিষ্ক্রিয় ও নৈরাশ্যগ্রস্ত করলেও তিনি হাল ছাড়েন নি। এ সমস্ত ঘটনার বিষাদ ও ক্লান্তি তাঁর কলমকে ছুঁয়েছে সত্যিই, কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের চাপ যে হারিয়ে যায় নি তার প্রমাণ কি পাই নি বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক দুঃখ ও গৌরবের প্রতিক্রিয়ায় লিখিত তাঁর দীর্ঘ অসম্পূর্ণ কবিতাতে?

আমাদের দেশের সমস্যা যে কত বিপুল ও বিচিত্র: আমাদের ঐতিহ্যের সমস্যা, আমাদের আধুনিকতার সমস্যা, আমাদের একান্ত স্বতন্ত্র নিজস্ব বাস্তবতার সমস্যা, একদিকে আমাদের অনুকরণপ্রিয় শিকড়হীন সাহেবিয়ানার সমস্যা, আবার অন্যদিকে আমাদের কূপমণ্ডুক স্থবির গেঁয়োমির সমস্যা—এই সব সমস্যার যে সুপারস্ট্রাকচার বা ডালপালার দিক তা সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিভাত হল তাঁর মার্কসবাদী আত্মজিজ্ঞাসায়, তাঁর কবিতায় ও প্রবন্ধে। সৃজনশীল মার্কসবাদ বোধহয় কোনো দেশের প্রাসঙ্গিকতায় মার্কসবাদের কালোচিত ও স্থানোচিত প্রয়োগেই নিহিত—সেই দিক থেকে বাঙলাদেশের অতীত বর্তমান ও স্বপ্ন-ভাবনায়, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের চিন্তায়, তাঁর অবদান আমাদের দেশের বিপ্লবী সাহিত্যের একটি প্রধান স্তম্ভ। তাই তাঁর সাম্প্রতিকতম ইংরেজি প্রবন্ধগ্রন্থ 'ইন দি সান অ্যাণ্ড দি রেন' মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের জগতে একটা বড় সুখবর।

তাঁর রচনায় পরিচয় মেলে যেমন একদিকে তাঁর বিশ্বনাগরিকতার বিস্তার, তাঁর মননশীল বৈদগ্ধ্য, পশ্চিমী বুর্জোয়া জগতের ও সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী অভিজ্ঞতা যেখানে স্বীকৃত সমাজ ও শিল্পচিন্তায়—অপর দিকে তেমনই তিনি নেমে আসেন আমাদের একান্ত স্বদেশী প্রকৃতির আবেগে, স্বদেশী নির্ধন মানুষে, গ্রামের চাষবাস থেকে লোকসংস্কৃতি পর্যন্ত সবকিছুর অন্তরঙ্গ নৈকট্যে। সেই সমগ্র মানুষের ধ্যান তিনি করে চলেছেন, স্বপ্ন দেখছেন সমাজের সেই সাম্যে, যেখানে সব রকমের গৌণতা ও বিচ্ছিন্নতার অবসান। আমাদের দেশের এই চারণ কবি, যাঁর মধ্যে স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি সবচেয়ে অবিকল রূপে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁকে স্বীকৃতি জানানো আমাদের সকলেরই কর্তব্য।

'পরিচয়'-এর পক্ষে আরো বিশেষ করে সুখের ও গৌরবের বিষয় হল এই, বিষ্ণু দে শুধু এই পত্রিকার উপদেশকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্যই নন, 'পরিচয়'-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আরো গভীর, আরো ঘনিষ্ঠ এবং অনেককালের। লেখক হিসাবে তিনি 'পরিচয়'-এর সব রকমের দাবি মেনে নিয়েছেন, প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ 'পরিচয়'-এর পাতায় দিনের পর দিন বেরিয়েছে, পত্রিকাকে চারিত্র্য দিয়েছে, তিনি আমাদেরই লোক। সেই আপনজন হিসেবেই 'পরিচয়'-এর আনন্দ করার আছে তাঁর এই স্বীকৃতির দিনে।

অরুণ সেন

আসন্ন শান্তি মহাসম্মেলন

পাবলো নেরুদা তাঁর এক বিখ্যাত কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে লাতিন আমেরিকা, পরোক্ষে সারা পৃথিবীর, নিরন্ন নিপীড়িত মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন সংগ্রাম করতে শান্তির জন্যে। এ কালের বহু মানবদরদী মানুষ এমনি করেই ডাক দিয়েছেন দেশ-বিদেশের সহমর্মীদের শান্তির সংগ্রামে সামিল হতে। এ সবই পনেরো-বিশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু আজো তাঁদের সেই ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সমান আছে, কোথাও কোথাও বেড়েও গেছে।

শান্তির জন্যে যে লড়াই, সে লড়াই বলাবাহুল্য শান্তির শত্রু, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে। দেশে দেশে কোটি কোটি মানুষ একে একে দুয়ে দুয়ে যতই সেই লড়াইয়ে এসে সামিল হচ্ছেন—সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়ার আসন্ন বিপর্যয় যতই ত্বরান্বিত হচ্ছে, ততই তার মরীয়া মনোভাবের প্রকাশ ঘটছে বেশি বেশি করে।

শান্তির জন্যে সংগ্রামের অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তার সব রকমের জোট, ছলচাতুরি, সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে লড়াই। এক কথায় শান্তি যারা বিনষ্ট করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই। অর্থাৎ যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তাই শান্তির সংগ্রাম হল সব রকমের যুদ্ধ ও যুদ্ধ বাধাবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়।

সাম্রাজ্যবাদ যেখানে যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধকে বিস্তৃত করে নিজের বাঁচার মেয়াদটুকু বাড়াতে চাইছে, সেখানে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলায় তার মারণাস্ত্রের পাল্টা জবাব দিয়ে, তাকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার পথে যে-কোনো সমস্যার মীমাংসায় বাধ্য করাটাও শান্তির জন্যেই সংগ্রাম। আজকের ভিয়েতনামে মুক্তিযোদ্ধারা সে লড়াই করে চলেছেন। ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াই তাই মানুষের সপক্ষে, শান্তির সপক্ষে।

এক কথায় সাম্রাজ্যবাদকে যুদ্ধ করতে না দিয়ে শান্তি বজায় রাখা, এবং যেখানে সে মরীয়া হয়ে লড়ছে সেখানে তাকে লড়াই বন্ধ করতে বাধ্য করা, এ দুটোই শান্তির সংগ্রাম। শান্তি আন্দোলন তাই একদিকে আন্দোলন, অন্য দিকে ভিন্নতর পরিস্থিতিতে সংগ্রাম।

ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কোটি কোটি মানুষের দুনিয়াজোড়া সমর্থন শান্তি আন্দোলনের এই দিকটাকেই তুলে ধরেছে। ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় আসন্ন। এবারের পারী বৈঠক সফল হোক বা ব্যর্থ হোক, ভিয়েতনামে আরো কয়েক লক্ষ টন মার্কিনী বোমা পড়ুক আর নাই পড়ুক, সাম্রাজ্যবাদকে ভিয়েতনামে হার মানতেই হবে। কিন্তু ভিয়েতনামের যুদ্ধের পরেও সাম্রাজ্যবাদ বেঁচে থাকবে এবং বাঁচার জন্যে আরো সচেষ্ট হবে। সাম্রাজ্যবাদের বেঁচে থাকার অর্থই হল যুদ্ধ থাকা, যুদ্ধের কারণগুলি বজায় থাকা। তাই দরকার শান্তির জন্যে সদা সতর্ক প্রহরা। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে সারা ভারত শান্তি সংসদ ও আফ্রো-এশীয় সংহতি সমিতি একটা শান্তি মহাসম্মেলন আহ্বান করেছেন।

দক্ষিণ এশিয়ায়, অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের নজর পড়েছে বহুকাল থেকে। ভারত যখন অবিভক্ত ছিল তখন গোটা দেশটাই ছিল সাম্রাজ্যবাদের দখলে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, ভারত-পাকিস্তান নিয়ে তার নীতির চেহারাটা বদলে গেছে। তা ছাড়া ইংরেজদের জায়গায় এসেছে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার শিরোমণি মার্কিনী প্রশাসন। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটানা পঁচিশ বছর ধরে উত্তেজনা বজায় রেখে, শত্রুতা সৃষ্টি করে, যুদ্ধ বাধিয়ে, নানা সমস্যার বোঝা এদের ঘাড়ে চাপিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বেশ বহাল তবিয়তে তার স্বার্থ সিদ্ধি করে চলেছিল। উপমহাদেশের মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সতর্ক দৃষ্টি বজায় রাখায়,

ঐ চক্রান্ত বহুদূর প্রসারিত হলেও কখনো তা সাম্রাজ্যবাদকে উপমহাদেশে সরাসরি হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয় নি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এই অসুবিধা দূর করতে কখনো চেষ্টার ত্রুটি করে নি। বিগত পঁচিশ বছর ধরে প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে তারই প্ররোচনায়, তারই শক্তি সামর্থ্যের জোরে বারে বারে সংঘর্ষ বেধেছে এই উপমহাদেশে। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের তিক্ততা শুধু দ্বিজাতিতত্ত্বের জের হিসেবেই এতো কাল টিকে থাকতে পারত না, যদি না তার পিছনে থাকত সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনা।

কিন্তু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জটিলতা যখন বাঙলাদেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের স্তরে উত্তীর্ণ হল, তখনই সাম্রাজ্যবাদের দূরে থেকে চক্রান্তের বেড়াজালে উপমহাদেশের রাজনীতিকে বিষাক্ত করে দেওয়ার অপচেষ্টায় বাধা পড়ল। এ কথা আজ সকলেরই জানা যে বাঙলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বাধা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সাম্রাজ্যবাদ সফল হয় নি। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সামান্য অনুকূল থাকলে সাম্রাজ্যবাদ এই যুদ্ধে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতেও দ্বিধা করত না। কিন্তু ভিয়েতনামে মার্কিনী সমরশক্তি প্রায় সর্বাত্মক ভাবে লিপ্ত হয়ে থাকায় এবং পশ্চিম এশিয়ায় আরব-ইস্রায়েলী সম্পর্কে যে-কোনো মূহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটার আশংকা থাকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এশিয়া নতুনতর কোনো সামরিক দায়দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়ার সুযোগ ছিল কম। তা ছাড়া রুশ-ভারত-পাকিস্তান শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের স্বার্থকে জড়িয়ে ফেলায় সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও কমে যায়। নিঃসন্দেহে সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল মহলে বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি ক্রমবর্ধমান সমর্থন. এমন কি মার্কিন মুলুকেও একটা যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ব্যাপক হয়ে পড়ায়, নিক্সন প্রশাসনের পক্ষে উপমহাদেশের রাজনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় নি। নিক্সন সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে একটা জুয়াখেলার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে পড়ায়, মুক্তিসংগ্রামের গতিপ্রকৃতি ব্যাহত হয় নি।

যে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিক্সনী প্রশাসনের চক্ষুশূল ছিল, তাকে অল্পকালের মধ্যে স্বীকার করে নিয়ে, মার্কিনদেশ চাইছে, বাঙলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে সেখানে একটা ঘাঁটি তৈরি করতে। তাহলে

পশ্চিমে সিয়াটো জোটের সহযোগী পাকিস্তান এবং পূর্বে অর্থনৈতিক বিচারে পরনির্ভর বাঙলাদেশকে দিয়ে উপমহাদেশে মার্কিনী কলকৌশলের নতুন ক্ষেত্র গড়ে তোলা হয়তো সম্ভব হবে। ভারত-বাঙলাদেশ সম্পর্ক ও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক তথা সাম্প্রতিক সিমলা বৈঠককে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেই তার গুরুত্ব ধরা পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের চরম ব্যর্থতা তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যখন ভারত-বাঙলাদেশ ও পাকিস্তান—উপমহাদেশের এই তিন রাষ্ট্র পারস্পরিক সম্পর্ককে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থের তাগিদে স্বাভাবিক ও সুষম করে তুলতে পারবে। আসন্ন শান্তি মহাসম্মেলনের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু শান্তি মহাসম্মেলন শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনায় শেষ হবে না। পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক সমস্যা, আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রাম, সুদূর লাতিন আমেরিকায় মার্কিনী শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন, চিলির সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভারত মহাসাগরের সমস্যাবলী নিয়েও সচেষ্ট হবে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বিচার, মুল্যায়ন ও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে। আর সর্বোপরি থাকবে ভিয়েতনামের সমস্যা। গণতন্ত্রী ভিয়েতনাম ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম, চিলি সহ লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোয় সম্মেলনের আলোচনাকে সজীব, সার্থক ও কার্যকরী করে তুলতে সাহায্য করবেন। মার্কিন দেশের গণতন্ত্রী মহানেত্রী এঞ্জেলা ডেভিসের উপস্থিতি সম্মেলনে এনে দেবে এক বিস্তৃত অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ। ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকলে, পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিনিধিত্বও সম্মেলনে সম্ভব হতে পারে। বাঙলাদেশের সরকার ও অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিরা যে সম্মেলনকে সফল করতে তাঁদের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার আলোয় তৃতীয় দুনিয়ার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠবেন, সে আশা সুনিশ্চিতভাবেই করা যায়। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার শিরোমণি সোভিয়েত, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার শান্তি আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ ও বিশ্বখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই যোগ দেবেন পারস্পরিক মত বিনিময়ে।

আগামী সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতায় শান্তি মহাসম্মেলনের এই অনুষ্ঠান যে অসীম গুরুত্ব বহন করে আনবে, তা সুনিশ্চিত।

বাসব সরকার

ভবানী সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

১৯০৯ অধুনা বাঙলাদেশের খুলনা জেলার পয়োগ্রাম-কসবা গ্রামে এক দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। তাঁর দাদামশায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

১৯২৩-২৪ : খুলনা জেলার মূলঘর স্কুলের ছাত্র। প্রথম রাজনৈতিক জীবন শুরু। যশোহর-খুলনা যুব সংঘ নামক একটি বিপ্লবী দলের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ। এই সংঘের অন্যতম নেতা নির্মল দাশ তাঁকে রাজনীতির আবর্তে সর্বপ্রথম টেনে আনেন। এই সময় আজকের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড প্রমথ ভৌমিকও তাঁকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন।

১৯২৫ : মূলঘর স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সসম্মানে উত্তীর্ণ। প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য বিভাগীয় বৃত্তি লাভ।

১৯২৫ : বাগেরহাট শহরে অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ মহাশয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চরকায় সুতো কাটার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার ও পুরস্কার লাভ। এই উপলক্ষে ১৯২৫ সালের ১৮ই এপ্রিল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় (আনন্দবাজার পত্রিকা) সম্ভবত প্রথম তাঁর নাম প্রকাশ।

১৯২৫-২৭ : খুলনার দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে (কলেজে) অধ্যয়ন। এই কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বৃত্তি পেয়ে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এই সময় যশোহর-খুলনা যুব সংঘের সক্রিয় কর্মী হিসেবে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। বিপ্লবী নেতা কমরেড প্রমথ ভৌমিক ও কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন। মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ ও মার্কসীয় গ্রন্থাদি পাঠ শুরু। খালিশপুরের তৎকালীন স্বরাজ আশ্রমকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত রাজনৈতিক জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

১৯২৭-২৯ : কলকাতায় আগমন। স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন। অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ. পাশ। আরও মার্কসীয় সাহিত্য

পাঠ। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী তৎপরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেও কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রতি অনুরক্ত এক গুপ্তচক্রে যোগদান।

১৯৩০ : কলকাতায় গঠিত কমিউনিস্ট গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। এই গ্রুপ পরিচালিত হত ট্রটস্কীপন্থীদের দ্বারা। এই গ্রুপে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দলনেতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান। শ্রমিক-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ।

১৯৩১ : বেঙ্গল ক্রিমিনাল এ্যামেণ্ডমেণ্ড এ্যাক্ট অনুসারে ডিসেম্বর মাসে সন্ত্রাসবাদী নেতা হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী। আত্মগোপন শুরু। আত্মগোপন করে শ্রমিক-আন্দোলন সংগঠন ও 'কারখানা' নামক একটি বাঙলা-সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা।

১৯৩২-৩৩ : ১৯৩২ সালের ২২ মে গ্রেপ্তার। গোপন জীবনের অবসান ও কারাজীবন শুরু। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আলিপুর জেলে অবস্থান। মার্চ মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত হিজলী বন্দীশালায় দুঃসহ জীবনযাপন।

১৯৩৩-৩৮ : হিজলী বন্দী-শিবির থেকে রাজস্থানের দেউলী বন্দী-শিবিরে প্রেরণ। ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৩৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত দেউলীতে বিনা বিচারে বন্দী। বন্দীজীবনে গভীর ভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য অধ্যয়ন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সঠিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা রূপে গ্রহণ। দেউলী বন্দী-শিবিরের কমিউনিস্ট কনসোলিডেশান-এ যোগদান এবং মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের তাত্ত্বিক প্রবক্তারূপে সন্ত্রাসবাদী সহবন্দীদের কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে টেনে আনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের একাংশ কর্তৃক কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ।

১৯৩৮-৩৯ : ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে বন্দীজীবনের অবসান। মুক্তজীবনে ১৯৩৮ সালের নভেম্বরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ। এই সময় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ। লিলুয়া ও কাঁচড়াপাড়ার রেল-শ্রমিক এবং কলকাতার ডক ও জাহাজী শ্রমিকদের

মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ।

১৯৩৯-৪১ : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু। আধা-আইনসঙ্গত কমিউনিস্ট পার্টির উপর প্রচণ্ড দমননীতি শুরু। বেআইনী পার্টি-সংগঠন গড়ার জন্য তাঁর উপর ভার অর্পণ। পুনর্বার আত্মগোপন। ১৯৪০ সালে তাঁর উপর কলকাতা ও শিল্পাঞ্চল থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারী। আত্মগোপন করে পার্টি-সংগঠন পরিচালনা। ১৯৪১ সালে আত্মগোপন অবস্থায় শ্রীমতী ইন্দিরার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। পূর্ব বাঙলার কৃষক-আন্দোলনে প্রধান সংগঠক রূপে আত্মনিয়োগ।

১৯৪২ : জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে বেআইনী আদেশ প্রত্যাহার। আত্মগোপন থেকে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ। প্রাদেশিক কমিটির অস্থায়ী সম্পাদক রূপে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যভার গ্রহণ।

১৯৪৩-৪৫ : মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলনে নির্বাচিত সম্পাদক রূপে পার্টি পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ। এ-বছর বোম্বেতে অনুষ্ঠিত পার্টির প্রথম কংগ্রেসে বাঙলার প্রতিনিধিদলের নেতা রূপে যোগদান। প্রথম পার্টি কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত। পার্টির আইনী যুগে তাঁর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট-বিরোধী নানা কুৎসা ও অপপ্রচার অতিক্রম করে বাঙলায় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের বিস্তার। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্তের মধ্যে পার্টির জঙ্গী গণভিত্তি স্থাপন। বাঙলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে নিরন্ন মানুষকে বাঁচাবার জন্য সমগ্র পার্টিকে সক্রিয় করে তোলা। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে জঙ্গী কৃষক-সংগঠনের বিপুল বিস্তার। তাত্ত্বিক নেতা, সংগঠক, সুবক্তা, প্রচারক এবং যুক্তিধর্মী লেখকরূপে জনমনে প্রতিষ্ঠালাভ। এই সময় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভাঙনের মুখে বাংলা' ও 'মুক্তির পথে বাংলা' প্রকাশিত হয়।

১৯৪৬-৪৭ : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় নেতৃত্ব প্রদান। পার্টিকে গণ-সংগ্রাম অভিমুখী করে গড়ে তোলার জন্যে ব্যাপক প্রয়াস। ১৯৪৬-৪৭ সালের বঞ্চিত কৃষকের ঐতিহাসিক তেভাগা সংগ্রামের তাত্ত্বিক নেতা ও শ্রেষ্ঠ সংগঠক। দাঙ্গা-বিরোধী অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ।

১৯৪৮-৫১ : ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার। দ্বিতীয় কংগ্রেসে রাজনৈতিক প্রস্তাবের উত্থাপক। কমরেড পি. সি. যোশীর নেতৃত্বের অবসান। বি. টি. রণদিভের হঠকারী যুগের সূচনা। দ্বিতীয় কংগ্রেসে রণদিভে-নীতির সহযোগী হিসাবে কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর সদস্য-নির্বাচন। দ্বিতীয় কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই কংগ্রেস-সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা। আবার আত্মগোপন শুরু। এই সময় 'মার্কসবাদী' সংকলনে বীরেন পাল ও রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে নানা বিতর্কমূলক রচনা প্রকাশ। ১৯৫০ সালে অতিবামপন্থী হঠকারী নীতি সম্পর্কে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম শুরু। ভুল নীতির প্রবক্তা হিসেবে সকল নেতৃপদ থেকে অপসারণ। ভুলনীতি স্বীকার করে প্রকৃত কমিউনিস্ট-এর মতো আত্মসমালোচনা। পার্টি আইনসঙ্গত হওয়ার পর আত্মপ্রকাশ।

১৯৫১-৫৫ : তৎকালীন রাজ্য-পার্টি নেতৃত্ব-কর্তৃক পার্টি শৃংখলার নামে জুলুম-বাজি শুরু। রাজনৈতিক জীবন বিপন্ন করার সকল কারসাজি অগ্রাহ্য করে বারাসত-এর গ্রামে সাধারণ সভ্যরূপে পুনর্বার পার্টি জীবন আরম্ভ। আশ্চর্য শৃংখলাবোধ, ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় প্রদান। কৃষক আন্দোলন ও ভারতের কৃষিসমস্যা সম্পর্কে নতুন বিচার-বিশ্লেষণের পথে অগ্রযাত্রা। ১৯৫৪ সালে সারা ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদকরূপে নির্বাচিত। ১৯৫২ সালে 'এগ্রেরিয়ান ক্রাইসিস ইন ইণ্ডিয়া' ও ১৯৫৫ সালে 'ল্যাণ্ড সিস্টেম এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্ম ইন ইণ্ডিয়া' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৫৬ : পালঘাট পার্টি-কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কমরেড অজয় ঘোষ সম্পাদিত 'ফোরাম'-এর প্রথম সংখ্যায় জাতীয় মোর্চার তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের প্রকাশ। পালঘাট কংগ্রেসে জাতীয় মোর্চার তত্ত্ব অগ্রাহ্য। এই তত্ত্বের সপক্ষে প্রায় নিঃসঙ্গ লড়াই।

১৯৫৮ : অমৃতসর কংগ্রেসে পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

১৯৫৯-৬২ : মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে

বিভেদ সৃষ্টি। বামপন্থী সংকীর্ণতা ও হঠকারিতার বিরুদ্ধে নতুন সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান। ১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদ। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন হঠকারী নেতৃত্ব গ্রেপ্তার বরণ করায় অস্থায়ী সম্পাদকরূপে রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৬৪-৬৭ : ১৯৬৪ সালে বিচ্ছিন্নতাকামীদের নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধা বিভক্তি। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হঠকারী গোষ্ঠী বের হয়ে সি. পি. এম. গঠন করলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য শাখার সম্পাদক রূপে নির্বাচিত। সি. পি. এম.-এর চূড়ান্ত হঠকারী নীতি ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নতুনভাবে গড়ে তোলার সংগ্রামে অগ্রণীর ভূমিকা পালন। ১৯৬৬ সালে 'কালান্তর' দৈনিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধার জন্য পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের তত্ত্বকে সার্থকভাবে প্রয়োগ। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে প্রচার-অভিযানকালে পশ্চিম দিনাজপুরে জীপ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত।

১৯৬৮ : পার্টির পাটনা কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত।

১৯৭০ : বারাসাতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি নির্বাচিত। কৃষকের জমি দখলের লড়াই-এ নেতৃত্ব প্রদান।

১৯৭১ বাঙলাদেশে মুক্তি-সংগ্রাম শুরু হলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বাঙলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি ভ্রাতৃপ্রতিম সকল সহযোগিতা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন। বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের পার্টিকে সক্রিয় ভূমিকা পালনে নিরন্তর সহায়তা দান।

১৯৭২ কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে পুনর্বার কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী যুক্তফ্রন্ট (প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা)

গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। জুন মাসে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে কমরেড ডিমিট্রভের স্মৃতিসভায় যোগদান। প্রাগ-বার্লিন ঘুরে ৮ই জুলাই মস্কো আগমন। ১০ই জুলাই সকালে আকস্মিক হৃদরোগে মস্কো নগরীতে এই মহান নেতার জীবনাবসান।

ধনঞ্জয় দাশ

'পরিচয়'-এ প্রকাশিত ভবানী সেনের রচনাগুলির একটি তালিকা আমরা পরবর্তী কোনো সংখ্যায় প্রকাশ করব।

—সম্পাদক

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

[জন্ম : ২৯এ জুন ১৮৯৩ / মৃত্যু : ২৮এ জুন ১৯৭২]

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ জগতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন স্ট্যাটিসটি-সিয়ান বা পরিসংখ্যানবিদ হিসেবে। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিট্যুট তাঁর বিরাট কীর্তি। সারা পৃথিবীর বহু বিখ্যাত পণ্ডিত—শুধু পরিসংখ্যানবিদ নয়—গণিত, পদার্থবিদ্যা, জৈববিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যাঁদের স্থান একেবারে প্রথম শ্রেণীতে তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানে বারবার এসেছেন, কেউ অল্প কেউ বেশিদিনের জন্য এবং এখানকার গবেষণা ও শিক্ষণকার্যে প্রভূত সহায়তা করেছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও বৈদেশিক নানা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে বারবার গিয়েছেন পৃথিবীর নানা দেশে।

১৯৪৫ সালে অধ্যাপক মহলানবিশ ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালের পর থেকে তাঁর অর্ধেক সময় কাটত বিদেশে। কারণ ১৯৪৬ সালে তিনি ইউনাইটেড নেশনস স্ট্যাটিসটিক্যাল কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হনএবং তারপর ইউনাইটেড নেশনস ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান বিষয়ক নানা কাজে বিশেষ জড়িত হয়ে পড়েন। তাছাড়া বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বারবার নিমন্ত্রণ করা হত ওঁকে বক্তৃতা ও আলোচনার জন্য। এইসব কাজের সূত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ওঁর অন্তরঙ্গ ও আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং ১৯৫৮ সালে ঐ দেশের এ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের তিনি বৈদেশিক-সভ্য নির্বাচিত হন।

বৈজ্ঞানিক কাজের উপলক্ষে এইভাবে অধ্যাপক মহলানবিশ বিদেশ যাত্রা করেন সত্তর বারেরও বেশি।···

প্রশান্তচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাধনার পরিচয় দিতে হলে বড় রকমের প্রবন্ধ লিখতে হয়। এবং তা সম্ভব একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে। মোটামুটি একটি কথা এখানে বলা যেতে পারে। পরিসংখ্যানচর্চায় একেবারে গোড়া থেকে তাঁর দৃষ্টি ছিল সমাজকল্যাণের দিকে। পরিসংখ্যানকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন এমন এক হাতিয়ার হিসেবে যাতে জাতীয়জীবনের নানা সমস্যার

সমাধান সম্ভব হয় ও নব নব উন্মেষের পথ প্রশস্ত হয়। এই বিষয়ে নিত্যনূতন ভাবনায় তিনি তন্ময় ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

পরিসংখ্যানচর্চায় তিনি যাঁদের উৎসাহ পেয়েছেন এবং যাঁদের নাম বার-বার উল্লেখ করেছেন সভাসমিতিতে তাঁরা হলেন বাঙলাদেশের তিন শ্রেষ্ঠ মনীষী: প্রশান্তচন্দ্রের মাতুল ডাঃ নীলরতন সরকার, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার লেবরেটরির একটি অংশে তিনি যখন পরিসংখ্যানচর্চার কেন্দ্র স্ট্যাটিসটিক্যাল লেবরেটরি স্থাপন করেন, তার কিছুদিন পরে সরকার থেকে প্রস্তাব হয় যে তাঁকে চাকুরির রীতি অনুসারে কোনো মফঃস্বল কলেজে পাঠানো হবে অধ্যক্ষ হিসেবে। পরিসংখ্যানে তখন তিনি সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। শুধু তাই নয়। তাঁকে ঘিরে এমন একটি ছাত্রমণ্ডলী গড়ে উঠেছে যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে জগতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রশান্তচন্দ্র সর্বনাশ গণলেন। এবং শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন দরকার হলে চাকরি ছাড়বেন কিন্তু পরিসংখ্যানের যে-কেন্দ্রটি তখন বেশ জোরালভাবে বাসা গেড়েছে তাকে নষ্ট হতে দেবেন না।

কিন্তু চাকরি গেলে তো বেকার লেবরেটরি ছাড়তে হবে। সুতরাং দরকার হবে আরেকটি কেন্দ্রের। অতএব ছোটাছুটি শুরু করলেন কলকাতার এদিক-ওদিক নতুন এক বাসার সন্ধানে। এ-বিষয়ে তাঁর মনে যেটুকু দ্বিধা তা ঘুচিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি প্রশান্তচন্দ্রকে শুধু পুরোপুরি সমর্থন করেন নি, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন পরিসংখ্যানকেন্দ্রের উপযুক্ত বাসার সন্ধানে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক মহলানবিশ কলকাতাতেই থেকে গেলেন এবং তার ফলে শুধু তাঁর নিজের নয় রবীন্দ্রনাথেরও ঘাড় থেকে একটা আপদ নামল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের পরিচয় আবাল্য। তিনি ছেলেবেলায় শিক্ষালাভ করেন কলকাতায় ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে। কিন্তু কলকাতায় এবং শান্তি-নিকেতনে কবির কাছে তিনি নিরন্তর যাতায়াত করতেন ও কবিশান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময় প্রশান্তচন্দ্রকে সভ্য মনোনীত করেন। বিশ্ব-ভারতী প্রতিষ্ঠার সময় প্রশান্তচন্দ্র ছিলেন কবির দক্ষিণ হস্তের মতন। এই কাজে তিনি এত বেশি সময় দিতেন যে একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের এক কর্মচারীকে গ্রাস করেছে বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতীর সংবিধান প্রায় তাঁরই রচনা। এরপর

রীতিমতো বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হল। তার যুগ্ম সম্পাদক হন রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র। এই কাজেরও ঝামেলার অন্ত ছিল না।

প্রশান্তচন্দ্রের আরেকটি কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের একেবারে গোড়ার দিককার নানা রচনা সম্বন্ধে আলোচনা যতদূর মনে পড়ে প্রথম করেন তিনিই। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধে (১৯২২) তিনিই প্রথম দেখান যে বিশ্বভারতীতে যে আদর্শের বিকাশ তার আভাস পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনী বিষয়ে নানা তথ্যের সংগ্রহে তিনি অগ্রণী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনীর প্রথম খণ্ড যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তাতে যে সকল গুরুতর তথ্যঘটিত ভুল ছিল তা তিনি দেখিয়ে দেন। উত্তরজীবনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত যোগ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার অবসর তিনি পান নি। কেন না তিনি সমাহিত হয়েছিলেন পরিসংখ্যানে।

কিন্তু ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বেশ একটি বড় প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তাতে এখন 'বাঙলাদেশ' বলতে যে অঞ্চল বোঝায় তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগের কথা উল্লেখ করেন। ১৯২৬ সালে প্রশান্তচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী নির্মলকুমারী রবীন্দ্রনাথের সাথী ছিলেন ইয়োরোপ ভ্রমণে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বেশ একটি চক্রান্তের ফলে ইটালিতে গিয়ে পড়েছিলেন মুসোলিনী ও তাঁর অনুচরদের খপ্পরে। এই সময় প্রশান্তচন্দ্র প্রায় দিনরাত খেটে ডিকশনারি দেখে দেখে যতটা সম্ভব ইটালিয়ান কাগজের মিথ্যা প্রচারের তর্জমা করে রবীন্দ্রনাথকে সব কথা বোঝাবার চেষ্টা করেন। এই সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ তাঁর 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' বইতে।

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত এবং প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় প্রায় অহোরহ তাঁর পাশে পাশে থেকেছেন প্রশান্তচন্দ্র যতক্ষণ না বড়লাটকে তাঁর বিখ্যাত চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। প্রশান্তচন্দ্র ঐ ঘটনার যা বিবরণ লিখে গেছেন তা শুধু রবীন্দ্রনাথের জীবনের নয় দেশের ইতিহাসের একটি অমূল্য দলিল।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রশান্তচন্দ্রের বলবার কথা ছিল অজস্র। এই আশা হত

যে হয়তো তিনি নিজে না লিখতে পারলেও এই সব অনেক কথা তিনি অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে রেখে যাবেন। কিন্তু ঐটুকু সময় তিনি শেষ পর্যন্ত দিতে পারলেন না! তবে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর কিছু মতামত পাওয়া যাবে তাঁর বিশেষ বন্ধু এডোয়ার্ড টমসনের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর: পোয়েট এ্যাণ্ড ড্রামাটিস্ট' বই'তে।

এই এডোয়ার্ড টমসনকে সঙ্গে নিয়ে প্রশান্তচন্দ্র একবার এসেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িতে. 'পরিচয়'-এর এক সাপ্তাহিক অধিবেশনে। অবশ্য ঠিক আড্ডা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। সুধীনের সঙ্গে টমসনের যোগাযোগের বিশেষ একটা কারণ ছিল বলেই তিনি সাহেবকে নিয়ে এসেছিলেন।

আড্ডার কথায় মনে পড়ল যে যদিও বেশির ভাগ শিল্পী-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিকের মতো তিনি আড্ডাবাজ ছিলেন না, কিন্তু একদা বিশেষ এক আড্ডার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ হয়েছিল। এই আড্ডাটির নাম হল 'মানডে ক্লাব' (১৯১৫-১৮) এবং যতদিন এই ক্লাব জীবিত ছিল প্রশান্তচন্দ্র উৎসাহের সঙ্গে এর আড্ডায় যোগ দিতেন। তবে সুকুমার রায়কে না পেলে তিনি এই ক্লাবের সভ্য হতেন কিনা সন্দেহ। ঐ সময় তিনি ও সুকুমার রায় মিলে চেষ্টা করছিলেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে নতুন প্রাণের জোয়ার আনতে। এর ফলে সৃষ্টি হল এক তুমুল আন্দোলন। এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হল সুকুমার-প্রশান্তচন্দ্রের নেতৃত্বে তরুণ সম্প্রদায়।

এই সব কথা এখন ইতিহাসেরই অঙ্গ। সেই ইতিহাসেরই অঙ্গ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের জীবনব্যাপী উজ্জ্বল সাধনা।

হিরণকুমার সান্যাল

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন লেখক, এবং ব্যক্তিগতভাবে আমরা অনেকে যাঁকে 'শান্তিদা' বলতাম, তুচ্ছ জ্ঞানেই আমাদের পুরোপুরি ছেড়ে চলে গেলেন এই তো সেদিন। তাঁর সেই সুগৌর ছটফটে চেহারা, খড়্গের মতো নাক, ঠোঁটের কোণে অষ্টপ্রহর ঝুলতে থাকা স্থির বিদ্যুৎ আর আমাদের

ভীষণ আসক্ত অথচ উদাসীন পুরুষ তিনি, আমাদের একেবারে না জানিয়েই ছেড়ে গেলেন। বাহান্ন বছর পুরতে না পুরতেই এই জেদী একরোখা অথচ বস্তুত নরম মানুষটি বাঙলা সাহিত্যের সতরঞ্চির সাম্প্রতিক ধূলো ঝেড়ে উঠে পড়লেন। বিচিত্র মানুষ ছিলেন শান্তিদা, বিচিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা। কলকাতার সারা শরীরে যখন গাঢ় রাতের অপরিমেয় ক্লান্তির কালি, এত বড় শহরের বুকের ব্যথা নিয়ে আউটরামের পাশে কুল কুল বয়ে চলেছে গঙ্গা, তখন উত্তেজিত তাঁর মুখ থেকে শুনেছি নানা রঙের জীবনের কথা। কখনো শরীরে সৈনিকের খাকি উর্দি চাপিয়েছেন (নিশ্চয়ই তাঁকে দারুণ মানাত), কখনো যন্ত্রচালিত নিরাসক্তিতে বিজ্ঞাপন সংস্থার ছাই-ভস্ম কপি লিখেছেন, কখনো এ-কাগজ থেকে ও-কাগজে কলম পিষেছেন; তারই ফাঁকে ফাঁকে জীবনের গাঢ় তৃষ্ণা নিয়ে ঘুরেছেন মানুষের মিছিলে, হাটে, ভীড়ে—অমৃত থেকে তলানি পর্যন্ত আকণ্ঠ গিলে খেয়েছেন অস্তিত্বের প্রাণরস। অসংখ্য গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা ও অনুবাদ তাঁর কলম থেকে অবলীলায় বেরিয়ে এসেছে।

নন-কমার্শিয়াল, নন-কনফার্মিস্ট শান্তিরঞ্জনের জীবনে ও লেখায় ছিল আমাদের প্রধান কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেজাজ, চিরাচরিত প্রথার বিপরীতে দাঁড়িয়ে একেবারেই ভিন্ন মর্জি ও চরিত্র বজায় রেখে লিখে গেছেন তিনি। কি রকম একটা ডেথ উইস্-এ আপ্লুত হয়ে উঠেছে তাঁর অনেক রচনা—সে কি সংস্কৃতির নামে হাঙর-বৃত্তির বিরুদ্ধেই 'অসম্ভব' ও 'অসম' অভিমান? সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে একটি একচেটিয়া সংবাদপত্রে কাজ করেও দুর্জয় অহঙ্কার ও আহত অনুভবে একটিও সৃজনশীল লেখা সেখানে ছাপান নি তিনি। কিছু খুদে খুদে প্রায় নাম না জানা কাগজ, কিছু প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকা—তাঁর সৃষ্টির সমস্ত উত্তাপ ও ভালোবাসার স্বত্ব সংরক্ষিত ছিল কেবল এ সবেরই জন্য। 'পরিচয়' পত্রিকার বরাবর বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন তিনি। গতবছর কিছু লেখেন নি। তার আগের বছর, মনে হয় এই তো সেদিন—তাঁর কর্মস্থলে সন্ধ্যেবেলা 'পরিচয়' শারদীয় সংখ্যার ও তাঁরও শেষ লেখা গল্পটি আনতে গিয়েছিলাম সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথের নির্দেশে। পূর্বাহ্নে ফোন করেছিল দীপেন। যেয়ে দেখি কি কৌতূহল ও চাপা অস্বস্তি বুকে নিয়ে বাহকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। পাণ্ডুলিপিটি জোরে জোরে পড়িয়ে শোনালেন একহাট লোকের উপস্থিতির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে, বালকের মতো অধীর

আগ্রহে মতামত শুনতে চাইলেন। 'পরিচয়' পত্রিকার ঘরে বসে তাঁর কড়ি-বরগা কাঁপানো হাসি এখনো কি মাঝে মাঝে কানে বাজে না ?

তাঁর রচনার মূলকেন্দ্রে সমস্ত ব্যর্থতা, বেদনা, অভ্যুত্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই ব্যক্তিগত মানুষ—সমাজ ও মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে যার অস্তিত্ব গিঁটে গিঁটে বাঁধা। শান্তিদা মারা গেছেন—তাঁর মৃত্যুকে উপলক্ষ করেই না হয় আবার পড়া হোক তাঁর 'শুভরাত্রি', 'জীবন যৌবন', 'মুখোমুখি', 'নিকষিত হেম', 'এসো নীপবনে', 'প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি', 'সুসমাচার'—খতিয়ে দেখে নেয়া হোক কেন শান্তিদার আরেক নাম মার খেয়েও পতাকা না ছাড়া যৌবন. কেন অলজ্জ, অবাধ, বেহিসাবী তারুণ্য ও তার ঔদ্ধত্যের তিনি ছিলেন প্রিয়তম বন্ধু। আমাদের সময়ের ব্যথার আঁত ছুঁতে তিনি যেভাবে চেষ্টা করেছেন, কই আর কারও কথা তো ঠিক তেমন ভাবে মনে পড়ে না !

লাল টকটকে গোলাপ ছিল শান্তিদার প্রিয় ফুল। তাঁর স্মৃতির প্রতি সেই গোলাপের মতোই গাঢ় ও উষ্ণ ভালোবাসা অর্পণ করতে চাই। পারি না। সে অক্ষমতা আমার। আমার সময়ের।

অমিতাভ দাশগুপ্ত